তিনে একে চার

গজেন্দ্রকুমার মিত্র

অমর সাহিত্য প্রকাশন
৭ টেমার লেন, কলিকাতা ৯

প্রথম প্রকাশ, বৈশাখ, ১৩৭০

প্রকাশক :

এন. চক্রবর্তী

অমর সাহিত্য প্রকাশন

৭ টেমার লেন, কলিকাতা ৯

মুদ্রণ :

এম. কে. লাহিড়ী

শ্রীবিজয়া প্রিন্টিং ওয়ার্কস

৫৭।৬, রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট,

কলিকাতা ৭০০০০৬

সূচীপত্র

আলেয়ার আগুন

১

আজ থেকে প্রায় পৌনে আটশো বছর আগে, খ্রীষ্টীয় ১১৯৬ সালের বৈশাখ মাসে যে সার্থবাহ দলটি গজনী থেকে দিল্লী যাত্রা করেছিল, ঘটনাচক্রে মূলতানে পৌঁছে তাদের কয়েকদিন অপেক্ষা করতে হল।

নিতান্তই দৈব বিপাক নইলে একসঙ্গে অতগুলি উট হাল ছেড়ে অসুখ বাধিয়ে বসবে কেন? তার ফলেই ওদের আটকে পড়তে হল একভাবে। ওদের সঙ্গে যা মাল তা এ কটি জীবকে বাদ দিয়ে নিজেরা কাঁধে করে বয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। তা ছাড়া উট আর খচ্চর দুইয়েরই যথেষ্ট দাম, এগুলিকে কিছু এমনি এমনি স্রেফ নসিবের ওপর ছেড়ে দিয়ে যাওয়া চলে না, আবার নতুন যে কিনে নেবে সেরকম টাকাও নেই কারও হাতে। তারা সকলেই অর্থনিঃস্ব ভাগ্যান্বেষী, বরাত ফেরাতেই এসেছে হিন্দোস্তানের হাটে। এগুলো যে বিক্রি করবে, তাই বা কিনবে কে রুগ্ন অক্ষম পশু? তার চেয়ে, মূলতানে নাকি ভাল জানোয়ারের হাকিম আছে। কাফের হিন্দু, তা হোক, নাচারীতে পড়লে অতশত বিচার করা চলে না। তাকে দেখিয়ে ওগুলোকে সারিয়ে তোলাই ভাল।

সুতরাং যতই অসুবিধা হোক, কয়েকদিনের জন্যে এখানেই ডেরাডাণ্ডা গাড়া ছাড়া উপায় রইল না। যাদের ওরই মধ্যে একটু অবস্থা ভাল তারা বিভিন্ন সরাইখানা বা চটিতে উঠল, যাদের গাঁটের অবস্থা নিতান্তই শোচনীয় তারা একটা গাছতলায় সকলের মালপত্র জড়ো করে তার চারদিকে নিজেদের অদ্বিতীয় উটের লোমের জাজিম বিছিয়ে আস্তানা ফেলল। এখানেই দুটো করে পাথরের নুড়ি পেতে চুলা তৈরী হল — তাতে রুটি পাকানো চলবে। দোকান থেকে কিনে খাওয়ার চেয়ে এতে অনেক কম খরচা পড়ে।

এই দ্বিতীয় দলে যারা ছিল তাদের মধ্যে ইখতিয়ারউদ্দীনও একজন।

ইখতিয়ারউদ্দীন মহম্মদ বখতিয়ার।

এই অভাবিত বিলম্বে ইখতিয়ারউদ্দীনই বিরক্ত হল সবচেয়ে বেশী। কারণ এদের মধ্যে কেউ না জানুক সে নিজে জানে ইখতিয়ারউদ্দিনের গাঁটের অবস্থাই সবচেয়ে শোচনীয়। অবশ্য দিল্লীতে গেলেই যে সে রাতারাতি সুলতান বনে যাবে তা নয় তবু কোশিশ তো করা যেত! এ যে একেবারেই হাত-পা গুটিয়ে বসে বসে মার খাওয়া!

সে বেচারা প্রথমে ভ্রুকুটি করল, তারপর অবিরাম নিজের ঠোঁট নিজে কামড়ে রক্তাক্ত করে তুলল কিন্তু উপায়ও কিছু খুঁজে পেল না যাত্রা ত্বরান্বিত করার। সে যে

একা যাবে বা অন্য কোন দলে ভিড়ে পড়বে তারও জো নেই, তার নিজের খচ্চরটিও অসুস্থ হয়ে পড়েছে। হিন্দোস্তানের এই দুঃসহ গরম মানুষের সহ্য হলেও জানোয়ারের হচ্ছে না দেখা গেল।...কী আর করা যাবে, নিতান্তই খুদার মার, চুপ করে সহ্য করা ছাড়া পথ নেই।

ইখ্‌তিয়ারউদ্দীনের অসহিষ্ণু হয়ে ওঠার একাধিক কারণ ছিল।

এত বড় একটা দলের মধ্যে থেকেও সে একেবারেই নির্বান্ধব। এরা কেউই তার সঙ্গে হৃদ্যতাস্থাপনে ব্যস্ত নয়, কারও কাছ থেকে বিন্দুমাত্র সহানুভূতি বা আনুকূল্য পাবার আশা নেই। বরং সাধ্যমত সবাই যেন এড়িয়ে চলতেই চায় তাকে।

অথচ, কেন যে এই বিরূপতা, কেন যে কেউ তার প্রতি সদয় নয় কারও সঙ্গে কোন অভদ্র ব্যবহার না করা সত্ত্বেও, তা ওদের কাউকে প্রশ্ন করলে সে তার ভালরকম জবাব দিতে পারবে না, আমতা আমতা করবে।

ইখ্‌তিয়ারউদ্দীন নিজে জানে অবশ্য কারণটা।

জানে বলেই এদের দিকে চোখ পড়লে সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবারই এদের দৃষ্টিতে অকারণ একটা বিরূপতা ও বিতৃষ্ণা প্রতিফলিত হতে দেখে আরও কঠিন ও তিক্ত হয়ে ওঠে সে, এবং সে তিক্ততা প্রকাশ পেতেও বিলম্ব হয় না। তাতেই এতদিনের এই সুদীর্ঘ পথের সঙ্গীদের সঙ্গে যেটুকু সৌহার্দ, যেটুকু আত্মীয়তা স্থাপিত হতে পারত সেটুকুর আর কোন সম্ভাবনা থাকে না।

কারণ ওর ঈশ্বরদত্ত এই চেহারাটা।

বয়স অল্প, আসছেও গজনী থেকে--কিন্তু ও অঞ্চলের যা বৈশিষ্ট্য, সুঠাম দৈহিক গঠন, তার চিহ্নমাত্র নেই তার মধ্যে।

ও অঞ্চল কেন- হিন্দোস্তানের এই উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের যারা অধিবাসী তারাও ওর থেকে ঢের ঢের বেশী সুগঠিতদেহ, ঢের বেশী সুদর্শন।

তা ইখ্‌তিয়ারউদ্দীনও স্বীকার করে।

করতে বাধ্য।

বুদ্ধিমান যে, সে নিজের দৈন্য সম্বন্ধে সচেতন থাকে। অপরের চোখে সে বার্তা পাঠ করা পর্যন্ত অপেক্ষা করে না।

ভুল যে মানুষ মাত্রেরই হয় শুধু তা নয়– বুঝি বা স্বয়ং ঈশ্বরেরও হয়।

ইখ্‌তিয়ারউদ্দীনের দেহটা- বলতে নেই—সেই সৃষ্টিকর্তারই ভুল।

খর্বাকৃতি—ঠিক বামন হয়ত বলা চলে না, তবে—স্বাভাবিক বেঁটে লোক আমরা যাদের বলি— যেন তাদের চেয়েও বেঁটে ; মুখটা অতি কদর্য, মর্কটের মতো তার ওপর

হাত দুটো দেহের হিসেবে অত্যন্ত বেমানান রকমের লম্বা, হাঁটু ছাড়িয়ে আরও নিচে এসে পড়েছে। যেটা সুশ্রী জোয়ান পুরুষের বেলায় সৌন্দর্যের কারণ হতে পারত, ওর বেলায় সেটা বীভৎসতার ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আর বাইরের—চেহারার এই বিকৃতির ফলেই তার মনটা এমন অস্বাভাবিক, এমন বিকৃত, এমন কঠিন হয়ে উঠেছে।

এমন রূঢ়, অকারণেই এমন অভদ্র।

হিন্দোস্তানে ঢোকার পথে এক নাঙ্গা হিন্দু ফকীরের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। ওর দলের লোকেরা ভক্তিভরে সালাম জানিয়েছিল তাকে, চেষ্টা করেছিল নিজেদের ভবিষ্যৎ ভাগ্য জানতে—শুধু ইখ তিয়ারউদ্দীনই কাছে যায় নি, বা কোন ঔৎসুক্য প্রকাশ করে নি, উদাসীন নিস্পৃহ ভাবে দূরে দাঁড়িয়েছিল। ফকীর কিন্তু ইঙ্গিতে ওকেই কাছে ডেকেছিল। পরিষ্কার পুস্ত ভাষায় প্রশ্ন করেছিল, 'বেটা, তুমি কিছু জানতে চাও না— তোমার জিন্দিগী, তোমার নসীবের খবর?'

'না, আমার দরকার নেই।' বেশ একটু রূঢ় ভাবেই উত্তর দিয়েছিল ইখ তিয়ারউদ্দীন।

কিন্তু ফকীর তাতে নারাজ হয় নি বা গুসসা করে নি। বেশ শান্ত ভাবেই উত্তর দিয়েছিল, 'সত্যিই তো আর দরকার নেই। তোমার নসিব অতি পরিষ্কার, খুব সাফ তোমার কপাল। একটা তো আর আজানুলম্বিত বাহু আমাদের শাস্ত্রমতে অতি সুলক্ষণ। এতগুলো লোকের মধ্যে তোমারই ভাগ্য বলবার মতো। বেটা তুমি জীবনে অনেক উন্নতি করবে, অনেক বড় হবে। নবাব সুবাদার তুচ্ছ সুলতান হওয়াও আশ্চর্য নয়। এমন কি সুলতানের সুলতান শাহেনশাহ হতে দেখলেও আমি অবাক হব না। তবে একটা কথা, কারও সুরৎ দেখে কখনও ভুলো না, কোন খুবসুরৎ লোক তা সে স্ত্রী কি পুরুষ বলতে পারব না তোমার সর্বনাশের কারণ হবে। খুবসুরৎ তোমার পক্ষে সুরৎ-হারামের কাজ করবে। সাবধান!'

বিশ্বাস করে নি অবশ্যই সে কাফের সন্ন্যাসীর কথা। কোন দামই দেয় নি অত ভাল ভাল ভবিষ্যদ্বাণীর। এমন কি একটা কিছু উত্তর দেওয়াও প্রয়োজন বোধ করে নি। বরং চরম ঔদ্ধত্যে ওর সামনেই অবজ্ঞাভরে থুক ফেলেছিল। কাফের ফকীরের কাছে মাথা নোয়াবে সে, সাচ্চা মুসলমানের বেটা! ওর ভাগ্যগণনায় নেচে উঠবে? ছো!

দাম তার কথার সেদিনও দেয় নি, আজও দেয় না।

নসিব যে কত ভাল সে তো বোঝাই গেছে! ভাল রকম বুঝে নিয়েছে সে।

নইলে গোড়াতেই এমন গলদ হবে কেন?

হ্যাঁ, গলদই। খুদা মেহেরবান —তবু গলদই বলবে সে।

চেহারা তার যেমনই হোক তাকৎ কি হিম্মৎ-এ সে যে মরদের বেটা মরদ, তাতে কোন সন্দেহ নেই। দিলাওয়ারী বা খয়রাত তার কারও থেকে কম নয়, কুদরৎ-হুঁসিয়ারিও তার সাধারণ মানুষের থেকে অনেক বেশী। এটা দুর্বিনয় নয় বাহাদুরিও নয় নিতান্তই সত্য কথা। কিন্তু সে ইখ্‌তিয়ারী দেখাবার ফুরসুৎই যে মিলছে না।

মিলছে না সে শুধু তার এই অপরূপ সুরতের জন্যেই।

কেউ আজ পর্যন্ত পরখ করে দেখতেই রাজী হল না। একবার মাত্র তাকিয়েই মুখ ফিরিয়ে নেয়, অবজ্ঞা আর অবিশ্বাসে কুঞ্চিত হয়ে ওঠে তাদের মুখ।

অথচ লড়াই করা, হাতিয়ার চালানো ছাড়া সে কিছুই আর শেখে নি বাচপন থেকে। ছাবাল্য কেন আশৈশবই বলা চলে লড়াইয়ের কায়দা আর কৌশল ছাড়া কোন কিছু চিন্তা করে নি।

দিনে রাতে এই চিন্তাই করেছে। রাত্রে খোয়াব দেখেছে লড়াইয়ের।

সেও বোধ হয় এই চেহারাটার জন্যেই। চেহারাটা না-মরদের মতো বলেই প্রাণপণে কোশিশ করেছে মরদ হয়ে উঠতে। চেয়েছে আজ যারা তাকে দেখলে ঘৃণা ও বিতৃষ্ণায় মুখ ফিরিয়ে নেয় তাদেরই শির ঝুইয়ে নিতে নিজের দিকে শ্রদ্ধায় ও তারিফীতে।

যার যেদিকে ন্যূনতা, সে সেইখানেই বাহাদুরি দেখাতে চাইবে এই তো স্বাভাবিক।

সৃষ্টির প্রথম দিন থেকে আজ পর্যন্ত এই নিয়মই চলে এসেছে।

সেই জন্যই সব কিছু ছেড়ে শস্ত্রবিদ্যাই শিখেছে সে, প্রাণপণে, সাধনার মতো ক'রে।

অবশ্য আর কিছু শেখার মতো ছিলও না ওর সামনে এক চাষবাস ছাড়া।

অন্দর-সীস্তানের সেই নিভৃত পল্লী গরমশির তার জন্মভূমি নেহাতই চাষী আর লুটেরার দেশ। ওদের দুটি কাজ ওরা অবসর সময় খেতখামার দেখে, ফাঁক পেলেই ডাকাতি করে। সেজন্যে তলোয়ার বর্শা চালানো তাদের ছোটবেলা থেকেই শিখতে হয় এটা ঠিক কিন্তু সেটুকুর জোরে লড়াই করা চলে না। লুটেরা কখনও ফৌজদার এমন কি সিপাহসালার হতে পারে না, তার শিক্ষা আলাদা।

এ কথাটা সেই প্রায় শৈশব থেকেই ওর মাথায় ঢুকেছিল। তাই দশ বছর বয়সেই গ্রাম থেকে বেরিয়ে এসেছে সে। অবশ্য একদল লুটেরার সঙ্গেই তারপর যেখানে সরকারী ফৌজের দেখা পেয়েছে—সে দল ছেড়ে দিয়ে এক জঙ্গী জওয়ানের হাতে-

* পরবর্তী নাম রুস্ত-ই-মার্গো

পায়ে ধরে তার বান্দাগিরিতে বহাল হয়েছে বিনা তন্‌খায়—প্রাণপণে সেবা করে লাথি খেয়ে তার অপরিসীম ঘৃণা ও অবজ্ঞা সহ্য করে ঘুরেছে তার সঙ্গে, শিখেছে লড়াইয়ের তরীকা, তার অন্ধিসন্ধি।

এ ছাড়াও অনেক কিছু করেছে।

যেখানেই কোন বুড়ো ফৌজী লোকের সন্ধান পেয়েছে তাকেই ধরে, তার গা-হাত-পা টিপে দিয়ে গল্প শুনেছে কোন্ লড়াই কি করে ফতেহ্ করেছে কে।

এইভাবে অনন্যমনা হয়েই শিখেছে সে লড়াইয়ের কায়দা আর কানুন: আয়ত্ত করেছে—হাতিয়ার চালনা শুধু নয়—গোটা ফৌজ চালানোরই কৌশল, শিখেছে সাচ্চা রুস্তমী। আজ ভাই—খুদা মাফ করবেন, এটা কোন বৃথা মগরুরী বা অহঙ্কার নয়, খাঁটি সত্য কথা—তার সঙ্গে একা দাঁড়িয়ে লড়াই ক'রে জিতবে এমন বাহাদুর মরদ কেউ নেই। এটা সে দুর্বিনয় প্রকাশ না করেও অনায়াসে বলতে পারে।

কিন্তু তার ফল কি হল?

একমনে বিদ্যাশিক্ষার মতো ক'রেই শিখেছে, পরের দাসত্ব ক'রে ক'রে—তাই পয়সা রোজগারে মন দিতে পারে নি কোনদিন। অথচ শিক্ষা যখন মোটামুটি শেষ হল তখন দারিদ্র্যই উন্নতির পথে প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়াল। ফৌজে নাম লেখাতে গেলে হাতিয়ার চাই ঘোড়া চাই পোশাক চাই। সিপাহ্‌সালার হতে গেলে একজন নৌকর থাকাও প্রয়োজন। এসব কোথায় পাবে সে, যার দু'বেলা রুটিই জোটা মুশকিল।

তবু চেষ্টা করেছে বৈকি।

কোন ত্রুটিই রাখে নি কোথাও।

পয়সা না থাক, মুরুব্বী না থাক—উচ্চাশাটা ছিলই বরাবর।

বহু লোককে সেধে বহু লোকের পায়ে ধরে শেষ পর্যন্ত গজনীর দরবারে এসে পৌঁচেছে। ভেবেছিল সুলতানের ফৌজে যদি একটা তাঁবেদারী নৌকরিও পায়—নিজের এলেম দেখিয়ে শেষ পর্যন্ত সিপাহী বনতে পারবে। সিপাহী থেকে সিপাহ্-সালার, তা থেকে ফৌজদার বনে যাওয়া—মাত্র তো কটা লড়াইয়ের ওয়াস্তা। এতটুকু সুযোগ পেয়ে গেলে কী করতে হবে তা সে জানে, বিধাতার কৃপায় সে বুদ্ধির অভাব নেই তার।

অনেক আশা নিয়ে গজনীতে এসেছিল ইখ্‌তিয়ারউদ্দীন। ওখানকার তখ্‌তে আছেন শিহাবউদ্দীন ঘুরী, নামী সুলতান, ভারী জলুস তাঁর নামের। ওদিকে কুম

থেকে হিন্দোস্তান—মায় চীনা মুলুক পর্যন্ত সকলে একডাকে চেনে, তাঁর প্রতাপে কাঁপে। তাঁর কীর্তিকাহিনী তাঁর দৌলতের কিস্‌সা লোকের মুখে মুখে ফেরে। বহু-দিন থেকেই শুনেছে সে, পয়সার নাকি শেষ নেই তাঁর, দেশবিদেশ থেকে কত যে সোনাদানা হীরা মানিক মোতি লুটে এনেছেন তার ইয়ত্তা নেই। লোকে যত বেশীই ধারণা করুক আসলের কাছেও নাকি যেতে পারে না। তাঁর শামাদানে নাকি বাতির বদলে জহরত জ্বলে।…এত যার ঐশ্বর্য, তাঁর দরবারে একটা নৌকরি মিলবে না? জরুর মিলবে।

কিন্তু সে আশা সফল হয় নি।

প্রথম তো সুলতানের কাছেই পৌঁছতে পারে নি। সুলতান কেন তাঁর যাবা তাঁবেদার - উজীব ওমবাহ—তাদের দোরেই ঢুকতে পায় নি।

তবে দারিদ্র্য আর প্রতিকূল ভাগ্যের কাছে মার খেতে খেতে একটা শিক্ষা হয়েছিল—জীবনের প্রথম ও প্রধান শিক্ষা বোধ হয়—কিছুতেই নিরাশ হতে নেই, হাল ছাড়তে নেই।

কিছু পাও বা না পাও কোশিশ করতে তো কোন অসুবিধা নেই, সেটা তো তোমার হাতে। সে তো কেউ বন্ধ করতে পারবে না।

হাল ছাড়ে নি সে। পৌঁচেছে শেষ পর্যন্ত ওমরাওয়ালাদের কাছেও। কিন্তু সবাই মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, কুষ্ঠরোগীর মতোই পরিহার করতে চেয়েছে—করেওছে। কেউ এতটুকু সহানুভূতি দেখায় নি, মেহেরবানি করে নি।

শেষ অবধি স্বয়ং শিহাউদ্দীনের দরবারেও গিয়েছে বৈকি।

যেতে পেরেছে অনেক সাধ্যসাধনায়, অনেক চেষ্টায়, অনেক অনুনয়বিনয়ের ফলে।

কিন্তু ওকে দেখেই তাঁর ভ্রূ কুঞ্চিত হয়ে উঠেছে, বিতৃষ্ণায় আর বিরূপতায়। সে মনোভাব গোপন করারও কোন চেষ্টা করেন নি। কেনই বা করবেন—এত সৌজন্য প্রকাশ করার মতো ক্ষেত্রও তো নয়।

অনুনয়বিনয় করেছে হাত জোড় করে, বলেছে যে-কোন লোকের সঙ্গে—জঙ্গী সিপাহীই হোক আর দঙ্গল-লড়াইয়ের* পালওয়ানই হোক, অথবা এমনি কোন মস্তানাই হোক—যাকে খুশি একবার লড়িয়ে দেখুন আলমপনাহ্—যদি জিততে না পারে, কোন বাহাদুরি দেখাতে না পারে, একটা কথাও বলবে না সে, নীরবে চলে যাবে এ দরবার থেকে, এ দেশ থেকে—চিরকালের মতো। চাই কি সেজন্যে শির জামিন রাখতেও রাজী আছে সে। জিততে না পারে জান দিয়ে উসুল দেবে এত তকলিফের মূল্য।

---

* কুস্তিগীর

আলমপনাহ এতক্ষণ তবু ধৈর্য ধরে শুনেছিলেন, শেষের দিকে আর উদ্গত বিদ্রূপ সামলাতে পারেন নি, হা হা ক'রে হেসে উঠেছেন, বলেছেন, 'শির জামিন রাখবে কি —সে চীজ কি আছে তোমার? থাকলে এমন অসম্ভব কথা মুখে আনতে পারতে না। তুমি করবে লড়াই? আরে বেঅকুফ—খুদা মেহেরবান কি সেজন্যে তোমাকে দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন? তাহলে চেহারাটা খুবসুরৎ না হোক ইনসানের মতো তো দিতেন অন্ততঃ। তোমাকে যে জন্যে পাঠিয়েছেন তাই কর গে, পথে পথে বান্দর নাচ দেখিয়ে বেড়াও। তুমি করবে লড়াই! আরে, জঙ্গী এওয়ানের গলা পর্যন্ত হাতই তো পাবে না, তুমি হাতিয়ার বাগিয়ে ধরবার আগেই তো সে তোমার শিরের মতো দেখতে ঐ জিনিসটি গলার ওপর থেকে নামিয়ে দেবে। না না, দিওয়ানার মতো কাজ করে কোন লাভ নেই, তার চেয়ে তোমার পক্ষে ঢের সোজা বান্দর নাচ দেখানো। তুমি বান্দর নিয়ে খাওয়ায় বেরোলে ভারী খুশ হবে লোক। বান্দরের সঙ্গে তুমিও নাচবে, কোন্‌টা বান্দর আর কোন্‌টা নয়—কেউ বুঝতে পারবে না।'

তারপর কণ্ঠ আরও কঠিন হয়ে উঠেছে সুলতানের, বলেছেন, 'যাও যাও, ঝামেলা বাড়িও না, এ দরবারে বহুৎ কাজ এখনও বাকি

"রাজা যত বলে পারিষদ-দলে বলে তার দশ গুণ" সুলতানের মুখের কথা শেষ হওয়ার আগেই দুটো দানোর মতো লোক—গায়ে শেকলের বর্ম, মাথায় লোহার টুপি —এসে ওকে ধরে 'কররকম ঘাড়ধাক্কা' দিয়ে বার ক'রে দিয়েছে দরবার থেকে।

বেরিয়ে যেতে যেতে শুনল, বড় উজীর সাহেব কাকে হুকুম করছেন, 'কে এই বান্দরটাকে দরবারে ঢুকতে দিয়েছে, কার সুপারিশে আসতে পেরেছে—খোঁজ নিয়ে আজই জানাবে আমাকে। আমাদের দরবার হয়ে উঠেছে যত ঘুষখোর বেতমীজের আড্ডা।'

আল্লাই জানেন, ঘুষ দেওয়ার সামর্থ্য ছিল না হথ তিয়ারের এক দামড়িও।

থাকলে হাতিয়ারই কিনত সে সেই টাকায়।

ধৈর্য! তক্‌দিরের কাছে মার খেতে খেতে এই জিনিসটি কখন এমন ভাবে আয়ত্ত হয়ে গেছে তা বুঝতেও পারে নি। নিজেরই এক-এক সময় তাজ্জব লাগে এখনও।

নইলে, সেই দিন সেই সময়েই তো এই স্থান চলে যাবার কথা।

সেই এক মুহূর্তে সমস্ত দুনিয়াটা লাল হয়ে গিয়েছিল ওর চশমের সামনে, খুনখারাপি রঙ দেখেছিল সর্বত্র।

ইচ্ছা হয়েছিল সেই লহমাতেই তলোয়ার বার ক'রে—হোক ওর গাঁয়ের কামারের তৈরী করা খাটো তলোয়ার—ঐ বান্দার বান্দা মস্তান দুটোকে এবং আরও যারা

আসতে চায় তাদেব শেষ ক'রে বুঝিয়ে দিতে ঐ বেঅকুফ সুলতানটাকে—ওর হিম্মৎ আব কিম্মৎ।

.সদিন খুদাই বক্ষা করেছেন তাকে সেই সর্বনাশা ক্রোধ থেকে।

সত্যিই কিছু—যত বড় রুস্তমই হোক না কেন—একা সে সুলতানে‌র অত সান্ত্রী সিপাহী আর ববকন্দাজেব সঙ্গে পেবে উঠত না, শেষ পর্যন্ত জানটাই দিয়ে আসতে হত।

জান দিতে সে পিছপাও নয়, এত জীবনের পরোয়া তার নেই—কিন্তু শুধু শুধু বেহুদা জান দিয়ে লাভ কি? অকারণ অসম্মানের মধ্যে জীবনটা দেওয়া. গরের ইনসাফিটাই সুবিচার প্রমাণ ক'রে? থামকা বেইজ্জত হওয়া, নির্বোধদের, মূর্খদের হাসি তামাশার খোরাক যোগানো।

না, এটুকু বিশ্বাস তার আছে। এটুকু সে জানে—খুদা তাকে ভুল ক'রে পাঠান নি এ দুনিয়ায়। তারও কিছু করার মত কাজ আছে, আর তা সে করবেও। একদিন না একদিন সে মাথা তুলে দাঁড়াবেই, আর ঐ যারা আজ অকারণে বিনা দোষে তাকে অপমান তুচ্ছতাচ্ছিল্য করছে—একদিন তাদের মাথা নিচু হবে, তাদের স্বীকার করতে হবে যে তারা ভুল বুঝেছিল, অন্যায় করেছিল। ঐ বেশরম লোক-গুলোকে ইজ্জতের মাথা খেয়ে মানতে হবে যে লোকের বাইরেটা দেখে বিচার করা ঠিক নয়, বাইরের সুরতের উপরই মানুষের হিম্মৎ আব এলেম নির্ভর করে না। এ দুনিয়ায় সুরৎ-হারাম লোকের তো অভাব নেই—তাদের নিয়ে কেন শুধু জ্বলে পুড়ে মরতে হয়।

খুদা তাকে বক্ষা করেছেন, সেদিনের সেই দুঃসহ ক্রোধ সে দমন করতে পেরেছে। দুনিযাব বে-ইনসাফি দেখে ওকে জ্ঞান হারাতে দেন নি।

গজনী থেকে বেরিয়ে সে অন্য অন্য জায়গাতেও গিয়েছিল বৈকি।

ছোটখাটো মুলুকের ছোটখাটো মালিক, সুবাদার, ফৌজদার—এমন কি জায়গীর-দারও বাদ দেয় নি। পাঠানদের মুলুকেও চেষ্টা করেছে ভাগ্য ফেরাবার। তার প্রার্থনা সামান্যই, ভাল হাতিয়াব, বর্ম, ঘোড়া এবং সামান্য কিছু টাকা। আর অন্ততঃ একশোটা লোক চাই তার সঙ্গে—সেই জন্যই টাকার দরকার। না, তাদের ঘোড়ার দরকার নেই, তাদের যে ক'দিন সবক দিতে হবে, সেই ক'দিনের খোরাকি আর একখানা করে ভাল তলোয়ার আর পেটা চামড়ার ঢাল—এই হলেই যথেষ্ট, এই পেলেই সে দুনিয়াটাকে দেখিয়ে দেবে তার কিম্মৎ। একশো থেকে হাজার লোক জড়ো হতে বেশী সময় লাগবে না তা সে জানে। আর তখন খরচের জন্যেও ভাবতে হবে না।

কিন্তু সেইটুকুই যে পাচ্ছে না, পেল না কোথাও।

ওদিকে আর কোথাও কোন সুবিধা হবে না, তেমনকোন জায়গায় ঢু'ড়তে বাকি নেই তার। তাই এবার শেষ চেষ্টা হিসেবেই হিন্দোস্তানে এসেছে।

এখানে ইসলামের নতুন জয়পতাকা উড়েছে- নতুন শাহী প্রতিষ্ঠা হয়েছে। বিরাট দেশ, বিপুল সম্ভাবনা। নতুন রাজ্য জয় করে নেবার, নতুন প্রতিষ্ঠা পাওয়ার বহু দরওয়াজা খোলা, শুনেছে সে। কাফেররা স্বভাবভীতু, অনায়াসে খেতে পরতে পায় তারা, কষ্ট করতে অভ্যস্ত নয় তাই লড়াইয়ের মর্ম বোঝে না। এদের সামনে তারা কেউ দাঁড়াতে পারবে না লোকার হাত, সামনে গরু কি বয়েল দেখলে হাতিয়ার ফেলে দিয়ে হাত-পা গুটিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মরে। এখানে নাকি জীবন জয় করতে গেলে শুধু উদ্যম ধ'রে এগিয়ে যাওয়ার যোগ্য।

অবশ্য তাও শুধু হাতে হবে না। একার দাবাও হবে না।

তবে যারা নতুন শাহীর পত্তন করেছে তাদের বিস্তর লোক দরকার হবে নিশ্চয়। এখানে হয়তো অত মুখ ঘুরিয়ে নেবে না কেউ— এই যা একটু ক্ষীণ উমীদ্। আশা যত ক্ষীণই হোক, যতক্ষণ একটুও আছে—ইশারায় থাকলেও -সে কোশিশ ক'রে দেখবে। তকদিরের ওপর হাল ছেড়ে বসে থাকার লোক নয় সে - তকদিরের থেকে পৌরুষে তার বিশ্বাস বেশী।

সেই জবাবই দিয়ে এসেছে সে। এখানে রওনা হওয়ার আগে হিরাটের বুড়ো সুলেমান মিঞা তাকে বয়েৎ শুনিয়ে ঠাট্টা করেছিল

"না বা হিন্দ অস্ত অযমন, ও না দর খতন।
আন্ কি দসম এ-উ অস্, ছায়া এ খেশ্তন॥"

তারপর শেষের পদটার ঈষৎ পরিবর্তন করে পুনরাবৃত্তি করেছিল—'সুরৎ এ খেশ্তন।'

ব্যাখ্যা করে বলেছিল, 'যার নিজের ছায়া- থুড়ি— নিজের চেহারাই নিজের দুশমন, সে হিন্দোস্তানেই যাক আর তাতারেও যাক--কোথাও তার কিছু হবে না।'

তার জবাব দিয়েছিল ইখতিয়ার সঙ্গে সঙ্গেই।

লেখাপড়া না শিখুক, দু-চারটে বয়েৎ সেও শুনেছে বৈকি। শুনে শুনেই শিখেছে, মুখস্থ হয়ে গেছে। বিশেষ এই বয়েৎটিই তার জীবনের মূলমন্ত্র, প্রাণবীজ। এটা বিশ্বাস না করলে সে বাঁচত না এতদিন, নিজেই নিজের জিন্দিগী খতম ক'রে দিত।

সে বলেছিল :

"কোই এ-নাউমেদি মা রো, উমেদ হা অস্ত্।
সেই-এ-তারিকি মা রো, খুরশেদ হা অস্ত্॥"

আরও বলেছিল, 'জীবনে আশাও আছে নৈরাশ্যও আছে। আশা থাকতে নিরাশ হব কেন? আশাই আমার পথ। চারিদিকে এত আলো, সূর্য তারা চাঁদ থাকতে আমি আঁধেরাকেই সাচ্চা বলে মেনে নিতে রাজী নই।'

সেই আশাই তাকে টেনে এনেছে এই হিন্দোস্তানের দিকে। দরকার হয় - হিন্দোস্তানেও তার তাকৎ তার এলেম দেখাবার সুযোগ না মেলে—আরও বহু দূরে পুরব দেশে চলে যাবে সে, অন্য না-জানা দেশেও। হাল ছাড়বে না কিছুতেই, নিরাশ হবে না। নাউমেদিতে বিশ্বাসী নয় সে।

॥ ২ ॥

দিন এবং রাত, সকাল আর সন্ধ্যা একই রকম এখানে, একই রকমের একঘেয়ে কাজও নেই, ছুটিও নেই। খালি খাওয়া আর শোওয়া, চুপ ক'রে জন্তুর মতো বসে থাকা—নয়তো লক্ষ্যহীন ভাবে ঘুরে বেড়ানো। খাওয়াটাবও কোন জুত নেই। তহবিলের সে অবস্থা নয়। ভাল-মন্দ তো দূরের কথা, একবেলা দুখানা মোটা পোড়া রুটি—তা-ই ক'দিন জুটবে কে জানে!

সুতরাং যতক্ষণ দিনের আলো থাকে ঘুরেই বেড়ায় সে, এমনিই, উদ্দেশ্যহীন ভাবে। বসতে ইচ্ছে করে না বলেই ঘোরে। বসলেই রাজ্যের দুশ্চিন্তা আর ক্ষোভ এসে মনে জড়ো হয়।

সেইভাবে ঘুরতে ঘুরতেই সেদিন সকালে শহরের 'নখাস' বা বান্দাবাজারে গিয়ে পড়েছিল—যেখানে ক্রীতদাস কেনাবেচা হয়। আর, কাজ ছিল না বলেই কতকটা, দাঁড়িয়ে গিয়েছিল, যেখানে বান্দা আর বাঁদী নিলাম হওয়ার জন্যে জড়ো ক'রে রাখা হয়েছে।

বাজার অবিশ্যি এমন কিছু নয়, একটা বড় খোলা জায়গা—চৌবাগ মতো। তার মাঝখানে কয়েকটা মোটা শালের খুঁটির ওপর কটা তক্তা বিছিয়ে উঁচু করা হয়েছে—একটা মাচার মতো। সেই উঁচু জায়গা বা মঞ্চের ওপর সার বেঁধে দাঁড়িয়ে কটা মরদ আর কটা মেয়ে। সব রকমই আছে তার মধ্যে, সব বয়সের। হাবসী খোজা থেকে শুরু করে আর্মানী, বাদাখশানী, যহুদী—সব। বয়সও ত্রিশ থেকে তেরো-চৌদ্দটা হয়তো আরও কম—যার যা পছন্দ, সেই মতোই ব্যবস্থা আছে।

এরা যারা, বিশেষ হাবসীগুলোকে কোমরে শেকল বেঁধে পায়ে বেড়ি দিয়ে রাখা হয়েছে—একজনকে আর একজনের সঙ্গে জুড়ে। ছোটদের বেলা অল্পবয়সী মেয়েদের বেলা সে ব্যবস্থা নেই। এদের দেহ সুকুমার, বেড়ি কি শেকল পরালে দাগ হয়ে

পাবে, চাই কি ঘা হয়ে যাওয়াও আশ্চর্য নয়। তাহলে সবটাই মাটি—যা দাম আশা করা গেছে, যার যা—তার সিকির সিকিও উঠবে না। দরকারও নেই, লোক আছে চারিদিকে। কড়া পাহারা মোতায়েন করা হয়েছে, কোথা হাতে যমদূতের মত লোকগুলো তৈরী হয়ে আছে, এতটুক বেচাল দেখলেই ঝাঁপিয়ে পড়বে। ছেলে মানুষ আর মেয়েমানুষ—কতদূর আর যেতে পারবে ওদের হাত এড়িয়ে?

মাল সাজানো প্রস্তুত কিন্তু তখনও খদ্দের বেশী জড়ো হয় নি। মানে সাধারণ সম্ভাব্য ক্রেতা কিছু এসেছে, এই ভিড়ের মধ্যেই আছে তারা—তবে ভাল মাল যা, সুন্দরী মেয়ে কি খুবসুরৎ ছোকরা বান্দা কেনার খদ্দের এরা নয়। এসব যাবে সুলতান কি নিদেন কোন সুবাদারের অন্তঃপুরে, তাঁদের লোক এদিকের সব নখাসেই ঘুরে বেড়ায়, চুনে চুনে নিয়ে যায়।

তাঁদের লোক অর্থে ব্যাপারীই—ঐসব সুলতান ওমরাহদের ঘরে যাদের খাতির আছে, সেখানে যারা এই ধরনের মাল সরবরাহ করে, বেচে আসতে পারে; যাদের সঙ্গে সাধারণতঃ বেচাকেনা হয় ঐ সব উঁচুতলায়। সুলতান কি তাঁর সুবাদার ফৌজদাররা কিছু নিজেরা আসেন না—এলেও দৈবাৎ কোনদিন, পথে পড়লে কি নজরে পড়লে তবেই। এই ব্যাপারীরা তাঁদের মর্জি-পসন্দ জানে, কার কি রকম ঝোঁক, কোথায় কার কাছে কি মালের কত দাম উঠবে। সেই বুঝেই নিলাম ডাকে তারা, ডাক বাড়িয়ে যায়।

এই রকমের শাঁসালো ব্যাপারীদের জন্যেই অপেক্ষা করছিল নিলামদার। মাল ওর নয়- যা বিক্রি হবে তার ওপর দস্তুরি পাবে মাত্র। তাই দাম যত বাড়বে তত ওর লাভ।

এখনও তেমন কেউ মালদার ক্রেতা আসে নি। তারা আসবে খেয়েদেয়ে বিশ্রাম ক'রে—আরও অনেক পরে।

এখন অলস কৌতূহলে দাঁড়িয়ে দেখবার লোকই বেশী।

মজা দেখবার লোক। কোন কাজ হাতে না থাকায় যেখানে হোক দাঁড়িয়ে গিয়ে সময় কাটায়—এই শ্রেণীর লোক সব। কৌতূহলটা নিতান্তই নৈর্ব্যক্তিক, কোন বান্দা বা বাঁদীর কত দাম উঠতে পারে দেখে একটু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করা। কোন সরাই-খানা কি সরাবখানায় বসে গল্প করার কাজে আসবে বড়জোর—কেনার কোন প্রশ্নই উঠবে না জীবনে এদের।

ইখ্‌তিয়ারউদ্দীনও এই দলের লোক।

কোন কাজ নেই বলেই ঘুরতে ঘুরতে এসে পড়েছে আর দাঁড়িয়ে আছে। দেখছে

কে কেমন, কী দর উঠতে পারে। তবে তার সঙ্গে এদের তফাৎ এই—সে আশা রাখে যে একদিন তার এইসব বান্দা বা বাঁদী কেনার সামর্থ্য হবে, প্রয়োজন হবে।

এদের কারুরই সে উমিদ নেই। কল্পনাও করে না।

অল্পবয়সী মেয়েদের মধ্যে আর্মানীস্তান কুর্দিস্তানের মেয়েরাই সুন্দর দেখতে - খুবসুরৎ যাকে বলা যায়। ঈষৎ সোনালী চুল কারও, কারও বা কালো। চোখও কারও কটা কারও বা কৃষ্ণতার।

মেয়েরাই সামনের সারিতে, তাদের আগে ডাক হবে। অধিকাংশ মেয়েই অর্ধনগ্ন, ডাক ওঠার সময় সম্পূর্ণ বিবস্ত্র ক'রে দেওয়া হবে। যে ডাক দেবে—চড়া ডাক দেনেওলাদের তো কথাই নেই—সে মাল ভাল ক'রে দেখে বুঝে নেবে। যত ই সম্ভব। এমনি চোখের দেখাতে এসব কাজ হয় না, হাত-পা টিপে দেখবে কে দেখবে টিপে টিপে- কতটা কষ্ট সইতে পারবে হাঁটু গেড়ে বসিয়ে, ঊর্ধ্ববাহু ক'রে পিছন দিকে হেলিয়ে - কতখানি পিছনে হেলতে পারে, নিজের হাতে নিজের পা ছুঁতে পারে কি না দেখে নমনীয়তার হিসেব হবে, দাঁতে হাত বুলিয়ে, [illegible] করিয়ে দেখবে ব্যাপারীর দল। অর্থাৎ স্বাস্থ্য কেমন। দাঁত দেখেই স্বাস্থ্য [illegible] কবার রীতি।

কুমারী কিনা মানে একেবারে অনাঘ্রাতা, পুরুষ-সংস্পর্শহীন—তারও পরীক্ষা আছে। সেক্ষেত্রে দাম অনেক বেশী ডাকা যাবে।

মেয়েদের পিছনে অল্পবয়সী ছেলেদের দল—বারো থেকে বাইশ বয়স যাদের, আন্দাজমত [illegible] তার পিছনে দামড়া খোজা হাব সীরা।

এই [illegible] তখানি বয়সেও ইথতিয়ারের মেয়েদের দিকে তাকাবার অবসর হয় নি কখনও।

প্রয়োজন হয়ত ছিল ফুরসুত ছিল না।

যার বাঁচার প্রশ্ন বড়, কোনমতে টিকে থাকার জন্যই যাকে প্রতিমুহূর্ত লড়াই করতে হয়েছে তকদিরের সঙ্গে—তার এসব বিলাস কি আরামের দিকে নজর দিতে যাওয়া বাতুলতারই নামান্তর। সে সামর্থ্যও নেই। স্ত্রীলোককে যেমন ভাবেই সম্ভোগ করো - দাসী বা বাঁদী—অর্থের প্রয়োজন। টাকা ছাড়া মেয়েছেলে রাখা যায় না।

তাছাড়া ওর যা চেহারা—আবারও সেই কথাই উঠছে, সুরতের সওয়াল—কেউ পেয়ার ক'রে ওর বক্ষলগ্ন হবে, ওর সঙ্গে দারিদ্র্য ভাগ ক'রে নেবে—সে সম্ভাবনাও নেই।

অবশ্য তেমন ঝোঁকও নেই। নেশা বলতে ওর জীবনে উচ্চাশাই। যদি কোন-

স্থির বড় হতে পারে, মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে. ওর যা উম্মিদ—কোন খানদানী ঘরের মেয়ে দেখে সাদি করবে—খানদানী ঘরের সামিল হবে। এই রিস্‌সাদারীর ওপরই আসল সামাজিক প্রতিষ্ঠা। চাই কি উন্নতির পথে আরও দ্রুত এগিয়ে যেতে পারে—ভাল জবরদস্ত শ্বশুর পেলে।

কিন্তু সে পরের কথা।

অনেক—অনেক দূরের কথা।

এখন দিনান্তে দুখানা রুটির কি ক'রে যোগাড় হবে সেই চিন্তাই প্রধান।

তা হোক, তবু দেখতে বাধা কি ?

দেখছে। কোন কোন মেয়ের চেহারা চোখেও ধরছে, তারিফও করছে মনে মনে। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। শক্তিও নেই তেমন জোর লালসাও নেই। কোন তাগিদ নেই দেহের বা মনের।...

অন্ততঃ সেই রকমই ধারণা ছিল ওর এতদিন।

কিন্তু প্রথম সারি শেষ ক'রে দ্বিতীয় সারিতে চোখ যাওয়ার আগেই একেবারে শেষের মেয়েটিতে গিয়ে নজরটা যেন আটকে গেল—হঠাৎ।

লোহা যেমন চুম্বকে আটকায় তেমনি।

সেইখানে পৌঁছে যেন সহসা একটা ধাক্কা খেল দেহ আর মন, দুই-ই।

কেন যে ধাক্কা খেল তা ভাল বলতে পারবে না ও। কখনই পারে নি।

জীবনের শেষ দিনেও বোধ হয় এ সওয়ালের জবাব মিলবে না।

খুবসুরৎ তো বটেই। কিন্তু তেমন সুন্দরী আরও আছে এদের মধ্যে। তার চেয়ে বেশীই আছে।

বাদামী চুল, আয়ত চোখে বাদামী আভা, চিবুক ও কপালের সুডৌল গঠন—কিন্তু সেও তো ঢের। অন্ততঃ তিনটি মেয়ের মুখ ঐরকম, বরং ওর চেয়েও ভাল।

না, তা নয়। কী যে—তা ধরতে পারছে না। কী যেন আছে ওর মধ্যে যা রক্তে আগুন লাগায়, বুকের রক্তে তুফান তোলে।

ওপরের সমস্ত দেহ অনাবৃত, পনেরো-ষোল বছরের বেশি হবে না বয়স, পুরুষ-সংস্পর্শহীন কি না তা ইখতিয়ার বলতে পারবে না—বোঝে না ওসব। কি কি লক্ষণ দেখে ওটা বিচার করে ব্যাপারীরা তা জানে না, কারও কাছে শেখে নি।

তফাৎ যা—তা অন্যত্র। এতগুলি লোলুপ লালসাতুর অথবা কৌতূহলী বর্বর দৃষ্টির সামনে অনাবরিত দেহে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছে বলে বেশির ভাগ মেয়েই মাথা হেঁট ক'রে আছে, অথবা শূন্য পানে চেয়ে শরম ঢাকবার চেষ্টা করছে ; দু-একটা একটু

বেহায়া, বোধ হয় অন্যরকম অভিজ্ঞতাও হয়েছে ইতিমধ্যেই বহু পুরুষের তৃষ্ণা মেটাবার অভ্যাস—তারা বেশ সপ্রতিভ ভাবে এদিক ওদিক চাইছে ফিকফিক্ করে হাসছে—ওরই মধ্যে যারা নওজোয়ান দর্শকদের ভেতরে, তাদের দিকে চোখের ইশারা হানছে। একেবারে যারা বাচ্চা তারাও এদিক ওদিক চাইছে বটে, তবে সে চাহনিতে কিছুটা ভয় কিছুটা কৌতূহল—ভয়ই বেশি।

এ মেয়েটি কিন্তু এদের থেকে একেবারে স্বতন্ত্র।

তার লজ্জাও নেই ভয়ও নেই। লজ্জা নেই বেহায়া বেশরম বলে নয়—এ যে উদ্ধত-ভাবে মুখ তুলে সোজা চেয়ে আছে সামনের দর্শকদের দিকে কিন্তু সে দৃষ্টি ওদের দিকেও নেই যেন, ওদের ভেদ ক'রে বা ওদের পেরিয়ে বহুদূর পর্যন্ত চলে গেছে সে নজর -তার একটিই মাত্র অর্থ হয়। সে এদের—এই সামনের পুরুষগুলোকে—মানুষ বলেই মনে করে না। না ভেদ ক'রে গেছে বলাও ভুল এদের ওপর দিয়েই চলে গেছে, এদের অস্তিত্বই সে অনুভব করছে না যেন। সমুদ্রের ঢেউ যেমন বালির ওপর দিয়ে চলে যায়—সে বালি না তার মধ্যে অন্য আবর্জনা কিছু আছে—কিছুই বুঝতে পারে না, তেমনি এদের ওপর দিয়ে এই মহিমময়ীর গর্বোদ্ধত দৃষ্টি চলে গেছে-—যাচ্ছে, এদের দিকেই হয়তো চেয়ে আছে কিন্তু কেউ আছে কি না সামনে পুরুষ না মেয়ে না কতকগুলো জানোয়ার—কিছুই দেখছে না।

কিন্তু এই কি ওর একমাত্র আকর্ষণ?

না না, তা নয়, ইখ্‌তিয়ার মনের মধ্যে তার এই অভূতপূর্ব চিত্ত আলোড়নের অন্য নানা যুক্তি হাতড়াতে লাগল। মেয়েটির চোখে এবং সমস্ত মুখের গঠনেই বোধ হয়—অসাধারণ বুদ্ধির দীপ্তি; দীপ্তিই—তাকে প্রাখর্য বললে অবিচার করা হয়—প্রাখর্যের সঙ্গে চাতুর্যের একটা সম্পর্ক আপনিই মনে এসে যায়, তাতে ছোট করা হবে মেয়েটাকে স্থির বুদ্ধি এবং অখণ্ড আত্মবিশ্বাস মিশিয়ে এই দীপ্তি সম্ভব হয়েছে।

অয় খুদা! বহুত মেয়ে সে দেখেছে এতখানি বয়সে, আটাশ উনত্রিশ বছর বয়স হল তার কিন্তু এ মেয়ের তুলনা নেই। এ মেয়ে পাশে থাকলে, সহায় হলে তামাম দুনিয়া জয় করা যায়, খুদা মাফ করবেন তিনিই দুনিয়ার আসল মালিক, এ সঙ্গিনী হলে, এই মুহূর্তে অন্তত: তাই মনে হচ্ছে, দুনিয়ার বাদশা হয়ে বসাও ছেলেখেলা।

এ মেয়ে বাঁদী হওয়ার জন্য জন্মায় নি, নেহাতই বিছানায় শুয়ে কোন অকর্মণ্য পুরুষের মনোরঞ্জন করার জন্যে নয় এ মেয়ে জন্মেছে বাদশার বেগম হতে—বাদশার আড়ালে থেকে বড় দেশ বড় সাম্রাজ্য শাসন করতে, সেই সঙ্গে বাদশাকেও। এ মেয়ের হুকুম তামিল করতে, এর শাসনে থাকতেও সুখ আছে। এর ঐ শির তেড়া

ক'রে রাখার ভঙ্গী, শান্ত উদ্ধত দৃষ্টিতে সুদূরে চাহনি দেখলেই মনে হয় বহু লোকের জীবনের রাশ টেনে রাখার জন্যেই ভগবান একে পাঠিয়েছেন।

মানুষের আশা নিমেষে বহুদূরে চলে যায়।

এই মেয়েটির দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে ইখ্‌তিয়ারউদ্দীনের আশাও কত কি স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছে '

মনে হচ্ছিল, এই মেয়েকে পাশে পেলে বিশ্ব জয় করা কঠিন কাজ নয়। সেও করতে পারে, অনায়াসেই।

দরকার নেই ওর খানদানী ঘরের—আমীর কি নবাব-সুলতানের মেয়েতে, পরের সাহায্যে কোন দরকারই হবে না, এই মেয়ে যদি সঙ্গিনী হয়। বাঁদী? তাতে কিছু এসে যায় না, বান্দা যদি এত বড় রাজ্যের সুলতান হতে পারে বাঁদীই বা বেগম হবে না কেন? তাদের পবিত্র ধর্মে বাঁদীকে বিয়ে করতে কোন বাধা নেই!

কিন্তু শুধুই কি এই? শুধু উন্নতির আশা?

না, আত্মপ্রবঞ্চনা করা হবে সে কথা বললে।

এই মেয়েকে বুকের মধ্যে পাওয়ার, একে সম্ভোগ করার কথাও কি মনে হয় নি—প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই? কলিজার মধ্যে এই যে তুফান উঠেছে, লোহুতে জেগেছে আগুন—এমন তো আর কখনও হয় নি। ওকে আলিঙ্গনে পিষ্ট করার জন্যে, নিজের বুকের সঙ্গে চেপে মিশিয়ে ফেলার জন্যে ওর হাতের এই পেশীগুলোর আজ যে আক্ষোভ, যে অধীরতা অনুভব করছে—এমন যে করা সম্ভব, তাই তো কখনও ভাবে নি!...

আর কাউকে দেখা হল না। পিছনের সারিতে কত খুবসুরৎ কত নওজোয়ান লেড়কা রয়েছে, আগে যা একবার এক ঝলক দেখে নিয়েছে—আর ভাল ক'রে দেখা গেল না। চোখই যে ফেরাতে পারছে না। এই মেয়েটি সামনে থাকতে অন্য কারও দিকে চাওয়া সম্ভব নয়।

তন্ময় হয়ে নিষ্পলক চোখে চেয়ে আছে—পাশে একটি মোটাসোটা আধবুড়ো ইরানী দাঁড়িয়ে ছিল, বেশ দামী কিন্তু যৎপরোনাস্তি ময়লা জোব্বা পরা,—আতরের গন্ধ আর ঘামের গন্ধ মিশিয়ে সেটা থেকে একটা অসহ্য 'খুশবু' বেরোচ্ছে,—তাকে লক্ষ্য করে নি এতক্ষণ। সে লোকটি ওর পেটে একটা খোঁচা দিয়ে চোখ টিপে বললে, 'কী রে ছোঁড়া, একেবারে যে দিওয়ানা হয়ে গেলি দেখছি—আমার মালের দিকে চেয়ে? শখ হচ্ছে কেনবার? কেনার মতো মনে হচ্ছে পয়সা খরচ ক'রে?'

নিছক তামাশা এটা নয়। এটা তার অবস্থার প্রতি, তার শারীরিক ও আর্থিক দৈন্যের প্রতি স্পষ্ট ইঙ্গিত।·· সূক্ষ্মে সূক্ষ্মেই কান রাগে ঝাঁ-ঝাঁ ক'রে উঠেছিল, হাত দুটো গিয়েছিল মুষ্টিবদ্ধ হয়ে আপনিই, খুন চড়ে গিয়েছিল মাথায়—কিন্তু স্থানকাল বুঝে সে ক্রোধ সে দমন করল।

এ তো আজ নতুন কিছু নয়, চিরজীবনই তো এই অপমান সহ্য করতে হচ্ছে তাকে। মিছিমিছি এ বাজে লোকটার সঙ্গে কেজিয়া করে লাভ কি?

সে একটু চুপ ক'রে থেকে উদ্গত উষ্মা দমন ক'রে নিয়ে সহজ ও স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন করল, 'এ তোমার মাল বুঝি? তুমি এর মালিক? বেশ বেশ। এসব বান্দা আর বাঁদী তুমি এনেছ হিন্দোস্তানের হাটে বিক্রি করতে?'

অকারণেই একবার বুকটা ফুলিয়ে দাড়ি চুমরিয়ে উত্তর দিল লোকটা, 'সব নয়। চুনা চুনা যত মাল সব আমার। হারুণ মিঞা ছাড়া এমন মাল খুঁজে খুঁজে কে আনবে? শুধু পয়সা থাকলেই এসব মাল কেনা যায় না, বিস্তর কোশিশ করতে হয় বুঝলি? বহু লোককে টাকা খাওয়াতে হয়, দাদন দিতে হয়। বড় করে ফেলাতে হয় বিরাট জাল—তবে এমন চুনেরী চিড়িয়া এসে ধরা দেয়।···তাই কি এ বিক্রি করাই সহজ? এ মাল কেনবার মতো লোক কটা আছে? শুনেছি এখানে অনেক বড় বড় ব্যাপারী আসে—তাই এ বেলাটা দেখব মনে করছি। দাম ওঠে ভাল, নয়তো সোজা চলে যাব দেল্‌হী।'

বিনা কারণেই হেসে ওঠে লোকটা, একটা আত্মতৃপ্তির হাসি, হে-হে ক'রে।

বুকের রক্তে যে ঢেউ উঠেছে, যে উন্মত্ততা উত্তাল হয়ে উঠেছে ধমনীতে ধমনীতে, হাতের পেশী ও শিরাগুলো যে মাতলামি আর চিৎকার করছে—তার আওয়াজ কি বাইরে পাচ্ছে কেউ?

খানিকটা চুপ ক'রে থেকে যেন সেইটেই শোনবার চেষ্টা করে ইখতিয়ার, তারপর আস্তে আস্তে কতকটা নিস্পৃহ ভাবেই প্রশ্ন করে, 'তা এ—এ কোথাকার মেয়ে? এর দেশ কোথায় ছিল?'

'য়হুদী—য়হুদীর মেয়ে। এনেছি অবিশ্যি আমি দামাস্কাস থেকে—এক বুড়ী আছে ওখানে, ভারী সেয়ানা আর শয়তান, তার চারিদিকে অনেক পোষা চোর আছে, খুবসুরৎ দেখে ছেলেমেয়ে চুরি করে এনে দেয়, মোটা দামের লোভে। এই চোরাই মালেরই কারবার রাবেয়া বিবির, বাপ কি দাদা সাজিয়ে কাউকে দিয়ে একটা

বিক্রির কোরাল্লা শিখিয়ে নেয়—সব যায় যাইর ছুট—তাও প্রথমটা। কিছুদিন ওখ ক'রে রেখে দেয় কোথাও—কোথায় কোথায় সব ওর এই আড্ডা আছে—দু-চার কি পাঁচ-ছ সাল—উমর বুঝে মাল তৈরী হলে, পোষ মানলে তবে বিক্রির ব্যবস্থা। তাও যার-তার সামনে এসব মাল বার করে না, আমাদের মতো ব্যাপারী পেলে তবেই—যারা দু-চার হাজার আশরফি ফেলে রাখতে পারে—যারা সাচ্চা মোতি চেনে, কীমৎ বুঝে মোটা দাম দিতে পারে।'

লোকটা বলতে বলতে আর একবার দাড়ি চুমরে নিয়ে নিজের বুকে একটা কিল মারে।

ইথতিয়ার মুখের প্রশান্তি আর অনাসক্তি নষ্ট হতে দেয় না, তেমনি নিস্পৃহ ভাবেই বলে, 'য়হুদী, না! তাই এরকম দেখতে।...আচ্ছা, ওদের তো সব কি উদ্‌খুট্টে উদ্‌খুট্টে নাম হয় না?...এর নাম কি?'

'এরও বিশ্রী একটা নাম ছিল—' হারুন মিয়া মুরুব্বিয়ানা সুরে জবাব দেয়, 'কী যেন হানা না হান্না, আমি বদলে দিয়েছি, হোসেনা নাম দিয়েছি।'

'আচ্ছা—' বলতে গিয়েও বাধ-বাধ লাগে, আড়ষ্টতা বোধ করে জিভে, নিজেকে শাসন করারও চেষ্টা করে, তবু শেষ পর্যন্ত বেরিয়েই যায় প্রশ্নটা, 'আচ্ছা, এর কত দাম উঠতে পারে?'

এবার হারুন মিঞার চোখ দুটো কৌতুকে নাচতে থাকে। সাধারণ কৌতুক নয়—অবজ্ঞা আর তাচ্ছিল্যমেশা। বেশ কিছুক্ষণ ওর দিকে চেয়ে থাকে সে, আপাদমস্তক দেখে—যেমন পাগলকে দেখে সেইরকম ভাবে। তারপর আর হাসি চাপতে পারে না—হা-হা ক'রে হেসে ওঠে। হাসতে হাসতে হাসির দমক বেড়েই যায়, চেষ্টা ক'রেও থামতে পারে না।

অনেকক্ষণ হেসে নিয়ে কিছুটা সামলে উঠে বলে, 'কেন বল দিকি? কিনবি? শখ হচ্ছে বুঝি খুব?'

আবারও হাসে খানিকটা হা-হা ক'রে।

বলে, 'তারে বান্দর—না, তোকে বান্দর বলাও ভুল, বান্দররা এত বেঅকুফ হয় না—উল্লু? না, উল্লুও তো বান্দরেরই জাত, গাধা—গাধাই ঠিক, আরে গাধা, এর দাম জিজ্ঞেস করাই তো তোর বড় বেঅকুফী—টাকার কথাটা জেনে মিছিমিছি মাথায় চক্কর লাগবে বৈ তো নয়। যত কমই হোক—অত টাকা তুই জিন্দিগী জুড়েও রোজগার করতে পারবি না কোনদিন!'

আবার মাথায় আর কানে সেই আগুনের ভাবটা বোধ করে ইথতিয়ার। ঝাঁ-ঝাঁ

শব্দ হতে থাকে যেন শিরায় শিরায়, লোহু জোরে বইতে থাকে চনচন ক'রে। হাতটা অজ্ঞাতসারেই কোমরে বাঁধা তলোয়ারের দিকে চলে যায়।

তবু সামলেই নেয়। অনেক লোক ওরা। পাহারাদারই কত। একা কত লোকের সঙ্গে লড়বে? এত সামান্য কারণে জানটা খোয়ানো আহাম্মুকী।

একটুখানি সময় লাগে তবু সামলে নিতে। তারপর শান্তভাবেই বলে, 'সাহেব, জিন্দিগী অনেক বড় কথা। ইন্সানের—বিশেষ মরদের তক্‌দির কখন খুলে যায়, কখন ঘুরে যায় চাকাটা, কেউ বলতে পারে? কেনা গুলাম শাহী তখ্‌তে বসেছে দেখছ—তার পরও জিন্দিগীর কথা তুলছ?'

'আরে যা যা। লাখ লাখ লোকের মধ্যে অমন তক্‌দির খুলে যায় একজনেরই। তোর খুলবে না কোনদিন, তুই থাতেরজমা থাক। সে তক্‌দির তোর চেহারাতেই মালুম হচ্ছে…টাকা হলেই কি ওকে কিনতে পারবি? ও মেয়ে তেমন নয়—সোলেমান বাদশার মতো ওর দিমাগ। তোর মতো মর্কট ওকে কিনলে নিজে হাতে নিজের গলা টিপে মরবে।'

কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল ওরা, মাচার সামনেই। আশপাশে যারা দাঁড়িয়ে ছিল হারুন মিঞার চড়া গলা তাদের শুনতে কোন অসুবিধাই হয় নি। 'মজা'র গন্ধ পেয়ে বরং আর একটু ঘেঁষে এসেছে। তারা হাসাহাসি আর গা-টেপাটেপি করছে অনেকক্ষণ থেকেই—তা চোখ এবং মন অন্য দিকে থাকলেও টের পেয়েছে ইখতিয়ার। 'বাওরা' 'দিওয়ানা' শব্দগুলোও কানে এসেছে। এবার তো সবাই হো-হো হা-হা ক'রে হেসেই উঠল। পাগলই পেয়েছে ওকে। ওদের কোন দোষ নেই—ওর যা অবস্থা, বেশভূষার যা হালচাল দৈন্যদশা—এসব কথা মুখে আনা সত্যিই পাগলামি।

আর পাগল তো হয়েইছে সে, তাতেও তো কোন সন্দেহ নেই। তবে ওরা যা ভাবছে সে রকম পাগল নয়।

যাক গে—ওরা যা ভাবছে, ওদের হাসাহাসিতে কিছু এসে যায় না ওর। এসে যায়ও নি। কিন্তু এবার অন্য ঘটনা ঘটল। তাতেই বিরাট একটা ওলটপালট হয়ে গেল ওর মাথার মধ্যে, ওর জীবনে—জিন্দিগীতে।

মেয়েটা—হোসেনাও ওদের কথা শুনছিল। কথা শুরু হতে তারই নাম, তারই প্রসঙ্গ—স্বভাবতঃই ওদের দিকে চেয়ে ছিল। এবার, যেন হারুন মিঞার কথার সমর্থনেই—ইখ্‌তিয়ারের স্পর্ধা চরম আঘাতে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিতেই—ওর দিকে মুখ ক'রে চরম অবজ্ঞায় থুথু ফেলল, ওকে দেখিয়েই, অর্থাৎ এ থুথু ফেলা যে স্বাভাবিক নয়, ইচ্ছে ক'রে অপমান করার জন্যেই ফেলা, সেইটে বুঝিয়ে দিতে।…

আর দাঁড়াতে পারল না ইব্‌ তিয়ারউদ্দীন।

দাঁড়ানো সম্ভব নয়।

মানুষের যতটা সহ্য হয়—ততটা সহ্য করেছে সে।

এর বেশী যে সইতে পারে—সে হয় শয়তান নয় তো ফেরিস্তা।…

যে দেশে ওর জন্ম সে দেশে প্রায়ই ভূমিকম্প হয়, ঘর বাড়ি মানুষ সব দুলতে থাকে সে সময়।

আজও এই মুহূর্তে একটা বিরাট ভূমিকম্প বোধ করল সে। এ ভূমিকম্প বাইরে কোথাও নয়—পায়ের নিচের জমিনে তো নয়ই—কেননা আশপাশের লোকেরা বেশ স্থির হয়েই দাঁড়িয়ে হাসছে, হাসছে ওরই দুর্গতিতে,—এ ভূমিকম্প ওর মাথার মধ্যেই। দেহের সমস্ত খুন বোধ করি মাথায় চড়ছে, তাতেই এরকম দুলছে শরীর, ভেতরটা কাঁপছে থরথর করে। এমন দিক্‌দাহকারী রোষ যে মানুষের হয়—অপমানে এমন দৈহিক দাহ যে বোধ করে মানুষ—এই প্রথম বুঝল সে। কি যেন হল ওর ভেতরে, মনে হল রোজকিয়ামত এসে গেছে—আজ প্রলয়ের দিন, ধ্বংসের দিন, খুদা সব যেন ভেঙেচুরে দিয়ে নতুন ক'রে গড়বেন দুনিয়া।

একবার ইচ্ছা হল সে নিজেই ঐ প্রলয়ের সূচনা করে—যে কটাকে সম্ভব শেষ ক'রে দেয়, ঐ মেয়েটাকে আগে, হারুন মিঞাকে, আর এই যারা দাঁত বার ক'রে হাসছে ওকে পাগল আর বুদ্ধু ভেবে—সব কটাকে। শেষ অবধি মরবে ঠিকই, কিন্তু তার আগে কম্‌সে কম কুড়িটাকে তো ঘায়েল করতে পারবে!

বাঁচিয়ে দিলেন তাকে পরমেশ্বরই।

কারা যেন পিছন থেকে চেঁচিয়ে উঠল, 'ঐ যে এব্রাহিম মিঞা ওপারে উঠে এসেছে, এবার নিলাম শুরু হবে। হাঁ, এই যে মোটা মোটা ব্যাপারীরাও সব হাজির—!'

সঙ্গে সঙ্গে পিছনের লোক সামনের লোককে ঠেলে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে সামনে এগিয়ে এল। সম্ভবতঃ ওধারে যে তিন-চারজন নিজের নিজের নৌকর-পাহারাদার, জিঞ্জির বেড়ি—বান্দা কেনার সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে এসেছে, ওরাই বড় ব্যাপারী—নিলাম ডাকবে। এমনি যারা নিজেদের জন্যে এক-আধটা ডাকবে তেমন রইস লোক কেউ বিশেষ নেই এদের মধ্যে, ভিড় যা মজা দেখবার লোকেরই।

এব্রাহিম মিঞা যাকে বলছে ওরা, নিলামদার, এতক্ষণ নিচে একটা খাটুলি পেতে বসে ছিল, এবার একটা ছড়ি হাতে মাচায় উঠে এল।

পিছনের লোকের ধাক্কা আর ঠেলাঠেলিতে দূরে পড়ে গেল ইব্‌তিয়ার, সরে যেতে যেতে অনেকটা দূরে একপাশের গিয়ে পড়ল। সকলের নজরই মাচার দিকে এখন,

ওকে কেউ লক্ষ্যও করল না বিশেষ। ওকে নিয়ে যেটুকু মজা তার তো চূড়ান্ত হয়ে গেছে, আর দরকার নেই। তামাশা এখন সামনে, ঐ মাচাটাকে ঘিরে।

বেঁচে গেল ইখ্‌তিয়ার। মাথা এখনও তেমনি টলছে, দেহের ঘর্মটাও—তবে পাগলামিটা গেছে।

সে আস্তে আস্তে ভিড়ের বাইরেই সরে এল। এদের অন্যমনস্কতার অবসরে, সকলের চোখ এড়িয়ে চৌরিবাজারের রাস্তা ধরে সবজীমণ্ডীতে এসে পড়ল।

জনতার চোখ এড়াতে, তাদের লক্ষ্যবস্তু হওয়ার দুর্ভাগ্য থেকে বাঁচতে জনারণ্যে ঢুকে পড়াই নিরাপদ। সব্‌জীমণ্ডীর ভিড়ে তাকে কেউ লক্ষ্য করবে না, মাথাটায় কেন কেবলই চক্কর লাগছে সে কারণও জানতে চাইবে না। দেখলেও ভাববে আগের রাতে সরাবের নেশাটাই জোর হয়ে গিয়েছিল। এমন তো হামেশাই হয়।

॥ ৩ ॥

ওর এই মনিবটির যেন মনের তল পায় না জঙ্গু বা জালালউদ্দীন হোসেন। কী যে চায়, কিসে যে খুশী—কখন যে মাটির মানুষ কখন সাক্ষাৎ শয়তান—আজও বুঝতে পারল না, এই গোটা দু'বছরেও।

না, আলস্য আরাম—এ শব্দ দুটো জানা নেই ইখ্‌তিয়ারউদ্দীন সাহেবের। বিশ্রাম যে কখন করে তা ভগবানই জানেন। লড়াই, জায়গীর, ঘোড়া, সওয়ার, সিপাহী—এই সব বুঝতে দাও, এই সব কথা পাড়ো, সারারাত খাড়া কাটিয়ে দেবে। চারিদিকে লোক পাঠাচ্ছে, অন্য কোন্ মুলুকের কী অবস্থা, কোন্ মুলুকে তড়িঘড়ি গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লে অনায়াসে দখল করা যায়। কেবল এই চিন্তা, এই ধ্যানজ্ঞান।

কিন্তু বিলাস আছে একটি।

বিলাসই বল আর নেশাই বল।

অতি বিশ্রী অভ্যাস। এই যে সম্পূর্ণ অকারণে মানুষগুলোর ওপর অকথ্য নির্যাতন, বিশেষ করে মেয়েদের ওপর—এটা কি? এ কি ইনসানের কাজ? ছোঃ, এ দাঁড়িয়ে দেখা যায় না!

এদিকে মানুষটা এত ভাল, মানে মনিব হিসেবে—প্রত্যেকটি লোকের সুখ-সুবিধা সম্বন্ধে এত সচেতন, প্রতিটি ঘোড়ার খবর নেয় বলতে গেলে—নিজে রোজ এক একটা আস্তাবলে গিয়ে পড়ে, কবে কোনটায় যাবে কেউ জানে না, সেখানে যদি দেখে কোন জানোয়ারের অযত্ন হচ্ছে তাহলে আর রক্ষে থাকবে না ঘোড়াবরদারের। তা সে তার নিজের ঘোড়াই হোক কি অপরের ঘোড়াই হোক—সে সব বিচার

নেই। কেউ যদি বলতে যায়, 'এ তো অমুকের ঘোড়া, কি আমার ঘোড়া—এর জন্যে আপনি অত গুস্‌সা করছেন কেন?' তখনই সেই লহমায় তলোয়ার বার ক'রে (ঐটুকু মানুষের কত বড় তলোয়ারই বা, প্রায় মানুষটার সমানই উঁচু—সবই কি বিদ্‌ঘুটে লোকটার!!) মাথাটা কচ্ করে কেটে নেবে, কারও পরোয়া করবে না।

এই যে এতগুলো লোক এসে জড়ো হয়েছে ওর চারপাশে—খিলজী তুরুক—যায় সেই উজবেকীস্তান থেকেও—দু'হাজারের ওপর হবে তো কম নয়, হাজারের মতো তো ঘোড়সওয়ারই হয়ে গেছে, আরও নিত্যিই আসছে, এরাই তো ওর বল-ভরসা, এরা ওর হযে জান দিতে তৈয়ার বলেই তো ইখ্‌তিয়ারউদ্দীন সাহেবের এত প্রতাপ আজ, দিল্লীর সুলতানের পর্যন্ত টনক নড়েছে—কিন্তু ঐ লোকগুলোই সাক্ষাৎ শয়তানের মতো ভয় করে ওকে, আর ও লোকটাও এদের কিছুমাত্র পরোয়া করে না। মরীয়া একেবারে, দানোয় পাওয়া মানুষের মতো।... মনে হয় যেন খাস খুদার কাছ থেকে পরোযানা নিয়ে এসেছে—কেউ ওর কোন নুকসান ওঠাতে পারবে না।

তা সে যাক গে, এটা ওর কী রোগ?

বেছে বেছে বড় বড় শহরের নখাসে লোক পাঠাবে—সব চেয়ে খুবসুরৎ দেখে বাঁদী আর ছোকরা বান্দা কিনে আনতে। এর ওপর লুটের মাল তো আছেই, টাকা পয়সা নিযে অত মাথা ঘামায় না, সব চেয়ে যা ফুটফুটে, আশমানের চাঁদের মতো লেড়কী, তা ওর চাই।

সে থাকে, অমন নেশা নবাব সুবাদারদের থাকে, ওটা ওদের চাই বইকি, রাজগীর তো ও-ই সুখ বলতে গেলে, আগভাগ সেরা মালগুলো ভোগ করা, নইলে এর ঝক্কি-ঝামেলা কি কম? সদা তটস্থ হয়ে থাকা, কখন কি হয়, কখন কি হয়।

এক লহমার ভুলে কি এতটুকু কোথাও হুঁসিয়ারিতে আলগা দিলেই আর একজন এসে কেড়ে নেবে। তারপর দুর্গতির সীমা নেই, হয় মেরে ফেলবে নয়তো বান্দা বাজারে বিক্রি করে দেবে। কেটে ফেলাই বেশী, এসব লোক, যারা আবার মাথা তুলতে পারে, পাল্‌টা শোধ নিতে পারে তাদের শেষ ক'রে ফেলাই বিধি, দুশমন ক'রে কেউ বাঁচিযে রাখতে চায় না।

তা ভোগ কর্‌ না বাপু, কেউ তো বারণ করছে না। ভোগ কর, অরুচি হয়ে গেলে ফেলে দে, বিলিয়ে দে· নইলে আবার কোনখানে পাঠিয়ে দে, বিক্রি হয়ে যরের পয়সা অন্ততঃ খানিকটা ঘরে আসুক!

এর সে সব কোন হিসেবেই নেই। কী যে চায়, কেন যে এমন করে—আজ অবধি বুঝতে পারল না জমু মিঞা।

বাউরা? না শয়তান? না জাহান্নমের কোন কর্মচারী—ইন্সানের চেহারা ধরে এসেছে? কিছুই তো বোঝা যায় না!

ভোগ করে ঠিকই, বাঁদীই হোক আর বান্দাই হোক—খুবসুরৎ দেখলে রাত্রে বা দিনে যখনই পাবে নিজের কামরায় নিয়ে যাবে—কি তাঁবুতে, যেখানে যা। কাউকে একদিন কাউকে দু'দিন কাছে রাখবে—যার ওপর যতক্ষণ ঝোঁক থাকবে—তার পরই শুরু হবে তার ওপর অকথ্য নির্যাতন।

কাউকে থামে বেঁধে সম্পূর্ণ নাঙ্গা ক'রে কোড়া লাগাবে, পাতলা নরম চামড়া মখমলের মতো, কোড়ার ঘায়ে কেটে ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটবে—দেখবে আর হা-হা ক'রে হাসবে ফুর্তিতে—একেবারে এখানের কাফেররা যাকে বলে পিশাচ বা যমদূত, অন্যরা যা বোঝে শয়তানের নৌকর—তাদের মতো হাসি। পাগল হয়ে যায় যেন, 'আরও আরও' কেবল এই বুলি তখন। অন্য সময় তবু হাব্‌সী নৌকর দিয়ে চাবকায়, জোশ ছোটে যখন তখন তার হাত থেকে কোড়া কেড়ে নিয়ে নিজেই পাগলের মতো মারতে শুরু করে।

আবার আপন মনেই বকে সেই সময়, 'কৈ মরছিস না তো! মনের যেন্নায় কৈ নিজের গলা নিজে টিপছিস না তো!' আবার কখনও বলে, 'কাঁদছিস কেন? তেজ কি হল? থুক্ ফেল্ না, শির-তেড়া ক'রে থুক্ ফেল্—ক্ষমতা থাকে তো!'

শুধু কি এই অমানুষিক মারেই শেষ।

নিজ হাতে ঐ ছোট ছোট মোলায়েম ফুলের কলির মতো আঙুলে পেরেক পুঁতে পুঁতে দেবে. গরমের সময় কড়া রোদে মাঠের মধ্যে পাথরের সঙ্গে বেঁধে ফেলে রাখবে—গাছের সঙ্গে বাঁধে না যদি ছায়া পায় এই কারণে—এক ফোঁটা জল কারও দেবার হুকুম নেই সে সময়ে। হ্যাঁ, ভয়ে এমন কঠিন নির্যাতনও করে বৈকি নবাব সুলতানরা, কেউ আমার জান নেবার যড় করেছিল কি চেষ্টা করেছিল, আমার নিমক খেয়ে আমার সঙ্গেই চরম বেইমানির সলা করছিল—এমন খবর পেলে, হাতে হাতে ধরা পড়লে, এমনি নির্যাতনই করা হয়। আরও বেশিও করে। জ্যান্ত ছাল ছাড়িয়ে নেওয়া হয়, ফুটন্ত তেলে একটু একটু ক'রে ফেলা হয়, মাটিতে অর্ধেক পুঁতে কুকুর দিয়ে খাওয়ানো হয়।

কিন্তু এখানে তো সেসব সওয়ালই নেই। এত্তটুকু টুকু বাচ্চা মেয়ে কি ছেলে—তাদের অপরাধ তারা খুবসুরৎ দেখতে। তকদিরের দোষে আল্লার মরজিতে চুরি হয়ে বান্দার মতো বিক্রি হয়েছে। কোন অপরাধ করে নি বেচারীরা, তোরই মন ঘুরিয়েছে হয়তো এক ঘড়ি আগে।

কত বোঝাতে গেছে লোকে, এতে ক'রে শরীরে এত দাগ হয়ে গেলে, আর যে ওদের কানাকড়িও দাম থাকবে না ; সবটাই মাটি, বিলকুল সব টাকা বরবাদ হয়ে যাবে। আর যা করো, শরীরটাকে অমন জখম ক্ষতবিক্ষত ক'রে দিও না। তা যারা বলতে যায় তাদেরই সে সময় তেড়ে মারতে আসে।...ঐ তো চেহারা—দানোর মত। মুখখানা মর্কট, শরীরটা বামন—হাত দুটো কিস্‌সা-কহানীতে শোনা দানোর মত ইয়া লম্বা, তার ওপর যখন চোখ দুটো খুনের নেশায় জবা ফুলের মতো লাল হয়ে ওঠে, আঙরার মতো জ্বলতে থাকে, তখন মনে হয় সিফ্‌ শয়তানের বাচ্চা—কাফেররা যাকে বলে পিশাচ রাক্ষস।

ভয় করে বৈকি। সে সময় ওর চেহারা দেখলে অতিবড় সাহসীরও বুকের রক্ত জল হয়ে যায়। মনে হয় তার গলাটা কেটে এখনই সেই তাজা খুন চুমুকে চুমুকে খাবে।

এটা যে কেন হয়—কেন যে অমন মাঝে মাঝে শয়তান ভর করে—ঐ সময়গুলোতে হিতাহিত-জ্ঞান হারিয়ে ফেলে. এমন পুরো বাওরা হয়ে যায়—তা অন্য বুঝতে পারে না কিছুতেই। তেমন কোন পীর ফকিরের সন্ধান পেলে কী কোন গুণীন—তাকে ঠিক ধরত এর কাঁধ থেকে শয়তান নামিয়ে দেবার জন্যে।

বুঝতে কি পারে ইখ্‌তিয়ারউদ্দীনই ?

কত বার কত সময়, শান্ত প্রকৃতিস্থ অবস্থায় নিজেকে বোঝাবার চেষ্টা করে যে, এটা অন্যায় এটা পাগলামি—এখন থেকে এটাকে সারাতে না পারলে পুরো পাগল হয়ে যাবে এর পর—এই এরাই তখন নির্যাতন করবে, হাসবে, গায়ে ধুলো দেবে ; প্রতিজ্ঞা করেছে এই সমস্ত সময়গুলোয় যে আর কখনও এমন শয়তানী করবে না। কিন্তু কী যে হয় ওর, খুবসুরৎ চেহারা দেখলেই লোহুতে কি আগ জ্বলে যায়, মাথায় কি দানো চাপে—একেবারে অমানুষ মাতাল হয়ে যায়—হ্যাঁ, লোহুর নেশাতেই মাতাল হয়ে ওঠে, সুন্দর চেহারাকে বিকৃত বীভৎস ক'রে না তোলা পর্যন্ত শান্তি পায় না। মনের পুরনো ঘা-টা দগদগিয়ে ওঠে, সেই জ্বালা ভুলতেই ঐ বাচ্চাগুলোর গায়ে ঘায়ের জ্বালা ধরিয়ে দেয়। একজনের অপমানের শোধ এতগুলোর ওপর তোলা সম্ভব নয় তা বোঝে—শুধু শুধু আর একটা গ্লানিই মনে জমা হতে থাকবে এও জানে—তবু পারে না নিজেকে সামলাতে।

কী করলে যে এ রোগ সারবে, কী করলে ভাল হবে—তা জানে না।

এত ক'রেও কি তৃপ্তি হয় কিছু ? শান্তি আসে মনে ?

কই, সেদিনের সেই আঘাত, হোসেনার সেই থুথু ফেলা—আজও তো কই ভুলতে পারল না, এতগুলোর ওপর গায়ের ঝাল মিটিয়েও ?

এই তো কাবুল গজনী কান্দাহার থেকে শুরু ক'রে এদিকে লাহোর মুলতান জালালাবাদ ওদিকে গুজরাত সিন্ধু—পূবে ঘোড়াঘাট পর্যন্ত চারিদিকে লোক পাঠিয়েছে, আজও পাঠাচ্ছে।

এত কষ্টের পয়সা, হ্যাঁ, খুবই কষ্টের ওর পয়সা তাতে কোন ভুল নেই জিন্দিগীর অর্ধেক যে কাটিয়েছে বলতে গেলে না খেয়ে—তার কাছে একটা দামড়িও এক মোহর। আর সত্যি, কীই বা রোজগার করেছে সে, এখনও পর্যন্ত সে কী দরের মানুষই বা, একটা ছোট জায়গীরদার, এই তো ?···সেই পয়সা জলের মতো খরচ করছে শুধু একটা খবরের জন্যে, অমুক তারিখে মুলতানের নখাসে হারুন মিঞার বাঁদী হোসেনা, এব্রাহিম মিঞা নিলামদারের মারফত বিক্রি হয়েছে—সে কোথায় এখন কার কাছে আছে, কে তার মালিক—এই খবরটুকু চাই। যদি খাস দেহ্‌লীর সুলতানের হারেমে থাকে তাও কেড়ে আনবে সে। যেখানেই থাক, যতদিনই লাগুক খুঁজে বার করতে—সেই মেয়েটাকেই চাই ওর। তাকে নিয়ে বিছানায় শুতে না পারলে, তারপর হাব্‌সী নৌকর দিয়ে তাকে অপমান করিয়ে তার গায়ে অমনি কোঃার দাগ বসাতে না পারলে এ পাগলামি সারবে না ওর, তার তেড়া-শির পায়ের কাছে লুটোতে না পারলে এ জ্বালার শান্তি হবে না।···

॥ ৪ ॥

বহুত কষ্ট করেছে সে।

তক্‌দিরের চাকা শেষ অবধি ঘুরেছে ঠিকই, তবে সহজে ঘোরে নি।

মুলতান থেকে একসময় দেহ্‌লীও পৌচেছিল বৈকি!

না খেয়ে, বলতে গেলে ভিক্ষে করতে করতে।

তারপর যেমন ভাবে একদিন শিহাবউদ্দীন ঘুরীর কাছে পৌছয় সেই ভাবেই লোকের হাতে পায়ে ধরে, অনেক দীনতা স্বীকার ক'রে সুলতান কুতব্‌উদ্দীন আইবকের সামনেও পৌছতে পেরেছিল।

তিনিও ওকে দেখে প্রথমটা মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছিলেন, বোধ করি হাসি চাপতেই —তবে ঘুরীর মতো হা-হা ক'রে হেসে ওঠেন নি, অপমানও করেন নি। শুধু প্রশ্ন করেছিলেন, ওর তাঁবে কোন সিপাহী আছে কিনা, তহ্‌বিলের অবস্থা কী রকম, ঘোড়া বর্ম ঢাল হাতিয়ার এসব কিনতে পারবে কিনা। ইখ্‌তিয়ার নিজের অবস্থা

গোপন করে নি—কিছুই নেই তার, কিন্তু পেলে নিজের কিমৎ প্রমাণ ক'রে দেবে।
তার জবাবে সুলতান পরামর্শ দিয়েছিলেন, বদাউনে মালিক হিজবারউদ্দীনের কাছে যেতে—তাঁর লোকের দরকার, ঘরের পয়সা দিয়ে পোষবারও সঙ্গতি আছে।

গিয়েছিল ইখ্‌তিয়ার।

খুব যে একটা আশা নিয়ে গিয়েছিল তা নয়, নিরাশ হবে জেনেই গিয়েছিল। সব জায়গায় যা হচ্ছে তাই হবে—এখানে অন্যরকম হবেই বা কেন?

কিন্তু হিজবারউদ্দীন ফেরান নি, কাজ বা নৌকরি একটা দিয়েছিলেন, অতি সামান্য বেতনেই অবশ্য, তাতে কোনমতে উপবাসটা বাঁচে, এই পর্যন্ত। তবে হ্যাঁ, ঘোড়া হাতিয়ার দিয়েছিলেন, কয়েকজন সিপাহীও দিয়েছিলেন ওর তাঁবে কাজ করার জন্যে, লড়াইয়ের কাজ।

তা-ই যথেষ্ট। কী দরমাহা পেল সেটা বড় কথা নয়—একটা আশ্রয় পেল, অবলম্বন পেল—সেইটেই বড় কথা।

প্রথম কাজ পেল, যত সামান্যই হোক, জীবিকার ব্যবস্থা হল একটা।

উন্নতির সেই প্রথম ধাপ।

তা হোক, এই ধাপটার জন্যেই তো অপেক্ষা করতে হয়েছে এতকাল, এত সাধনা এত কষ্ট করতে হয়েছে, এত অপমান সহ্য করতে হয়েছে…

একটু ফাঁক পেলে একটু সুঁড়িপথ পেলেই যে এগোতে পারবে, এ বিশ্বাস ওর ছিল। এগোলও তাই। ওর হিসেবে কিছুমাত্র ভুল হয় নি দেখা গেল।

ভুল হয় নি হিজবারউদ্দীনেরও।

দুটো-চারটে সুযোগ পেতেই ইখ্‌তিয়ার তাঁর নিমকের দাম উসুল করে দিল, বুঝিয়ে দিল নিজের দামও।

হিজবারউদ্দীনেরও যেমন নজর পড়ল তেমনি অন্য লোকও সচেতন হয়ে উঠল এই বেঁটে মর্কটটার কেরামতি সম্বন্ধে।

যে যথার্থ নেতা তাকে দলপতি বলে ওপরওলা বলে চিনতে ভুল হয় না কারও।

দেখতে দেখতে ওর মতোই ভাগ্যান্বেষী দু-চারজন জুটে গেল—তারা চায় ওর সঙ্গে কাজ করতে—লড়াই করতে, লুঠ করতে। ওর তক্‌দিরে নিজেদের তক্‌দির মেলাতে। দল হয়ে গেল তৈরী।

লুঠ ক'রেই তাদের ঘোড়া হাতিয়ার পোশাকের ব্যবস্থা করল ইখ্‌তিয়ারউদ্দীন। তারপর দল বেশ তৈরী হতে বদাউন ছেড়ে অযোধ্যায় গেল। সেখানে সুবাদার মালিক হুসামউদ্দীন দিলদরিয়া মেজাজের লোক, তাঁর কাছে গেলে সুবিধা হবে

অনেকেই বলেছিল একথা।

সুবিধা হলও।

সুবাদারের কানেও ইতিমধ্যে 'বদাউনের মর্কট'টার কথা পৌঁছেছে। তিনি ওকে দেখে, ওর দলের কুচকাওয়াজ নিয়মানুবর্তিতা দেখে খুশী হলেন, বুঝলেন এ কাজের লোক।

আরও খুশী হলেন ওর আনা নজর দেখে। আসবার পথেই লুঠ করা—তবু ওর নজর আছে এটা বুঝলেন। বাছাই করা জিনিস সব। উৎকৃষ্ট ঘোড়া। খুবসুরৎ বাঁদী। জহরৎ। তোবামোদেও তুষ্ট হলেন। খুশীমনেই দুটো পরগণা জায়গীর দিলেন ওকে। বললেন, 'ঐতেই যা পার করে নাও। তবে অন্তত হাজারখানেক লোক যেন পাই তোমার কাছে—জরুরত পড়লে!'

ইখ্‌তিয়ার বলল, 'পাবেন, আমি জবান দিচ্ছি। তবে অন্তত দুটা মাস সময় দিতে হবে।'

জায়গা ভাল। ভুইলী আর ভাগবত দুটা পরগণা। এখন যেখানে ওর ডেরা—এই ভুইলী গ্রামের নামেই পরগণা।* গ্রামের প্রান্তে ছোট্ট পাহাড় একটা, তার ওপর পুরনো ভাঙা একটা কিল্লাও ছিল।

এই মোট। কিন্তু যে দীর্ঘকাল, এতখানি বয়স পর্যন্ত ক্রমাগতই প্রতিকূল ভাগ্যের সঙ্গে যুঝেছে, তার কাছে এইটুকুই যথেষ্ট। সে কঠোর পরিশ্রমে সেই ভাঙা দুর্গই মেরামত করিয়ে বসবাসযোগ্য ক'রে নিয়ে সেইখানে আস্তানা গাড়লে। নবাব কি রাজা হতে গেলে আগে একটা প্রাসাদ দরকার এ জ্ঞানটা তার ছিল। নিজের থাকার যেমন আড্ডা চল—সিপাহী আর ঘোড়া থাকারও।

তারপর এইটুকু সম্বল ক'রেই রাজ্যবিস্তারে মন দিল সে। পূবে অবারিত মুলুক পড়ে আছে সব। বাধা দেবার কেউ নেই, সেখানে থেকে লুটে আনবার মতো ঐশ্বর্যও প্রচুর।

মনে হল খুদা এতদিন ধরে ওকে পরীক্ষা ক'রে দেখে এবার পুরস্কার দিতেই এখানে এনে ফেলেছেন।

ইখ্‌তিয়ার যা ভেবেছিল, যে হিসেব ক'রে মাত্র দু মাস সময় নিয়েছিল মালিক হুসামউদ্দীনের কাছে—তাতেও ভুল হয় নি দেখা গেল। প্রচুর লুঠ ও নতুন জায়গীর তালুক জয় করার সম্ভাবনা আছে শুনে ওরই মতো ভাগ্যান্বেষী খিলজী আর তুর্কদের দল এসে জমতে লাগল ওর পতাকার তলায়। ঘোড়াও এনেছে কেউ কেউ, যাদের

* বর্তমান মির্জাপুর থেকে ৪৮ কিলোমিটার (৩০ মাইল) দূরে, চুনারের ১৭॥ কিলোমিটার বা ১১ মাইল পূর্বে।

বেই অথচ-রাম্না সত্যিকারের লড়িয়ে—দেখে পরীক্ষা ক'রে তাদের ঘোড়া কিনে দিয়েছে ইখ্‌তিয়ারউদ্দীন। নিজের যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও এতটুকু সুবিধা সহায়তা কারও কাছ থেকে পায় নি—সে দুঃখ ওর মনে আছে, যতটা পারে উপযুক্ত লোকের ওপর সুবিচার করতে চায় তাই।

তাতে ফলও হয়েছে ভাল। ওর দলের লোক ওর জন্যে জান দিতে তৈয়ার।

যখন আরও ঢের কম লোক ওর তাঁবে, ভুইলীর কিল্লা মেরামত শেষ হয় নি, তখনই বর্তমান বিহার রাজ্যের সীমানা পর্যন্ত পৌঁছে গেল তার অধিকার। সামান্য জায়গীর-দার কার্যতঃ সুবাদারে পরিণত হল।

নজর ছিল মিথিলা, শুনেছিল সেখানে ঘরে ঘরে সোনার পাহাড় জমা আছে, কিন্তু সেখানে দাঁত ফোটাতে পারল না। সেখানে তখনও কর্ণাটক বংশের রাজারা রাজত্ব করছেন—এবং দেখা গেল, আর যাই হোক, তাঁরা নিতান্ত আরামে আলস্যে দিন কাটান না। ধারে-কাছে সীমানা বরাবর একটু খোঁচা দিতে গিয়ে—লুঠতরাজ করতে গিয়েই টের পেল অবস্থাটা, বুঝল এ শক্ত মাটি, এখানে এত সহজে এত অল্প লোক দিয়ে কাজ হবে না। সমস্ত সীমান্ত জুড়েই যেন রাজার সদাজাগ্রত দৃষ্টি, হুঁশিয়ার কড়া পাহারা।

আর ঘাঁটাল না ইখ্‌তিয়ার। এখন সামনাসামনি লড়াই করতে গেলে যদি হেরে যায়—বড় বেশী বেইজ্জত হতে হবে, আর কখনও সে বেকায়দা সামলাতে পারবে কিনা সন্দেহ। যারা নতুন এসেছে, ওকে একটা দিগ্বিজয়ী অপরাজিত নেতা ভাবছে—তাদের মোহভঙ্গ হয়ে যাবে, তারা হয়ত অন্যত্র সরে পড়বে। তার চেয়ে এখন থাক, পরে-পশ্চাতে দেখা যাবে।

এই ভেবেই অন্য ছল ক'রে ফিরে চলে এল, কিন্তু একেবারে 'শুধু-হাতে' নয়। মুঙ্গের পর্যন্ত গোটা ভূখণ্ডটাই ওর দখলে চলে এল এক বছরের মধ্যে।

টনক নড়ল দিল্লীর সুলতানের। বুঝলেন, এ লোককে হাতছাড়া করে ভাল করেন নি। সেই ভুল শোধরাতে তাড়াতাড়ি লোক পাঠালেন গুটিকতক ঘোড়া আর খিলাত দিয়ে। খুশী হয়েছেন সুলতান কুতবউদ্দীন, তার কাজে সন্তুষ্ট হয়েছেন—এই উপহার তারই নিদর্শন।

হাসল ইখ্‌তিয়ার মনে মনে। পাছে হাতছাড়া হয়ে যায়, প্রতিদ্বন্দ্বীতে পরিণত হয়, স্বাধীন ভাবে রাজত্ব করতে চায়—তাই এত ব্যস্ততা।

কিন্তু ইখ্‌তিয়ারও এত নির্বোধ নয়। নতুন দেশ, নতুন মানুষ—কিছুই বলতে গেলে চেনে না এখনও এদের—এখানে এগোতে হবে সন্তর্পণে, সতর্ক হয়ে। পিছনে

প্রবল শক্তিকে দুশমন করা চলবে না। দেহ্‌লীর সুলতান তার টাকা-কড়ির কিছুই কেড়ে নিচ্ছেন না, হয়তো মাঝে মধ্যে সামান্য কিছু নজরানা দিতে হবে, লড়াই বাধলে প্রয়োজন মতো পাশে গিয়ে দাঁড়াতে হবে। তাতে দোষ নেই, এখন ওদের—বিদেশীদের একতাবদ্ধ হয়ে থাকাই দরকার।

সে সসম্মানে সুলতানের পাঠানো খিলাত গ্রহণ করল, দূতকে বলল, আলা-হজরতের এ তবররুক সে মাথায় করে নিল। সামান্য বান্দার প্রতি তাঁর এ করুণা এ অনুগ্রহ তাঁর সরাফতেরই নিদর্শন, এর মধ্যে বান্দার কোন কৃতিত্ব নেই। গরিব-নওয়াজ যে তাকে ইয়াদ রেখেছেন এতেই সে অবাক হয়ে যাচ্ছে। তাতেই বোঝা যাচ্ছে যে খুদা উপযুক্ত লোককেই তখ্‌ৎএ বসিয়েছেন। ইত্যাদি ইত্যাদি—

সেও অন্য লোক দিয়ে সুলতানের নজরানা হিসেবে পাচটি বাঁদী, এক হাজার মোহর, কিছু ভাল রেশমী কাপড় আর উৎকৃষ্ট সরু চাল কয়েক মণ পাঠিয়ে দিল।

এ পর্যন্ত, এদিকে দুঃখ করার, আপসোস করার মতো কিছু নেই। শুধু যদি—যদি এই ঘা-টা না থাকত! এই জ্বালাটা—!

॥ ৫ ॥

অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল ইখ্‌তিয়ার। ভুইলা কিল্লায় ওর নিজের কামরার সামনে যে ছোট্ট তিন-দিক-খোলা জায়গাটুকু—এরা বলে বারান্দা, এইখান থেকে পুব উত্তর দক্ষিণ পরিষ্কার দেখা যায়, বহুদূর পর্যন্ত, একটু চেষ্টা করলে পশ্চিমেরও খানিকটা। দেখা যায় বলেই এটা ঢাকতে দেয় নি, এখানে ঘর ওঠাতে দেয় নি সে। ঘরে কোন জানলা নেই, জানলা বাখাব দস্তুরও নেই, একটি মাত্র দরজা—ঘর থেকে কিছুই দেখার উপায় নেই, তাই বেশির ভাগ সময় এইখানেই বসে থাকে সে।

আজও বসে ছিল, খোলা জায়গাটায় একটা পাথরের বেদী করা আছে, তার ওপর একটা কাঠের চাবকোণা চৌকি পেতে বসে পূবের দিকে চেয়ে ছিল। পশ্চিমে জয় করার মতো কোন মুলুক নেই কাছাকাছি, সৌভাগ্য সম্মান ঐশ্বর্য সবই এই পূর্বদিকে পড়ে আছে এখনও। কোথায় কতটা আছে—কতখানি অরক্ষিত, সেই খবর নিতেই লোক গেছে আজ ক'দিন, চোদ্দ-পনেরোজন গুপ্তচর পাঠিয়েছে সে। সেই কথাই ভাবা উচিত, ভাবতে শুরুও করেছিল, কিন্তু ওর বেশীক্ষণ নির্জনে থাকার উপায় নেই—ভাবতে বসলেই—এই আজও যেমন—মনটা কখন সুলতানের এক বান্দাবাজারে চলে যায়, বুঝতেও পারে না।

এখন একটা ছোট্ট দীর্ঘনিশ্বাসের শব্দে হঠাৎ সচেতন হয়ে উঠল যে, সে ছাড়াও

তারই পায়ের কাছে আর একটা জীব বসে আছে।

অনেকক্ষণ ধরেই বসে আছে। এত স্থির হয়ে আছে যে, তার অস্তিত্বই ভুলে গিয়েছিল ইখ্‌তিয়ার। দেহের একটা অংশ নড়ে নি, একটু সরে বসে নি, সোজা হয়ে বসার চেষ্টা করে নি, এমন কি—ওর লোবে হচ্ছে যে—এতক্ষণ নিশ্বাসও ফেলে নি বোধ হয়। সেই যে দুপুর থেকে, যখন ইখ্‌তিয়ার বলেছিল, 'বোস ঐখানে, বসে থাক এখন। বিকেলে সময়মতো তোর ব্যবস্থা করব, মর্জিমতো। কোড়াটা মেরে মেরে কেটে গেছে - মেরামত হয়ে আসবে তার মধ্যেই - ' তখন থেকেই ঠায় ঐভাবে মাথা নীচু করে বসে আছে পাথরের মতো।

এ মেয়েটাকে নিয়েও একটা সমস্যা।

কী যে করবে এখনও মন স্থির করতে পারে নি ইখ্‌তিয়ারউদ্দীন।

এরকম কখনও হয় না। কারও বেলাতেই হয় নি—এই গত দু'বছর আড়াই বছরে। মন স্থির করার প্রয়োজন হয় নি। এই মেয়েটা প্রথম ওকে দ্বিধায় ফেলেছে।

মিথিলার সীমানা থেকে ফেরবার পথে ওর দলবল যে-কটা মেয়েকে ধরে এনেছিল —তার মধ্যে এই গোটাকতক খুবসুরৎ দেখে বেছে ইখ্‌তিয়ারের কাছে পাঠিয়েছে —মালিক বা নেতার প্রাপ্য হিসেবে। তার মধ্যে আর সব ক'জনের ব্যবস্থাই হয়ে গেছে, এইটিই শেষ।

এও এসেছে আজ তিনদিন ওর ঘরে। ওর হিসেবে এ-ই যথেষ্ট, এবার সরিয়ে দেওয়ারই কথা। এমন কিছু অপূর্ব সুন্দরী নয় যে তিনদিনেরও বেশি লালচ থাকবে। তাছাড়া এসব বেশীক্ষণ ভালও লাগে না ইখ্‌তিয়ারের।

কিন্তু এ মেয়েটা একটু বেয়াড়া।

সেয়ানা? সবটাই ভেবেচিন্তে হিসেব ক'রে করা? আগে শুনেছে কারও কাছে—এখানে কি হয়, যে সব মেয়েরা খোদ মালিকের ভাগে পড়ে, তাঁর শোবার ঘরে যাদের ডাক পড়ে—তাদের দুর্দশা?

তাও তো মনে হয় না। নতুন এসেছে দূর দেশ থেকে। ওর ভাগের যা মেয়ে তাদের আলাদা রাখা হয় নিচের তলার একটা ঘরে বন্ধ করে, আর কারও সঙ্গে, বাইরের কারও সঙ্গে যোগাযোগ হয় না। যতক্ষণ না মালিকের ভোগ শেষ হচ্ছে ততক্ষণ আদরযত্নেরও ত্রুটি হয় না। তারপর—ওর যা আছে, নির্যাতন শেষ হলে একেবারে নৌকরদের মহলে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। তারা কেউ ফিরে এসে নিজেদের অভিজ্ঞতা গল্প করবে সে সম্ভাবনা নেই। এক নৌকররা গল্প করতে পারে। কিন্তু যে তাতারনীরা এদের পাহারা দেয় তাদের জিভ কাটা— গল্প করার কোন

উপায় নেই। এক যদি ইশারা-ইঙ্গিতে জানিয়ে থাকে। কি জানি বলে তো হয় না। তাদেরও প্রাণের ভয় আছে—পিঠের চামড়া ছাড়িয়ে নেবার ভয় আছে।

না, মেয়েটা বড়ই ভাবিয়ে তুলেছে।

আসলে গোলমাল শুরু হয়েছে সেই প্রথম রাত্রিতেই।

অন্য মেয়েদের বেলায় দেখেছে, কাঠ হয়ে পড়ে থাকে মড়ার মতো, ও যা সম্ভোগ করে নিতান্ত নিজের গরজে। এর থেকে অন্য রকম কিছু, ভাল কিছু আশাও করে নি কখনও, এ নিয়ে মাথাও ঘামায় নি। ভালবাসা তো নয়ই। জোর ক'রে ধরে আনা বা কিনে আনা অপরিচিত মেয়ে হুকুম তামিল করবে এই পর্যন্ত—তার কি দায় পড়েছে যে সে আগ্রহ দেখাবে? বিশেষ ওর মতো এই চেহারার মরদ!

তাও বেশীদিন ঘর করলে, একসঙ্গে বাস করলে একটা মহব্বৎ আসা সম্ভব—সে সুযোগও তো পায় না কেউ।

এই মেয়েটা—প্রথম দেখল সে—সাড়া দিয়েছে, পাথর নয়।

এ অভিজ্ঞতা কখনও ছিল না। কখনও জানেও না, কল্পনাও করতে পারে নি, মেয়েদের তরফ থেকে আগ্রহ থাকলে নিতান্ত পাশববৃত্তিও কত রমণীয় কত মোহনীয় হতে পারে।

এই মেয়েটা তাকে জড়িয়ে ধরেছিল, বুকে চেপে ধরেছিল। বহুক্ষণ পর্যন্ত সে বন্ধন শিথিল হয় নি।

শুধু সেদিন বা সেই একবারই নয়। বারবারই ঘটেছে এই ঘটনা। পশুবৃত্তি যখন জাগে তখন কোন জ্ঞান থাকে না ইখ্‌তিয়ারের, অন্য মেয়েরা অজ্ঞান হয়ে যায়, মূর্ছিতের মতো মড়ার মতো পড়ে থাকে—এ কিন্তু তা নয়। একে জীবিত মানুষ বলেই মনে হয়েছে।

তার পরেও, দিনের বেলা যখন তাতারী দাসীরা পাশের ঘরে গিয়ে বিশ্রাম করতে ইঙ্গিত করেছে—ইখ্‌তিয়ারের ক্ষণ-সঙ্গিনীদের দু'তিন দিনের বাসা ঐ ঘরটায়—মেয়েটা যায় নি, ইঙ্গিতে তাদের অনুনয়বিনয় ক'রে নিবৃত্ত করেছে, ওর কাছে থাকতে চেয়েছে। থেকেওছে। কে জানে কেন, নিষেধ করতে পারে নি ইখ্‌তিয়ার। অবসর সময়ে বাতাস করেছে—প্রথম আঁচল দিয়েই—পরে পাখা একটা খুঁজে বার ক'রে পাখা দিয়ে। আর কিছু করার না থাকলে পা টিপে দিয়েছে, এটা ওটা হাতে যুগিয়ে দিয়েছে—না হয় তো পায়ের কাছ ঘেঁষে বসে থেকেছে।

এর সবটাই কি অভিনয়?

সুপরিকল্পিত, সুচিন্তিত?

.এইটেই যে বুঝতে পারছে না কিছুতে।

নিজের মনেই বিচার করতে করতে ক্লান্ত হয়ে হাল ছেড়ে দিয়েছে।

থাক অমনি, তাড়া কিছু নেই। এমন তো কোন বাধ্যবাধকতা নেই যে সকলের সঙ্গে ঠিক একরকম ব্যবহার করতে হবে। একই সময় বাঁধা থাকবে সকলের জন্যে, ইচ্ছে হলেও একজনকে বেশী দিন কাছে রাখতে পারবে না!...

মন স্থির করতে না পেরেই বসে থাকতে বলেছিল, তারপর ভুলেই গিয়েছিল ব্যাপারটা, ওর অস্তিত্বই। চিন্তা কখনও নিজের উন্নতির, নূতন রাজ্য জয়ের, সাম্রাজ্য স্থাপনের গৌরবকল্পনা থেকে অত্যন্ত গ্লানিকর একটা বিষাক্ত স্মৃতিতে চলে গিয়েছিল —তা টেরও পায় নি।

এইবার, ওর এই নিশ্বাসের শব্দে মেয়েটা সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠল আবার। কী যেন নাম বলেছিল? ললতা। মেয়েটা নাকি হিন্দু, উঁচু জাতের মেয়ে। এখানে আবার জাত বলে একটা জিনিস আছে। একই ধর্ম, একই দেবতা বা পুতুল পূজো করে—অথচ একজন আর একজনের হাতে জল খায় না, সাদি হয় না। এই জন্যেই এরা গেছে, এই কাফেরগুলো—বিপদের দিনেও এক হয়ে মিলতে পারে না, লড়াই করতে গিয়েও খাওয়া-ছোঁওয়ার বিচার করে। এক-এক জাতের রান্না এক-এক জায়গায় হওয়া চাই, এ দলের ছায়া পড়লে কি জলের ছিটে পড়লে ও দল খাবে না। আবার নাকি মাঠের মধ্যে মাটির আল দিয়ে চৌকা গড়ে নেয়। সেই জন্যেই সামনে গরু দেখলে আর লড়াই করতে পারে না, চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে মরে। গরুর চেয়েও কম বুদ্ধি বেটাদের।

আর সেই জন্যেই ইখ্‌তিয়ারদেব—সত্যধর্মে বিশ্বাসীদের এত সুবিধে। ওদের জন্যেই এতকাল ধরে যেন পরমেশ্বর এত ঐশ্বর্য সাজিয়ে রেখেছেন।

কথাটা মনে পড়তেই খানিকটা হেসে ওঠে।

তারপর বলে, 'এই, খেয়েছিস কিছু? ভুখ লাগে নি?'

ঈষৎ একটু হাসির আভা খেলে যায় ললতার মুখে। তাতে আরও ভারী মিষ্টি দেখায় মুখখানা। খুব যে সুন্দরী তা নয়—খুঁটিয়ে দেখলে হয় তো বেশ কিছু খুঁত বেরোবে, রঙও একেবারে দুধে-আলতা নয়, তবু কী যে আছে একটা, চেয়ে থাকতে ভালই লাগে, মনে হয় এ মেয়ে সামনে ঘুরে বেড়ালে, এটা-ওটা কাজ ক'রে দিলে কি একটু সেবা করলে মন্দ লাগবে না।

ললতা বলে, বেশ নিঃসঙ্কোচে পরিষ্কার কথা বলে সে, 'সকাল থেকে তো যার খাওয়ার কথাই বলছেন জনাবালি, অন্য খাওয়ার কথা তো শুনিও নি, কেউ আজ

কিছু খেতে দেয়ও নি। ওরাও বোধ হয় জানে যে আজ আর মার ছাড়া অন্য কিছু খাওয়ার কথা নয় আমার—',

'তা বটে—', ইঙ্গিতটা বুঝে নিজের ওপরই নিজে বিরক্ত হয়ে ওঠে যেন, নিজের দুর্বলতায়, 'আমারই আলসেমি! কাজটা সেরে ফেলাই উচিত ছিল। যাক গে—আজ বোধ হয় বেঁচেই গেলি। এই কে আছিস, এই উল্লুকে বাচ্চী, একে খেতে দিস নি কেন? না খেয়ে মরে গেলে আমি ঠেঙ্গাব কাকে?'

'থাক আপনি ব্যস্ত হবেন না জনাবালি, একবেলা না খেলে কেউ মরে না। আমাদের মাসে চার-পাঁচটা করে নির্জলা উপবাস করতে হয়—মানে এতদিন হত। ও আমাদের অব্যেস আছে।'

'উল্লুকে বাচ্চী' বলে যাকে সম্বোধন করা হল সে ইঙ্গিতে জানাল যে, পাশের ঘরে খাবার দেওয়াই আছে সেই দুপুর থেকে।

অর্থাৎ দোষ বা গাফিলতি যদি কারও হয়ে থাকে তো সে জনাবালিরই হয়েছে, আর কারও নয়। সে-ই ছাড়ে নি বা ছুটি দেয় নি, বসে থাকতে বলেছে, মেয়েটা বসেই আছে।

আরও রুক্ষ কণ্ঠে বলল ইখ্‌তিয়ার, 'সবগুলো হয়েছে ভক্ত আমার এখানে! যা খেয়ে আয়।'

'আর একটু থাকি না। একেবারে সন্ধ্যাতেই খাব। আপনার পা টিপে দি ই না একটু?'

ইখ্‌তিয়ারের মুখ ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে, 'আমার হুকুম শুনতে পাস নি? আমি একবারই হুকুম করি। ফেলা থুথু চাটার অব্যেস নেই আমার।'

ললতা বিনা বাক্যব্যয়ে উঠে পাশের ঘরে গেল। কিন্তু ফিরেও এল প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই।

'কৈ, খেলি না?'

'খেয়েছি বৈকি।' ললতা একেবারে ওর পায়ের কাছে বসে জুতোটা খুলে নিয়ে পায়ে হাত বুলোতে শুরু করল।

অন্য সময়, অন্য কেউ হলে এটা বেয়াদবি ভাবত ইখ্‌তিয়ার, লাথি মেরে দূরে সরিয়ে দিত—কিন্তু কে জানে কেন একে কিছু বলল না। ইঙ্গিতে তাতারী দাসীকে জিজ্ঞাসা করল—সত্যিই খেয়েছে কিনা। সেও আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল, একখানা রুটি।

রুটিই খায় শুধু ললতা তা ইখ্‌তিয়ার জানে। রুটি আর জল। এখানে রুটির

সঙ্গে মাংস হয়, কিংবা একটু ডাল। নিচের সাধারণ বাবুর্চিখানায় আর কি হয় তা অত খবর রাখে না, সেখানে সব্‌জি হয় নিশ্চয় কিছু—তবে কে অত গরজ ক'রে আনে সেখান থেকে। ইখ্‌তিয়ার ওসব খায় না নিজে। এখানে থাকে কিছু ফল, ইচ্ছে করলে খেতে পারে লল্‌তা—প্রথম প্রথম নাকি শুধু ফলই খেত—শুনেছে যা—তবে কে আর এখানে ওসব খাওয়াচ্ছে বা খেতে বলছে।

সে জিজ্ঞাসা করল, 'তুই মোটে একখানা রুটি খাস কেন রে?'

লল্‌তা মুখ টিপে হাসল আবারও—আরও একবার লক্ষ্য করল ইখ্‌তিয়ার মুখটা কত সুন্দর হয়ে ওঠে ওর এইভাবে হাসলে—'বেশী খেয়ে মোটা হয়ে যাই যদি—আপনার তখন আর মনে ধরবে না।'

হো হো ক'রে হেসে ওঠে ইখ্‌তিয়ার, 'তোর তো খুব লম্বা আশা দেখতে পাই। তিনদিন হয়ে গেছে—যথেষ্ট। এর পরও তোর কথা মনে থাকবে ভাবিস?'

'উমিদ রাখতে দোষ কি? আপনিই তো কাল বলছিলেন কাকে যেন—উমিদও আছে না-উমিদও আছে, যেমন আলো আর আঁধিয়ারা। আলো থাকতে আঁধিয়ারাকে সত্যি বলে ভাবব কেন?'

ঠিক বটে, ঠিক। বলছিল ঐ বুদ্ধ জল্লুটাকেই।

আশ্চর্য! ওর মনে নেই, মেয়েটা ঠিক মনে ক'রে রেখেছে তো!

আবারও কেমন অন্যমনস্ক হয়ে গেল। একে নিয়ে কি করবে, সেই কথা।

এ মেয়েটা একেবারেই অন্যরকম। এই এক বছরে কত বাঁদী এসেছে, কত লুটের মাল। কেউ তার সঙ্গে দুটো কথাও বলেছে কিনা সন্দেহ। ভয়ে শিটিয়ে থাকে, তার দিকে চোখ তুলে চাইতেও সাহস করে না—কথা বলা তো দূরের কথা। তাকে দৈত্যের মতোই মনে করে, সাক্ষাৎ শয়তানের মতো।

একটু চুপ ক'রে থেকে বলল ইখ্‌তিয়ার, 'তোকে কেউ বলে নি যে, আমার ক্ষিদে মিটে গেলে এই বাঁদীর বাচ্চীগুলোকে কি করি? কোড়া চালিয়ে পিঠের ছাল তুলে নিই—একটু চামড়া থাকতে কোড়া বন্ধ হয় না আমার—সে ঘা শুকোতে তিন-চার মাস সময় লাগে, কেউ কেউ মরেই যায়—এ কিন্তু মশকরা নয়, সত্যি—কোথাও কারও কাছে শুনিস নি?'

তেমনি বেপরোয়া ভাবেই উত্তর দেয় লল্‌তা, 'কেন শুনব না, এইখানে আপনার কাছেই শুনেছি, কাল থেকে কম্‌সে কম সাতবার বলেছেন।'

'তা তোর ভয় করছে না? নাকি ভাবছিস, তুই একা বেঁচে যাবি? এতগুলো মেয়ের নতীজা আর তোর নতীজা কি আলাদা?'

'তা কেন মনে করব জনাবালি। সে তো ভালই, ঐভাবে ক্ষতবিক্ষত ক'রে দিলে আর তো বিক্রি করা চলবে না। আপনার কাছেই তো রাখতে হবে।'

'আমার কাছে! ঐ কুচ্ছিত চেহারা হয়ে যাবার পর!...তুই কি পাগল! সে মেয়েগুলোর কে কোথায় আছে,—কি হয়েছে তাদের—জানিও না। চাকর নফররা কেউ নিযে থাকবে, কিংবা বাবুর্চীখানায কেউ গেঁহু পিষছে, কেউ জল তুলছে। কিংবা ছেড়ে দিযেছে, পথে ভিখ্ মেগে খাচ্ছে। আমাব কাছে আবার এসে পৌঁছতে পারবি! না তোর উমিদের তেজ আছে!'

'তা কেন বলছেন জনাব। তারা কেউই আর আপনার কাছে ফিরতে চায নি। আমি চাই!.. আর আমি এটা জানি, আমি যদি চেষ্টা ক'রে যাই—যদি প্রাণে বেঁচে থাকি অবশ্য—একদিন-না-একদিন আপনাব কাছে পৌঁছবই।'

'কী ক'রে? কি করব তোকে নিয়ে?'

'জনাবালির সঙ্গে শোবার মেয়ে ঢের মিলবে, মিলছেই তো প্রত্যহ—সেবা করবার লোক কেউ নেই। আপনারও বযস হচ্ছে, মেহনত ঢের করেছেন—এখন একটু ক্লান্তি লাগে আপনার—স্বীকার করুন চাই না করুন। সেবার দরকারে লাগতে পারব, সেইটুকু পেলেই খুশী।'

'তুই কি সত্যিই আমাকে চাস? আমার কাছে থাকতে চাস?'

গলাটা কি ঈষৎ একটু কেঁপে যায় ইখ্‌তিযারউদ্দীনের?

তার নিজেরই বিশ্বাস হয না যেন—নিজের গলাই শুনছে!

তারপর আবার বলে, 'কেন রে? আমাব কি আছে? এই তো আমার সুরৎ—না মানুষ না মর্কট। কি দেখলি আমাব মধ্যে?'

'কি জানি। যে নিজে আসে সে সুরৎ দেখে আসে। আমি তো নিজে আসি নি, আমাকে ধরে আনা হযেছে। আমি তো আপনাকে দেখছি এখানে এসে।'

'তা কি দেখলি? এখানেই বা কি দেখে পছন্দ হল?'

'পছন্দ হয়েছে কে বলল জনাবালি? মানে আপনার সুরৎ পছন্দ হয়েছে একথা তো বলি নি। তাহলে মিথ্যা বলা হত। মিথ্যা বলতে আমার বড় ঘৃণা হয। এসে দেখলাম আপনি কৃপার পাত্র। আপনাকে দেখে দয়া হল আমার।'

'দয়া! · তোর আস্পর্ধা তো কম নয়।·· তুই করবি আমাকে দয়া!'

কঠিন, ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে ইখ্‌তিয়ার নিমেষে।

'আমি কেন করব। আপনি দয়ার পাত্র তাই বলছি।'

'তার মানে?'

'গুস্‌সা করবেন না। আপনি বুদ্ধিমান, নইলে আজ এত বড় হতে পারতেন না। আপনার কথা আমি গাঁয়ে থাকতেই শুনেছি—এত নাম আপনার। আপনি ভেবে দেখুন কথাটা। এত করেছেন, এত কঠোর মেহনত সারা জীবন, এখনও করছেন—কিন্তু কী একা আপনি বলুন তো! দেখলাম, ক'দিনই দেখছি, আপনার মুখ চাইবার, আপনার কথা ভাববার, আপনার কাজ নিজের ওপর তুলে নেওয়ার মতো কেউ নেই এখানে—আপনার দিলের লোক, যার কাছে আপনি মনটা খুলতে পারবেন, সব কথা বলতে পারবেন—এমন একজনও নেই।...না বাবা-মা, না বিবি—না একটা দোস্ত, মানে সত্যিকারের দোস্ত্‌। একেবারে একা এই এত বড় বোঝা বইছেন, এতগুলো লোকের বোঝা—আপনি যে পাগল হয়ে যাবেন জনাব! মানুষ সব পারে,—সব দুঃখ সইতে পারে, যদি মনের কথাটা চিন্তাটা ভাগ ক'রে নেবার মতো একটাও লোক থাকে!'

অনেকক্ষণ চুপ ক'রে থাকে ইখ্‌তিয়ার। কথাটা বোঝবার চেষ্টা করে, মনে মনে মিলিয়ে নেবার।

তারপর বলে, 'তা আমি পেলামই বা দুঃখ, তোর কি? আর পাগল? পাগল তো হয়েই গেছি কবে, নইলে খামকা অমন করি কেন, লোকে তো আমাকে আড়ালে পাগলই বলে, আমার বান্দা নৌকররা। সে জন্যে তোর কি মাথা-ব্যথা? তোকে তো আমি জোর ক'রে ধরে এনেছি, দুঃখ ছাড়া সুখ তো পাস নি। জাত গেছে, ধর্ম গেছে—ইহকাল পরকাল সব গেছে। আমার ওপর এত মায়া পড়ল কেন?'

'কি জানি। যা গেছে তা তো আর ফিরবে না। এমন তো হাজারো মেয়ের সর্বনাশ হচ্ছে। বেছে বেছে আপনি শুধু আমারই সর্বনাশ করেছেন তা তো নয়। আপনারা এ-ই জানেন, এ-ই শিখেছেন—তাই ক'রে যাচ্ছেন। মানুষকে ভালবাসবার ভাল করবার মধ্যে যে আনন্দ আছে তার কথা কেউ শেখায় নি আপনাদের, মানুষ মেরে, নির্যাতন করে, সর্বনাশ করে আনন্দ পাওয়া যায়—এই শিখেছেন। হয়তো আপনি সব জানেনও না—আপনার লোকগুলো কত কি করে!...আমাদের শাস্ত্রে আছে, দাদার কাছে শুনেছি—কৃষ্ণ-ভগবান এক সাপকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তুমি অত বিষ ছড়াও কেন—তাতে সে সাপ জবাব দিয়েছিল, তুমি যা দিয়েছ—বিষ দিয়েছ তাই ছড়াই, অন্য তো কিছু দাও নি, পাব কোথায়?...না, সে জন্যে মনে কোন রাগ নেই আমার। আর মায়া? জঙ্গলের শের—বাঘ ভালু তো হিংস্র জানোয়ার, মানুষ মেরে খায়। তার ওপরও তো মায়া পড়ে কারও কারও। পোষে তো শখ ক'রে।'

'ও—তোর সেই বাঘকে পোষ মানাবার শখ, শেরকে নাচিয়ে আনন্দ! এতক্ষণে বুঝলাম, সেই বাহাদুরি চাস।'

কণ্ঠস্বর থেকে কিছু পূর্বের সেই গাঢ়তা আর আর্দ্রতা চলে যায় যেন এক নিমেষে। মেয়েটার একটা অভিসন্ধি,—একটা উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে নিশ্চিন্ত হয় ইখ্‌তিয়ার, দুর্বলতা ঝেড়ে ফেলার সুযোগ পেয়ে যেন বেঁচে যায়।

'সেই সঙ্গে আপনাকেও বাঘ বা সিংহ বলে স্বীকার করেছি জনাব—সেটা বলুন। জানোয়ারের মধ্যে শেরই শ্রেষ্ঠ, পশুর রাজা বলা হয়। তার মানে আপনাকেও মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, রাজার উপযুক্ত বলে মেনে নিয়েছি—যা আপনার এই তলব-খাওয়া বান্দা-বাঁদী কেউ স্বীকার করে না। আড়ালে বলে বাওরা, নয়তো মর্কট বান্দর। সেই সব চেয়ে দুঃখ আমার—যারা এত কাছে থাকে তারাও আপনাকে চিনতে পারে নি।'

'তা আমাকে পাগল লাগে না তোর?'

'না জনাব। শুনেছি—আমার ঠাকুরবাবা খুব পাড়লিখি লোক—তিনি অনেক গল্প করতেন, কোন কোন পাহাড়ের তলায় নাকি আগুন আছে, সে সব পাহাড়ও এমনি পাগলামিই করে। কখনও তার ভেতরে গুমগুম শব্দ হয়, কখনও মাটি গাঁও শহর কাঁপে চারপাশের, কখনও শুধু ছাই বৃষ্টি হয়—কখনও বা আগুন বমি করে—তরল গলা আগুন। খানিকটা আগুন বেরিয়ে গেলে আবার শান্ত হয়, ঘুমিয়ে পড়ে পাহাড়। আপনার বুকের মধ্যেও সেই আগুন—বেরোবার পথ খুঁজে পাচ্ছে না। আপনি সে আগুন বার ক'রে দেবার পথ খুঁজে পেলেই, আপনার উপযুক্ত কাজ পেলেই শান্ত হবেন। ভগবান আপনাকে বাদশাহী করার মতো ক্ষমতা দিয়ে পাঠিয়েছেন—জায়গীরদারীতে তাই আপনার মন ভরছে না। আপনার ক্ষমতা নষ্ট হচ্ছে।'

'বাহবা বা—', বিদ্রূপে-প্রশংসায় মেশা কণ্ঠে বলে ইখ্‌তিয়ার, 'বড় চমৎকার বলেছিস। এই জন্যেই তোকে কাছে রাখতে হবে দেখছি। বড় ভাল কথা বলিস তুই।…গাঁয়ের মেয়ে—এত কথা কোথা থেকে শিখলি রে, কে শেখালে?'

'বললাম তো—আমার ঠাকুরবাবা ভারী পণ্ডিত ছিলেন, এখনও বেঁচে আছেন—তাঁর অনেক পুঁথি আছে, নিজেও পুঁথি লেখেন। তাঁর কাছে শুনেছি। তাছাড়া—এসব আসলে ভগবানেই শেখান। আপনিও তো গাঁয়ের লোক, লিখিপড়িও কিছু জানেন না, আমি যা জানি বোধ হয় তাও জানেন না,—এমন লড়াই করতে রাজ্য চালাতে শিখলেন কি ক'রে? এ এলেম ভগবানই দিয়ে দেন।'

'হু'। তোর জিভে বড় ধার। এই জিভের জন্যেই মরবি তুই। বেশ ফাঁক বুঝে এর মধ্যে আমাকে বান্দর বাওরা বলে নিলি, এখন মুখখু বলছিস। বাঃ!'

'মরব তো একবারই জনাবালি। মৃত্যু যা লেখা আছে, যে ভাবে লেখা আছে, কপালে ঠিক সেই ভাবেই হবে। তবে আমি মিথ্যে বলি নি, বানিয়েও বলি নি। মিছে কথা বলি না আমি।'

আবারও চুপ করে থাকে ইখ্‌তিয়ার।

পায়ের ডিমে যে জায়গাটা নরম হাতে চাপ দিয়ে টিপছে লল্‌তা—সত্যিই ওটা ব্যথা করে মধ্যে মধ্যে। বেশ লাগছে। ওখানটা টিপলে অত আরাম লাগে তা এতদিন জানত না।

কিন্তু আরাম ভাল নয। মেয়েছেলেগুলো এই আরামের লোভ দেখিয়েই পুরুষদের ভেড়া বানিয়ে নেয়। জাদু করে।

আবারও রূঢ় ভাবে কি বলতে যাচ্ছিল, হঠাৎ নজরে পড়ল—পূব দিক থেকে মেঠো রাস্তা ভেঙে তিনজন ঘোড়সওয়ার আসছে।

ওরই পাঠানো লোক—এত দূর থেকেও চিনতে পারল।

প্রবল উত্তেজনায় লল্‌তার কথা মনেও রইল না। উঠে আলসের ধারে এসে দাঁড়িয়ে হাত নেড়ে ইশারা জানাতে লাগল যে সে ঐখানে আছে।

তার মধ্যে কখন যে লল্‌তাও উঠে ওর ধার ঘেঁসে দাঁড়িয়েছে ও বাঁ হাত দিয়ে তার কাঁধে ভর দিয়েছে—ইখ্‌তিযার তা টেরও পেল না।

॥ ৬ ॥

লল্‌তা ব্রাহ্মণের ঘরের বিশেষ পণ্ডিত বংশের মেয়ে হয়ে মুসলমানের তোষামোদ করছে আর পা টিপে দিচ্ছে—তখনকার দিনে এ কেউ দেখলেও বিশ্বাস করত না। ওর বাড়ির কেউ তো নয়ই। এ দুর্গতির থেকে উপবাস ক'রে মরা তো ঢের সোজা। জোর ক'রে খাওয়াবে? কত দিন কত জোর করবে? যে মরবে বলে কৃতসংকল্প তাকে কেউ বাঁচিয়ে রাখতে পারে না।

কিন্তু লল্‌তা বাঁচতেই চেয়েছিল, মরতে নয়।

বাঁচতে আর বাঁচাতেও—যদি সম্ভব হয়।

এই নিত্যকার বীভৎস নারকীয় লীলা যদি বন্ধ করতে পারে—ঐ বাঘ নয়—অসভ্য অর্থাৎ টাকে যদি বশ করতে পারে।

অবশ্য এ সঙ্কল্প জেগেছে—এখানে আসার পর—মেয়েগুলোর পরিণতির কথা শুনে—দু-একজনকে চোখে দেখেও।

এছাড়াও উদ্দেশ্য ছিল তার, যে জন্যে প্রথমেই মরে নি কিংবা মরবার চেষ্টা করে নি।

প্রতিশোধের উদ্দেশ্য।

সে প্রতিশোধ কি ভগবানের ওপর?

এক-একবার তাও মনে হয়েছিল বৈকি। ওরা ব্রাহ্মণ নয় শুধু, পরম বৈষ্ণবের বংশ ওদের। গৃহে শালগ্রাম শিলা আছেন—বা ছিলেন, অষ্টধাতুর—বেশির ভাগই সোনার তৈরী—গোপাল মূর্তি; আর ছিলেন শিব। এ ছাড়াও প্রপিতামহ হেঁটে বৃন্দাবন গিয়ে সারা পথ মাথায় করে একখণ্ড গোবর্ধন শিলা এনেছিলেন বৈষ্ণবগৃহে নাকি অবশ্যপূজ্য; এই গোবর্ধনশিলা না থাকলে নাকি সে গৃহে কৃষ্ণ-ভগবান অন্নগ্রহণ করেন না। সোনার সিংহাসন ক'রে গোবর্ধন পাহাড়ের পাথর, সেই শিলা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

ওরা বৈষ্ণব বলেই ওদের এমনি সব নাম। ওর আসল নাম ললিতা। ওর পরের বোন বিশাখা। রাধিকার সখীদের নামে নাম রাখা।

এতকাল ধরে এত নিষ্ঠাসহকারে কৃষ্ণভগবানের পূজা ক'রে এসে কী ফল হল? বিধর্মী দুর্বৃত্তরা যখন এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে সেই সব মূর্তি ভেঙে শালগ্রাম শিলা চূর্ণ ক'রে অলঙ্কার সিংহাসন কেড়ে নিয়ে গেল, সেই সঙ্গে তাঁর এতদিনের সেবিকা পুরললনাদের—মৃত্যুর অধিক অপমান আর নির্যাতন, কানে শুনলেও শরীরে গ্লানি বোধ হয় এমন সব অত্যাচার—দেবতার নৈবেদ্য শৃগাল-কুকুরে কাড়াকাড়ি ক'রে খেল, মেয়েকে মায়ের সামনে, মাকে ছেলেমেয়ের সামনে ভোগ করল—কৈ তখন তো ভগবান কিছু করতে পারলেন না। বিশাখা আগেই গিয়ে কুয়ায় ঝাঁপ দিয়ে মরেছিল, চন্দ্রাবলী জঙ্গলে চলে গিয়েছিল, তার কি হল কেউ জানে না—মানুষের হাত থেকে বাঁচলেও হয়তো বাঘের হাত থেকে বাঁচে নি, তবে সেও ঢের ভাল—বাকি সকলকে বেঁধে নিয়ে এল বাঁদী করতে আর উপভোগের সঙ্গিনী করতে—ওর চাচীও বাদ গেলেন না, বাবাকে কাকাকে তো কেটেই ফেলেছিল, পড়ে রইল শুধু বুড়ী নানী আর বাচ্চা ছেলে দুটো।

প্রচণ্ড ক্রোধ আর অভিমান হয়েছিল ভগবানের ওপর সেদিন—কতকটা সেই ঝোঁকেই ও অনায়াসে এদের জল খেয়েছে—কিন্তু পরে অতটা থাকে নি। ওর ঠাকুরবাবা বলতেন একটা কথা, পরে মনে হয়েছিল নির্জন বন্দীদশায় বসে বসে—বলতেন, 'ভগবান একই রে—সর্বশক্তিমান বলছি, সর্বময় বলছি, বলছি এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড

তাঁর বিভূতি, এ সবেতেই তিনি বিলীন, তাঁতেই এ সব রয়েছে—তবে আবার আলাদা ভগবান কি ক'রে হবে? মুসলমানরা যাকে আল্লা বলছে, আমরা তাকেই তো ভগবান বলছি। শুনেছি এমনি অনেক আরও ধর্মমত আছে, ইরানে চীনে—য়হুদীদের ঘরে কে এক যীশু জন্মেছেন মুসলমানরা তাঁকেও পয়গম্বর বলে মানে—সবাইয়ের ভগবানই এক। এ সবই তাঁর লীলা—তাঁকে নিয়ে এই ঝগড়া-কাজিয়া, তিনিই করছেন, তিনিই উপভোগ করছেন। কখনও কখনও পশুশক্তিতে অসুর-শক্তিতে লীলা করেন—আবার কখনও দৈবীশক্তিতে, শ্রীশক্তিতে তা দমন করেন। সেই ছল ক'রে দেহ ধারণ করেন, নিজের থেকেই খানিকটা নিয়ে নিজেকে সৃষ্টি করেন নরদেহে। যেমন কিষণ-ভগবান। দেশে দেশেই এই ভাবে আসেন, কখনও আমাদের মধ্যে, আমাদের দেশে, কখনও অন্য দেশে, অন্য জাতে। যুগ যুগ ধরেই তিনি নিজেকে নিয়ে লীলা ক'রে যাচ্ছেন।'

ভগবান সম্বন্ধে ঠিক অত কথা এমন ভাবে ভাবতে পারে না সে—ভাল ধারণা হয় না, তবে কথাগুলো মনে আছে। মোটামুটি এইটুকু বুঝেছে যে ভগবান ওদেরও যে তাদেরও সেই। তিনি এক রূপে বিনষ্ট হচ্ছেন ঠিকই, কিন্তু তাঁরই আর এক রূপ বিনাশ করছে—তাতে তিনি রাগ করবেন কেন?

কিন্তু সে যাই হোক, তাই বলে সব ছেড়ে দিয়ে নির্বিকার চিত্তে এই অত্যাচার দেখার আর সহ্য করার মতো মন তার এখনও গড়ে ওঠে নি। মানুষের ওপর এর শোধ তোলবার প্রতিজ্ঞা সে ত্যাগ করে নি, বরং আরও দৃঢ় হয়েছে। তার বাঁচার একমাত্র উদ্দেশ্যই এখন এই—প্রতিকার ও প্রতিশোধ।

সেইজন্যেই এই অখাদ্যভোজীদের ঘরে রুটি খেয়েছে, ঐ মর্কট পশুটার কাছে ইজ্জত দিয়েছে—তাকে সেবা ক'রে তোয়াজ ক'রে মিষ্ট ভাষায় ভোলাচ্ছে।

নইলে মরতে সেও জানত। যে দৃশ্য সে দেখেছে, যা দেখল এখানে এসে—যে অপমান যে পাশবিক আচরণ সহ্য করল—তার পরও বাঁচার কোন ইচ্ছাই কোন মেয়ের থাকতে পারে না, ইতর ভদ্র মিলিয়ে সব মেয়ের কথাই বলতে চায় সে—থাকা উচিত নয়।...ঐ যারা বেঁচে আছে, খোঁড়াতে খোঁড়াতে কাতরাতে কাতরাতে গিয়ে ইঁদারা থেকে জল তুলছে—বলদের বদলে জোড়ে বাঁশ কাঁধে নিয়ে ঘুরছে—তারা মানুষ নয়, তাদের এমনি শাস্তি হওয়াই উচিত। কী আর পাবে তারা জীবন থেকে, কিসের আশায় প্রাণটাকে ধরে রেখেছে এত কষ্ট ক'রেও?

মরার লোভ দুর্নিবার হয়েই উঠেছিল তার।

মা কাকী খুড়তুতো বোনদের অকথ্য দুর্দশা, বাবা কাকার শোচনীয় মৃত্যু দেখার

পর বহুবারই মনে হয়েছে দেওয়ালে কি মেঝের পাথরে মাথা ঠুকে মরে সে—কিন্তু শেষ অবধি সে লোভ সংবরণই করেছে।

করেছে এর শোধ তুলবে বলে।

পারলে অন্তত কটা মেয়ের এই পরিণতি রোধ করবে—আর এই লোকটার, এই নরপিশাচ নারীমাংসলোলুপ রাক্ষসটার সর্বনাশ করবে।

সে মেয়েছেলে, অল্পবয়সী মেয়ে—এখনও যুবতী বলাও যায় না তাকে, তবু সে পারে কিনা দেখবে ; অন্তত সহজে হা'র মানবে না, হাল ছাড়বে না।

তারপর, এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত কি তা সে জানে। যদি কিছুটা শোধ নিতে পারে —তাহলে শুধু উপবাস ক'রে প্রাণ দেওয়াই যথেষ্ট, কৃষ্ণভগবানের নাম-জপ করতে করতে উপবাস ক'রে মরবে। তার তা যদি না হয়, আশা বা উদ্দেশ্য পূর্ণ না করেন ভগবান—একূল ওকূল দু'কূলই যায় তাহলে তুষানলেই প্রাণ দেবে। ঠাকুরবাবার মুখে শুনেছে, গ্রামেও দেখেছে একজনকে ছেলেবেলায়, তুষেতে আর গোবরেতে মিশিয়ে সর্বাঙ্গে পুরু ক'রে লেপে একটু শুকিয়ে নিয়ে একপ্রান্তে একটু আগুন ধরিয়ে দিতে হয়। তুষের সে আগুন ধিকিধিকি জ্বলে, একটু একটু ক'রে পুড়তে পুড়তে ওপরে ওঠে। খুবই কঠিন সে যন্ত্রণা অতক্ষণ ধরে সহ্য করা—তবু এর আগে করেছে তো অনেক, ও-ই বা পারবে না কেন ?

না, পারবে ও শোধ নিতেও।

সে বিশ্বাস আছে নিজের ওপর।

নইলে এতখানি নিচে নামত না কিছুতেই। প্রাণ ? প্রাণের ভয়ে এ কাজ সে করত না।

তাছাড়া, প্রাণ কি ভাবে থাকে তা তো দেখছেই। শুনছেও। ঐ নরপশুটা নিজেই তো জাঁক ক'রে বলেছে। শুনেছে নিচের ঘরে বন্ধ থাকতে থাকতেই, পথে আসতে আসতেও। ঐ কৃতান্ত সহচর—না না, তা বললে যমদূতদের অপমান করা হয়, তারা তো অপরাধীকেই শাস্তি দেয়, এমন অকারণ নির্যাতন করে না—ঐ শয়তানের বাচ্চাগুলো, ঐ পিশাচের সঙ্গী পিশাচগুলোই শুনিয়েছে। মর্কটটার বিশ্বাস —সে বারণ ক'রে দিয়েছে বলে এই সব—তার ভাগের কোন বাঁদীকে তাদের পরিণামের কথা শোনানো হয় না। হায় রে, আগেই শুনিয়ে দেয় এরা। তবে এতখানি নৃশংসতা, অকারণ এই পৈশাচিক নিষ্ঠুরতার কথা হয়তো সবটা বিশ্বাস হয় না, বা ধারণা করতে পারে না—সে আলাদা কথা। সত্যিই এ উন্মত্ত নৃশংসতা কল্পনা করাও কঠিন। নইলে, ঐ মেয়েগুলোর অনেকেই নিজেদের শাড়ি গলায়

লাগিয়ে মরত নিশ্চয়—অন্তত খাওয়াটা তো বন্ধ করতে পারত!

ললতার প্রথম প্রতিশোধের পাত্র কিন্তু এ লোকটা নয়! এর ওপর শোধ তুলতে বিরাট বিপুল সর্বনাশের আয়োজন করতে হাব। তার দেরি লাগবে। সে বেশ-কিছু সময়সাপেক্ষ।

প্রথম যে, সে লক্ষ্মীকান্ত।

ওদেরই গ্রামের ছেলে। আব—

হ্যাঁ, ওর প্রণয়াস্পদও।

ললতারাও ব্রাহ্মণ, লক্ষ্মীকান্তরাও। কিন্তু বিচিত্র সমাজব্যবস্থায় ওদের পাল্টি ঘর নয়। বিয়ে হতে পারে না। ললতারা নাকি দাক্ষিণাত্য বৈদিক—কোন্ সূত্রে কার বিষয় পেয়ে দূর দেশ থেকে ওর প্রপিতামহ এই গ্রামে এসে বসবাস শুরু করেন। দরিদ্র লোক, বিপুল সম্পত্তি পাচ্ছেন—তখন শুধু সেই কথাটাই ভেবেছিলেন, এসব অসুবিধার কথা মনে পড়ে নি। গৃহস্থ হিসাবে ওরা বেশ সম্পন্ন, অবস্থাপন্নই বলা যায়—সুতরাং অর্থের অভাব নয়—পাত্রের অভাবে, সমান ঘরের পাত্রের অভাবে ওদের বিয়ে হয় না!

ওদের সঘর এদেশে—এ অঞ্চলে প্রায় দুষ্প্রাপ্য। সেই জন্যেই ওদের বিয়েতে বহু বিলম্ব হয়, বিস্তর সময় লাগে পাত্র খুঁজে বার করতে। দূর দূর দেশে যেতে হয়—পাত্রের সন্ধান পেলেও গিয়ে দেখে কথাবার্তা বলে আসতে হয়তো মাসখানেক লেগে যায়, তারা আবার এত দূরে বিয়ে দেবার জন্যে আসতে চায় না। বিস্তর ঝামেলা।

এই কারণেই ললিতার এত বয়স পর্যন্ত বিবাহ হয় নি।

নইলে ওদের দেশে এ বয়স পর্যন্ত অনূঢ়া থাকার কথা ভাবতে পারে না কেউ।…

লক্ষ্মীকান্তরা ওদের সঘর নয়, কিন্তু নিকটতম প্রতিবেশী। ওর ঠাকুরবাবার কাছে ব্যাকরণের পাঠ নিতে আসত প্রায় প্রত্যহই। ছোটবেলায় ওদের বাড়িতেই খেলাধুলা করেছে, লক্ষ্মীকান্ত আর তার দাদা। বিনত সুশ্রী চরিত্রবান তরুণ। বয়সে হয়তো ললিতার থেকে মাত্র বছর দুই-তিনের বড়। তা হোক, পুরুষের বিয়েও ওদের দেশে অনেক আগে হয়ে যাওয়ার কথা। হয় নি তার কারণ—প্রথমত, এদের মতো দুষ্প্রাপ্য মিল না হলেও, লক্ষ্মীকান্তদেরও পাল্টি ঘর অর্থাৎ বিয়ে চলতে পারে এমন ঘর খুব বেশী নেই। দ্বিতীয়ত, লক্ষ্মীকান্তরও নাকি আপত্তি, সে পড়াশুনো করবে, উচ্চ-শিক্ষাই তার জীবনের লক্ষ্য আর আদর্শ, এখনই বিয়ে ক'রে জড়িয়ে পড়তে চায় না।

এই অনিচ্ছাকে ভুল বুঝেছিল ললতা।

ভেবেছিল ওর প্রতি আসক্তি, প্রেম।

এই সুদর্শন ছেলেটিকে ওরও ভাল লেগেছিল। আশৈশব দেখছে ঠিকই, কতকটা ভাইয়ের মতো, অন্তত দুই পরিবার সেই কথা ভেবেই নিশ্চিন্ত ছিল—কিন্তু কৈশোর-উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গেই দৃষ্টিভঙ্গী পালটাতে শুরু করল, পনেরো বছর বয়সে পৌঁছে ললিতার আর কোন সংশয় রইল না। লক্ষ্মীকান্তকে সে দয়িত, প্রেমাস্পদরূপেই দেখে; দিনের ভাবনা আর রাতের স্বপ্ন ওকে ঘিরেই আবর্তিত হয়; ওর নাম শুনলে তার বুকের রক্ত দ্রুততর হয়, কাছে এসে দাঁড়ালে সমস্ত শরীরটা ভেতরে ভেতরে কাঁপতে থাকে।

ওর ধারণা লক্ষ্মীকান্তর মনোভাবও এর অনুরূপ।

ইদানীং সে একা ওর কাছাকাছি থাকতে চাইত না, থাকলেও মাটির দিকে চেয়ে বা অন্য দিকে চেয়ে কথা কইত—গলাটাও ঠিক স্বাভাবিক শোনাত না।

তবু মুখ ফুটে কেউ কাউকে বলতে পারে নি সে কথা। মনের ভাব যাচাই করে দেখতে পারে নি।

বুক ফাটলেও মুখ ফোটে না এসব ব্যাপারে। একথা কি কেউ বলতে পারে নিজে থেকে? বিশেষ মেয়েছেলে?

তাই দুরুদুরু বক্ষে অপেক্ষা করছিল কোন অবিশ্বাস্য দৈব সুযোগের। প্রেমিক কৃষ্ণভগবান যদি তার ব্যথা ও আকুতি বুঝে উভয় পক্ষের বাবা-মার সুবুদ্ধি দেন।...

দৈব সুযোগ এসেও গেল অবশেষে।

নিদারুণ বিপদের মধ্যে দিয়ে, সর্বনাশের বেশে।

প্রলয়ের সময় সাধারণ সমস্যার কোন মূল্য থাকে না, তুচ্ছ ধারণা সংস্কার সব অর্থহীন হয়ে পড়ে।

সেই প্রলয়ই আসন্ন মনে হল এবার।

দক্ষিণ-পশ্চিম দিক থেকে এক প্রচণ্ড বিপর্যয়, প্রলয়ঙ্কর আঁধি এদিকেই নাকি এগিয়ে আসছে। দুর্ধর্ষ মুসলমান বাহিনী, তাতার ও পাঠানের মিলিত প্রমত্ত পিশাচদল নারকীয় কাণ্ড করতে করতে আসছে, লুঠতরাজ, অগ্নিকাণ্ড, হত্যা, নারীহরণ—যেখান দিয়ে আসছে তার বহুদূর পর্যন্ত শ্মশানে পরিণত হচ্ছে, সেখানে জনপদের মানববসতির নাকি চিহ্ন পর্যন্ত থাকছে না, লুঠপাটের পর এক-একটা গ্রাম ঘিরে আগুন লাগাচ্ছে—যারা পালাতে যাচ্ছে তাদের পুরুষ হলে কেটে ফেলছে, তরুণী কি বালিকা মেয়ে হলে বেঁধে নিয়ে যাচ্ছে সঙ্গে। এসব জায়গায় নতুন ক'রে বসতি কি প্রাণলক্ষণ দেখা দিতে নাকি বহু বৎসর সময় নেবে।

জনশ্রুতি বাতাসের আগে দৌড়য়। এদের শান্ত সুপ্তিবিমগ্ন গ্রামের নিস্তরঙ্গ জীবনেও সে সংবাদের বাতাস পৌঁচেছিল। ভীত, অসহায়, এমন বিপদ সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ বিমূঢ় গ্রামবাসী কি করবে কিছুই ঠিক করতে পারে নি—শুধু ভগবানকে ডেকেছে আর আশা করেছে যে এ বিপদ অন্য দিক দিয়ে কেটে যাবে, ঝড়টা যাবে অন্য জনপদের ওপর দিয়ে—তারা বেঁচে যাবে। এতদূর আসবে কেন? এখানে কি আছে?

এরই মধ্যে একদিন শুনল লক্ষ্মীকান্ত ওদন্তপুর বিহারে যাচ্ছে উচ্চশিক্ষার জন্যে। আরও যা শুনল—তার কথাবার্তার ভাবে—হয়তো আর ফিরবেই না, গৃহীর জীবনে নাকি ওর অনীহা, শেষ পর্যন্ত হয়তো ভিক্ষু সন্ন্যাসীর জীবনই অবলম্বন করবে।

প্রথমে বিশ্বাস হয় নি কথাটা। তারপর যখন একাধিক লোকের মুখে একই কথা শোনা গেছে, বুঝেছে সন্দেহের আর কোন কারণ নেই, তখন আর এক মুহূর্তও ইতস্তত করে সময় নষ্ট করে নি। সমস্ত সঙ্কোচ সমস্ত চক্ষুলজ্জা পরিহার করে ছোট বোনকে দিয়ে ডেকে পাঠিয়েছে ওদের বাড়ির পিছনের আমবাগানে।

লক্ষ্মীকান্ত এসে দাঁড়াতেও বৃথা কুশল প্রশ্ন বা কৌতুকসম্ভাষণে কালক্ষেপ করে নি, সোজা প্রশ্ন করেছে, 'তুমি নাকি চলে যাচ্ছ গ্রাম ছেড়ে—দক্ষিণের দিকে কোন বিহারে?'

'হ্যাঁ। কাল প্রত্যূষেই।' মাথা নিচু করে উত্তর দিয়েছিল লক্ষ্মীকান্ত। এসে পর্যন্ত ললিতার দিকে চায় নি, বোধ করি চোখে চোখ মেলাতেই ভরসা করে নি। এদিক ওদিক—নিচের দিকে তাকিয়েছিল।

'সে কি, তুমি শোন নি ওদিক থেকে বিরাট একদল তাতার ডাকাত আসছে —চারিদিক ছারখার ক'রে দিতে দিতে? এই সময় তুমি চলে যাবে?'

'থাকলেও কি বাধা দিতে পারব?' তেমনি ভাবেই পায়ের নখে ক'রে মাটি সরাতে সরাতে উত্তর দেয় লক্ষ্মীকান্ত, 'ভাগ্যে যা আছে তাই হবে—সে ভাগ্যকে বাধা দেওয়ার শক্তি কারও নেই।'

'এ তো নিতান্ত স্বার্থপরের মতো কথা হল। বাধা দিতে পারবে না হয়তো— দাঁড়িয়ে মরতেও তো পারবে। মা বাবাকে এই নিদারুণ বিপদের মুখে ফেলে রেখে চলে যাবে তাই বলে—ভাগ্যের দোহাই দিয়ে?'

'ত্যাখো, আমার এ যাওয়া হঠাৎ নয়। এক কথায় সেখানে যাওয়া যায় না। সেখানে প্রবেশাধিকার পাওয়াই এক তপস্যার ব্যাপার। আজ এক বৎসর যাবৎ চেষ্টা করছি—দ্বারপণ্ডিতের কাছে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়ে এসেছি—এই সবে অনুমতি

এসেছে। আমি যে বিপদ দেখে পালাচ্ছি তা নয়। আর বিপদ ঠিক যে এখানেই আসবে তারও কোন নিশ্চয়তা নেই। নাও আসতে পারে এদিকে। ডাকাত বর্বরদের কল্পিত মর্জির ওপর নির্ভর করে আমার এতদিনের আশা নষ্ট করাটাই কি ঠিক হবে!·· অবশ্য আমি অদৃষ্টবাদী, ভাগ্যে না থাকলে আমার যাওয়াও হয়তো শেষ মুহূর্তে বন্ধ হয়ে যাবে।'

সময় অল্প। এভাবে কথাকে অন্য দিকে চলে যেতে দিলে চলবে না।

ললিতা তা বুঝেই সোজা নিজের বক্তব্যে এল। বললে, 'শুনছি তুমি নাকি আর ফিরবে না?'

'কে বললে! কৈ, আমি তো কাউকে বলি নি!'

'লক্ষ্মীকান্ত, চোখ তোল, আমার মুখের দিকে তাকাও। আজ আর বৃথা লজ্জা ক'রো না। তোমার এ বৈরাগ্য কি আমার জন্যে? তুমি কি আমাকে ভালবাস? আমাকে চাও?'

মাথা আরও নিচুই হল লক্ষ্মীকান্তর। আমতা আমতা করে, স্পষ্ট কোন উত্তর দিতে পারে না।

ললিতা এবারে এগিয়ে গিয়ে জোর ক'রে তার মুখটা তুলে নিজের দিকে ফেরায়, 'কৈ বল। উত্তর দাও। আমি মেয়ে আমি লজ্জা করছি না, তোমার এত লজ্জা কেন? ত্যাখো, এই তো আর কয়েক দণ্ড সময়—চার প্রহরও বোধ হয় নেই। আর হয়তো জীবনে দেখাই হবে না, কোন কথাই বলার সুযোগ পাবে না।'

এবার আর মুখ নামাল না লক্ষ্মীকান্ত, ধীর ভাবেই বলল, 'কতকটা তাই। যদি তোমাকে পেতাম লল্‌তা, তোমাকে যদি ঘরে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হত তাহলে হয়তো এদিকে এতটা মন যেত না। তা যখন সম্ভব নয়—।'·· বক্তব্য শেষ না ক'রেই কতকটা খাপছাড়া ভাবে বলে, 'আমার এই ওদন্তপুর বিহার যাওযার, উচ্চশিক্ষার ঝোঁক বরাবরই, তা তো তুমি জানো লল্‌তা!'

ললিতা ওকে ধরে যেন একটা ঝাঁকানি দিয়ে ওর এই নিষ্ক্রিয়তা এই জড়তা থেকে জাগাতে চেষ্টা করে, 'কিন্তু কেন, কেন সম্ভব নয়? তুমি ব্রাহ্মণ, আমিও ব্রাহ্মণের মেয়ে। দুজনেই সদ্বংশজাত। তবু সম্ভব নয় কেন? তুমি একটু জোর করলেই হতে পারে লক্ষ্মীকান্ত!'

'তুমি আমার বাবাকে আজও চিনলে না? তাঁর কাছে এসব বংশ-কুলের সংস্কার তাঁর ছেলেমেয়েদের চেয়েও বড়। তিনি রাজী হবেন না কিছুতেই।'

'শোন। সর্বনাশের পরিমাণ তিনি এখনও বুঝতে পারছেন না। তুমিও পারছ

না। এর আগেও ওরা যেখানে গেছে বীভৎস পৈশাচিক অত্যাচার করেছে, সেসব কথা কানে শুনেই ক'রাত্রি ঘুমোতে পারি নি। সে ঘূর্ণিঝড় যদি আসে ওসব সংস্কার ব্রাহ্মণত্ব কুল বংশের বিচার কোথায় উড়ে চলে যাবে।...এক কাজ কর—তুমি একটু জেদ করো, মাকে ভয় দেখাও যে নইলে তুমি সন্ন্যাসী হয়ে যাবে। আমার বাবাকে আমি রাজী করাতে পারব। ব্রাহ্মণের কন্যাগত কুল—তোমার বাবার এত আপত্তিরই বা কারণ কি?...তাও, তোমার বাবা যদি ঘরে স্থান না দেন—বিয়ের পরই চল আমরা মিথিলায় চলে যাই। মিথিলার রাজার কাছে দারুণ মার খেয়েছে ওরা শুনেছি, একমাত্র সেখান থেকেই মার খেয়ে ফিরে এসেছে, রাজ্যে ঢুকতে পারে নি—মিথিলায় গেলে নিরাপদ, তুমি ব্রাহ্মণ, কিছুটা লেখাপড়াও জান, রাজসভা থেকে কোন বৃত্তি পাওয়া কিছু কঠিন হবে না। একটা চতুষ্পাঠী খুলে বসতে পারবে—না হলেও অন্নের অভাব হবে না দেবত্র জমি কিছু নিশ্চয়ই পাবে।'

তারপর একটু থেমে আবার বলল, 'বাড়িতে অসুবিধা হয়—গোস্বামীদের মঠ আছে সেখানে গিয়ে বিবাহ ক'রে নিই চল। সে বিবাহও অসিদ্ধ নয়, তুমি আমি দুজনেই বৈষ্ণব পরিবারের লোক। তাঁদের প্রথা কিছু সংক্ষিপ্ত, কিন্তু তাঁরা বিবাহই দেন।'

'সে তো স্বার্থপরের মতো কাজই হবে, সেও তো এঁদের অনিশ্চিত ভাগ্যের মধ্যে—আসন্ন বিপদের মধ্যে ফেলে রেখে যাওয়া!'

ঈষৎ একটু বিদ্রূপের ইঙ্গিত কি পাওয়া যায় লক্ষ্মীকান্তর কণ্ঠস্বরে?

'তবু তাতে তোমার বংশের ধারাটা রক্ষা পাবে। আমার বাবা-মার একটা মেয়েও তবু মহাসর্বনাশ থেকে রক্ষা পাবে।'

অনেকক্ষণ চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল লক্ষ্মীকান্ত, তারপর বলল, 'তুমি আমাকে ক্ষমা কর ললিতা। তোমাকে পেলে সুখী হতাম ঠিকই—কিন্তু তার জন্য এত কাণ্ড করতে পারব না। বাবা-মাকে নির্লজ্জের মতো বলা, ভয় দেখানো—না না, ছিঃ! সে আমার দ্বারা সম্ভব হবে না। আর তাঁদের অমতে তোমাকে নিয়ে দেশত্যাগী হওয়া—সেও আমি পারব না।...তুমি আমাকে ভুলে যাও, অপদার্থ অক্ষম অমানুষ মনে ক'রে ঘৃণা করো ললিতা—এ, এসব আমি সত্যিই পারব না।'

আর দাঁড়ায় নি লক্ষ্মীকান্ত। একরকম ছুটেই পালিয়ে গিয়েছিল সেখান থেকে!...

অপমানিত প্রত্যাখ্যাত ললিতা সেইখানেই পাথরের মতো দাঁড়িয়ে ছিল প্রায় এক প্রহর রাত্রি পর্যন্ত। সেইখানেই যদি শেষ হয়ে যেত তখন—নিজের আগুনে পুড়ে ভস্মীভূত হয়ে যেত!

তার অন্তরে তখন যে নরকাগ্নি জ্বলেছিল, যে দাবদাহের সৃষ্টি হয়েছিল তা এদের —এই পিশাচগুলোর জ্বালানো আগুনের চেয়ে কিছুমাত্র কম ভয়ংকর নয়!

॥ ৭ ॥

ইখ তিয়ারের পাঠানো চররা ফিরেছে—সাধারণ খবর নিয়ে।

ছোট ছোট জায়গীরদার, রাজা নাম এদের—এদিকে এইরকম ভূস্বামীই বেশী বাংলায় মিথিলায় এবং উড়িষ্যায়—এই তিন দেশেই প্রতাপশালী রাজা, সেখানে এত অল্প সামর্থ্যে কিছু হবে না।···এ তিন দেশ জয় করার চেষ্টা না ক'রে এমনিই যদি কিছুটা এগিয়ে যেতে চায় ইখ্‌তিয়াবউদ্দীন সহজেই যেতে পারে, কোথাও কেউ বাধা দেবে বলে মনে হয় না।

বিরক্ত হল ইখ্‌তিয়ার।

'কোথাও কোন বড় শহর রাজধানী কি দুর্গ নজরে পড়ল না? লুটের মতো কোন জায়গা—সোনা চাঁদি যেথানে বহুত? গাযে গাঁয়ে ঘুরে কি করব?'

এ ওর মুখের দিকে চায়। ঠিক এ ধরনের প্রশ্নের জন্য তৈরী ছিল না কেউ। একজন বিপন্ন মুখে বলল, 'তেমন দুর্গটুর্গ তো কই দেখলুম না—এক আছে বিহার দুর্গ। সেখানে বিস্তর অল্পবয়সী ছোকরা দেখলুম—দশ-বারো বছর থেকে কুড়ি-পঁচিশ বছর পর্যন্ত বয়স। অনেক কিন্তু—হাজার দেড় হাজার হবে, বেশী তো কম নয়। শুনে দেখা তো যায় না। কী কবে তা জানি না, হাতিযারটাতিযার তো কারও হাতে দেখলুম না। আর সেখানে কোন টাকাকড়ি ধনদৌলত আছে বলেও মনে হল না। কাপড়চোপড় সাধারণ। একটা দারোয়ান পাহারাদার পর্যন্ত নজরে পড়ল না। অবস্থা খুবই খারাপ মনে হল—যদি কোন রাজা থাকে সেখানে—তার। আর তো কই—

পাশেই ছিল লল্‌তা, চুপ করে মেঝেয় বসে· চুপিচুপি বলল, 'আমি দু-একটা কথা কইতে পারি জনাবালি?'

'তুই আবার এর মধ্যে কি কথা কইবি? তুই এসবের কি বুঝিস?'

সাহস করে মুখ তুলল লল্‌তা। অনুমতিও যেমন আসে নি, নিষেধ বা ধমকও নয়।

সেই চরটির দিকে চেয়ে বলল, 'বিহার দুর্গ? কোথায় জায়গাটা বল তো? বড় কোন রাজ্য, সেখানকার রাজধানী না হলে দুর্গ কোথা থেকে আসবে? আর দুর্গটুর্গ সাধারণত তৈরী হয় পাহাড় দেখে। সেখানে কি পাহাড় আছে? তোমরা বলছ অত লোক—যদি সৈন্য হয় তো কোন বড় রাজার রাজধানী নিশ্চয়—অথচ পাহারা নেই, দারোয়ান নেই, হাতিয়ার নেই—সে আবার কি কথা?'

'ঠিক কথা! ঠিকই বলছে এ বাঁদী। খুব এলেমদারের মতো কথা বল্ছে।' ইখ্‌তিয়ারউদ্দীন ওর পিঠ চাপড়ে বলল, 'বল, জবাব দাও।'

ওরা ওদের সাধ্যমতো মোটামুটি জায়গাটার বর্ণনা দিলে।

পাহাড় আছে কাছাকাছি, কিন্তু দুর্গটা পাহাড়ের ওপর নয়। কোথা দিয়ে যেতে হয়, কতদূর এখান থেকে—তারও একটা আন্দাজ দিলে।

ললিতা হাসল। বলল, 'জনাবালি, ওটা দুর্গ নয়। ওটা একটা বিহার, সন্ন্যাসী ভিক্ষুদের মঠ। ওখানে লেখাপড়া শেখানো হয়। ঐ যে অত ছোকরা থাকে শুনলেন, ওরা সব ছাত্র। ওখানে পড়ানো হয়, অধ্যাপকরা ভিক্ষুরা পড়ান। আর টাকাপয়সা নেই তাও না, বিস্তর টাকা আছে। সে টাকা আপনারা ধারণাও করতে পারবেন না। শুনলেন তো অত ছাত্র বাস করে—হাজার দেড় হাজার—সবাইকে খেতে দেয়, কারও কাছ থেকে এক পয়সাও নেয় না। বড়লোক, শেঠ রাজারা টাকা ঢেলে দিয়ে যায় ওখানে।'

'ঢেলে দিয়ে যায়? সত্যি বলছিস?'

'যতটা জানি, শুনেছি। চোখে দেখি নি তো।'

'তুই এত কথা জানলি কি ক'রে? কার কাছ থেকে শুনেছিস?'

'অনেকদিনের বিহার ওটা, খুব নামকরা। বহুদূর থেকে ছাত্ররা আসে পড়তে ওখানে। বাপ-দাদার মুখে শুনেছি। আমাদের গাঁ থেকেও ছেলেরা এসেছে অনেকে। এখনও আছে কেউ কেউ। বেশী দূর তো নয়, শও ক্রোশ হবে বড়জোর।'

'অতগুলো ছেলে পড়ে ওখানে? মাদ্রাসা?...সব কাফের? কাফেররাই পড়ায়? কাফের ফকীররা—? বাহবা বা, তবে তো আগেই যেতে হবে। এ তো কর্তব্য একটা, ইমানের কাজ। খুদার কাজ।'

বলতে বলতে উত্তেজিত হয়ে উঠে দাঁড়ায় ইখ্‌তিয়ার, তার পরই বোধ হয় মনে পড়ে যায় কথাটা। বলে, 'আর আমার সে খবর?'

এবার ওদের মুখ আরও শুকিয়ে যায়।

আর একবার পরস্পরের মুখের দিকে তাকিয়ে বলে, 'অনেক খোঁজ নিয়েছি খোদাবন্দ, কেউ বলতে পারে নি। জৌনপুর থেকে মালিকের সঙ্গে পূবের দিকে রওনা হয়েছে, তার পর কোথায় গেছে কি হয়েছে কেউ বলতে পারে না।'

কঠিন হিংস্র হয়ে উঠল ইখ্‌তিয়ারের মুখ। ভয়ঙ্কর। চোখ দুটো আস্তে আস্তে রক্তবর্ণ ধারণ করল। ঘৃণাভরে ওদের একজনের—যে কথাটা বলছিল তারই—মুখের ওপর খানিকটা থুথু দিয়ে বলল, 'চুপ! চুপ কর্! গাধার বাচ্চা! সব

কটা গাধার বাচ্চা গিয়েছিলি তোরা। মানুষ? মানুষের বাচ্চা হলে এ খবরটা এনে দিতে পারতিস! পয়সা খরচ করে কতকগুলো বুদ্ধু জানোয়ারকে পাঠিয়েছিলুম —তার খবর পাব কি!…যাঃ, দূর হয়ে যা আমার সামনে থেকে—'

অধিক বলাই বাহুল্য। তারা পালাতে পারলেই বাঁচে। মুখ-চোখের চেহারা যা হয়ে উঠেছে—এমনিই তো যা প্রচণ্ড ক্রোধ—আস্ত কাঁচা চিবিয়ে খেয়ে ফেলাও আশ্চর্য নয়।

বকশিশের মতো কোন কাজই ক'রে আসতে পারে নি বকশিশ পাবে না জানা কথাই—তা না পাক—এখন গর্দানের ওপর শিরটা থাকলে খুশী। নিছাৎ এখানে আওরাৎ আর বালবাচ্চা ফেলে গেছে বলে—নইলে ফিরত না হয়তো। ওরা এই কথাই ভাবতে ভাবতে আসছে।…তবু তো এই কাজের লোওটা বাঁচিয়ে দিয়েছে খুব, ওখানে অনেক সোনা-চাঁদি আছে বলে নইলে ওরা তো সে খবরও কিছু আনতে পারে নি। এখন গিয়ে যদি কিছু না পায় চোটটা পড়বে ঐ বাঁদীটার ওপর। ওদের আর কি দোষ, ওরা তো বলেই দিয়েছে কিছু নেই।…

সামনে থেকে দ্রুতই সরে গেল, এ ওর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে যেন—কে কার আগে পালাতে পারে।

নিচে নেমে চোখের আড়ালে গিয়ে সকলেই একবার নিজের নিজের গর্দানে হাত বুলিয়ে নিল—তখনও যেন বিশ্বাস হচ্ছে না ঠিক, শিরটা ঘাড়ের ওপর টিকে আছে!…

গুম খেয়ে বসে রইল ইখ্‌তিয়ারউদ্দীন অনেকক্ষণ। তারপর বললে, 'বাঁদী, তুই তো অনেক কথা জানিস দেখছি, তুই বলতে পারিস কি ক'রে সেই বাঁদীটার খবর পাবো? হোসেনা নাম, মুলতানের হাটে বিক্রি হতে দেখেছি—তিন বছর আগে। মানে ঠিক বিক্রি হওয়াটা পর্যন্ত দেখি নি, নখাসে এনে রেখেছিল দেখেছি। পরে খবরও নিয়েছি—বিক্রি হয়েছিল। কার মাল, কোন্ নিলামদার—সব আমি জানি। নাম সব মাথায় লেখা হয়ে আছে। যে ব্যাপারী কিনেছিল সে আগেই নিয়ে গিয়েছিল দিল্লীর সুলতানের কাছে। বাদশা-সুলতানের ঘরেই রাখবার মতো এটা ঠিক—তেমনি দামই হেঁকেছিল, কিন্তু অত দাম সুলতান দিতে চান নি, বা পারেন নি দিতে। আরও দু-চারজনের কাছে দেখিয়েছে, সেখান থেকে ঘুরতে ঘুরতে অযোধ্যার সুবাদারের কাছে এসেছিল। সুবাদারের পসন্দ আছে, তিনি নাকি ঐ দামেই কিনতে চেয়েছিলেন, ব্যাপারী যা বলেছিল তাতেই রাজী হয়েছিলেন—কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর একজন কে এসে নাকি তার দু'গুণ দাম দিয়ে কিনে নিয়েছে।'

এই পর্যন্ত বলতে বলতে যেন হাহাকারের মতো শোনাল গলার আওয়াজটা ওর, "সেইটে, কে কিনেছে, এই খবরটাই কেউ দিতে পারল না। যে কিনেছে সে নিজের জন্তে কেনে নি, সে অপরের লোক, কর্মচারী। বুরখা পরিয়ে রাতের আঁধারে চুপিচুপি নিয়ে পালিয়েছে, তা নইলে শহরের বাইরে নিয়ে যেতে পারত না কিছুতেই। সুবাদার মালিক হুসামউদ্দীন সাহেবের লোহু গরম হয়ে গেছে তখন লোসেনার আঁখের দিকে চেয়ে—সে লৌণ্ডিকে দেখে ইস্তক তিনিও নাকি ঘুমোতে পারেন নি —তিনি সহজে ছাড়তেন না এটা ঠিকই—কিন্তু মেয়েটা যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেল একেবারে—মেয়েটা, আর যে কিনেছিল সেও। মালিকসাহেবও নাকি বিস্তর খোঁজ করেছেন, এখনও করছেন—তিনিও খবর বার করতে পারেন নি। যে কিনেছে সে কোন দেশের লোক, তাও কেউ বলতে পারে না। এত টাকা যার —সুলতান সুবাদারের থেকে দু'গুণ তিনগুণ দাম দেয়, সেও যে-সে কোন লোক নয়।·· কেউ কেউ বলে কোথাকার এক পীরসাহেব কিনেছেন—তাঁর সাধনায় লাগবে বলে, কেউ বলে কোন কাফের রাজা। কিন্তু যে-ই কিনুক, সে সামান্ত লোক তো নয়—যার এত টাকা। আর মেয়েটাও কিছু এতটুকু কোন কুঁচো জহরত নয় যে জেবে পুরে ফেলবে কি গিলে নেবে—কিংবা কোমরে লুকিয়ে রাখবে। দুনিয়া থেকে কি একটা জলজ্যান্ত মানুষ হাওয়া হয়ে আসমানে মিলিয়ে গেল ?'

এই পর্যন্ত বলে চুপ করল ইখ্‌তিয়ার, অর্থাৎ কথা বলাটা বন্ধ করল।

কিন্তু নিষ্ফল আক্রোশ তখন তাকে আরও উত্তেজিত করে তুলেছে—সে স্থির হযে বসতে পারল না, খাঁচার বাঘের মতোই সেই সঙ্কীর্ণ খোলা জায়গাটুকুতে পায়চারি করে এল খানিকটা। তারপর আবার এসে ধপ ক'রে বসে পড়ে বলল, 'মালিক হুসামউদ্দীন সাহেবও খবর নেওয়া বন্ধ করেন নি এখনও। আমি সেখানেও আমার লোক রেখেছি—তিনি খবর পেলে আমিও পাব। তারপর—! তিনিও আছেন আমিও আছি। সুবাদার কেন সুলতানের ঘরে গেলেও কেড়ে আনব আমি—কেউ ঠেকাতে পারবে না, এক খুদা যদি নারাজ না হন।···অবিশ্যি সুবাদার চাইছেন ভোগ করতে, ভোগ করে নিন, আমার তাতে কোন নুকসান নেই। সে তো এমনি বসেও নেই এতকাল, ভোগ তো কেউ-না-কেউ করছেই।···আমার দরকার অন্ত, আমি তাকে শেষ ক'রে দেব। আমার থেকে আর কোথাও যাবে না, আর কেউ নিতে পারবে না।'

'খুন করবেন ?' আস্তে প্রশ্ন করল লল্‌তা।

'হ্যাঁ, খুনই করব।' যেন দাঁতে দাঁত ঘষতে থাকে ইখ্‌তিয়ার, 'তবে সহজে নয়'

এমন কষ্ট দেব, এমন একটু একটু ক'রে মারব—যা কেউ আজ পর্যন্ত ভাবতেও পারেনি। আমি যা ভেবেছি, এতকাল ধরে একটু একটু করে ভেবে রেখেছি, তা ইন্‌সানের কল্পনাতেও আসে নি আজ পর্যন্ত। কেটে তো ফেলব না, কি গরম তেলেও ফেলব না, কি আগুনেও পোড়াব না, তাড়াতাড়ি ম'লে তো ফুরিয়েই গেল, শুধু যন্ত্রণা দেব যত রকমে দেওয়া যায়, কতকগুলো যন্ত্র তৈরি করাব সেজন্যে।··তাইতেই একটু একটু করে মরবে। জানিস, সে বাঁদী আমার সুরৎ দেখে থুথু ফেলেছিল, তার মালিক বলেছিল আমার সঙ্গে শোবার আগে সে নিজের হাতে নিজের গলা টিপে মারবে—সেই থুথু তাকে দিয়ে চাটাব। হ্যাঁ, থুক্ ফেলিয়ে থুক চাটাব। আমার সঙ্গে শোবার জন্যে পায়ে ধরবে, ভিক্ষে চাইবে—দেব না।·· সে, সে তুই ভাবতেও পারবি না লল্‌তা।·· না না, সে ভাবতে গেলেই আমার মাথা গরম হয়ে যায়—আর একটা কাউকে সাবাড় করতে না পারলে স্থির হতে পারি না।···থাক, থাক সে কথা।'

আবারও উঠে অস্থির ভাবে পায়চারি করতে থাকে। যেন ছুটে বেড়ায় ঐটুকু সীমাবদ্ধ জায়গার মধ্যে।

তারপর—বোধ করি মানসিক উত্তেজনার প্রতিক্রিয়াতেই—ফিরে এসে অবসন্ন ভাবে বসে পড়ে আবার, ধপ ক'রে।

দুর্দান্ত ঐ মানুষটা ছেলেমানুষের মতোই প্রশ্ন করে, 'কী বলিস, পারব না খুঁজে বার করতে?'

লল্‌তাও চুপ ক'রে থাকে কিছুক্ষণ। চুপ ক'রে বসেই পায়ে হাত বুলোয়। খানিকটা পরে বলে, 'জনাবালি, আমাদের দেশে একরকম জিনিস আছে, তাকে আলেয়া বলে। খুব অন্ধকার জলা-জমিতে রাতের বেলায় দেখতে পাওয়া যায়, আলোর মতো জ্বলে ওঠে আবার নিভে কোথায় মিলিয়ে যায়।·· সবাই বলে আলেয়া-পেত্নী, মেয়েছেলে অপঘাতে ম'লে—মানে জলে ডুবে কি গলায় দড়ি দিয়ে মারা গেলে তাদের উদ্ধার হয় না, স্বর্গে যেতে পারে না তারা—তাদের আত্মা এখানেই ঘুরে বেড়ায়—সেই আত্মাকেই পেত্নী বলে। লোকে বলে আলেয়াও সেই পেত্নীই এক-রকমের, আলেয়া ভূতও বলে কেউ কেউ।···মানে আসলে তাদের কোন শরীর নেই, তাকে ধরতে গেলে কি কাছে গেলেই মিলিয়ে যায়, আবার দেখা যায় দূরে দপদপ করে জ্বলছে তেমনি, আবারও কাছে যান, আর দেখতে পাবেন না।'···

একটু থেমে আবার শুরু করে, 'আপনারা জানেন না, দেখেন নি—তার কারণ শুনেছি আপনাদের পাহাড়ে দেশ, জলই বিশেষ নেই। এ আলো জলাজমি ছাড়া দেখা

যায় না—বিশেষত যে জলায় নলখাগড়ার বন আছে, কি হোগলার বন—সেখানেই বেশী। আমার ঠাকুরবাবা অবিশ্যি বলতেন যে, ও কোন আত্মা নয়, ভূত-পেত্নী কিছুই নয়—জলাজমিতে পাক পচে একরকমের বাতাস হয়—জলের মধ্যেই বুড়বুড়ি কেটে উঠে পড়ে মধ্যে মধ্যে—সেই বাতাসে বাইরের বাতাস লাগলেই দপ করে জ্বলে ওঠে একবার আপনাআপনিই। ঐ জ্বলে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই সে বদ হাওয়া পুড়ে যায়। আমরা আবার যা জ্বলতে দেখি সে নাকি নতুন ওঠা বাতাস, নতুন বুড়বুড়ি কেটে উঠেছে যা। সেই জন্যেই ধরা যায় না। · তা তাঁর কথা অবশ্য কেউই বিশ্বাস করে না, ভূত বা পেত্নী বলেই মনে করে সব্বলে।'

এই পর্যন্ত বলে আবারও একটু চুপ ক'রে যায় লল্‌তা, তারপর বলে—একটু মুচকি হেসে, সে হাসি ঘনায়মান সন্ধ্যার আঁধারে দেখতে পায় না ইখ্‌তিয়ার, 'আপনি নারাজ হবেন না জনাবালি, আপনি যার পিছনে ছুটছেন সেও ঐ আলেয়া। আপনার মনের গরম হাওয়াকেই আপনি জ্বলতে দেখছেন। সে লেড়কী আর নেই—এখন তাকে দেখলেও চিনতে পারবেন না হয়তো। সেও আর সেকথা মনে ক'রে রাখে নি কিছু। বহু লোকের সামনে তাকে দাঁড়াতে হয়েছে যাচাই হতে—বহু লোকের হাত-বদল হয়েছে এতদিনে।···তাকে ভুলে যাওয়াই ভাল। শুনেছি, আমাদের দেশে ঐ আলেয়াকে ধরতে যারা যায় তারা জলা-জমির পাঁকে ডুবে মরে। পেত্নীরা নাকি সঙ্গী টানবে বলে, ভূত বানাবে বলে ঐ ভাবে নিয়ে গিয়ে অপঘাতে মারে।·· ওর কথা ভুলেই যান না জনাবালি। মনে করুন না একটা খারাপ খোয়াব দেখেছিলেন।··· এমন তো কত দেখে মানুষ।'

গুম খেয়ে দূরের আকাশের দিকে চেয়ে থাকে ইখ্‌তিয়ার।

দিনের আলো যেমন ম্লান হয়ে আসছে—একটির পর একটি তারা ফুটছে আকাশে। দক্ষিণ থেকে এক এক ঝলক ঠাণ্ডা মিষ্টি হাওয়া আসছে মধ্যে মধ্যে। পায়ের ওপর যে নরম হাতখানা চাপ দিচ্ছে একটু একটু ক'রে তাতেও জাদুর ছোঁওয়া। ঘুমিয়ে পড়তে খোয়াব দেখতেই চায় বৈকি মন।

তারপরই একটা চটকা ভেঙে আবার চাঙ্গা হয়ে ওঠে।

এ কি, সে কি মেয়েছেলে হয়ে যাচ্ছে নাকি? আরামে লোভ!

হঠাৎ, অকারণেই যেন, একটু গলা চড়িয়ে বলে, 'ওসব ঝুট।' ঝুটা বাত। কাফেরের কথা ওসব। · মরে গেলে মানুষের জান মাটির তলাতেই থাকে, অপেক্ষা করে রোজকিয়ামতের। আল্লার যেদিন মরজি হবে—দুনিয়ার আখেরি ঘনিয়ে আসবে, যেদিন ইস্রাফিল এসে বাঁশী বাজাবে, সেদিনই সকলে উঠবে আবার মাটির

বিছানা ছেড়ে, খুদা সেই দিনই বিচার করবেন সকলের। যারা সত্যধর্মে বিশ্বাসী, যারা শরিয়ৎ মেনে চলেছে তারা যাবে বেহেস্তে—বাকী সব দোজখে।…যে যেমন কাজ করেছে তার তেমনি জায়গা মিলবে।"

তারপর আবার বলে, 'যদি তাই হয—যদি তোর কথাই সত্যি হয তাহলেও আমি তার আশা ছাড়ব না। তাকে আমার চাইই। যদি সে খোঁজে মরি তাও ভাল। যতক্ষণ জ্ঞান থাকবে তার আশা ছাড়তে পারব না।'

আর কথা বাড়াল না ললিতা, চুপ ক'রে গেল।

॥ ৮ ॥

ললিতা যখন ইখ্‌তিয়ারের কাছে ওদন্তপুর বিহারেব কথা বলে তখন ওব মনের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য ছিল লক্ষ্মীকান্তর চিন্তাটাই।

তার ওপর শোধ তুলতে হবে, তাকে জব্দ করতে হবে—এইটেই বড় কথা, বোধহয তখন একমাত্র কথা।

যে ওকে এই মহাসর্বনাশের মধ্যে এই চরম বিপদের মধ্যে ফেলে, অপমানিত ক'রে চলে গেছে সেখানে—সে নিশ্চিন্ত নিরাপদ থাকবে, পডাশুনো ক'রে পণ্ডিত বলে গণ্য হবে, সমাজে প্রাধান্য পাবে, আর ও—ও এই বিধর্মী ম্লেচ্ছের ক্রীতদাসী হযে অপমানিত নির্যাতিত হবে, অমানুষিক নির্যাতনের পর ঐ দানবটারও বান্দাদের ভোগ্যা হবে!

এই জ্বালা, এই সর্বদিকদাহকারী উষ্মাই ওকে পাগল কবে রেখেছিল, তাই প্রথম সুযোগেই সে সেইদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে দৈত্যটার।

কিন্তু শোধ নেওযা কথার কথা। সেটা কেমন হবে—মনের মধ্যে অস্পষ্ট একটা ধারণামাত্র ছিল। বড়জোর কিছু লোক মরবে, হযতো লক্ষ্মীকান্তও মরতে পারে তার সঙ্গে—আবার পালাতেও পারে—এরা গিয়ে পড়ছে জানলে কি আব পালাবে না—যা ভীতু, আর শুধু সে কেন, সবাই পালাবে।…টাকাপয়সাগুলো লুটে নেবে এরা, হযতো ঘরদোরে আগুন লাগাবে, আশপাশের কিছু বসতিও নষ্ট হবে। সবাই কিন্তু ওর বাবার মত বোকা নয—দাঁড়িযে মরবে।

ওদের গ্রামের দিকে যখন এরা আসে তখনও কেউ কেউ পালিযেছিল বৈকি। অনেকেই যা পেরেছে, জেবর জহরত সোনা চাঁদি আর গৃহদেবতা নিয়ে জঙ্গলে পালিয়েছে। অবশ্য তাদের মধ্যেও কেউ কেউ যে ধরা পড়ে নি তা নয়। এরাও মানুষের মতিগতি বোঝে, পালাতে চাওযা এবং জঙ্গলে পালাতে যাওয়াই স্বাভাবিক

তাও জানে—সেখানেও গেছে, উল্টো দিক থেকে জঙ্গল ঘিরেছে—তবুও মনে হয় কেউ কেউ বেঁচেছে।

ওর বাবা যেতে রাজী হন নি। গৃহদেবতাকে ছেড়ে যাবেন না, আর পিতৃ-পিতামহের প্রতিষ্ঠিত দেবতাকে গৃহছাড়াও করবেন না—এই তাঁর প্রতিজ্ঞা। বলেছিলেন, 'এতকাল ধরে সেবা ক'রে এলুম, ওঁর মনে যা আছে তাই করবেন। এখন বুড়ো বয়সে বিধর্মীর ভয়ে জঙ্গলের জানোয়ারের মত ছুটোছুটি করতে পারব না।'

বোধহয় ভেবেছিলেন যে, এতকাল ধরে সেবা করার পুরস্কারস্বরূপ ভগবান ওদের বাঁচিয়ে দেবেন।

যেন, আর যারা মরছে তাদের কেউই ওদের মতো নিষ্ঠার সঙ্গে সেবা পূজো করে নি। হায় রে অহঙ্কার!

তা সে অহঙ্কারের শাস্তি তো তিনি পেলেন না, তিনি তো মরে বাঁচলেন. মরার থেকে ঢের ঢের বেশী দুর্গতি হল ওদের—তাঁর বাড়ীর মেয়েদের। এর থেকে মৃত্যু ঢের সহজ, ঢের বেশী কাম্য।···

যাই হোক—ললিতা ভেবেছিল, বিহারের ছেলেরা ওর বাবার মতো নির্বোধ নয়. তারা বিপদ কাছে এসে পড়লে পালাবে. অন্তত পালাবার চেষ্টা করবে নিশ্চয়। তার মধ্যে লক্ষ্মীকান্তও বেঁচে যেতে পারে। মরলেও আপত্তি নেই। তবু মরার আগে জেনে যেতে পারবে এ বিপদ কি ও কতখানি।

অবশ্য তারও ঘরবাড়ি গেছে, বাবা-মা গেছেন। সে খবর কি আর পায় নি? পেয়েছে নিশ্চয়ই। তবু দূরের কোন ঘটনা যত সাংঘাতিকই হোক, প্রত্যক্ষদৃষ্ট বিপদের মতো ভয়ঙ্কর নয়।··

•

কিন্তু সে বিপদ যে এরকম, মানুষ যে এমন অমানুষিক নিষ্ঠুর হতে পারে, তা ললিতা জানত না। তাহলে সে এদের সঙ্গে আসত না অন্তত, প্রাণপণে চেষ্টা করত না আসবার। কোন একটা কৌশল অবলম্বন করত যাতে ইথ তিয়ারই রেখে চলে যায়।

তাদের ওপর দিয়েও এ ঝড় গেছে, তাদের বাড়িঘর পুড়েছে, মেয়েদের ইজ্জত গেছে, গ্রামকে গ্রাম পুড়ে ছাই হয়েছে—তবু সে সামান্য একটুখানি জায়গা, সে অভিজ্ঞতা দিয়ে এ অভিজ্ঞতা কল্পনা করা যায় না। ললিতাও পারে নি।···

সেদিন থেকে ইথ তিয়ারের একটা পরিবর্তন এনে দিয়েছে ললিতা।

নতুন নতুন মেয়ে আমদানি ক'রে পরে অকারণে তাদের নির্যাতন করা—এটা বন্ধ আছে এই কটা দিন—মাস দুইয়ের ওপর। ললিতাকে আর কাছ থেকে সরাতে

পারে নি, শুধু শয্যাসঙ্গিনী নয়, এমনি কর্মসঙ্গিনী বা চিন্তাসঙ্গিনী রূপেও ভাল লেগেছে। তাই, মধ্যে মধ্যে এখনও সেই ভয়ঙ্কর পরিণামের ভয় দেখালেও, সে প্রায় অপরিহার্য হয়ে উঠেছে ইখ্‌তিয়ারের জীবনে। ওর প্রতি ব্যবহারেও অনেক পরিবর্তন হয়েছে। দাসদাসী ইখ্‌তিয়ারের অনুচরদের সেজন্যে বিস্ময়ের সীমা নেই, তাদের চোখে যৎপরোনাস্তি সম্ভ্রম ফুটে উঠেছে ওর সম্বন্ধে—সম্ভ্রম ও বিস্ময়। মেয়েটা নির্ঘাত জাদু জানে কাফেররা যাকে বলে ভেল্‌কি।·· আড়ালে তারা বেগমসাহেবা বলেই উল্লেখ করে ললিতাকে - এবং সেটা ওকে শুনিয়েই।

কে জানে কী থেকে কি হয়—হাতে রাখা ভাল।

সেই কারণেই, অপরিহার্য সঙ্গিনী হিসেবেই ইখ্‌তিযারের সঙ্গে যাওয়ার কথা উঠেছিল, ললিতাও তাতে আপত্তি করে নি।

স্ত্রীলোকের বুদ্ধি চিরদিনই একপেশে, সে শুধু লক্ষ্মীকান্তর কথাই ভেবেছে, কেমন ক'রে তাকে জব্দ করবে, শিক্ষা দেবে—সেই সঙ্গে অন্য কোন সম্ভাবনার কথা মনে পড়ে নি। এমন কি, একথাও এক-একসময় মনে পডে উৎসাহিত হযে উঠছে যে হয়তো লক্ষ্মীকান্তর আতঙ্ক, অসহায় অবস্থা, তার পলায়নের চেষ্টা, তার লাঞ্ছনা ওর চোখে পড়ে গেলেও যেতে পারে।

আর হয়তো সে সময়, এই দৈত্যটাকে বলে তাকে অব্যাহতি দেওয়াতেও পারবে।

মনে মনে অনেক ছবি এঁকেছে সে এই অভিযানের, কিন্তু তার কোনটাই বাস্তবের ধার ঘেঁষেও যেতে পারে নি।

সেটাই বুঝল সে, এখানে এসে।

কিন্তু তখন বড বেশী দেরি হয়ে গেছে।

এই বিপুল ধ্বংসলীলার কথা অবশ্য কারুরই কল্পনা করা সম্ভব নয।

বিরাট বিহার যা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে একটু একটু ক'রে গড়ে উঠেছে তা মাত্র দুটি দিন ও দুটি রাত্রের মধ্যে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল।

অত বড়, একটা বিপুল গণ্ডগ্রামের মতো বিহার—অত ঘরবাড়ি চৈত্য মন্দির কীভাবেই না ভাঙ্গল। প্রতি ঘরে ঢুকে দেখেছে ওরা, প্রতিটি পেটিকা হাঁড়ি ঘড়া ভেঙ্গে দেখেছে—টাকা কি সোনা আছে কি না। সোনা-চাঁদি ছিল ঠিকই, কিন্তু তার চেয়েও ঢের বেশী ছিল পুঁথি। এসব পুঁথির ওদের কাছে কি দাম, কাফেরদের শাস্ত্রগ্রন্থ, মানুষকে বিপথে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে শুধু। উপকার নেই, অপকার—অতএব পুড়িয়ে দাও। পুড়িয়ে দাও।

পুড়িয়েই দিয়েছে। এক-একটা বাড়ি ভেঙেছে, লুঠ করার মতো যা পেয়েছে সরিয়ে নিয়েছে—সঙ্গে সঙ্গেই সেখানে আগুন জ্বেলেছে আর সে আগুনের প্রধান ইন্ধন হয়েছে—বই, পুঁথি।

আর আগুন যখন জ্বলেছে দাউদাউ করে—জীবিত, আহত, অর্ধমৃত মানুষ-গুলোকে নিয়ে গিয়ে তার মধ্যে ফেলেছে। তাদের হাহাকার ও আকুল আর্তনাদ ছাপিয়ে উঠেছে এদের পৈশাচিক উল্লাস, খলখল হাসি। কোথাও বা ছাত্রগুলোকে অধ্যাপক ভিক্ষুকগুলোকে তাড়িয়ে এনেছে বর্শার খোঁচা দিতে দিতে—যাতে তারা নিজেরাই সেই আগুনে ঝাঁপ দিতে বাধ্য হয়।

বিপুল বিহার—তাকে কেন্দ্র ক'রে তার চারপাশের সমৃদ্ধ জনপদ—তার চিহ্নমাত্রও রাখল না এরা।*

এরকম ধ্বংসলীলা চিন্তা করা যায় না। শুধুমাত্র এমন ভাবে নষ্ট ক'রেই কারও এত আনন্দ হয় তাও জানা ছিল না ললিতার।

পাছে দেখার অসুবিধা হয় বলে একটা বয়েল গাড়ির ওপর উঁচু বাঁশের মাচা মতো করিয়েছিল ইখ্‌তিয়ার। অনেকটা উঁচু, দোতলা বাড়ি-সমান প্রায়। মজবুত দেখে দুটো বয়েল বা বলদ জোতা হয়েছিল তাতে—ঘোড়ায় এখানে টানতে পারবে না, কোথাও চষা জমি, কোথাও শস্যক্ষেত্র, মাঠ যা আছে অসম্ভব উঁচুনিচু। শুধু ঘোড়ার ওপর বসে বেশীদূর অবধি দেখা যায় না—তাই এ ব্যবস্থা। নইলে এসেছে ললিতা ঘোড়ায় চেপেই—ইখ্‌তিয়ার নিজে শিখিয়ে দিয়েছে ওকে, কী ক'রে ঘোড়ায় চাপতে হয়, আর বসে থাকতে হয়।

ইখ্‌তিয়ার নিজে অবশ্য সব সময় মাচায় থাকছে না। কখনও উঠে এসে দাঁড়াচ্ছে—পরক্ষণেই হয়তো তরতর ক'রে নেমে যাচ্ছে—বিভিন্ন আদেশনির্দেশ দিতে। ললিতা নামে নি, নামবার প্রয়োজন হয় নি। খাওয়ার কথা জিজ্ঞাসা করেছিল একজন—'না' বলে দিয়েছে। এখানে এই বীভৎস হত্যা তাণ্ডবের মধ্যে খাওয়ার কথা বোধ করি ইখ্‌তিয়ারের মতো লোকও ভাবতে পারে না। সেও খেলে না সারাদিনই কিছু—দু-এক আঁচলা জল ছাড়া।

---

* ইতিহাসে আছে—এই ধ্বংসকাণ্ডের অব্যবহিত পরেই কাশ্মীরের শাক্য শ্রীধর মগধে এসে ওদন্তপুর বিহারের ভগ্ন ও দগ্ধাবশেষ দেখেন। তাঁর এমন আতঙ্ক হয় এদের সম্বন্ধে যে আর কোথাও তিলার্ধকাল বিলম্ব না করে সোজা কাশ্মীরে ফিরে চলে যান।

ললিতা একদৃষ্টে দাঁড়িয়ে দেখল।

নিজেকে কি দায়ী মনে হচ্ছিল এজন্যে ?

অপরাধবোধ অনুভব করছিল মনে মনে ?

কে জানে! সে সব কিছু ভাবার মতো, অনুভূতিবোধের মতো মনের অবস্থা ছিল না। সবটাই জড়, স্তম্ভিত হযে গেছে, ভেতর বার সব।

দেখল—শত শতাব্দীর কষ্টার্জিত জ্ঞান, গুরু-পরম্পরায় বহু জ্ঞানতপস্বীর আজন্ম সাধনার ধন—এক-একখানি অমূল্য গ্রন্থ—কেমন করে মহা-উল্লাসে এরা আগুনের মধ্যে ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিচ্ছে।··· ললিতা লেখাপড়া তেমন জানে না কিন্তু এদের মূল্য বোঝে। তার পিতামহের কাছে এসব গল্প বহু শুনেছে। শিষ্য-পরম্পরায় এক এক বিষয়ে কত পুঁথি লেখা হয়েছে, এক-একজন ক'বে তাঁর নিজের অভিজ্ঞতা, চিন্তা ও বিচারের ফল যোগ ক'রে গেছেন পূর্বসূরীদের অভিজ্ঞতাব সঙ্গে। এমন সহস্র সহস্র পুঁথি জমা ছিল এখানে, কত শত বছরের সঞ্চিত জ্ঞান ঐশ্বর্য। সমস্ত ভস্মীভূত হয়ে গেল ওরই চোখের সামনে। আর হয়তো সহস্র বছরেও মানুষ এই সব জ্ঞান-রত্নের পুনরুদ্ধার করতে পারবে না।

দেখল—মানুষগুলোকে কেমন ক'রে তাডিয়ে নিযে এসে ঐ আগুনের মধ্যে ঝাঁপ দিতে বাধ্য করা হচ্ছে। যারা সহজে রাজী হচ্ছে না, তাদের খানিকটা জখম ক'রে প্রাণ ও যন্ত্রণাবোধ থাকতে থাকতেই ছুঁডে ফেলে দেওয়া হচ্ছে আগুনের ভেতর। বড় বড চৈত্য অট্টালিকা ছাত্রাবাস—ভেঙে সমভূম ক'রে দেওয়া হচ্ছে। অনেক সময় এখানকার ছাত্রদেরই কয়েকজনকে ধরে এনে ভাঙানো হচ্ছে, তারা হয়তো প্রাণে বাঁচতে পারে এই আশায প্রাণপণে খাটছে—তারপর কাজ শেষ হয়ে গেলে, ভয়াবহ কৌতুকের অট্টহাসির সঙ্গে তাদেরও কাউকে পুড়িযে মারা হচ্ছে, কাউকে বা খুঁচিযে খুঁচিয়ে—খাঁচার ইঁদুরের মতো।···

সাবাদিন ধরে দেখল ললিতা, প্রায় সারারাতও।

আগের রাত্রি থেকেই তো দেখছে।

আগুনের সোঁ সোঁ শব্দ; আহত, মৃত ও ভীতর প্রাণফাটা আকুল আর্তনাদ, এদের পৈশাচিক খলখল হাসি ও সোল্লাস জয়ধ্বনি—সবটা জড়িয়ে বধির পাথর করে দিয়েছিল ওকে।

মা-ঠাকুমার মুখে নরকের বহু গল্প শুনেছে— কল্পিত গল্পই, যারা বলেছেন তাঁরাও পুরো বিশ্বাস করতেন না নিশ্চয়ই—কিন্তু ললিতার এখন মনে হল, নরক আছে,

অন্তত নরকযন্ত্রণাটা, আর ওর সে অভিজ্ঞতা হয়েই গেল বোধহয় ওর পাপস্খালনের জন্যই কৃষ্ণভগবানের এই আয়োজন।

লক্ষ্মীকান্ত ?

হ্যাঁ, তার ওপরও শোধ নেওয়া হয়েছে বৈকি।

খুবই ভীতু ছিল বেচারী। বাপ-মায়ের -বড় ছেলে, আদরে লালিত, এতটুকু শারীরিক কষ্ট সহ্য করতে পারত না। একবার দিওয়ালীতে হাতের একটা আঙুলে সামান্য একটু ছ্যাঁকা লেগেছিল—তাতেই প্রায় একমাস হাত উঁচু ক'রে বেড়াত, মুখ শুকিয়ে বিবর্ণ হয়ে গিয়েছিল। মা খাইয়ে দিতেন, স্নান করিয়ে দিতেন অত বুড়ো বয়সেও। তার পর থেকে আর কখনও দিওয়ালীতে ঘর থেকে বেরোয় নি।

নিজের কষ্টও যেমন সহ্য করতে পারত না—পরেরও না। একবার কুয়াতলায় পাথরে পা কেটে গিয়েছিল ললিতার, ও একটা শব্দও করে নি কিন্তু লক্ষ্মীকান্তর চোখে জল ভরে এসেছিল।

লক্ষ্মীকান্তও মরেছে এতক্ষণে। হয় অস্ত্রে নয় অগ্নিতে। একই পরিণতি সকলকার। এর মধ্যে থেকে কেউ যে বাঁচবে, কেউ যে বাঁচল তা মনে হয় না। এক যদি ভগবান কোন অলৌকিক লীলায় রক্ষা করতে পারেন। কিন্তু মনে তো হয় না ভগবান এ নরকের কাছাকাছি কোথাও আছেন!

এতটা ভাবে নি, এতটা কল্পনা করতে পারে নি।

কিন্তু সেটা কোন কৈফিয়ত নয়।

কৈফিয়ত দিতে হবে ললিতাকে। পরজন্মে তো বটেই—ইহজন্মেও। সারাজীবন ধরে নিজেকে কি কৈফিয়ত দেবে ?

'কী রে, সাধ মিটল ?···কী দেখছিস ? এ তোর মুলুকের আলেয়া নয়—দস্তুরমাফিক আগুন। এ মিছে ক'রে ভোলায় না।'

একসময় পিছন থেকে তৃপ্ত ইখ্‌তিয়ারউদ্দীন রসিকতা করে উঠল।

হঠাৎ যেন চমকে জেগে উঠলো ললিতা। একটানা একটা দুঃস্বপ্ন থেকে।

সে কোথায়, কী হচ্ছে—ব্যাপারটা বুঝতেই সময় লাগল খানিকটা।

ইখ্‌তিয়ারের অত লক্ষ্য করার কথা নয়, করলও না। ওর পিঠ চাপড়ে বাহবা দিল, 'না, তুই খুব তৈরী মেয়ে। তোকে সঙ্গে আনাই সার্থক। অন্য কোন লৌণ্ডী হলে এ জিনিস এতক্ষণ ধরে দেখতে পারত না।···না, তোকে আর বিলিয়ে দেওয়া হল না দেখছি, তোকে সঙ্গেই রাখতে হবে। তুই খুব জিতে গেলি।'

ললিতার কানে বোধ হয় এ কথাগুলো ঢুকল না—সে আগের কথারই জের

টেনে উত্তর দিল, 'সাধ ? না, সাধ এখনও পুরো মেটে নি, আর একটু বাকী আছে। ···আমিও যে আলেয়ার পিছনেই ছুটেছিলুম জনাবালি, তার খেসারত দিতে হবে যে!'

বলতে বলতেই দ্রুত মাচা বেয়ে নিচে নেমে গেল সে।

ব্যস্ত হয়ে উঠল ইথ্‌তিয়ার, 'ও কি রে, কোথায় যাচ্ছিস ? আগুন যে ওদিকে, চারদিকে ছিটকে ছিটকে উঠছে—ফিরে আয়, ফিরে আয়।'

'সহমরণে যাচ্ছি জনাব। সে আপনি বুঝবেন না। আগুনই দরকার এখন, আগুনে না পুড়লে ভেতরের আগুন নিভবে না, শুদ্ধ হতে পারব না—'

বলতে বলতেই ছুটছে সে। কথাগুলো এত কোলাহলে শুনতেও পেল না ইথ্‌তিয়ার। ব্যাপারটা কি ঘটছে, কি ঘটল—কেউ ভাল ক'রে বুঝতেও পারল না। বাধা দেওয়া উচিত কি না তাও ভেবে পেল না। গায়ে হাত না দিলে তো ধরাও যায় না—এ ক'দিনে যা দেখছে ওরা—লৌণ্ডাটা তো সুবাদার সাহেবের পিয়ারী হয়ে উঠেছে, বেগমসাহেবা বলে ওরা প্রকশ্যেই ডাকছে এখন—তার গায়ে হাত দেওয়া কি উচিত হবে ?

তা ছাড়াও—ললিতার উদ্দেশ্যটাও ওরা বুঝতে পারে নি।

বোঝে নি ইথ্‌তিয়ারও।

সে ওপর থেকে তখনও চেঁচাচ্ছে, 'ওরে, ওরে, কোথায় যাচ্ছিস ?···ধর্‌ ধর্‌ ওকে, বেঅকুফ গাধার দল—ইস্‌, এ কী হয়ে গেল!'

কিন্তু কেউ কিছু বোঝবার বা প্রতিকার করার আগেই—তখনও যেখানটায় সবচেয়ে জোর আগুন জ্বলছে—ললিতা তার মধ্যে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

প্রতিশোধ

॥ ১ ॥

সকলে তখন তাঁবু ফেলতে ব্যস্ত।

তাঁবু ফেলা মানে শুধুই কিছু ঐ বড় ছোট কাপড়ের আচ্ছাদনগুলো খাড়া করা নয়—কাপড়ের ঘর, তাঁবু ফেলা মানে কিছুকালের মতো সমস্ত বাহিনীর ঘরকন্না সাজানো। ঘোড়ার আস্তাবল ঠিক করা; তাদের ঘাস-দানা দেওয়ার ব্যবস্থা করা, রসুইয়ের ব্যবস্থা - এতগুলো লোকের খাওয়া, বড় সোজা কথা তো নয়।

তার মধ্যেও জাত-পাতের কথা আছে—তিন-চারটে রান্নাশালা না হলে চলে না। ব্রাহ্মণদের জন্যে একটা—ছত্রি বা ক্ষত্রিয়দেরও তিন-চারটে শাখা আছে—তাদের আলাদা আলাদা হাঁড়ি। আবার চাকরবাকর গোছের যারা—কাঠ কাটে জল তোলে মাল বয় - ভীলই বেশী তাদের মধ্যে, তাদের জন্যে আর একরকম ব্যবস্থা, সে আলাদা রান্নার জায়গা।

আসলে এইসব ব্যবস্থাতেই ঝঞ্ঝাট বেশী, সময় অনেক লাগে নইলে তাঁবু ফেলা বা বাঁধায় খুব একটা হাঙ্গামা নেই, খুঁটি দড়ি কাপড় সব সাজানোই আছে—খুঁটি গাড়া হ'লেই টপাটপ সব কাজ হয়ে যায়।

সাধারণ ফৌজ বা সিপাহী শ্রেণী—তাদের তো তাঁবুরই ব্যবস্থা নেই, অন্তত এ যাত্রায় নেই। অল্প দু-চারদিনের মামলা, মাঠে গাছতলায় যে যে-ভাবে পারে শুয়ে পড়ে থাকবে। শীতের দিন, দুপুরের রোদ তো খুবই মিঠে। রাত্রে 'জাড়া' একটু 'জাস্তি' —তা হোক, কাঠকুটো আছে, আছে ঘসী বা ঘুঁটে—আগুন জ্বালিয়ে তার চারদিকে গোল হয়ে ঘিরে পড়ে থাকবে'খন।

তাঁবুর ব্যবস্থা শুধু সর্দার আর তাঁর সঙ্গী দু-দশজন সম্ভ্রান্ত অনুচরদের জন্যে। বলা বাহুল্য, এ যাত্রার প্রধান সঙ্গী যে—চারণ কবি দেবা, তার জন্যেও আচ্ছাদনের ব্যবস্থা আছে একটু। স্বয়ং রাজাসাহেব উম্মেদ সিংয়ের তাঁবু বা বস্ত্রাবাসের এক পাশের একটি ছোট ঘর তার জন্যে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

এ অবশ্য এমন কোন বিশেষ ব্যবস্থা নয়।

আমরা যে সময়ের কথা বলছি—আজ থেকে সওয়া দুশো বছর আগে—তখন কেন —তার অনেক আগে থেকেও রাজস্থানের এ চারণ কবিরা এমনি সম্মানই পেতেন।

এ কবিদের কাজ ছিল প্রভু বা প্রতিপালক রাজা কী জায়গীরদারদের—বীরত্বের, উদারতার, মহত্ত্বের কাহিনী—কীর্তিকথা কবিতায় বেঁধে গানের মতো সুর ক'রে গেয়ে বেড়ানো।

এ কবিদের রাজা প্রজা সকলেই সম্মান করতেন। সর্বত্র অবারিত দ্বার ছিল। এঁরা কোথাও অতিথি হলে গৃহস্থরা নিজেদের ধন্য মনে করতেন। কোন কোন বিখ্যাত কবিকে মেবারের মহারাণা বা রাজস্থানের অন্য মহারাজারা যে সম্মান দেখিয়েছেন তা কোন সম্রাট্‌কেও কখনও দেখান নি তাঁরা—সে সম্মান একমাত্র গুরুকেই দেখানো যায়।

তাই চারণরা প্রাসাদে থাকলে প্রাসাদ বা দুর্গের ফটকের ওপরে তাঁদের বাসা দেওয়া হ'ত। এঁদের বলা হ'ত পোতপাল—আর রাজার সঙ্গে যুদ্ধযাত্রা করলে রাজার পাশে পাশে যেতেন এঁরা, কখনও বা এক হাতীতেই ; যখন কোথাও ডেরাডাণ্ডা গাড়া হ'ত, মানে ছাউনি পড়ত, তখন—রাজার সঙ্গে এক তাঁবুতেই থাকার জায়গা হ'ত।

এখানেও তাই দেওয়া হয়েছিল।

এ ক্ষেত্রে অবশ্য একটু বিশেষ কারণও ছিল।

দেবাই এ অভিযানের আসল নেতা। চারণ দেবা—সে-ই পথ দেখিয়ে এনেছে রাজা উম্মেদ সিং শিশোদিয়াকে।

সেই কারণেই দেবা ঘরের কোণে স্থির থাকতে পারে নি। পারে নি আরামের ব্যবস্থা নিতে, সঙ্গে বয়ে আনা খাটিয়া বা চারপাইতে শুয়ে কিংবা আরাম ক'রে বসে 'তামাকু' খাবার সুখভোগ করতে।

আসার সঙ্গে সঙ্গেই প্রায়—গরম দুধের ব্যবস্থা হয়েছিল, তখনও ইষ্টপূজা হয় নি বলে তাও খায় নি দেবা। খুঁটি গাড়া তাঁবু বাঁধা, মালপত্র বয়ে আনার গোলমাল, লোকজনের হাঁকডাক চেঁচামেচি অসহ্য বোধ হওয়াতেই ঘরের বা বাসার বাইরে চলে এসেছে—স্কন্ধাবার থেকে বেশ একটু দূরেই একটা প্রায়-নিষ্পত্র ন্যাড়া বাবলা গাছের তলায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে।

এইখান—হ্যাঁ, এইখান থেকেই ভাল দেখা যায় বনেড়ার দুর্গটা। এর আগেও কয়েকবার দেখে গেছে। ঠিক এই গাছতলাটা থেকে। গাছটা চিহ্নিত করা আছে তার। দেখেছে, দীর্ঘশ্বাস ফেলেছে এবং বোধহয় সহস্র বারের মতো প্রতিশোধের প্রতিজ্ঞাটা ঝালিয়ে নিয়েছে।

আজও এইখান থেকেই দেখিয়েছে রাজাসাহেবকে—তাঁর জ্ঞাতি বনেড়ার জায়গীর-দার সর্দার সিং শিশোদিয়ার এই প্রাসাদ দুর্গ।

অতি প্রিয় দুর্গ তার। অতি প্রিয় বাসস্থান।

অতি মধুর দৃশ্য ছিল তার কাছে।

আজ অতি দৃষ্টিকটু, অতি বিষাক্ত।

ঐ দুর্গ ধ্বংস করার জন্যে, ঐ প্রাসাদের চূড়ায় যে পতাকা গর্বভরে বাতাসে উড়ছে তাকে ধুলোয় লুটিয়ে দেবার জন্যেই দেবা আজ পথ দেখিয়ে এনেছে শাহপুরার রাজা উম্মেদ সিং শিশোদিয়াকে।

এই বিপুল বাহিনীকে নিমন্ত্রণ ক'রে ডেকে এনেছে বলতে গেলে।

রামচরিত-মানসের সেই বিভাষণজী যেমন লঙ্কাপুরীর দুশমন ভগবান লছমনজীকে পথ দেখিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন—সেইরকম সেও এনেছে।

হ্যাঁ—তাকেও লোকে বিভীষণ বলবে। তা দেবা জানে। হয়ত অতটাই ঘেন্না করবে।

তবে দেবাও নিরুপায়। বিভীষণজীর মতো তারও আর অন্য পথ ছিল না—ঐ চরম অপমানের প্রতিশোধ নেওয়ার।

এ অপমান যদি শুধু তার একার—ব্যক্তিগত—হ'ত তো এত কাণ্ড করত না দেবা। হয়ত নিঃশব্দে সহ্য করত, অন্তত এমন ঘরভেদী দুশমনের মতো কাজ করত না।

এ অপমান যে তার পিতা-পিতামহেরও, এ অপমান বলতে গেলে সমস্ত চারণ জাতির। এই যে দেশে চারণরা ইষ্টদেবতার মতো পূজা পেয়ে গেছে চিরকাল, যে দেশে রাজারা কোন কোন চারণের পাল্‌কীতে কাঁধ দিয়ে নিয়ে গেছেন সাধারণ বাহকদের সঙ্গে, পায়ে হেঁটে এগিয়ে গিয়ে অভ্যর্থনা জানিয়েছেন, নিজের হাতীতে চাপিয়ে নিজের আগে আগে বক্সীর মতো ঘোড়ায় চেপে নিয়ে গেছেন।

এমন কি এও শোনা গেছে যে কোন অতিথি কবি এক খুব বড় শক্তিশালী রাজার সভায় যথেষ্ট সৌজন্য পাননি মনে করে একটু দুঃখিত হয়েছিলেন, সে কথা বলেও ছিলেন কাউকে। কথাটা রাজার কানে যেতে তিনি নিজে কবির জুতো এনে নিজের হাতে পরিয়ে দিয়েছিলেন।

সেই দেশের সামান্য এক জায়গীরদারের এ স্পর্ধা সহ্য করলে তার পূর্বপুরুষ—পূর্বপুরুষ কেন সমগ্র চারণ সমাজেরই অমর্যাদা করা হ'ত।

হয় আত্মনাশ, সেই মুহূর্তেই মৃত্যুবরণ করা—নয় অপমানকারীর নাশ—এ ছাড়া কোন পথ খোলা ছিল না সেদিন।

মৃত্যুতে কোন রাজপুত ভয় পায় না, তবে অপমানের শোধ না নিয়ে মরতে ইচ্ছে করে নি বলেই সেদিন দেবা নিজেকে সামলে রেখেছে, ইষ্টদেবতার নাম ক'রে পিতৃ-পিতামহের নাম ক'রে শপথ করেছে এই অপমানের প্রতিশোধ নেবার, শপথ নিয়েছে প্রতিহিংসার।

শপথ নিয়ে বেরিয়ে এসেছে দুর্গ থেকে।

ঐ বনেড়ার সুউচ্চ প্রাসাদশিখর থেকে উদ্ধত জায়গীরদারের পতাকাটা টেনে নামিয়ে ধুলায় ফেলে দেবে—সেই সঙ্গে মাটিতে মিশিয়ে দেবে ওর গর্ব অহঙ্কার ইজ্জত—তবেই সে চারণ নামের যোগ্য।

দিব্যি গেলেছে যে, পাঁচ বছরের মধ্যে এ শোধ না নিতে পারলে এ জীবনে কোনদিন বাবার পরিচয় দেবে না, চারণ হিসেবে কোন সম্মান বা সুবিধা দাবী করবে না। দূর বিদেশে রাজস্থানের বাইরে গিয়ে সামান্য বিদেশী ভিক্ষুক হিসেবে জীবন ধারণ করবে, নইলে কোন তীর্থে গিয়ে উপবাস ক'রে প্রাণ দেবে।

অবশ্য অত কিছু করতে হয় নি।

তার ওয়াদা করা সময় পূর্ণ হবার অনেক আগেই প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হবার আয়োজন হয়েছে।

বনেড়ার শক্তি সামর্থ সাহস সে জানে। আপিংখোর সর্দার সিং শিশোদিয়া তাঁর সমস্ত শক্তি নিয়ে প্রাণপণে লড়াই করলেও উম্মেদ সিংয়ের সঙ্গে পেরে উঠবে না। উম্মেদ সিং যত লোক এনেছেন এর সিকি লোকও লাগবে না বনেড়ার প্রাসাদ-দুর্গ ভেঙে গুঁড়িয়ে দিতে।

হয়ত তাও লাগবে না, বিনাযুদ্ধেই আত্মসমর্পণ করবেন- বশ্যতা স্বীকার করবেন—সর্দার সিং ; দেবার প্রাক্তন প্রতিপালক ও অন্নদাতা।

॥ ২ ॥

অথচ এর কোন দরকার ছিল না।

আজ দেবাকে যে কাজ করতে হ'ল—একান্ত অনিচ্ছায়, সে কাজ সর্দার সিং-ই তাকে দিয়ে করিয়েছেন বলতে গেলে।

দেবাকে বাধ্য করেছেন—এই বিশ্বাসঘাতকতা করতে।

না, বিশ্বাসঘাতকতা নয়, আপন মনেই মাথা নেড়ে যেন প্রতিবাদ ক'রে উঠল সে। কোনও বিশ্বাসই ভঙ্গ করা হয় নি। সে অপবাদ দেবাকে কেউ দিতে পারবে না।

যেখানে বিশ্বাস করাই হয় নি, সেখানে বিশ্বাসভঙ্গের কথা উঠছে কোথায়?

দেবাকে বাধ্য করেছেন গৃহশত্রু, জ্ঞাতিশত্রুর কাজ করতে, আর এক জ্ঞাতিশত্রুকে উত্তেজিত ক'রে পথ দেখিয়ে নিয়ে আসতে।

বিভীষণ? না, তাও নয়। দেবা কিছুতেই স্বীকার করবে না যে সে বিভীষণের কাজ করেছে। বিভীষণকে অপমান করেছিলেন রাবণ ঠিকই, পদাঘাত করেছিলেন—কিন্তু

তবু বিভীষণ ইচ্ছা করলে অন্যত্র গিয়ে স্বাধীন ভাবে জীবিকা নির্বাহ করতে পারতেন।

দেবার সে উপায় ছিল না। ওর রুজি-রোজগারের পথও বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। ওখানে যদি স্থানই না হয় তো খাবে কি?

নতুন ক'রে কোথাও গিয়ে জমি ভিক্ষা ক'রে চাষবাস শুরু করা, কিংবা কারও জমিতে মজুরী খেটে খাওয়া সম্ভব নয় ওর পক্ষে। ওসব কাজ করে নি কখনও, জানেও না। আর সে হ'ল ওর পক্ষে স্বধর্ম থেকে সরে আসা।

সে তো আত্মহত্যার সামিল।

রাজার সেবা করার বদলে মাসিক বৃত্তি পাওয়া, গীত রচনা ক'রে সম্মানমূল্য পাওয়া—এই তাদের কুলগত পেশা, তাদের স্বধর্ম। এ কাজ সে ছাড়বে কি করে? এ পেশা ছাড়বার তো কোন অধিকারই তার নেই।...

ওদের বিশ্বাস— এ বৃত্তি ওদের বিধি-নির্দিষ্ট। এই কাজ ক'রে খাওয়াই ওদের ধর্ম।

আশ্চর্য! কী সামান্য কারণেই না এত বড় ঘটনার সৃষ্টি হ'ল সেদিন। ঘটনা না বলে অঘটন বলাই উচিত।

আর তার ফলেই আজ বনেড়ার ভাগ্যাকাশে এই দুর্যোগ ঘনিয়ে এসেছে, জায়গীরদারের মহাসর্বনাশ উপস্থিত হযেছে।

দেবার পূর্বপুরুষ হলেন 'বারহট' চারণ সোদা বারু। যাঁর দয়ায় মেবারের মহারাণা বংশ আজও মেবারে রাজত্ব করতে পারছেন।

'বারহট' মানে বাইরে যে থাকে, দ্বাররক্ষক।

যে চারণ কবিরা প্রধান দুর্গদ্বারের ওপরের বুরুজে বাস করেন, কোন যাত্রার সময় প্রভুর আগে আগে যান—তাঁরাই 'বারহট' বা 'পোতপাল'।

আর সওদাগরী করে অন্নদাতার বংশকে অপমানের হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন বলে মহারাণার দেওয়া উপাধি—'সোদা'।

দিল্লীর খিল্‌জী সুলতান আলাউদ্দীন যখন চিতোর ধ্বংস করেন—চিতোর ছিল তখনকার দিনে মেবারের রাজধানী—তখন মহারাণা লক্ষ্মণ সিংয়ের পৌত্র হামীর এক বছরের শিশু। তাঁর এক কাকা দূর গ্রামাঞ্চলে পালিয়ে গিয়ে প্রাণরক্ষা করেছিলেন বটে—যুদ্ধবিগ্রহ করে রাজ্য ফিরিয়ে নেবার ক্ষমতা তাঁর ছিল না।

সে চেষ্টাও তিনি করেন নি। বুদ্ধিমানের মতো দাদার ছেলে হামীরকেই মাত্র বারো বছর বয়সে রাজতিলক পরিয়ে দিয়ে মেবারের মহারাণা বলে ঘোষণা করেছিলেন।

কিন্তু ঐ পর্যন্তই মহারাণা তিনি।

হামীরের না ছিল লোকবল, না ছিল অর্থবল। আলাউদ্দীনের অনুগত মালদেও তখন চিতোরে রাজা হয়ে বসে শাসন করছেন। তাঁর পিছনে দিল্লীর সুলতানের শক্তি। মেবারের সামন্ত বা সর্দাররা সকলেই তাঁকে ভয় করেন। এই সহায়সম্বলহীন অনাথ ছেলেটার জন্যে বিপদ টেনে আনতে তাঁরা কেউ রাজী হলেন না।

অনেক চেষ্টা করলেন হামীর। কিছু কিছু লড়াইও করলেন - কিন্তু অতবড় শক্তির সঙ্গে লড়াই করা দু-পাঁচশ লোক নিয়ে সম্ভব নয়। ভিখিরীর মতো সর্দারদের দোরে দোরে ঘুরলেন হামীর। তবু কেউই এগিয়ে এসে তাঁর পাশে দাঁড়াল না। শেষে হতাশ হয়ে আত্মহত্যা করতে যাবেন, চারণ বারু এসে বাধা দিলেন। বললেন, 'আপনি ছেলে-ছোকরাদের নিয়ে নিজেই সেনাবাহিনী গঠন করুন। হাতিয়ার তো যে যার নিজেদেরই আছে,—ঘোড়া? ঘোড়া আমি দেব। আজ থেকে ঠিক একমাসের মধ্যে পাঁচশ ঘোড়া নিয়ে আসব আমি, যেমন ক'রেই হোক।

কি ক'রে যে সেই পাঁচশ ঘোড়া যোগাড় করেছিলেন বারু, তা আজও কেউ জানে না। তাঁর নিজের টাকা ছিল না, মালিকের টাকা না থাকলে তার বৃত্তিভোগীর টাকা আসবে কোথা থেকে?—হয় টাকা ধার করতে হয়েছে, নয় ঘোড়াই ধারে কিনতে হয়েছে। কিন্তু অত টাকা একজন সামান্য চালচুলাহীন চারণ কবিকে কি বিশ্বাসে দিল কে জানে—তবে সেই অসাধ্য সাধন করেছিলেন বারু। ঠিক দিনে পুরো পাঁচশটি ঘোড়াই পৌঁছে দিয়েছিলেন।

আর তাতেই যেন হামীরের ভাগ্যের চাকা ঘুরে গিয়েছিল। সেই থেকেই তাঁর সৌভাগ্য শুরু হয়ে গেল। মালদেওর কাছ থেকে শুধু চিতোর গড়ই নয়—সমস্ত রাজ্যই একে একে ফিরে পেয়েছিলেন হামীর। তারপর থেকে প্রতাপ সিংয়ের কাল পর্যন্ত মেবারের মহারাণারা স্বাধীন ভাবে রাজত্ব ক'রে গেছেন।

সেই বারুরই বংশধর দেবা।

অসাধ্য সাধন করার ক্ষমতা তারও কিছু আছে বা থাকতে পারে—সেইটেই ভুলে গিয়েছিলেন—মহারাণাদের জ্ঞাতিবংশ শিশোদিয়া কুলের সর্দার সিং।

ভুলে গিয়েছিলেন যে ওঁরই পূর্বপুরুষ রাজা ভীমসিংহ শিশোদিয়া দেবার পূর্বপুরুষকে অনুনয় বিনয় ক'রে ডেকে এনে একটা গ্রাম দিয়ে বসতি করিয়েছিলেন। বিখ্যাত চারণ বংশের কবি একজন তাঁদের পাশে থাকবে—এ গৌরব সেদিন একটা বড় যুদ্ধজয়ের গৌরবের থেকেও বেশী মনে হয়েছিল ভীমসিংহের কাছে।

॥ ৩ ॥

ভীমসিংহের বংশধরের প্রতি কৃতজ্ঞতা অবশ্যই থাকা উচিত ছিল দেবার।

এই সেদিন পর্যন্ত সেই বংশধরের অন্নই খেয়েছেন।

বার্ষিক বৃত্তি তো ভোগ করেছেনই—সেই সঙ্গে সব রকম দানের পূর্বভাগ।

পূজা-পার্বণে আগে চারণদের সিধা দিতে হয় এ-ই রীতি।

সে কৃতজ্ঞতার অভাবও ছিল না দেবার। আনুগত্যও ছিল যথেষ্ট। তার বা তার পরিবারের সকলেরই। যতটা থাকা উচিত ঠিক ততটাই ছিল।

আজ যদি তার অভাব দেখা দিয়ে থাকে তার জন্যে দাযী ওর অন্নদাতারাই, দেবা নয়।

দেওয়া-নেওয়ার ব্যাপারে দেওয়ার সঙ্গে নেওয়ার যোগ্যতাটাও থাকার প্রয়োজন। দাতার মতো গ্রহীতারও কিছু করণীয় আছে।

কতখানি প্রীতি, ভালবাসা, কৃতজ্ঞতা ছিল তা তাঁরা বোঝেন নি, বোঝবার চেষ্টাও করেন নি। সহজে পেয়েছিলেন বলেই সস্তার জিনিস মনে করেছিলেন।

কিছুই না, নিতান্তই ছেলেমানুষী থেকে ব্যাপারটার সূত্রপাত।

সর্দার সিংয়ের ছোট ছেলে অজয় সিংহ শিকারে গিয়েছিলেন। আহেরিয়ার দিন সামনে। যেদিন স্বয়ং সর্দার সিং যাবেন বন্য বরাহ শিকার করতে, সেদিন ছেলে-ছোকরাদের বিশেষ সুবিধে হবে না। সেই বুঝেই কদিন আগে বেরিয়ে পড়েছিলেন অজয় সিং।

সঙ্গে যাবার কথা নয়, নিতান্ত হাতে কোন কাজ ছিল না বলেই, আর অজয় সিং যাবার সময় হাঁক দিয়ে একটা নিমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন বলে—দেবাও গিয়েছিল সঙ্গে।

অজয় সিংয়ের তেজী ঘোড়া, দেবাকেও জায়গীরদার কদিন আগে একটা ভাল ঘোড়া উপহার দিয়েছিলেন—ফলে দুই ঘোড়াই অনেকটা এগিয়ে গিয়েছিল। সাঙ্গ-পাঙ্গরা তার সঙ্গে তাল রাখতে পারে নি।

আর যে দাঁতালো বুনো শুয়োরটার পিছু পিছু ওরা যাচ্ছিল সেটাও ছিল নিরতিশয় বদ। এমন একটা জায়গায় নিয়ে গিয়ে ফেলে ঘুরে দাঁড়িয়ে ওদের তেড়ে আক্রমণ করেছিল যে, এক লহমার মধ্যে শুয়োরটাকে না মারতে পারলে শুয়োরটাই কুমার অজয় সিংকে মেরে ফেলত।

ষোল বছরের ছেলে অজয় সিং তা বুঝতে পারেন নি। পঞ্চান্ন বছরের দেবা ঠিক বুঝেছিল। অভিজ্ঞ চোখ তার। এমন অনেক দেখেছে।

তখন বুঝিয়ে বলার কি অনুমতি চাইবার সময় ছিল না। সময় নষ্ট করারও না—দেবা চোখের পলক ফেলার আগেই নিজের বর্শা ছুঁড়েছিল শুয়োরটার দিকে, চোখেব মধ্যে দিয়ে সে বর্শা বিঁধে এফোঁড়-ওফোঁড় হয়ে গিয়েছিল—লাফ দেবার সময় শূন্যে ওঠা অবস্থাতেই।

কবিই হোক, আর গাইয়েই হোক—রাজপুত রাজপুতই—লক্ষ্য আর হাতের জোর অব্যর্থ। শিকার হাতছাড়া হবার জো নেই।

অন্য যে কোন লোক হ'লেই খুশী হ'ত, কৃতজ্ঞ হ'ত—প্রাণদাতা বলে স্বীকার করত দেবাকে। কিন্তু অজয় সিং ছেলেমানুষ। বিপদটা তিনি বুঝতেই পারলেন না। তাঁর মনে হ'ল তাঁর প্রাপ্য গৌরব দেবা চালাকি ক'রে চুরি করল। তাঁকে বঞ্চিত করল। এ এক বকমের বিশ্বাসঘাতকতা।

তিনি ভাল ভেবে ডেকে আনলেন সঙ্গে—আর দেবা কিনা এখানে আসল যা উদ্দেশ্য—সেই শিকারটাই মাটি ক'বে দিল! নিজের হাতে ঐ ভয়ঙ্কর জন্তুটাকে শিকার করার তৃপ্তি ও গৌরব ভোগ তাঁকে করতে দিল না!

এতবড় দাঁতালো বরা মেরে নিয়ে গিয়ে দেখাতে পারলে বাবার কাছে বাহবা তো বটেই—চাইকি কিছু মোটারকম পারিতোষিকও মিলত। এ এখন প্রমাণ হয়ে গেল তাঁর শিকারে যাওয়ার কোন যোগ্যতা নেই—তাঁদের বৃত্তিভোগী সামান্য একজন চারণের যেটুকু শক্তি-সামর্থ আছে—রাজকুমারের সেটুকুও নেই।

তিনি তখনই যথেষ্ট তিরস্কার করলেন দেবাকে, বেশ একটু কটু ভাষাতেই—কিন্তু তাতেও রাগ পড়ল না। প্রাসাদে ফিরে এসে বাবার কাছে আটখানা করে লাগালেন।

শুধু তাই নয়—মাকে জানালেন এব বিহিত না হ'লে তিনি জলগ্রহণ করবেন না।

অজয় সিংয়ের মা সর্দার সিংয়ের চতুর্থ পক্ষের বৌ। বুড়ো বয়সে বিয়ে করা—সর্দার সিং তাঁকে যমের মতো ভব করতেন। সেই রাণী যখন এসে ছেলের হয়ে এই অন্যায়ের, এই অপমানেব প্রতিকার চাইলেন তখন সর্দার সিং একেবারে দিশাহারা হয়ে পড়লেন।

তখনই দেবাকে ডেকে পাঠিয়ে যা নয় তাই বলে তিরস্কার করলেন।

অজয় সিংয়ের অন্যায় তিরস্কার তার অভদ্র ব্যবহার দেবা সহ্য করেছিল সে ছেলেমানুষ বলে। বৃদ্ধ সর্দার সিংয়ের এ অবিচার সহ্য ক'ল না। সেও সমানে সমানে উত্তর দিল। শেষে এক সময় বলে ফেলল, 'ঐ শুয়োরটার যেটুকু কাণ্ডজ্ঞান ছিল—আপনার ছেলের তাও নেই। আমি তখন সেটাকে না মারলে আজ ছেলের

জলে বসে কাঁদতে হ'ত। মড়াটাও খুঁজে পেতেন কিনা সন্দেহ।'

'মরত মরতই।' সর্দার সিংও তখন রীতিমতো চটে উঠেছেন, 'তোমার মতো একজন নিকর্মা নফরের দয়ায় প্রাণে বাঁচার থেকে শিশোদিয়া রাজপুত্রের মরাও ভাল।'

তারপর বললেন, 'আমরা সূর্যবংশের লোক, যুদ্ধ আর শিকারের গৌরবই আমাদের প্রাণ, আমাদের কীর্তি আমাদের জীবনের থেকে বড়। এ তুমি বুঝবে না। বাউণ্ডুলে ভিখমাঙ্গা তুমি! আমাদের কীর্তি গান ক'রে জীবন ধারণ করবে—এই তোমার কাজ। আমাদের কীর্তিতে ভাগ বসাতে এসো না।'

দেবাও সমান তেজের সঙ্গে জবাব দিল, 'নফর' আর 'ভিখমাঙ্গা' শব্দটা তার বুকে তীক্ষ্ণ তীরের মতোই বিঁধেছিল, 'তোমাদের অপকীর্তি ঢেকে মিথ্যে ক'রে বানিয়ে সুকীর্তি গান ক'রে বেড়ানোই আমাদের কাজ। তা বেশ তো না হয় এবারও তাই করব। স্বীকার করব। পাঁচজনকে বলব এ বরা অজয় সিংই মেরেছে—আমি ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে বসেছিলাম। কুমার না থাকলে আমার জীবন রক্ষা হ'ত না!'

যতই নেশাখোর হোন্—এই ব্যঙ্গ বা অপমান বুঝতে পারবেন না, এত ভীমরতি তখনও সর্দার সিংয়ের হয় নি। তিনি জলে উঠলেন একেবারে। যা মুখে এল তাই বলে গাল দিতে লাগলেন। দেবাও কম গেল না। বলল, 'তোমার বংশের আসল কীর্তিই যদি গাইতে হ'ত—তাহলে তো ভদ্রসমাজে মুখ দেখাতে পারতে না। এক গামলা জল যোগাড় করে মাথা চুবিয়ে মরতে হ'ত। তোমার মতো লোককে পিশোলার* জলেও ডুবে মরতে দিতেন না মহামায়া। তোমার মতো লোক ডুবলে পিশোলার জল বিষিয়ে যেত।'

এই বলে সে সর্দার সিংয়ের অনেক রকম কুকাজের কথা মনে করিয়ে দিল, বলল, 'কী সর্দার সাহেব—গাইব এইসব গান?'

এবার সর্দার সিং যেন রাগে পাগল হয়ে গেলেন। অকথ্য গালিগালাজ শুরু করলেন। যুক্তিসহ কিছু বলবার না পেলে ছোট ছেলেরা যেমন আবোলতাবোল গালাগাল দেয়—তেমনি ভাবেই বলতে লাগলেন, 'তুই বোকা, তুই রাতকানা, তোর অমুক দোষ আছে। তোর ও গান তো গান নয়—গাধার চিৎকার!' এই ধরনের সব কথা।

এক কথা দু'কথায় আরও উত্তেজিত হয়ে উঠল উভয় পক্ষই। কারুরই আর কথায়

---

* বর্তমানে যাকে উদয়সাগর বলা হয়। মহারাণা উদয়সিংহ এর তীরে নূতন প্রাসাদ তৈরী ক'রে উদয়পুরে রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেন।

লাগাম রইল না। কী কথা কার বলা উচিত তাও ভুলে গেল। রাজা যত বড় শক্তিশালীই হোন, রাজা বলেই কতকগুলো কথা তাঁর মুখে শোভা পায় না। তেমনি চারণদেরও যতই স্বাধীনতা থাক— তাদেরও কতকগুলো রীতি মেনে চলা উচিত। অন্নদাতা প্রভুকে কতটা কি বলা যায়—তারও একটা হিসেব থাকা দরকার।

তবে কি না পাগলের শোভনতা বা হিসাব বোধ থাকে না। এঁদেরও রইল না। এঁরাও তখন রাগে পাগল হয়ে গিয়েছিলেন।

শেষ পর্যন্ত সর্দার সিং একবার রাগের মাথায় বলে বসলেন, 'যা দূর হয়ে যা এখান থেকে, তোর মুখদর্শন করতে চাই না আমি।'

দেবাও সদম্ভে জবাব দিল, 'এখান থেকে নয়, তোমার জায়গীর থেকেই দূর হয়ে যাচ্ছি। তোমার অধিকারের মধ্যে আর অন্নজল গ্রহণ করব না— যদি করি তাহলে যেন আমার পিতৃপুরুষ নরকস্থ হন।…আর কখনও এদেশে আসব না। বনেড়ার মাটিতে পা দেব না। যদি কোনদিন কোন বিজয়ী রাজা বা সর্দারের সঙ্গে আসতে পারি তবেই আসব। তোমার ঐ পতাকা যেদিন মাটিতে লুটোবে, তোমার এই গর্ব অহংকার চূর্ণ হয়ে যাবে, পরাজয় আর অপমানের কালিতে কালো হয়ে উঠবে উদ্ধত লাল ঐ মুখ—সেদিন আবার এই রাজ্যের সীমানার মধ্যে কটি জল খাব—তার আগে না।'

সত্যি সত্যিই সেই মহূর্তে ঘোড়া ছুটিয়ে বেরিয়ে চলে গেল দেবা। এতক্ষণ ঝগড়া বকাবকির ফলে পিপাসায় আকণ্ঠ শুষ্ক হয়ে উঠেছে তার, এখন এই জায়গীর-সীমার বাইরে না গেলে মুখে একটু জল দিতে পারবে না—সুতরাং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এ রাজ্যের বাইরে যাওয়া দরকার। নইলে প্রাণসংশয় ঘটবে।

স্ত্রী, পুত্র কন্যা? তারা গ্রামের বাড়িতে থাকে, তাদের কেউ কোন অনিষ্ট করবে না, সে বিষয়ে দেবা নিশ্চিন্ত।

॥ ৪ ॥

দেবা মুখে যতই বড়াই করুক—ওরও আশ্রয় নেবার জায়গা বেশী ছিল না। ওই বংশের লোক ছাড়া কারও কাছে হাত পাতার উপায় নেই ওর, আর কারও কাছে দান নেওয়া সম্ভব নয়।

সোদাবারুর বংশধর দেবা। সোদাবারু এ বংশের জন্যে এক কঠিন নিয়ম করে দিয়ে গেছেন। শিশোদিয়া বংশ ছাড়া অপর কারও দান তারা নেবে না, অন্য কোন লোকের অন্ন গ্রহণ করবে না।

মহারাণা হাম্মীরের ছেলে বা মহারাণা ক্ষেত্র সিং যখন বিয়ে করতে বুন্দী যান —সোদাবারুও রীতিমাফিক সঙ্গে গিয়েছিলেন। বারু তখন খুবই বুড়ো হয়ে গিয়েছেন—তবু এ সম্মানটুকু ছাড়তে রাজী হলেন না, এ তাঁর কর্তব্যের মধ্যেও একটা। বারহট চারণরা যে-কোন যাত্রায় রাজার সঙ্গে যাবে—এ-ই নিয়ম। সে নিয়মের অন্যথা করবেন কেন বারু!

বারুর খ্যাতি রাজস্থানেব সকলেই শুনেছে। তাঁকে দেখবার জন্যে সবাই উৎসুক। ক্ষেত্রসিংহের শ্বশুর লালসিংহ হাড়ার ইচ্ছা হ'ল এমন একটি লোক যখন তার বাড়ি আসছেন, উপযুক্ত প্রণামী দিয়ে তাকে সম্মান দেখাবেন। এতে যে অন্য কোন বিভ্রাট ঘটতে পাবে তা ভাবেন নি। * প্রচুর টাকা, জমি মানে কয়েকটি গ্রামের দানপত্র ইত্যাদি সব ঠিক ক'রে রেখেছিলেন। কিন্তু বারু নিতে রাজী হলেন না। তিনি বললেন, 'যে হাত পেতে মেবারের মহারাণার কাছ থেকে বৃত্তি নিয়েছি এতকাল, সে হাতে অপরের দান নিলে মহারাণাব অসম্মান হয়। তাছাড়া আমাদের অপ্রতিগ্রহ ব্রত আছে, আমরা অযাচক, অন্নদাতার বংশ ছাড়া অন্য কারও দান নিলে ধর্মে পতিত হব। আমাকে ক্ষমা করবেন।'

প্রথমটা লালসিং হাড়া বুঝিয়ে বলতে গেলেন। বারু রাজী হলেন না। ক্রমশঃ লালসিংএর রোখ চেপে গেল। তিনিও এটাকে অপমান বলে মনে করলেন। শেষে তিনি এক ছুতোয় নিজের প্রাসাদের মধ্যে নিয়ে গিয়ে বহু লোক দিয়ে ঘিরে ফেললেন। জোর ক'রে ওঁকে দান নিতে বাধ্য করবেন—এই মতলব। হাতে দলিলটা দিয়ে দানের মন্ত্র পড়ে জল দিলেই তো দান নেওয়া হয়ে গেল। বারু ব্যাপারটা বুঝলেন এবং এরা কেউ বোঝার আগেই চোখের নিমেষে নিজের তলোয়ার নিজের গলায় বসিয়ে দিলেন, লালসিংয়ের দান নেবার হাত থেকে অব্যাহতি পেতে।

সেই বংশের লোক দেবা, পূর্বপুরুষের অপমান করতে পারবে না সে। তার চেয়ে প্রাণ দেওয়া ঢের সোজা।

অনেক ভেবে দেবা শাহপুরার রাজা এই উম্মেদ সিং শিশোদিয়ার কাছে গিয়ে আশ্রয় প্রার্থনা করল। উম্মেদ সিং সর্দার সিংয়ের জ্ঞাতিকাকা, শিশোদিয়া বংশের লোক। তাঁর অন্ন খেলে তাঁর দান নিলে দোষ নেই। তখনকার দিনে চারণদের ঘর-বাড়ি জমি-বৃত্তি দিয়ে বসবাস করানোকে রাজস্থানের রাজারা পুণ্যকর্ম মনে করতেন। বিশেষ যদি অপর কোন রাজা বা সর্দারের প্রধান চারণ কেউ তাঁকে ছেড়ে এসে আশ্রয় প্রার্থনা করে তো যাঁর কাছে এসেছে তাঁর পক্ষে সেটা খুব

গৌরবের ব্যাপার। উম্মেদ সিংও সসম্মানে সাদরে দেবাকে আশ্রয় দিলেন। জমি-জমা মাসোহারা সব নির্দিষ্ট করলেন, এমন কথাও বললেন যে সে যদি নিজের পরিবার আনিয়ে নিতে চায় তিনি সে ব্যবস্থাও করবেন।

আশ্রয়ের দিক থেকে দেবার ভালই হ'ল বরং। কিন্তু তাতে তো তার মন ভরবে না। তার প্রধান চিন্তা প্রতিশোধ। দেহ যেখানেই থাক, মন পড়ে আছে ঐ বনেড়ায়। বিজয়ীর সঙ্গে—রাবণের নিজের বিজয়ীর বেশে যেতে নেই, ব্যক্তিগত-ভাবে প্রতিশোধ নেওয়া তার নিষেধ—না গেলে ওখানে যাওয়া যাবে না, পিতৃপুরুষের নামে দিব্যি গেলেছে সে।

সুতরাং উম্মেদ সিংকে তাতানো ছাড়া কোন উপায় নেই।

প্রথম প্রথম উম্মেদ সিং তার কথায় কান দেন নি। অকারণ জ্ঞাতিবিরোধ, আত্মীয়ের সঙ্গে লড়াই করতে চান নি। বেশ কিছুটা সময় লেগেছে দেবার তাঁকে উত্তেজিত করতে, তাতাতে। কয়েক বছর। তবে দেবা মনে মনে যত অধীরই হয়ে উঠুক, কার্যসিদ্ধি করতে গেলে ধৈর্য ধরতে হয় তা সে জানে। মাটির কলসী রেখে রেখে কুয়াতলায় পাথরের গর্ত হয়—বোপদেবের সে গল্প দেবা শুনেছে, এমন ঘটনা চোখেও দেখেছে। সে জানে লেগে থাকলে একদিন তার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবেই।

হ'লও। এর মধ্যে সর্দার সিংও একটা কি কুকার্য ক'রে বসলেন। শাহপুরার সীমান্তে ঢুকে ওঁর লোক হামলা করল। কী একটা ঔদ্ধত্যপূর্ণ চিঠি এল বনেড়া থেকে। ছোট ছোট ঘটনা, অন্য সময় হ'লে হয়তো উড়িয়েই দিতেন উম্মেদ সিং, কিন্তু কাছেই তাতাবার লোক রয়েছে, সে কোনটাই জুড়িয়ে যেতে দিল না। তাছাড়া আগেও —দেবার বনেড়ায় থাকার সময় যে সব ঘটনা ঘটেছে—জ্ঞাতিকাকার সম্বন্ধে সর্দার সিংয়ের যে মনোভাব, যে সব তাচ্ছিল্য আর বিদ্রূপপূর্ণ উক্তি শুনে এসেছে দেবা, সময় ও সুযোগ বুঝে, রাজার মর্জি আর মেজাজ বুঝে, না বলবার ছলে যথাসময়ে সবই বলেছে দেবা।

সোজাসুজি কারও নিন্দা করলে অনেক সৎ লোক বিরক্ত হন। বিশেষ যেখানে নিন্দা করায় নিন্দুকের স্বার্থ আছে—সেক্ষেত্রে নিন্দাকে সন্দেহের চোখে দেখেন। এক্ষেত্রেও দেবা সোজাসুজি নিন্দা করলে উম্মেদ সিংয়ের সন্দেহ হ'ত যে স্বার্থসিদ্ধির জন্যে মিথ্যা ক'রে বলছে দেবা। দেবা সে পথ দিয়েই গেল না। এসব কথা বলার ইচ্ছে নেই, হঠাৎ মুখ দিয়ে কিছুটা বেরিয়ে গেল, তারপর এঁদের পীড়াপীড়িতে বাকীটা বলতে বাধ্য হ'ল—এই ভাবেই বলেছে সব কিছু।

তারই ফলে এতকাল পরে উম্মেদ সিং নড়েছেন। এই বিপুল বাহিনী নিয়ে—

মানে বনেড়ার পক্ষে বিপুল বাহিনী—বনেড়ার পথে যাত্রা করেছেন। সঙ্গে আছে দেবা। দেবা এখন উম্মেদ সিংয়েরও খুব প্রিয়—তাকে একবারও কাছছাড়া করতে চান না।

এখানে এই বনেড়া থেকে ঠিক দু'ক্রোশ দূরে ছাউনি ফেলা, এও দেবার পরামর্শ। সংবাদ যাবেই। সেই সংবাদ শোনবার পরে ভয়েই সর্দার সিং খানিকটা পরাজিত হয়ে থাকবেন—যুদ্ধজয়ের অর্ধেক কাজ সারা হয়ে যাবে। দেবা তাই চায়। তার অতি প্রিয় বনেড়া, সেখানের লোকগুলো ওর আত্মীয়ের মতো হয়ে গেছে—অনেকেই আবাল্য সহচর, সঙ্গী—অকারণে তাদের সকলের মৃত্যু ওর পছন্দ নয়।

অনেকক্ষণ সেই বাবলা গাছের তলায় দাঁড়িয়ে থেকে থেকে দেবা তাঁবুতে ফিরে এল। তখন খানিকটা গোছগাছ হয়ে গেছে। গরম দুধ আর কালাকন্দ প্রস্তুত। দুপুরের রুটিও তৈরী হয়ে এল। জলযোগ শেষ করে রাজা উম্মেদ সিং মন্ত্রণায় বসলেন। স্থির হ'ল, ওঁর নাতি রণসিংহ সেনাপতি হয়ে প্রথমে যুদ্ধযাত্রা করবেন, দেবা সঙ্গে যাবে পথ দেখিয়ে। দুর্গের কোন্ দিকে আক্রমণ করলে সহজেই জয়লাভ ঘটবে, অপরপক্ষ বিব্রত হয়ে পড়বে—কোথা দিয়ে পাহাড়ে ওঠা সুবিধা—এটা দেবা যতটা জানে ততটা কেউ নয়। ও প্রাসাদের সব দুর্বলতাও সে যেমন জানে—কোথায় তার জোর সেটাও অজানা নেই। এসব জেনে আক্রমণ করতে গেলে বিস্তর বেগ পেতে হবে।

রণসিংহকে পাঠাবার কারণ—যুদ্ধ শেখানো। ছেলেমানুষদের হাতেকলমে শেখাবার পক্ষে এইরকম যুদ্ধে পাঠানোই নিরাপদ। শত্রু যেখানে দুর্বল, যেখানে জয় সুনিশ্চিত, এমনি জায়গায় পাঠিয়ে লড়াই করা অভ্যাস করানোই ভাল, বিপদের আশঙ্কা বিশেষ থাকে না।

দেবা সব শুনল। মতামতও দিল কিছুটা। বেশীর ভাগই উম্মেদ সিংয়ের মত মেনে নিল। উম্মেদ সিং যুদ্ধ ক'রে ক'রে বৃদ্ধ হয়ে পড়েছেন, চল্লিশটি অস্ত্রাঘাতের চিহ্ন তাঁর গায়ে—এ বিষয়ে তিনি যা বলবেন তার ওপর বলার কিছু থাকে না। আর একটিও বাজে কথা তিনি বলেন নি—তা দেবাও মানতে বাধ্য।

তবু দেবা যেন কি ভাবছে। এই আলোচনায় অংশগ্রহণ করলেও সে যে অন্যমনস্ক হয়ে আছে তা বোঝা যায়। সে ভাবটা উম্মেদ সিংয়ের চোখ এড়ায় নি। তিনি একবার বললেনও সে কথা, 'তুমি কি ভাবছ দেবা' বলো তো, আমরা বকে যাচ্ছি, কিন্তু তুমি তো কান দিচ্ছ না!'

দেবা অপ্রস্তুত হয়ে বলল, 'না না। এই—যুদ্ধের কথাই ভাবছি। এতদিনের স্বপ্ন আমার—বনেড়ার দম্ভ চূর্ণ হবে। ভগবান বুঝি এতকাল পরে মুখ তুলে চাইলেন। এইসব ভেবেই মনের মধ্যে একটা—'

বলতে বলতে থেমে গেল সে। মনের মধ্যে একটা উত্তেজনা, আশা-আকাঙ্ক্ষার দ্বন্দ্ব কিংবা আর কিছু তাকে এতটা অন্যমনস্ক বা চিন্তাকুল ক'রে তুলেছে সেটা খুলে বলল না কিছু। উম্মেদ সিংও আর ও প্রসঙ্গ তুললেন না।

॥ ৫ ॥

দেবা অন্যমনস্ক ছিল অন্য কারণে।

শুধুই উত্তেজনা বা আশা-আকাঙ্ক্ষার দ্বন্দ্ব নয়।

কাল কি হবে সেটা তখন তার কাছে বড় কথা নয়। সে ভাবছিল আজ রাত্রের কথা।

আজকের জন্যেই একটা মতলব আঁটছিল সে। মনে মনে তারই ভালমন্দ নিয়ে তোলপাড় করছিল। কতটা পারবে, কতটা সম্ভব—কোন্ বিপদ কোন্ দিক থেকে আসতে পারে—এই কথাই চিন্তা করছিল।

উম্মেদ সিংয়ের মন্ত্রণা-সভা ভাঙ্গতে ভাঙ্গতেই তার মনের সঙ্গে মন্ত্রণা শেষ হয়ে গেল। মন স্থির করে ফেলছে সে। খুবই দুঃসাহসিক কাজ। তা হোক, কী আর করা যাবে! এ না হ'লে তার শান্তি হবে না। যতই হোক—সর্দার সিং তার প্রতিপালক, অন্নদাতা। ওঁর বংশের কাছে দেবার বংশের অন্নঋণ বহুকালের।

রাত এক প্রহরের মধ্যেই—মানে ন'টা বাজার আগেই সকলে শুয়ে পড়েছে। শুধু প্রহরীরা জেগে পাহারা দিচ্ছে ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে। পাশের ঘরে রাজাও ঘুমিয়েছেন। তাঁর অল্প অল্প নাক ডাকার শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। এই ঠিক অবসর।

দেবা খালি পায়ে চুপি চুপি বেরিয়ে পড়ল তার তাঁবুর কামরা থেকে। সাধারণ পোশাক, হাতে একটি ছোট্ট পুঁটুলি। সম্পূর্ণ নিরস্ত্র বেরিয়েছে সে। সে যে কাজে যাচ্ছে তাতে অস্ত্র নিয়ে যাওয়ার কোন দরকার নেই, বরং বিপদ আছে। ধরা যদি পড়েই—অস্ত্র থাকলেও একা অতগুলো লোকের সঙ্গে কিছু লড়াই করতে পারবে না, অথচ ওর মতলব যে সম্পূর্ণ অহিংসা সেটা প্রমাণ করা শক্ত হবে। তাছাড়া ওজনও তো কম নয় একটা তলোয়ারের—তা সে যত ছোটই হোক।

তাঁবুর পাহারাদার সান্ত্রীরা তাকে সকলেই চেনে। বেরুতে কোন অসুবিধা নেই। মুশকিল একটু হবে হয়ত ফেরার সময়, তা 'ছাড় শব্দ'টা জেনে নিয়েছে সন্ধ্যার সময়ই

—কুমার রণসিংহের কাছ থেকে। 'সুরয ভগবান'—মনে মনে একবার আউড়ে নিল সে।

স্কন্ধাবারের বাইরে গিয়ে ভগবান রামচন্দ্র আর একলিঙ্গ মহাদেবকে স্মরণ ক'রে জোর কদমে পা চালাল সে। দু'ক্রোশ পথ—এমন কিছু দূর নয়। একঘড়ি সময়ের ভেতরই পৌঁছবার কথা—কিন্তু সে আরও একটু আগে পৌঁছতে চায়। কাজ সেরে দু'প্রহর রাতের মধ্যে ফিরে আসা দরকার। কারণ তারপরই চাঁদ উঠলে আঁধেরা যাবে ফিকে হয়ে।

খুবই দ্রুত পথ হাঁটতে লাগল দেবা। রাস্তা ভুল হবার কোন সম্ভাবনা নেই। এ অঞ্চলে ছোটবেলা থেকে ঘুরে বেড়িয়েছে সে—পঞ্চান্ন বছর বয়স তার এখানেই কেটেছে—এখানকার প্রতিটি গাছপালা প্রতিটি টিলা পাহাড় তার পরিচিত—আশ-পাশে কোথায় কোন্ গ্রাম আছে, কোন্ গ্রামে একখানা বাড়ি, কোন বাড়িতে কে থাকে—সব তার নখদর্পণে।

জোর কদমে হেঁটে গিয়ে বনেডার প্রাসাদ-দুর্গে গিয়ে যখন পৌঁছল তখনও একঘড়ি অর্থাৎ কিনা একঘণ্টা হয় নি। একটু হাঁপিয়ে পড়েছে ঠিকই, ঘামে পিরান-টিরান ভিজে গেছে—তা হোক, ক্লান্ত হয় নি সে একটুও, যাকে বলে 'থকাঅট', তা বোধ হয় নি।

প্রাসাদের সদর ফটকের দিকে গেল না দেবা। চওড়া পাহাড়ে পথ এঁকে-বেঁকে ফটকের দিকে গেছে। কিন্তু তা থেকে বিস্তর পাকদণ্ডী বা পায়ে হাঁটা পথও বেরিয়ে গেছে এদিক ওদিক। যে জানে তার রাস্তা এই আঁধার রাতেও খুজে পেতে অসুবিধা হবে না।

তেমনি একটা রাস্তাই ধরল দেবা। বাঁদিকে বেঁকে গেল সে—কিন্তু ঠিক উত্তর দেউড়ির দিকেও গেল না। মাঝামাঝি খানিকটা গিয়ে সে পাকদণ্ডী পথও ছাড়ল—ছোট ছোট কাঁটাগাছ আর গুল্ম মাড়িয়ে পাথুরে জমির ওপর দিয়েই চলল পরিখা আর পাঁচিলের দিকে।

খানিকটা এইভাবে গিয়ে যখন একেবারে পরিখার ধারে পৌঁছল তখন অস্ফুট একটা শব্দ করে উঠল দেবা। আনন্দের শব্দ, জয়লাভের উল্লাস সেটা। কারণ ঠিক সামনেই পাঁচিলের গায়ে প্রকাণ্ড একটা কাটা নর্দমা, বেশ চওড়া। বর্ষায় যখন বৃষ্টির জল পাহাড় বেয়ে পাঁচিলের ধারে এসে জমে তখন তার চাপে পাঁচিল ভেঙ্গে যায় অনেক সময়। তেমন বৃষ্টি হয় অবশ্য কদাচিৎ, কিন্তু হলে আর রক্ষা নেই। সমস্ত

প্রাসাদ বা দুর্গ—পাহাড়ের ওপর, খালি জমি যা পড়ে আছে সবই উঁচু নীচু পাথুরে—জল যে দিক থেকেই আসুক, নেমে পাঁচিল-প্রান্তেই এসে জড়ো হয়।

সেই জল বার করে দেবার জন্যই চওড়া পাঁচিলের গায়ে এই বড় বড় নালাগুলো কেটে রাখা হয়েছে। পাছে এ পথে বুনো শুয়োর বা চোর-ছ্যাঁচোড় ঢোকে সেজন্যও অবশ্য ব্যবস্থার ত্রুটি নেই। একটা করে লোহার ঠেস দরজা দেওয়া আছে, তাতে তালা দেওয়া। বর্ষার সময় জল এলে কেউ এসে তালা খুলে কপাট সরিয়ে দেয়। তখন যা প্রবল বেগে জল বেরোয়—সে সময় এদিক থেকে কারও যাওয়া সম্ভব নয়।

এ সব রহস্যই দেবা জানে।

এই ধরনের কোন কোন কপাট বহুদিন রঙ না ধরানোর ফলে মরচে ধরে জরাজীর্ণ হয়ে আছে তাও তার অজানা নেই। গত তিন বছরে একদিনও তেমন বর্ষা নামে নি। এসব নালার মুখও খোলবার দরকার হয় নি কারও। মনেও নেই বোধহয় এই লোহার কপাটগুলোর কথা। কিন্তু দেবা জানে, তার মনে আছে, সে মনে ক'রে ক'রে সব চেয়ে যেটা জরাজীর্ণ - সেইটের কাছেই এসেছে।

তবে আরও একটা বাধা আছে। সামনে পরিখা, যাকে গড়খাই বলে। বেশ চওড়া পরিখা, জল অবশ্য নেই, এখানে—এই বৃষ্টিবিরল মরুভূমি দেশে এতখানি লম্বা গড়খাই ভর্তি করে রাখার মতো জল কোথায় পাবে? সে জায়গায় লম্বা লম্বা কাঁটাওয়ালা গাছের শুকনো ডাল দিয়ে পরিখা বোঝাই ক'রে রাখা হয়েছে। সেখানে নেমে আবার ওধারে মসৃণ পাথরের গা বেয়ে ওঠা মুশকিল।

দেবা অবশ্য সে চেষ্টাও করল না। সবই ভেবে রেখেছে সে। এইখানে একটা বহুদিনের অশ্বত্থ গাছ আছে। গাছটা মরে গিয়েছে সম্প্রতি, কিন্তু সেটা কাটা হয় নি।

অশত্থ গাছ সাক্ষাৎ নারায়ণ—তাকে কাটবে কে? ওরা আশা করছে যে গাছটার গোড়ায় পোকা ধরে আপনিই পড়ে যাবে। আশপাশের ভীল প্রজারা জ্বালানি করার জন্য কাঁটাগাছ ঝোপঝাড় যা পায় নিয়ে যায়, তারাও অশ্বত্থ বলেই এ গাছে হাত দেয় নি।

কাপড়চোপড় সামলে পুঁটলিটা কোমরে গুঁজে 'জয় বজরঙ্গজী ভগবান' বলে দেবা গাছে চড়ে গেল। বড় যে ডালটা দক্ষিণমুখো হয়ে পাঁচিলের ওপারে গিয়ে লেগেছে সেই ডাল ধরে গিয়ে এক সময় ঝুপ করে নেমে পড়ল নালাটার সামনে। খুবই সঙ্কীর্ণ জায়গা, একটু এদিক ওদিক হলেই গড়িয়ে নিচে কাঁটার ওপর পড়বে—সেখান থেকে ওঠাও অসম্ভব। যত উঠতে যাবে ততই ঐ পেরেকের মতো লম্বা কাঁটাগুলো চেপে

বিঁধবে গায়ে—এ সবই জানে সে ভাল রকমই। দেবা এ পথে এ ভাবে এর আগেও এসেছে, খেলাচ্ছলেই এসেছে—কেমন করে আসা যায় পরখ করতে—সে খুব সন্তর্পণেই সেই সামান্য জায়গাটুকুতে নেমে দাঁড়াল।

তারপর দরজা।

এ দরজারও দুর্বলতা কোথায় তা তার জানা আছে। হাঁসকল লাগানো আছে পাথর কেটে—গর্ত করে চুন বালি দিয়ে আটকে দেওয়া হয়েছে। জলে আর রোদে মরচে ধরে সেটা বহুকালই আল্‌গা হয়ে এসেছে, তা কেউ লক্ষ্যও করে নি। অত ফুরসত হয় নি কারও। সেইভাবে হাঁসকলের দিকটা ধরে একটু ছাড় দিতেই দেওয়াল থেকে ডুংরীগুলো খুলে এল। তখন কপাটটা ফাঁক করে গলে যেতে আর কতক্ষণ? থাক না ওদিকে তালা দেওয়া যেমন আছে। অবশ্য তাও খোলা যেত কারণ সেদিকেও একটা কড়া লাগানো আছে পাথরেই। তারও অবস্থা অমনিই হবে নিশ্চয় —কিন্তু তাতে দেবার দরকার নেই।

চওড়া নালা, তবু একটু সঙ্কুচিত হয়ে ঢুকতে হয়, কতকটা হামাগুড়ি দিয়ে—তবে জলের সময় নয় বলে কাদা পাঁক থাকার কোন সম্ভাবনা নেই, দু-একটা আগাছা যা হয়েছিল, তাও করে শুকিয়ে গেছে,—পথ বেশ পরিষ্কারই।

ভেতরে পৌঁছে দেবা আর এক অদ্ভুত কাজ করল। চুড়িদার পাজামা আর পিরান ছেড়ে ফেলে সেগুলো সাবধানে সেই কপাটটার আড়ালে লুকিয়ে রাখল, তারপর পুঁটলিটা খুলে ফেলল। তাতে ছিল খানিকটা ছাই আর একটা কাজললতা। খালি গায়ে বেশ করে তেলমাখার মতো ছাইটা মেখে ফেলল। ছাই মাখা শেষ হলে কাজল নিয়ে কপালে তিনটে রেখা টানল, দু গালে দুটো—বুকেও কয়েকটা—সাদাতে কালোতে বাঘের মতো ডোরাকাটা অবস্থা হ'ল সর্বাঙ্গের।

অন্ধকারেই কাজ সারতে হ'ল তাকে। আন্দাজে আন্দাজে। অবশ্য আকাশ পরিষ্কার, নক্ষত্রের আলো পড়ে ঝাপসা ঝাপসা কতকটা দেখা যাচ্ছে—তাতে পথঘাট বুঝতে খুব অসুবিধা হয় না। এই অদ্ভুত মূর্তি ধারণ করার পর দেবা এবার নিঃশব্দে এগিয়ে চলল প্রাসাদের দিকে।

এখানেও তার আগেকার জ্ঞান ও স্মৃতি সাহায্য করল তাকে। কোন্ ঝরোখার উপর পা দিয়ে কোন্ ঘরে পৌঁছানো যায়—মোটামুটি একটা ধারণা ছিলই, সর্দার সিং কোথায় শুয়ে ঘুমোন তাও জানা ছিল। এক ভয়—যদি ইদানীং কিছু রদ-বদল হয়ে থাকে—তা দেখল তেমন কিছু হয় নি। ঘরের পশ্চিমদিকের যে খোলা বারান্দায় শুতেন সর্দার সিং, সেখানেই শুয়ে আছেন। তেমনি একটা পাতলা চাদর মুড়ি দিয়ে

ঘুমে অচেতন।

দেবা বারান্দায় পৌঁছে আগ ওদিকের ঘরের কপাটটা খুলে রেখে এল—ফেরার সময় সর্দারের সামনে বারান্দাটা টপকে আসা ঠিক হবে না। তাহলে ওর এত পরিশ্রম এত ফন্দী সব বেফায়দা হয়ে যাবে।

ওদিকের কপাট খুলে রেখে ফিরে এসেই এক ঝটিকায় সর্দার সিংয়ের গায়ের চাদরটা টেনে খুলে দিল, তারপর বেশ একটু রূঢ় হস্তেই ধাক্কা দিল ওকে।

সে ধাক্কায় আফিংয়ের ঘুমও ছুটে গেল সর্দার সিংয়ের, তিনি চমকে চাইতেই নজরে পড়ল ঐ বিকট মূর্তি সাদা দেহ। সর্বাঙ্গ কালো ডোরা কাটা, কপালে ভয়ঙ্কর এক তৃতীয় নয়ন (এও কাজল দিয়ে ক'রে নিয়েছিল দেবা)। প্রথমটা মনে হ'ল স্বপ্ন—কিন্তু পরে যখন বুঝলেন স্বপ্ন নয়—তখন এমনই ভয় পেয়ে গেলেন যে না রইল তাঁর নড়বার ক্ষমতা, না রইল চিৎকার ক'রে কাউকে ডাকবার। ফ্যালফ্যাল করে চেয়েই রইলেন শুধু, চিৎকার করার চেষ্টা করতে গিয়ে একটা খুব ক্ষীণ গোঁ গোঁ শব্দ বেরোতে লাগল গলা দিয়ে।

বেশী ফুরসৎও দিল না দেবা। এইটুকুই সুযোগ, ভয়ের বিহ্বলতা থাকতে থাকতে কাজ সারতে হবে। সে গলার আওয়াজটাকে বিকৃত করে চাপা অথচ গম্ভীর গলায় বলল, 'শোন্ পাপিষ্ঠ, আমি নন্দী, বাবার প্রমথ একজন। ভগবান একলিঙ্গজী আমাকে পাঠিয়েছেন তোকে সাবধান ক'রে দিতে। তুই সারাজীবন পাপ করেছিস, তোর জন্যে বাবার কোন মাথাব্যথা নেই, তোর মা গৌরীমায়ীর আশ্রিত। মায়ীজী তাকে খুব স্নেহ করেন। তিনি স্বপ্ন দেখে তোর বিপদ বুঝে এসে বাবার কাছে কেঁদে পড়েছিলেন, তাই বাবা পাঠিয়েছেন। শোন্, বেটা, তোর খুব বিপদ। চার হাজার লোক নিয়ে উম্মেদ সিং এসেছে, আজ রাত শেষ হবার সঙ্গেই সে এসে পড়বে বনেড়ায়। তোর বাবারও সাধ্য নেই তাকে বাধা দিতে পারিস্। ওর সঙ্গে আছে দেবা, যাকে তুই অপমান করে তাড়িয়েছিলি। সে-ই পথ দেখিয়ে আনছে। তার এখন একাদশে বৃহস্পতি, শনি শত্রুস্থানে তুঙ্গী। তার জয় হবেই, গুরু সহায়, কেউ বাধা দিতে পারবে না। যদি বাঁচতে চাস তো এখনই উঠে পালা। দেবার দুটি বাসনা, উম্মেদ সিংকে বলা আছে তার—বনেড়ার দুর্গ ভেঙ্গে মাটিতে গুঁড়িয়ে দেবে। আর তোকে জিঞ্জীরে বেঁধে খাঁচায় পুরে নিয়ে যাবে শাহপুরায়। ওরা এসে পড়লে তোর নিস্তার নেই, এখনই পালা।'

এই বলে—কথাটা কি হচ্ছে সর্দার সিং তা ভাল ক'রে বোঝবার আগেই—বাবা একলিঙ্গজীর সেবক নন্দী ভূত ঘরের মধ্যে অন্ধকারে মিলিয়ে গেলেন। বেশ

দেখলেন সর্দার সিং—বেন ঘরের দেওয়ালেই মিলিয়ে গেলেন নন্দীবাবা। এমনই ভয় যে—পরেও উঠে দেখবার কথা মনে রইল না সর্দার সিংয়ের যে ঘরের ওদিকের দরজাটা খোলা কিনা, বাবা নন্দীজী সত্যি সত্যিই বাতাসে মিলিয়ে গেলেন, না পায়ে হেঁটে চলে গেলেন আর পাঁচটা মানুষের মতো।

দেবা আর এক মুহূর্ত অবসরও দিল না অবশ্য। আবারও সিঁড়ি দিয়ে নেমে নিচের একটা বারান্দা দিয়ে বেরিয়ে পাথরের নল বেয়ে নিচে নেমে এল। তারপর ত্বরিত গতিতে সেই নালার ধারে পৌঁছে পুঁটলি বাঁধা পাগড়ি-ছেঁড়া কাপড়ের টুকরোটায় কপাল ও গালের কালি যতটা সম্ভব মুছে সাফ করে ফেলল। এর পর পোশাক এঁটে নালা দিয়ে গলে গিয়ে লোহার আগড়টা টেনে আগের মতো কতকটা সাজিয়ে রেখে বেরিয়ে আসা তো চোখের পলকের ব্যাপার। সমস্ত কাজটা সারতে তার বোধহয় একদণ্ড (এখনকার ইংরেজী হিসেবে চব্বিশ মিনিট) লাগল না।

তারপর যখন সেই শুকনো অশথ গাছের ডাল ধরে এপারে আসছে তখন দেখল সর্দার সিংয়ের মহলের দিকে দু-তিনটে আলো জ্বলে গেছে। এখান থেকে যতটা নজর পড়ে—বেশ কয়েকজন লোক চলাফেরাও করছে। তবু এখনও কেল্লার ঘড়িতে ঘা পড়ে নি বা শিঙা বাজে নি যখন—তখন মনে হচ্ছে ওকে কেউ সন্দেহ করে নি, মানে চোর বা বদমাইশ লোক কেউ ঢুকেছিল এরকম কারও মনে হয় নি। তাহলে তো শিকারী কুকুরও ছেড়ে দিত।

কুকুরের ভয় দেবার ছিল না। দুটি মাত্র শিকারী কুকুর আছে—তারা ঘরে বাঁধা থাকে। এমনি যা বুনো কুকুর তারা কেউ দেবাকে দেখলেও শব্দ করবে না—ওর গন্ধ তাদের সকলেরই পরিচিত। আর তারা কেউ এদিকটায় থাকেও না। সান্ত্রী পাহারা দেয় কিন্তু তাদের একবার ঘুরে আসতে কতটা সময় লাগে তাও তো দেবার জানা, সে হিসেব ক'রেই সে এসেছে।

॥ ৬ ॥

সর্দার সিংয়ের ঘুম ভেঙে সবটা বুঝতে কিছু সময় লাগল। তারপর কোনমতে উঠে ঘরের মধ্যে গিয়ে অন্দরমহলে এসে ভৃত্যকে ডাকলেন। ভৃত্য ডেকে নিয়ে এল ছেলেকে। রাণীদের মহলে খবর দিলেন না সর্দার সিং, মেয়েরা কেবল হৈ চৈ করতে পারে আর কাজে বাধা দিতে পারে, বিপদের খবর তাদের দেওয়া মানে বিপদ বাড়ানো।

লোকজন যারা এল—ছেলে, শালা : দেওয়ানকেও খবর দেওয়া হয়েছিল, তিনিও

এসেছিলেন—সকলকেই সর্দার সিং বললেন, ভগবান একলিঙ্গের অচর নন্দীবাবা এসেছিলেন, বললেন আমার মা দুর্গা মাঈর কাছে গিয়ে আমার প্রাণ ভিক্ষা চেয়েছেন তাই ভগবান নন্দীবাবাকে পাঠিয়েছেন—খবর দিয়েছেন যে দুশমন উম্মেদ সিং চার হাজার লোক নিয়ে এসেছে, তার সঙ্গে ঐ বেইমান দেবাটাও আছে, ওরা বনেড়ার প্রাসাদ গুঁড়িয়ে ধুলো করে দেবে। বাবা বললেন, আমাকে এখনই এখান থেকে চলে যেতে, তাহলে ওদের কোপ এত পড়বে না, বনেড়ার আর বাকী লোক বেঁচে যাবে। আমার ওপর আর অজয় সিংয়ের ওপরই ওদের বেশী রাগ।

শেষের কথাটা অবশ্য বানিয়েই বললেন সর্দার সিং, নইলে ইজ্জত থাকে না।

পালাতে তাঁকে হবেই। ভয় দারুণ—দুর্দান্ত ভয়ে তার পেট গুলোচ্ছে, বুকের মধ্যে ধড়কড় করছে, হাত পা কাঁপছে ঠকঠক ক'রে। কথা কইতে এখনও কষ্ট হচ্ছে তাঁর। মৃত্যুভয় হয়ত তাঁর এমনি এতটা নয়—কিন্তু নন্দীবাবা এসে আচমকা যে ভয় দেখিয়ে দিয়ে গেছেন—তাতেই, অত কিছু আগুপিছু না ভেবেই, একটা ভীষণ আতঙ্ক বোধ করছেন তিনি। কিসের এত ভয়, খুব বেশী হলে বড় জোর তিনি মরবেন—মরার বাড়া গাল নেই, এসব কোন কথাই তাঁর মাথাতে ঢুকছিল না, ভাল ক'রে কিছু ভেবে দেখার ক্ষমতা ছিল না আর।

শালা বা দেওয়ান কথার প্রতিবাদ করতে সাহস করলেন না। নন্দীবাবা এত লোক থাকতে সর্দার সিংয়ের মতো নেশাখোর বদ্ধ লোককে বাঁচাতে মর্ত্যধামে আসবেন একথা বিশ্বাস হয় না। তাও স্বয়ং ভগবান একলিঙ্গ যদি ওকে বাঁচাবেন বলে মনে ক'রে থাকেন তো ওঁকে পালাবার পরামর্শ দেবেন কেন, তাঁর চোখের এক পলকেই তো উম্মেদ সিংয়ের বাহিনী ভস্ম হয়ে যেত!

না, এসব কিছু নয়, সর্দার সিংজী আসলে খোয়াব অর্থাৎ কিনা এটা সম্পূর্ণ স্বপ্নই দেখেছেন। উম্মেদ সিংয়ের আসার খবর পেয়েছেন কাল সন্ধ্যাতেই, অতবড় বাহিনীর সঙ্গে লড়াই করা যে তাঁর কর্ম নয়—তা বুঝেই চিন্তিত হয়ে শুয়েছেন। ঘুম হবার কথা নয়। নিতান্ত আপিং খান (অনেকখানি খান)—তার আগে বোধ হয় 'ভাঙ'ও হয়েছে—বলে ঝিমুনি এসেছে। আর তাতেই ঐ খোয়াব দেখেছেন।

এটা সকলের কাছেই পরিষ্কার।

তবে দেওয়ান তা বলতে পারেন না, হাজার হোক মনিব। মনিব [illegible] এত ভয় পেয়েছেন—এ কথা তাঁর মুখের ওপর বলা যায় না। শালাও বলতে পারেন না—কারণ তিনিও এখন কর্মচারী এখানকার। নৌকরি করে না যে সে-[illegible]

পারে। বড় ছেলে অজিত সিং, সে বলল। ঐ সব কথাই বলল। তাতে কোন কম বল না। ভয়ে পা অবশ হয়ে এসেছে সর্দার সিংজীর, দাঁতে দাঁত লেগে ঠকাঠক শব্দ হচ্ছে, কোন সদুপদেশই মাথায় ঢুকেছে না।

অজিত সিং আরও বলল যে, এত ভয় পাবার কোন কারণ নেই, ওদেরও কিছু সৈন্য আছে। ওরা দুর্গের মধ্যে আছে, ঘাঁটি বুঝে দাঁড়াতে পারলে এক একজন প্রতিপক্ষের অমন চল্লিশ-পঞ্চাশজনকে ঘায়েল করতে পারবে। বাইরে থেকে যে দুর্গ দখল করতে আসবে তার অসুবিধা ঢের। বিস্তর লোকক্ষয় হবে তাদের। যতদূর শুনেছেন ওপক্ষে মোটে দুটি কামান এসেছে। ওঁদেরও ছোট হোক, দুটো কামানই আছে—সমান সমান। সুতরাং হেরে যে যাবেনই এমন কোন অর্থ নেই।

'খুব ভাল', উৎসাহ দিলেন সর্দার সিংজী ওরই মধ্যে, বললেন, 'তোমরা লড়াই করো। তোমাদের কল্যাণ হোক। সর্বান্তকরণে তোমাদের জয় কামনা করছি। মোদ্দা আমি নন্দীবাবার হুকুম অমান্য করতে পারব না। আমি চললুম। বেশ তো, তোমরা তো রইলেই, লড়াই হোক—আমি না থাকলে আর কি ক্ষতি হবে? ··বরং আমি নেই জানলে ওদের লড়াই করবার উৎসাহ কমে যাবে অনেকটা। তাতে তোমাদের সুবিধেই হবে। · জয় একলিঙ্গজী কি। আমি চললুম।'

রাত্রি তৃতীয় প্রহর শেষ হবার আগেই মাত্র কুড়িটি অনুচর আর ছোট ছেলে বীরপুরুষ অজয় সিংকে সঙ্গে ক'রে সর্দার সিং বনেড়ার কেল্লা থেকে বেরিয়ে—যেদিকে উম্মেদ সিং শিবির ফেলেছেন তার উলটো দিকে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলেন। যাতে রাত্রি প্রভাত হবার আগেই বনেড়া এবং ঐ দুশমনদের থেকে বহুদূরে চলে যেতে পারেন।

॥ ৭ ॥

উম্মেদ সিং বা রণসিংহ এর কোন কথাই জানতে পারেন নি। তাঁরাও রাত তৃতীয় প্রহরে উঠেছেন, প্রাতঃকৃত্য সেরে তৈরী হয়ে ব্রাহ্মমুহূর্তে যাত্রা করবেন বলে—কিন্তু দেখা গেল তারও আগে চারণ কবি দেবা স্নান ক'রে পূজা সেরে তৈরী হয়ে আছে।

তা দেখে রাজা উম্মেদ সিং ঠাট্টা করে বললেন, 'চারণদের বৈর বা শত্রুতা মনে রাখতে নেই শুনেছি। চারণ নিজের অপমানের শোধ নিতে কখনও অস্ত্র ধারণ করবে না—এই নাকি নিয়ম। দেবাকে দেখে তা তো ঠিক বলে মনে হচ্ছে না একবারও। কী বল রণসিং ভাইয়া?'

দেবা একটু শুকনো হাসি হাসল শুধু—এর কোন জবাব দিলে না।

ঠিক ব্রাহ্মমুহূর্ত যাকে বলে, আকাশ লাল হবার সঙ্গে সঙ্গে রণসিংহ শিবির ত্যাগ

করলেন। সঙ্গে পাশেপাশে দেবাও চলল তাঁর সঙ্গে ঘোড়ায় চেপে। বেশ বড় একদল পদাতিক সৈন্য তার আগেই রওনা হয়ে গেছে। এ'রা ঘোড়ায় যাচ্ছেন মোট শ দুই লোক। তাদের ধরে ফেলে একটু আগেই চলে যাবেন তবু তারা যাতে খুব পিছনে না থাকে সেই জন্যেই তাদের আগে পাঠানোর ব্যবস্থা।

কিন্তু এত আয়োজন একেবারেই বৃথা দেখা গেল।

বনেড়াতে যুদ্ধ করবার—এদের বাধা দেবার কোন আয়োজনই নেই।

উম্মেদ সিংযের বিপুল বাহিনী আসছে, তাদের পথ দেখিযে নিযে আসছে, ওদেরই ঘরের লোক দেবা, যে নাকি এখানকার ঘাঁতঘোঁত সব জানে - সুতরাং এযাত্রা রক্ষা পাওয়া মুশকিল—এ খবর কাল সকাল থেকেই ছড়িযে পড়েছে এখানে, সকলেই চিন্তিত বিবর্ণ মুখে আলোচনা করেছে সে কথা।

তবু, সবাই ধৈর্য ধরে ছিল। অসম যুদ্ধ হলেও করতে হবে। প্রান আগে নয়—সম্মানই আগে।

কিন্তু আজ যখন শেষ রাত্রে উঠে খবর পেল শিশোদিয়াদের মুখে চুনকালি মাখিযে তাদের মালিক জাযগীরদার সর্দার সিং কাপুরুষের মতো অন্ধকারে পালিয়ে গেছেন —তখন আর তাদের মানরক্ষার অত উৎসাহ রইল না।

যার জন্য প্রাণ দেওয়া সে যদি দাঁড়িযে সেই আত্মত্যাগটা একবার না দেখে, তাহলে কেন তারা এমন জবাই হ'তে যাবে শুধু শুধু ভেড়া ছাগলের মতো? তারাও 'যে পালায় সে-ই বাঁচে' এই নীতি অনুসরণ ক'রে আকাশে আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে যে-যার পালাতে শুরু করল।

অজিত সিং অনেক বোঝালেন, হাতে পায়ে ধরতে গেলেন বলতে গেলে—রাগ করলেন, গাল দিলেন, মাথা খুঁড়লেন, শেষে কেঁদে ফেললেন—কিন্তু শেষ পর্যন্ত বনেড়ার গৌরব রক্ষা করতে শ-খানেকের বেশি লোক জড়ো করা গেল না। ফলে শহর তো একেবারেই বিনা বাধায় রণসিংহের অধিকারে এল—কিল্লা দখল করতেও বোধহয় এক দণ্ডের বেশী সময় লাগল না। শ'খানেক লোক হাজার লোকের সামনে কতক্ষণ দাঁড়াবে। বেগতিক দেখে স্বয়ং অজিত সিংহই আত্মসমর্পণ করলেন—রণসিংহের সৈন্যরা উল্লাসে চিৎকার করতে করতে দুর্গের মধ্যে প্রবেশ করল।

এ পর্যন্ত দেবা স্থির হয়ে সব লক্ষ্য করছিল। তার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হয়েছে। বিজয়ীর সঙ্গেই সে ফিরে এসেছে বনেড়ায়। বনেড়া শত্রুর পদানত, যে শত্রু দেবার পৃষ্ঠপোষক, আশ্রয়দাতা এবং বন্ধু। দেবার কথাতেই এসেছে তারা, দেবার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করতে।

এ জয় সম্পূর্ণভাবে দেবারই। তার প্রতিটি নির্দেশই পালিত হ'ল—বনেড়ার প্রাসাদ শিখর থেকে সর্দার সিংয়ের পতাকা টেনে নামিয়ে ধুলোয় ফেলে দেওয়া হ'ল—বহুলোক সে পতাকা মাড়িয়ে চলে গেল ভেতরে।

তবু হয়ত দেবা খুশী হ'তে পারে নি। অন্তত তার মুখের চেহারায় কোথাও উল্লাস বা আনন্দের চিহ্ন ছিল না। এত বড় বিজয়লাভেও তার মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল না।

রণসিংহও তা লক্ষ্য করলেন, কারণটা ঠিক বুঝতে পারলেন না। দেবার প্রতিজ্ঞা বজায় থেকেছে, ব্রত সফল হয়েছে—তবু তার মুখে বিষাদের ছায়া কেন?

তরুণ রণসিংহের সেকথা বোঝার শক্তি নেই। উম্মেদ সিং হলে ঠিক বুঝতে পারতেন।

তবু এতক্ষণ অন্তত অবিচলিত ছিল দেবা। আর থাকতে পারল না।

তখন একটা রীতিই দাঁড়িয়ে গিয়েছিল—বিজয়ীপক্ষের সৈন্যরা বিজিতপক্ষের রাজধানী ও রাজপ্রাসাদ লুঠ করবে। যে যা কেড়ে-বিগড়ে নিতে পারবে তা তারই হয়ে যাবে, সেজন্যে তাকে কেউ দোষ দেবে না।

পাঠানদের আমল থেকেই হয়ে আসছে এটা। আসলে তখন সাধারণ সিপাহদের মাইনে ছিল খুব কম, যে ঝুঁকি নিতে হ'ত—তখন আজকালকার মতো, রেডক্রশ হাসপাতাল বা চিকিৎসার ব্যবস্থা ছিল না সৈনিকদের জন্যে, যুদ্ধক্ষেত্রে যে আহত হ'ত, তার মৃত্যুই হয়েছে বলে ধরে নেওয়া হ'ত, বরং তার আরও কষ্ট, পড়ে পড়ে যন্ত্রণায় কাতরাতে হ'ত, রাত্রে শিয়াল কুকুরে এসে জ্যান্ত মানুষটাকে টানাটানি করত—তাতে ঐ টাকায় পোষাত না। লুঠের লোভেই তারা ফৌজে নাম লেখাত। লুঠের সুযোগ পাবে, লুঠের বখরা পাবে বলে। এক এক সময় এই লুঠে—প্রচুর টাকা আসত। মারাঠী সৈন্যরা এক-একজন পেশোয়াদের আমলে লক্ষপতি হয়ে গেছে নাকি—এই রকম শোনা যায়।

এখানেও উম্মেদ সিংয়ের সৈন্যরা হৈ হৈ করে ভিতরে ঢুকে লুঠতরাজ শুরু ক'রে দিয়েছে বিনা বাধায় এমন সুযোগ পাবে সকাল বেলাই তা কে ভেবেছিল।

রণসিংহ সবই দেখলেন—কিন্তু কোন বাধা দিলেন না। কেনই বা দেবেন? বা রেওয়াজ। সব ক্ষেত্রে সব দলই যা ক'রে থাকে, এরাও তাই করছে। অন্যায় তো কিছু করছে না।

এসব করতে না দিলে ভবিষ্যতে লড়াই করার জন্যে ফৌজ পাবেন না।

প্রথমটা প্রাসাদের বাইরের দিকটা, সৈন্যসামন্ত কর্মচারীরা যেদিকে থাকে, রাজার

কোষাগার—এইসব লুঠ চলছিল। কিন্তু সে আর কতক্ষণ। বেলা দ্বিতীয় প্রহরের মধ্যেই সব শেষ হয়ে গেল—তখন অন্তঃপুরের দিকে পা বাড়াল ওরা।

কিন্তু সেদিকে দেখা গেল বিরাট এক বাধা তাদের জন্ত অপেক্ষা করছে।

চারণ দেবা এক পাশে দাঁড়িয়ে তাদের কাণ্ড দেখছিল সকাল বেলা, তারপর কখন যে সে সরে পড়েছে তা কেউ লক্ষ্য করে নি।

দেবা এখানকার সমস্তই জানে। কোথায় সেলাখানা অর্থাৎ অস্ত্রশস্ত্র থাকে তাও যেমন জানে, কোথা দিয়ে তাদের অনেক আগেই অন্দরমহলে পৌছানো যায়—তাও।

ইতিমধ্যেই সে এক বর্ম এঁটেছে গায়ে, হাতে নিয়েছে বিরাট এক তলোয়ার। অন্দরমহলের পথ আটকে ঐ সাক্ষাৎ যমদূতের মতো দাঁড়িয়ে আছে রণমূর্তি ধরে। শাহপুরার সিপাইরা স্বপ্নেও ভাবে নি এসব কথা, যেমন তারা হৈ হৈ ক'রে ওদিকে ঢুকেছিল, তেমনি ভাবেই চিৎকার করতে করতে এদিকে এসেছে, কিন্তু তার মধ্যেই শুনল, বজ্রগম্ভীর কণ্ঠে দেবা বলছে, 'খবরদার। যে এদিকে আসবে তার মৃত্যু অনিবার্য।… আমাকে না মেরে সর্দার সিংহের অন্দরমহলে ঢুকতে পারবে না কেউ!'

এ আবার কি!

ওরা তো অবাক!

হকচকিয়ে গেল সবাই। দেবা তো তাদেরই লোক, তাদেরই দলের। আসলে ওর জন্যই তো এবারের এই অভিযান। ওর শখ মেটাতেই। তবে এখন এ মূর্তি কেন?

কিন্তু সে যা-ই হোক। চারণ অবধ্য। তার গায়ে হাত তোলা যাবে না।

খবর দাও সেনাপতি কুমার রণসিংহজীকে, তিনি এসে এর বিহিত করুন। বলল সবাই।

খবর পেয়ে রণসিংহও এলেন।

তিনিও অবাক। বললেন, 'কিন্তু, চারণজী, এ তো আবহমান কাল থেকে চলে আসছে, যুদ্ধের দস্তুর এই। এ লুঠ বিজয়ী সৈন্তদের প্রাপ্য, এ তো কোন অন্তায় করছে না ওরা!'

চারণ তেমনি কর্কশ গম্ভীর কণ্ঠে জবাব দিল, 'অন্দরমহলটা সে লুঠের জায়গা নয়—মেয়েরা যেখানে থাকেন, বর্বরদের সেখানে কোন অধিকার নেই। সর্দার সিংজীর অন্তঃপুরের মেয়েরা আমার মায়ের মতো। ওদের ও যদি যা খুশি তাই করার অধিকার থাকে, আমারও অধিকার আছে এ অন্তঃপুর রক্ষা করার। পারব না জানি—কিন্তু প্রাণ দিতে তো পারব!'

সেই আক্বর উগ্রমূর্তি দেখে রণসিংহও পিছিয়ে এলেন, সত্যিই তো কিছু চারণকে বধ করা যায় না।

কিন্তু এর অর্থ কি ? বিহ্বলভাবে প্রশ্ন করেন রণসিংহ বার বার।

কেউই কিছু বলতে পারে না।

শেষে প্রবীণরা সকলে পরামর্শ দিলেন,—'রাজাকে খবর দাও। যা করবার যা সিদ্ধান্ত নেবার তিনিই নেবেন।'

রণসিংহ সেটা বুঝলেন। তখনই সবচেয়ে দ্রুতগামী যে ঘোড়া—সেই ঘোড়া দিয়ে একজন দূত পাঠালেন উম্মেদ সিংকে খবর দিতে।

সৌভাগ্যের বিষয়—বিনা যুদ্ধে বনেড়ার জনপদ ও কিল্লা অধিকারে এসেছে এ খবর পেয়ে উম্মেদ সিংজী সদলবলে এইদিকেই আসছিলেন, কাছাকাছিই এসে পড়েছেন তখন—যখন পৌত্রের ডাক গিয়ে পৌঁছল।

ঘোড়া একটু দ্রুতই ছুটিয়ে আনলেন রাজা উম্মেদ সিং।

ঘোড়ায় চেপেই কিল্লার মধ্যে ঢুকে অন্দরমহলের মুখ পর্যন্ত চলে গেলেন। সে প্রবেশপথ ঘিরে দাঁড়িয়েছিল সৈন্যরা, উশখুশ করছিল কোন ফাঁকে ঢোকা যায়—এখন স্বয়ং রাজা সাহেবকে দেখে দুদিকে সরে পথ করে দিল, রাজা একেবারে সামনে এসে পড়লেন।

দেখলেন ঐ কালান্তক মূর্তি—তাঁর বন্ধু ও সহচর দেবার।

পথেই শুনেছেন সব কথা, নাতি রণসিংহের মুখ থেকে, অমাত্যদের মুখ থেকে।

কিছুক্ষণ নীরবে দেবার দিকে চেয়ে থেকে উনি প্রশ্ন করলেন' 'ব্যাপার কি দেবা ? বেইমানি ?'

দেবা সতেজে সদম্ভে জবাব দিল, 'কে বলেছে বেইমানি, এ-ই নিমকহালালী। আগে যা করেছি সেটাই বেইমানি। যতই হোক সর্দার সিং আমার প্রতিপালক, বংশের প্রতিপালক। আমার পিতা-পিতামহ সকলে এদের নিমক খেয়ে মানুষ। এদের পক্ষ থেকে যদি কোন অবিচার হয়েও থাকে—সে বিচার করা আমার উচিত হয় নি, অন্তত শত্রুকে ডেকে আনা।... সে যাই হোক, যা হবার হয়ে গেছে, শোধ উঠে গেছে ষোল আনার বদলে আঠারো আনা। এরপর এতটা অন্যায় মুখ বুজে সহ্য করা, শুধু দাঁড়িয়ে চেয়ে দেখা আমার পক্ষে সম্ভব নয় মহারাজ। বিশেষ সর্দার সিংজীর অন্তঃপুরিকারা আমার জননীর মতো, আমার দেহে একবিন্দু রক্ত থাকতে তাঁদের অসম্মান হ'তে দেব না। তার জন্য আমাকে ক্ষমা করবেন।'

প্রথমটা ভুরু কুঁচকেই প্রশ্ন করেছিলেন রাজা উম্মেদ সিং, একটু রুষ্টভাবেই হয়ত। দেবার কথা শুনতে শুনতে সে মুখের ভাব স্নিগ্ধ হয়ে এল।

খানিকটা চুপ ক'রে দেবার মুখের দিকে চেয়ে থেকে বললেন, 'তা আমিও তো কিছু প্রতিপালক বটে। সেটা স্বীকার করো তো?'

'আলবৎ, আপনার কাছে আমার ঋণের শেষ নেই।'

'তা বাপু আমার একটি ভিক্ষা আছে তোমার কাছে!'

'ছি ছি, এ কি বলছেন মহারাজ! আদেশ বলুন। ইজ্জৎ, ধর্ম আর কৃতজ্ঞতা ছাড়া যা হুকুম করবেন তাই দেব।'

উম্মেদ সিং বললেন, 'আর কিছু নয়, এই বেইমান কাপুরুষ অপদার্থ সর্দার সিংয়ের জন্যে যা করলে--আমার বংশধরদের জন্যেও প্রয়োজন হ'লে তাই করবে—এইটুকু আশ্বাস শুধু চাইছি তোমার কাছে। এই কথা পেলেই আমি খুশী থাকব।'

দেবা এবার অস্ত্র বর্ম ছুঁড়ে ফেলে দিল। রাজার সামনে নতজানু হয়ে বসে বলল, 'ঈশ্বর করুন, ভগবান একলিঙ্গ করুন—এমন দুর্দিন যেন আপনার বংশে কখনও না আসে। তবে যদি আসেই, আপনার বংশের সেবায় আমার বংশের যে যেখানে আছে—তাদের দেহের শেষ রক্তের ফোঁটাটিও হাসতে হাসতে ফেলবে—এ বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। রাজা সাহেব, এ হতভাগ্য ঈশ্বর সিংয়ের হয়ে আমি ক্ষমা-প্রার্থনা করছি—একে রক্ষা করুন।'

রাজা উম্মেদ সিংয়ের ইঙ্গিতে সৈন্যরা অন্তঃপুরের দরজা ছেড়ে পিছিয়ে এল, সন্ধ্যার আগেই কিল্লা ত্যাগ করল তারা। উম্মেদ সিং কিল্লার একজন লোককে পাঠিয়ে দিলেন, 'সর্দার সিংকে খবর দাও। চারণ দেবা—যাকে তিনি অন্যায় ক'রে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন, তারই দয়ায় ওর প্রাণ ও মান দুই-ই রক্ষা হয়েছে। এখন সে স্বচ্ছন্দে ফিরে আসতে পারে—আমার তরফ থেকে আর কোন ভয় নেই!'

শুধু তাই নয় উম্মেদ সিং দেবাকে তাঁর রাজ্যের মধ্যে বিপুল এক জমিদারী দিয়ে পুরস্কৃত করলেন—বস্তুত তার এই বিদ্রোহ এবং অবাধ্যতার জন্যই।

জায়া নয় দয়িতা

ঝি এসে হাঁ করার সঙ্গে সঙ্গেই চিত্রা কথাটা বুঝতে পারে। যেন এই কথাটারই অপেক্ষা করছিল ও।

'বড়মা ডাকছেন, এই তো ?' একটু প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপই ফুটে ওঠে ওর কণ্ঠে। জীবনকে উপেক্ষা করার, ব্যঙ্গ করার স্পর্ধা ফুটিয়ে তুলতে চায় ও। আশঙ্কাকে দাবিয়ে রাখতে চেষ্টা করে তাকে প্রত্যুদ্‌গমন ক'রে।

'ওমা, তা হলে তো তুমি জানো।' ঝি নিশ্চিন্ত হয়ে চলে যায়।

প্রাণপণে ঠোঁটটা কামড়ে ধরে চিত্রা। অবাধ্য চোখে জ্বালা করে জল ভরে আসে উষ্ণ, তপ্ত অশ্রু। সেটাকে সমস্ত শক্তি দিয়ে ও দমন করার চেষ্টা করে।

বড়মা—অর্থাৎ ওদের লেডী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট। তিনি যে কেন ডাকছেন তা ও জানে। কী প্রশ্ন করবেন তাও ওর অজানা নেই। কারণ এ অভিনয় এর আগেও দু-বার হয়ে গেছে। এটা যেন ও প্রত্যাশাই করছিল—এখানে এসে পর্যন্ত। তবু তো এক বছর কেটেছে।

ভাগ্যিস্ এখন ঘরে আর কেউ নেই। কুঁজো থেকে জল গড়িয়ে চোখে ঝাপটা দেয় চিত্রা। চোখে জল নিয়ে যাওয়া চলবে না। চোখ লাল থাকাও বাঞ্ছনীয় নয়। সে জানে অন্যায়টা তার দিকে নয়—সুতরাং মাথা উঁচু ক'রেই যেতে হবে তাকে।

অবশেষে চুলটা ঠিক ক'রে নিয়ে খুব হাল্‌কা ক'রে পাউডারের পাফ্‌টা গালে বুলিয়ে ও ঘর থেকে বেরোয়। সিঁড়ি দিয়ে নেমে গিয়ে নিচের লম্বা করিডরটা পেরিয়ে বড়মার অফিসঘর। অনেক, হ্যাঁ অনেকটা সময় পাওয়া যাবে বৈকি।

বড়মা মিস্ সেন ডেস্কের তলায় একটা উঁচু টুলের ওপর ফ্ল্যানেল-জড়ানো পা দুটো তুলে বসে এক মনে হিসেবের খাতা দেখছেন। দুই পায়েই তাঁর বাত। বেশ একটু স্থূলকায়—এককালে হয়ত মন্দ দেখতে ছিলেন না, এখন কিন্তু বিরাট একটা জলহস্তীর মতো দেখায়। আধপাকা চুল, খুব বাহার ক'রে আঁচড়ানো, গলায় সোনারই রুদ্রাক্ষ হার, হাতে দুটো বালা—সবচেয়ে লক্ষণীয় ওঁর শাড়ি। খুব জমকালো রঙের শাড়ি ছাড়া পরেনই না। যতবারই ওঁকে দেখে, চিত্রার হাসি পায়। আজও একটা ক্ষীণ হাসির রেখা ওর ঠোঁটের কোণে ফুটে উঠল, এই দুঃখের মধ্যেও।

মিস্ সেন ওর আগমন বুঝতে পারলেন কিন্তু অনেকক্ষণ সেটা বুঝতে দিলেন না। এক-মনে প্রায় মিনিট-দুই হিসেবের খাতা দেখবার পর অপাঙ্গে একবার চেয়েই আবার হিসেবের খাতায় চোখ ফিরিয়ে আনলেন। তবে কথাও কইলেন এবার। ওর দিকে না তাকিয়েই বললেন, 'এই যে চিত্রা—এসেছ ? ব'সো ব'সো। তোমার

সঙ্গে কথা আছে কতকগুলো।'

এ সবই জানে চিত্রা। সর্বত্র এই একই ভূমিকা।

'আমাদের এটা মেয়েদের ইস্কুল, মেয়েদের হোস্টেল—আমাদের দায়িত্ব বড় বেশী তা তো জানো! সাধারণ—ছেলেদের জন্য কোন ইনস্‌টিটিউশন্‌ হ'লে এত ভাবতেই হ'ত না।'

আবার একটা স্তব্ধতা।

চিত্রা বসে আছে পাথরের মূর্তির মতো—ওর চোখও বড়মার হিসেবের পাতার ওপর।

'আমি দুটো-তিনটে বেনামী চিঠি পেয়েছিলাম চিত্রা—তোমার—তোমার পরিচয় সম্বন্ধে বিশ্রী ইঙ্গিত ক'রে। কিন্তু আমি তা বিশ্বাস করি নি।' কোনমতে একসঙ্গে, এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো ব'লে ফেলে যেন নিশ্চিন্ত হন মিস সেন।

এবার চিত্রাই কথা বলে, 'আমাকে কি আজই হোস্টেল ছেড়ে দিতে হবে? শান্ত, সহজ প্রশ্ন।

'না, মানে—য়্যা কী বললে?' একটু বিহ্বল ভাবে তাকান মিস্‌ সেন, 'না, তা কেন? বলছিলুম যে সেগুলো অমি বিশ্বাস করি নি—"মনে মনে যে ভাবে রিহার্স্যাল দিয়ে রেখেছেন, নিজের মহত্ত্ব দেখাবার সে সুযোগগুলো নিজেকে দেবেন বলে প্রতিশ্রুত, সহসা তাতে বাধা পড়ায় যেন একটু বিরক্ত হযে ওঠেন, 'কিন্তু আজ এক অভিভাবক চিঠি লিখে পাঠিয়েছেন—বলেছেন যে আমরা কোন স্টেপ্‌ না নিলে খবরের কাগজে চিঠি দেবেন।·· তিনি বলতে চান যে, তোমার যে মামা রসরাজবাবু তোমাকে ভর্তি করে দিয়ে গেছেন, উনি নাকি তোমার মামা নন—'

'না, উনি কিছু টাকার লোভে এই পরিচয়টুকু দিতে রাজী হয়েছিলেন।'

'সে কি!' মিস্‌ সেন কিছুকালের জন্য হতবাক্‌ হয়ে যান, 'কৈ, এসব কথা তো তিনি বলেন নি?'

চিত্রা যেন আরও সহজ হয়ে ওঠে, 'তা বললে আর মিছে কথা বলবার দরকারই বা হ'ত কেন বলুন!'

'কিন্তু এর কি দরকারই বা ছিল?'

'না হলে কি আপনারা ইস্কুলে ভর্তি করতেন? সব জেনেশুনেও?'

চিত্রার কণ্ঠে স্পর্ধা, বিদ্রূপও।

'কিন্তু—কিন্তু এটাও তো ভাল নয়—'

'কেন ভাল নয়? নইলে আমি কি করতুম? মা দিদিমা যে পথে গিয়েছেন

সেই পথেই চলা কি আমার তাহলে উচিত ছিল? কেউ যদি সৎপথে আসতে চায়, কেউ যদি ভাল হতে চায় তো তাকে আপনারা হতে দেবেন না? · আমি আর কি করতে পারতুম আমাকে বলে দেবেন?'

মিস্ সেনের ব্রোঞ্জের মতো পুড়ে-যাওয়া মুখেও যেন কোথায় একটু লালিমা খেলে যায়। কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে থাকেন তিনি, তারপর আস্তে আস্তে—কতকটা যেন ক্ষমা প্রার্থনার সুরেই বলেন, 'সো সরি চিত্রা, য়্যাম রিয়্যালি সরি! কিন্তু কী করব বলো? সরকারী পয়সায় আমাদের ইন্‌স্টিটিউশন চলে, পাবলিক কমিটি আছে—এত সামলাতে পারব না। যদি সত্যিই কেউ খবরের কাগজে লেখে তো সে কী একটা স্ক্যাণ্ডাল হবে বলো তো!'

চিত্রা মাথা হেঁট ক'রে জবাব দেয়, 'আমি এখনই চলে যাচ্ছি।

'না না—আমি তা বলি নি। টেক ইওর টাইম। আমি বলি কি কাল-পরশু যে কোন একদিন, মা'র শরীর খারাপ বা ঐরকম একটা কিছু বলে যদি চলে যাও তারপর খুব কোয়াইটলি—একটা ট্রান্সফারের দরখাস্ত করো তো হাঙ্গামা চুকে যায়।'

চিত্রা ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছে। সে বললে, 'আমি এখনই চলে যাব মিস্ সেন। কালকে চাকর পাঠাব যদি আপনার কিছু পাওনা থাকে তো তার কাছ থেকেই পাবেন, তাকেই আমার জিনিসগুলো দিয়ে দেবেন। হঠাৎ মা'র অসুখের খবর পেয়ে চলে গেছি—দয়া ক'রে এইটেই জানিয়ে দেবেন। কাল স্কুলেও লোক পাঠাব ট্রান্সফারের জন্য—আর আপনাদের ক্ষতি করব না। নমস্কার।'

চিত্রা ওপরে উঠে শুধু ওর ব্যাগটা তুলে নিলে। ঝিরা কেউ তখন ও অঞ্চলে নেই। · কাউকেই কোন কৈফিয়ত দেবার প্রয়োজন হ'ল না। নিঃশব্দে, কোন দিকে না তাকিয়ে একেবারে বেরিয়ে এল রাস্তায়। দারোয়ান একটু বিস্মিত হয়ে তাকাল কিন্তু ওর মুখের চেহারা দেখে আর কোন প্রশ্ন করল না।

বড়রাস্তায় পড়ে ইশারা করে একটা রিক্সা ডাকলে চিত্রা, সেটা কাছে আসতে যেন কোনমতে হামাগুড়ি দিয়ে তাতে উঠে ক্লান্তিতে একেবারে এলিয়ে পড়ল।

চোখের জলটা না কেউ দেখতে পায়—এই ওর সবচেয়ে বড় কথা তখন মনের মধ্যে।

চিত্রা যখন বাড়ি পৌছল, তখন ওর মা জাহ্নবী সন্ধ্যাহ্নিকের জন্য ঠাকুরঘরে ঢুকতে যাচ্ছেন। সেদিন বোধ হয় ওঁর শনিবারের উপোস, সবে স্নান ক'রে উঠেছেন, নরুনপাড় তসরের ধুতি পরনে—ভিজে চুল তারই ওপর এলিয়ে পড়েছে, হাতে

একগাছি ক'রে সরু চুড়ি। উপবাসের একটা স্নিগ্ধ ক্লান্তির ছাপ তাঁর শান্তগম্ভীর মুখকে আরও শ্রদ্ধেয় ক'রে তুলেছে।

এই মা তার খারাপ? এই মায়ের মেয়ে হয়ে জন্মানো তার অপরাধ?

অপরিসীম ক্ষোভ এবং দিক্‌দাহকারী রোষের সঙ্গে এই প্রশ্নই সে বার বার করতে থাকে নিজেকে।

ওকে এই অসময়ে আসতে দেখেই জাহ্নবীর মুখ শুকিয়ে গিয়েছিল। তিনিও যেন বুঝতে পারলেন কথাটা, চিত্রার মুখের সেই অস্বাভাবিক শুষ্কতা দেখে কিছুই বুঝতে বাকী রইল না ওঁর। তবু বিহ্বল মন থেকে প্রশ্নটা মুখেও বেরিয়ে এল, 'তুই যে এত সকাল সকাল? এমন হঠাৎ? কী হয়েছে রে?'

অকস্মাৎ মা'র প্রতিও একটা বিরূপতায় মন বিষাক্ত হয়ে ওঠে চিত্রার। সবই তো জানেন, সবই তো বুঝতে পারছেন, তবে আবার এ ন্যাকামি কেন?

'কী আবার হবে? জানো না কি হয়? এর আগে আগে যা হয়েছে তাই।'

তিক্ততা ওর অন্তরের পাত্র ছাপিয়ে পড়ে। যেন অসহ্য লাগে ওর এই সব কিছু। বার বার এই একই অপমানকর অভিনয়। কেন? কেন? কি করেছে সে? যা সে নিজে করে নি—যে অপরাধ ওর দেহের কোথাও নেই—তারই সমস্ত শাস্তি বার বার ওকেই পেতে হবে কেন?

'কে—কে বললে এবার?' আড়ষ্ট জিহ্বা থেকে প্রশ্নটা খুব অস্ফুট কণ্ঠে বেরিয়ে আসে।

'সেটা জেনে কিছু লাভ আছে? বিরক্ত, ক্লান্ত চিত্রা বলে, 'না, কোন প্রতিকার করতে পারবে? মিছিমিছি বাজে কথা বলে লাভ কি? যা হবে না, যা হবার নয় সে চেষ্টা আর ক'রো না, দোহাই তোমাদের।...এ লজ্জা, এ অপমান আমি আর সইতে পারি না।'

তারপরেই যেন অত্যুগ্র একটা দাহ বেরিয়ে আসে ওর কণ্ঠ থেকে। হাত-পা নেড়ে মুখখানা বিকৃত ক'রে ও ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে, 'কুঁজোর আবার চিৎ হয়ে শোবার শখ কেন?.. কেন?...কেন?...কি করতে এ ন্যাকামি করতে যাও? জান না তুমি কি? তোমরা কি?'

কিন্তু বলার সঙ্গে সঙ্গেই ওর মায়ের উপবাস-ক্লিষ্ট শুষ্ক মুখে যে অপরিসীম বেদনার ছায়া ফুটে উঠল তা চিত্রার চোখ এড়াল না। নিজের ব্যথা তো আছেই, তার ওপর এই আঘাতও যেন ফিরে গিয়ে দ্বিগুণ হয়ে বাজল ওর বুকে। অকস্মাৎ এই অনেকগুলো বিপরীতমুখী আবেগের সংঘাত সইতে না পেরে সেও কেঁদে ফেলল

ঝরঝর ক'রে। তারপর একরকম ছুটেই ওপরের ঘরে গিয়ে বিছানার উপর লুটিয়ে পড়ল। অনেকক্ষণ ধরে অনেক চেষ্টার এই কান্নাকে সে চেপে আছে, কিন্তু আর সম্ভব নয়।

জাহ্নবী অনেক—অনেকক্ষণ সেইখানেই দাঁড়িয়ে রইলেন স্তব্ধ হয়ে। সন্ধ্যা ঘনিয়ে একসময়ে তা উত্তীর্ণ হয়ে গেল। চাকর কৈলাস কি কাজে বাজারে গিয়েছিল, সে ফিরে এসে তবে আলো জ্বালল। সে অনেক কালের চাকর। বহু ইতিহাস সে জানে এ বাড়ির। বহু ইতিহাস তার চোখের সামনেই রচিত হয়েছে—তাই সে জাহ্নবীকে অমন ভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে বা চিত্রাকে সেই অন্ধকারে ভর-সন্ধ্যাবেলা পড়ে থাকতে দেখেও কোন প্রশ্ন করল না—নিজেই ঘরে ঘরে আলো জ্বেলে, চৌকাঠে চৌকাঠে জল দিয়ে শাঁখটাও বাজিয়ে দিল। তারপর তখনও জাহ্নবীর চমক ভাঙল না দেখে একবার শুধু সবিনয়ে স্মরণ করিয়ে দিল, 'মা, সন্ধ্যে উৎরে গেছে অনেকক্ষণ, পুজো সারবে না?'

'এই যে বাবা, যাই।' সম্বিৎ ফিরে আসে জাহ্নবীর, কখন নিজের অজ্ঞাতসারেই চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়তে শুরু হয়েছে, অপ্রস্তুত হয়ে তাড়াতাড়ি চোখ মোছেন। কণ্ঠস্বর সহজ ও স্বাভাবিক করার চেষ্টা ক'রে বলেন, 'ঘণ্টাখানেক পরে উনুনে আঁচ দিও বাবা কৈলাস, খুকী এসেছে তোমার—আজ রাঁধতে হবে।'

তারপর ঠাকুরঘরে ঢুকে তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ ক'রে দেন। ঠাকুরের কাছে কাঁদতে হবে বহুক্ষণ ধরে—তার পূর্ণ অবকাশ চাই।

পূজার আসনে বসে কিন্তু যেন আর কাঁদতে পারেন না। একটা নিদারুণ অভিমান ঘনিয়ে আসে মনে মনে। এ অভিমান ঠাকুরের ওপরই—তাঁর ইষ্ট, তাঁর প্রাণের ঠাকুর, ঐ যিনি সিংহাসনে বসে হাসছেন তাঁর দিকে তাকিয়ে। ওঁর সামনে চোখের জল ফেলতেও যেন লজ্জা হয়।

যে পাপের যে প্রায়শ্চিত্ত। তা তিনিও জানেন। কিন্তু সে পাপ কি আজও মুছে গেল না? এত প্রায়শ্চিত্তেও?

আর সে পাপ তো তাঁর। তাঁর পাপে ঐটুকু দুধের মেয়ে, শিউলি ফুলের মতো অমলিন, পবিত্র তাঁর মেয়ে, সে সইবে কেন এত লাঞ্ছনা? এ তাঁর কেমন বিচার?

তাছাড়া—পাপ কি তাঁরই এমন কিছু ছিল?

যে ঘরে তিনি জন্মেছেন, তারই পরিচয় বহন ক'রে বড় হয়ে উঠেছেন—যথা নির্দিষ্ট পথে এগিয়ে গেছেন—নিজের অবশ্যম্ভাবী পরিণতির দিকে। ভাল মন্দ, সৎ

অসৎ কোন কিছু বোঝবার আগেই মাত্র তের বছর বয়সে তাঁর দেহকে সঁপে দিতে হয়েছে এক প্রৌঢ় মাংসলোলুপ ব্যারিস্টারের লালসার কাছে।...

তারপর, হ্যাঁ, আরও বড় হয়ে, সব বুঝতে পেরেও অপরের ভোগ্যা হ'তে হয়েছে বৈকি। কিন্তু তখনও কি তাঁর বিচারবুদ্ধি জাগবার বয়স হয়েছে?

যেদিন থেকে ভাল মন্দ বোঝবার বয়স হয়েছে, সেদিন থেকে কোন পাপ তিনি করেছেন বলে মনে হয় না। তার বহু পূর্বেই, যখন ওঁর মোটে সতেরো বছর বয়স তখনই ওঁর সামনে আসে সুদর্শন, সৌম্য, ভদ্র এক তরুণ যুবা—তারই সেবা ক'রে ওঁর জীবনের সুদীর্ঘ ত্রিশ বৎসর কেটেছে। ওঁর ইতিহাসের অন্তত এ পরিচ্ছেদের জন্য জাহ্নবী লজ্জিত নন। যে কোন স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্যজীবনের চেয়ে ওঁদের জীবন কম পবিত্র ছিল না। ঠাকুর জানেন—এই দীর্ঘ সময়টা এবং তারপরও এত দিন তিনি আর কারুর দিকে লালসার চোখে চান নি, আর কাউকে ভজনা করা তো দূরে থাক, কামনাও করেন নি।

সে? তার কথা জাহ্নবী শপথ ক'রে বলতে পারবেন না। অপূর্ব ছিল শিল্পী, নাট্যকার, কবি—ধনীর সন্তান। বিবাহ সে করে নি ঠিকই এবং চিরকাল সে জাহ্নবীকেই স্ত্রী বলে সকলকার কাছে স্বীকার ক'রে এসেছে, কিন্তু আর কোন ষড়যন্ত্র, আর কোন সামান্য প্রণয়-নাট্য কোথাও ছিল কিনা তা তিনি জানেন না। হয়ত ছিল, থাকাই সম্ভব—সে সন্দেহ যে তাঁর হয় নি তা নয়। তবে সে তো বহু বিবাহিত স্বামীরও থাকে, এ ব্যাধি। তাতে তাদের স্ত্রীরা তো পতিতা হয় না—বরং মহিমান্বিতা হয়।

অপূর্বকে জাহ্নবী বহু বন্ধুবান্ধবের কাছে 'আমার স্ত্রী' বলে পরিচয় দিতে শুনেছেন। দুই কান জুড়িয়ে গেছে তাঁর। কৃতজ্ঞতায়, আনন্দে, প্রেমে নিজেকে নিঃশেষ ক'রে দিয়েছেন ওর পায়ে। পূজা করেছেন সেই দয়িতকে। সেদিন এসব কথা একবারও মনে হয় নি। নইলে রেজেস্টারী ক'রে বিয়ে—সে তো মুখের কথা খসালেই হ'ত। সে প্রয়োজনও মনে জাগে নি কোনদিন। অপূর্বও বুঝতে পারে নি—সে কবি, সে ভাবুক, স্বপ্নরাজ্যেই বিচরণ করেছে দিনরাত। বাস্তব জগৎকে সে চেনে নি, চিনতে চায়ও নি।

প্রয়োজন যার জন্য হ'তে পারত, সে রতন, জাহ্নবীর প্রথম সন্তান—সে বহুদিন আগেই চলে গেছে। মারা যায় নি—গেলে খুশী হতেন জাহ্নবী। ছেড়ে গেছে। সেই লম্পট প্রৌঢ় ব্যারিস্টারের ছেলে, তার মনের সমস্ত পশুপ্রবৃত্তি নিয়ে জন্মেছে রতন। বরং শিক্ষার যে মুখোশটা ছিল ওর বাপের, সেটাও গড়ে ওঠবার সুযোগ

পায় নি। অবশ্য তাকে মানুষ করবার মতো বুদ্ধিও সেদিন ছিল না জাহ্নবীর—ইচ্ছাও না। ওদের ছেলেরা যেমন ভাবে বড় হয় তেমনি ভাবে সেও হয়েছে। অপরের সন্তান চোখের সামনে থাকলে পাছে অপূর্বর মনে কোন প্রতিক্রিয়া জাগে এই আশঙ্কায় জাহ্নবী তাকে সর্বদা অপূর্বর সামনে থেকে সরিয়ে রাখতেন। তার অস্তিত্বই জানত না অপূর্ব বহুকাল। প্রথম তারুণ্যের আবেগ-কম্পিত প্রণয়ে সে দিশেহারা—প্রতিদিন রাত জেগে বিবস্ত্রা জাহ্নবীকে মৃত্তিকায় রূপ দেবার সাধনায় সে তন্ময়, প্রণয়িনীর সন্তানের কল্যাণ-চিন্তা করার তার তখন বয়সও নয়।

তার ফলে ষোল বছর বয়সেই রতন সমস্ত রকম অপরাধে পরিপক্ক হয়ে উঠেছিল। পাড়ায় ছিল মুসলমানের বস্তী, তার দিনরাতের বেশী সময় কাটত সেইখানেই। তারপর জাহ্নবী যখন তার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে শঙ্কিত হয়ে কঠিন হ'তে গেলেন তখনই বাঁধন ছিঁড়ল। রতন একদিন গৃহ ত্যাগ করল। এমনি করে নি, মা'র হাজার ছয়েক টাকার গহনা নিয়ে একদিন সে উধাও হ'ল। আর কোনদিন ফেরে নি।

সেইটেই সৌভাগ্য বলে মনে করেন জাহ্নবী। হয়ত সে আজও বেঁচে আছে। হয়ত চুরি ক'রে জেলও খেটেছে এর ভেতর, তবু—তবু সে যে ফিরে আসে নি তার সেই কদর্য উপস্থিতি নিয়ে—কলঙ্কিত করে নি তাঁর ঘর, এই জন্যই তিনি তার কাছে কৃতজ্ঞ।...

চিত্রা তাঁর বহু বয়সের সন্তান সন্তান যে আর কোনদিন হবে এ কল্পনাও যখন তাঁর ছিল না, তখনই হঠাৎ সে এল ওঁর কোলে। চাঁদের মতো মেয়ে—মার সমস্ত রূপ এবং বাপের চিত্তের উদার প্রসন্নতা নিয়ে এল সে। তার প্রতি জাহ্নবী এবং অপূর্ব কারুরই মোহের অন্ত ছিল না। অতি যত্নে মানুষ ক'রে তুলেছিলেন ওঁরা মেয়েকে।

কিন্তু ওরই দুর্ভাগ্য, নইলে ওর বাপেরই বা মৃত্যু হবে কেন অত অল্প বয়সে?

চিত্রার যখন ন বছর বয়স তখনই হঠাৎ একদিন অপূর্ব মারা গেল মাত্র তিন দিনের জ্বরে। মারা গেল সে এখানেই—এই বাড়ি জাহ্নবীর নামে কিনে মনের মতো ক'রে সাজিয়েছিল অপূর্ব—জীবনের শেষ দশ বছর আর বাড়িতে যায় নি। ওর প্রকাণ্ড প্রাসাদের মতো বাড়িতে বাস করত ওর অসংখ্য কু-পোষ্য এবং জ্ঞাতি। উইল ক'রে বাড়িটা চিত্রার নামে লিখে দেবে এমন কথা অনেকবারই বলেছে—কিন্তু সেটা কাজে পরিণত হবার আগেই তাকে চলে যেতে হ'ল।

তবু শেষ কথা ওর চিত্রাই। তখন শ্বাস উঠেছে, তার মধ্যে হাঁপাতে হাঁপাতে বলেছিল অপূর্ব, 'বুঝতে পারছি না জান্থ, আর বাঁচব কিনা। যদি না বাঁচি তো যেমন ক'রেই হোক খুকীকে মানুষ ক'রো। সে যেন আমার মেয়ে বলে পরিচয়

দিতে পারে।'

সেই শেষ কথা, তারপরই কথা জড়িয়ে অস্পষ্ট হয়ে গেল।

কিন্তু সে কথা জাহ্নবী রাখতে পারেন নি বহুকাল। শোকে পাগলের মতো হয়ে গিয়েছিলেন। কত পয়সা নষ্ট করেছেন, কত ক্ষতি করেছেন নিজের এবং মেয়ের, তা তিনি জানেনও না। অন্তরের সমস্ত উন্মত্ত আবেগ দিয়ে তিনি ভালবেসেছিলেন অপূর্বকে, বোধ হয় অমন নিঃশেষে আর কেউ কোন দিন ভালবাসে নি। তাই তার ধাক্কা সামলাতেও দেরি হয়েছিল।

সে দিন বাঁচিয়েছিল এই কৈলাসই।

নানা উপলক্ষে—কারণে অকারণে অনেক অলঙ্কার তিনি উপহার পেয়েছিলেন তার স্বামী—হ্যাঁ, তাঁর স্বামীর কাছ থেকেই। সেগুলির কত ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলেন তিনি উপরের বারান্দা থেকে; কত দামী বিলাতী আয়না—লোহার শিক দিয়ে দিয়ে ভেঙে নষ্ট করেছিলেন। শেষে এই কৈলাসই দামী জিনিসগুলো বড় ঘরে রেখে তালাবন্ধ ক'রে রেখেছিল। চাবিটা রাখত সর্বদা নিজের কাছে। তাই আজও তিনি খেতে পাচ্ছেন।··

তবু, যখন কিছুটা প্রকৃতিস্থ হলেন, তখনও চিত্রার কোন ব্যবস্থা হয় নি। বোন যমুনাকে বাড়িতে এনে রেখে তার হাতেই চিত্রার ভার দিয়ে তিনি কৈলাসকে নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিলেন তীর্থযাত্রায়। ভারতময় বহু তীর্থ ঘুরে বৎসর দুই পরে একেবারে যেদিন ফিরলেন সেদিন দেখলেন যে চিত্রার লেখাপড়া শেখার কোন ব্যবস্থাই যমুনা করে নি—বরং এর আগে যেটুকু সে শিখেছিল এত দিনে তাও ভুলে গেছে। ওঁর মত না নিয়েই যমুনা বাড়িতে আরও দু-একটি ভাড়াটে বসিয়েছে। সেই সব বারাঙ্গনা এবং তাদের বাবুরা মিলে চিত্রাকে অধঃপাতে দেবার বেশ ভালরকম ব্যবস্থাই ক'রে তুলেছে। এখনই সে মুখে ঠোটে রং করতে শিখেছে, পান খাওয়া ধরেছে এবং যে সব ভাষায় কথা বলছে তা আর যাই হোক অপূর্ব মুখুজ্জের মেয়ের উপযুক্ত নয়।

সেদিন জাহ্নবী চোখে অন্ধকার দেখেছিলেন সত্যিই।

আর কোন দিন যে তিনি স্বামীর শেষ নির্দেশ পালন করতে পারবেন এ ভরসা ছিল না। বহু কষ্টে যমুনাকে তাড়িয়ে ভাড়াটেদের উঠিয়ে তিনি বাড়িটাকে পবিত্র করলেন। তারপর শুরু করলেন মেয়েকে ভদ্র করার তপস্যা।···চিত্রা তার বাপের স্বভাবের বহু গুণ পেয়েছিল তাই রক্ষা—ধীরে ধীরে সে কালির দাগ মুছে ফেলা সম্ভব হয়েছিল ওর।

লেখাপড়া শুরু করতে হয়েছিল প্রথম থেকেই আবার। তাই বহু বয়স হয়ে গেল চিত্রার ম্যাট্রিকুলেশনের কাছাকাছি এগিয়ে আসতে। খুঁজে খুঁজে এক বৃদ্ধ মাস্টারও বার করেছিলেন, রসরাজবাবু, এই পাড়ারই কোন এক ইস্কুলের নিচের ক্লাসে পড়ান তিনি। অপূর্ব বেঁচে থাকতে বহু দান ভদ্রলোক গ্রহণ করেছিলেন বহুবার—এই বাড়িতে বসেই। তিনি মাসিক দশ টাকা বেতনে চিত্রাকে পড়াতে আরম্ভ করলেন। কিন্তু তাঁর নিজেরও বিদ্যার দৌড় বেশি দূর নয়। তাই বৎসর কয়েক পড়াবার পরও দেখা গেল চিত্রা বেশিদূর এগোয় নি। তখন অন্য শিক্ষক দেখতে হ'ল। পর পর দুজন এলেন—মাস ছয়েক করে পড়ালেন। একজন বৃদ্ধ, তিনি এসে ওকে পড়তে বলে চেয়ারে বসেই ঘুমোতেন। আর একজন মধ্যবয়সী, তাঁর দৃষ্টি ষোড়শী চিত্রাকে দেখে লুব্ধ হয়ে উঠল।

এতে নানা অসুবিধা। পড়া এগোয় না। তখন রসরাজবাবুই প্রস্তাব করলেন 'ওকে ইস্কুলে দাও।'

তার যে সব বাধা আছে, যৎকিঞ্চিৎ অর্থ পেলেই সে সব বাধা তিনি দূর করতে প্রস্তুত আছেন। তবে এখান থেকে আনাগোনা করা চলবে না।—এখানে গাড়ি এলে ধরা পড়বে, গাড়ী না এলেও কৈলাস যদি নিত্য পৌঁছে দিয়ে আসে তো—নানাভাবে কথাটা ছড়াবে। পাড়ার লোকে কেউই জাহ্নবী তথা চিত্রার ভদ্রভাবে চলাটা প্রীতির চোখে দেখে না—তারা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে খবরটা পৌঁছে দিয়ে আসবে। সুতরাং হোস্টেলে দেওয়াই ভাল। প্রায় পঞ্চাশ টাকা করে মাসিক খরচ হবে, তা হোক, একমাত্র কন্যার ভবিষ্যতের জন্য জাহ্নবী সর্বস্বান্ত হতেও প্রস্তুত। তা ছাড়া ওঁর যা অলঙ্কার এবং টাকা ছিল তার অধিকাংশ নষ্ট হলেও যা এখনও আছে তাতে ঐ অঙ্কের জন্য চিন্তা করতে হবে না। দেওয়া হল এক ইস্কুলে। একেবারে থার্ড ক্লাসে ভর্তি হ'ল চিত্রা। এতদিনে সে জেনেছে তার পরিচয় এবং তার অবশ্যম্ভাবী দায়িত্ব। কারণ বাইরের জগৎ থেকে একরকম বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকলেও দু-বছর যমনার সাহচর্য এবং অপূর্বর কেনা তিন-চার আলমারি ঠাসা বই তাকে অনেক জ্ঞান দিয়েছে। তার বয়সও তখন কিছু হ'ল বৈকি ?

সুতরাং সে সাবধানেই ছিল। মিথ্যার প্রায় দুর্লঙ্ঘ্য বেড়া তুলে রেখেছিল তার নিজের চারদিকে। সতর্ক প্রহরায় থাকত ওর মন। তবু বৎসরখানেক না যেতে যেতে একদিন কথাটা প্রকাশ পেল। ভদ্র পাড়ায় যে সব ভদ্র তরুণরা চিত্রার রূপবহ্নিতে নিজেদের পতঙ্গ-মনকে পোড়াতে পারত তারাই নিজেদের ব্যর্থতার বিদ্বেষ-বহ্নিতে ওকে দহন করার জন্য এগিয়ে এল সাগ্রহে।

এক কথায়, সে ইস্কুল থেকে ওকে বিদায় নিতে হ'ল। তবে তাঁরাও সব শুনে ভদ্রতাই করেছিলেন। ওকেই অবসর দিয়েছিলেন ছেড়ে চলে আসবার। তারপর এক সরকারী ইস্কুল— সেখানে তিন মাস। আবার এই ইস্কুল—এটাও আধা সরকারী। এর ব্যয় সর্বাধিক—কিন্তু তাও টিকল না···নজর শুধু চিত্রার ওপর নয়, এ পাড়ার অনেক প্রৌঢ়েরও নজর ছিল জাহ্নবীর ওপর। জাহ্নবী এবং তার কাল্পনিক কুবেরের ঐশ্বর্য। এমন করে জাহ্নবী পৃথিবীর সামনে দুয়ার বন্ধ ক'রে থাকবেন—তা তাঁরা আশঙ্কা করেন নি। যা আছে তার চেয়ে অনেক বেশী শুনেছেন তাঁরা। আরও শত্রু আছে—সে আত্মীয়ের দল। এই হঠাৎ অভিজাত হয়ে ওঠাটা তারা পছন্দ করে নি। কোথা দিয়ে কার আক্রমণ কখন হচ্ছে তা কে জানে, কে বলতে পারে।···

জাহ্নবীর চোখের সামনে দিয়ে এই সমস্ত অতীত ও বর্তমান ইতিহাস ছবির মতো সবে সরে যায়। যে সব বেদনা, যে সব ব্যর্থতাকে—অন্তরের যে সব ক্ষতকে এতদিনে প্রায় ভুলতে বসেছিলেন তাই আবার নতুন ক'রে টনটনিয়ে ওঠে। ধারায় ধারায় চোখের জল ঝরে প'ড়ে তসরের ধুতিটা সিক্ত হয়। একসময় যেন আর থাকতে পারেন না,—বাতাস পান না কোথাও। নিঃশ্বাস যেন ফুরিয়ে আসে। বুকফাটা অথচ চাপা আর্তনাদে 'ঠাকুর' ব'লে মেঝেতে লুটিয়ে পড়ে সেই পাথরের মেঝেতে মাথা ঠুকতে থাকেন বার বার।

॥ দুই ॥

এরপর দুটো দিন কাটল অস্বাভাবিক এক মৌনের মধ্যে দিয়ে। অতঃপর কী হবে এবং কী করা উচিত, এ প্রশ্ন সহস্রবার ওষ্ঠের কাছাকাছি এগিয়ে এলেও সাহস করে উচ্চারণ করতে পারেন না জাহ্নবী—কোথা থেকে অসম্ভব একটা সঙ্কোচ এবং লজ্জা, অপমানের আশঙ্কা এসে কণ্ঠরোধ করে। চিত্রাও নিজে থেকে কিছু বলে না। সেই প্রথম দিন সন্ধ্যার পর থেকে আর সে চোখের জল ফেলে নি, খুব যে বিষণ্ণও দেখায় তাকে, তাও না। শুধু একটা অখণ্ড স্তব্ধতা যেন তার চতুর্দিকে বেড়া দিয়ে রেখেছে। সে খাওয়াদাওয়া করে সহজেই- সামান্য দু-একটা কথা কয়, অধিকাংশই কৈলাসের তুচ্ছ তুচ্ছ প্রশ্নের তুচ্ছতর জবাব। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। নিজের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা সম্বন্ধে সে যেন একেবারে নির্বিকার, উদাসীন। অবশেষে তিন দিনের দিন সমস্ত সঙ্কোচ ঝেড়ে ফেলে তিনিই প্রশ্ন করেন, 'হ্যাঁ রে, তাহ'লে কি হবে?'

'কিসের কি হবে ?'

নির্লিপ্ত কণ্ঠ—কিন্তু ওষ্ঠের প্রান্ত দুটো বিদ্রূপের ভঙ্গীতে যেন শানিত হয়ে ওঠে।

মাথা নিচু ক'রে বলেন জাহ্নবী, 'তোর পড়ার ?'

'হবে না।'

'হবে না ?' একটা হতাশা, কান্না যেন বেরিয়ে আসতে চায় জাহ্নবীর কণ্ঠস্বরে।

'কী করে হবে মা ?…বার বার তিনবার হ'ল—তবু তোমার চৈতন্য হ'ল না ? আরও কতবার দেখতে চাও তুমি ? তুমি চাইলেও আমি আর প্রস্তুত নই এইভাবে অপমানিত হ'তে যেতে। আমার সহ্যশক্তিরও সীমা আছে।…আর লাভই বা কি ? এখন পাশের পড়া পড়ছি—এখানে তিন মাস ওখানে দু মাস—এভাবে তো চলবেও না। ইস্কুলই বা কটা আছে কলকাতায় হোস্টেলওলা ?'

'কলকাতার বাইরে কোথাও যেতে চাস ?' থেমে থেমে যেন ভয়ে ভয়ে প্রশ্ন করেন জাহ্নবী।

'না। ওসব আর ভাল লাগে না। ডাক সেখানেও যায়।'

প্রায় পাঁচ মিনিট দুজনেই চুপচাপ। চিত্রার কোলে একখানা বই খোলা—মন না থাক দৃষ্টি সেদিকেই আছে। জাহ্নবী মেঝের দিকে চেয়ে বসে আছেন পাথরের মতো স্থির ভাবে।

'তবে, তুই এখন কি করবি ?' কোনমতে প্রশ্ন করেন।

'কী আবার করব। স্রোতে গা ঢেলে দেব—যা হবার হবে। আর কিছু ভাবব না। না ভাববারই চেষ্টা করছি কদিন ধরে প্রাণপণে।'

জাহ্নবী আরও অনেকক্ষণ ঐ ভাবে বসে থেকে থেকে একসময় উঠে চলে যান। কদিন ধরে কেঁদে তাঁর চোখের জলও বোধ করি ফুরিয়ে এসেছিল।

কিন্তু সেই দিনই পাশে শুয়ে জাহ্নবী কথাটা পাড়েন 'চিতু মা, আমার একটা কথা শুনবি ?' ওর মাথায় গায়ে হাত বুলোতে থাকেন সস্নেহে, ছেলেবেলার মতো।

'কি মা ?' চিত্রার কণ্ঠও নরম হয়ে আসে। সত্যিই তো, মা'র কি দোষ এর ভেতর ? অথচ এই ক'দিন তিনি যে যন্ত্রণা সহ্য করেছেন তা কি সে বুঝতে পারছে না !

'ছাখ্, তুই যখন প্রথম হোস, তখনই আমার মনে হয়েছিল—তোকে নিয়ে কী করব। যে পথে আমরা গিয়েছি সে পথে আমার জীবন থাকতে যেতে দিতে পারব না - তার আগে তোর গলা কেটে ফেলব নিজে-হাতে। এক বিয়ে—হ্যাঁ, আমাদের মধ্যে অনেকেই আজকাল ছেলেমেয়েদের বিয়ে দিচ্ছে বটে কিন্তু তার

কোনটাই সুখের হয় না। এই সব ঘরেরই তো ছেলেমেয়ে—এ পাপ যেখানে যাবে সেখানেই অশান্তি। তখনই এসব ভেবেছিলুম রে, আর মনে মনে ঠিক করেছিলুম, তোকে ঠাকুরের পায়েই সঁপে দেবো। তাঁর জিনিস তিনিই যা হয় করবেন! তাঁর সেবা করে, তাঁকে ধ্যান করে কাটাবি। একটা জীবন তো—কেটেই যাবে। সে কথা তাঁকে বলেও ছিলুম—তিনি হেসে উড়িয়ে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, হ্যাঁ—ঐ করে বুঝি একটা মানব জীবন নষ্ট করতে চাও? ওর আর সাধ আহ্লাদ নেই, না?·· সে হবে না। ওকে ভাল করে লেখাপড়া শেখাব, বিলেত পাঠাব। —ছেলেমেয়েদের জন্য কিছু একটা করবে ও, ওদের নিয়েই থাকবে। তারপর সৎপাত্র পায়, ওর মন চায় তো যাকে খুশি ও বিয়ে করবে।· ওঁর অন্তিম আদেশও ছিল তাই—সেই জন্যেই আমি আমার কথা তুলি নি, ওঁর ইচ্ছামতো কাজই করতে চেয়েছিলুম।'

আবেগে ওঁর কণ্ঠস্বর গাঢ় হয়ে এল। খানিকটা চুপ করে থেকে বললেন, 'ঠাকুরকে স'পে দেওয়া জিনিস ফিরিয়ে নিয়ে মানুষের ভোগ্যা ক রে তুলছিলুম, তাই হয়ত ঠাকুর বার বার সে চেষ্টা ব্যর্থ ক'রে দিচ্ছেন। কে জানে!'

'তুমি কি আমাকে সন্ন্যাসিনী করতে চাও মা?' একটুখানি চুপ ক'রে থেকে চিত্রা প্রশ্ন করে।

'সে তোর ইচ্ছা মা। আমি চাই এখন একটি সৎগুরু দেখে তোকে দীক্ষা দিতে। তুই এখন তাঁর কাছে পথ দেখে নিয়ে কিছুদিন সেই পথে চল্—তারপর তোর যা খুশি তুই তাই করিস। আশা করছি তাঁর পথ তিনিই দেখিয়ে একদিন তোকে টেনে নেবেন তাঁর কাছে।'

ভক্তিতে, বিশ্বাসে, হতাশায়, ব্যর্থতায় - জাহ্নবীর কণ্ঠস্বর আর্দ্র হয়ে এল।

অনেক—অনেকক্ষণ চুপ ক'রে রইল চিত্রা। জাহ্নবীর যেন মনে হ'লো এক যুগ। কত কী আশার সৌধ গড়ে উঠেছিল, কল্পনার আকাশপটে ওর মন কত কী চিত্র এঁকেছিল! তা আজ আর কিছু রইল না—সব মুছে গেল। প্রাসাদের এক-একটি প্রাকার খান খান হয়ে ভেঙে ছড়িয়ে পড়ল। চিত্রা বুঝি প্রাণপণে সেই বেদনাই সইছিল নিঃশব্দে।

আরও কতক্ষণ পরে সে বলল আস্তে আস্তে, 'তুমি যা ভাল বোঝ করো মা। আমি কিছু জানি না, আর ভাবতেও পারছি না।'

জাহ্নবী কি খুশী হ'লেন এ উত্তরে? এই আত্মসমর্পণই কি তিনি চাইছিলেন? তাও বোঝা গেল না। দুজনেরই বহুরাত্রি বিনিদ্র কাটল পাশাপাশি শুয়ে—কিন্তু

কেউই আর কোন কথা কইল না।

পরের দিন সকালে চিত্রা উঠল মন স্থির ক'রেই। আশা সব গেছে তা যাক—ওর বাবা যা চেয়েছিলেন, ওর নিজের মন এই অল্প কয় বছরের অভিজ্ঞতায় যে সুখ এবং ভবিষ্যৎ আশা করেছিল তা যখন হবার উপায় নেই তখন মাকে নিরাশ ক'রে লাভ কি? সত্যিই তো, ওরও একটা অবলম্বন চাই।

সন্ন্যাস? মন্দ কি?

সকালে চা ক'রে খেতে খেতে মাকে জিজ্ঞাসা করল, 'কার কাছে দীক্ষা নেব মা? তোমার গুরুদেব আছেন?'

'না রে, তা হ'লে তো ভালই হ'ত। তিনি দেহ রেখেছেন আজ বছর-তিনেক হ'ল।'

'তিনি তো সন্ন্যাসী ছিলেন, না?'

'হ্যাঁ, তবে জটাধারী নয়—এমনি।'

'কোন্ সম্প্রদায় মা?'

'তা অত জানি না বাপু। তবে ঐ রামকৃষ্ণ মিশনের মতোই ন্যাড়ামাথা গেরুয়া-পরা সন্ন্যাসী ছিলেন তিনি। অবশ্য ওঁদের সম্প্রদায় নয়। তাঁরই এক গুরুভাই ওঁদের আশ্রমটাশ্রম বাড়িয়ে মন্দিরটন্দির ক'রে খুব এক কাণ্ডকারখানা করেছেন। বল্ তো তাকেই ডাকি।'

'সে তুমি যা হয় করো। আমি ওর কীই বা জানি।'

সংবাদ পেয়ে সেই গুরুভাই, বসন্ত মহারাজ এসে উপস্থিত হলেন। বছর চল্লিশ বয়সের সমর্থ বলিষ্ঠ পুরুষ, হাসেন খুব জোরে জোরে, রসিকতা করেন নানা রকম—তার কোন-কোনটা আদিরস-ঘেঁষাও হয়ে পড়ে, খেতে ভালবাসেন প্রচুর—অর্থাৎ গেরুয়া কাপড় এবং ছোট ছোট খোঁচা খোঁচা চুল ছাড়া সন্ন্যাসের কোন লক্ষণ তাঁর নেই। তবু তাঁকে দেখে ভক্তি না হোক—ভাল লাগল চিত্রার। কথায় কথায় ব্রহ্মতত্ত্ব বা যোগের কথা তোলেন না—এইতেই সে খুশী। তা ছাড়া লোকটির হাসিতে এমন একটা জাদু আছে, ভাল না লেগে পারে না কারুর।

'কৈ গো জানু দিদি—কী হুকুম বলো! এই খুকী, চা দে শিগ্‌গির।' এসেই হুকুম করেন তিনি। জাঁকিয়ে বসেন একটা চেয়ার টেনে নিয়ে ঠাকুরঘরের সামনের ছাদে।

চিত্রা এসে গলায় আঁচল দিয়ে প্রণাম করে—বেশ ভক্তিভরেই। 'ইস্—এই সেই খুকী জাহ্নদি? · কত বড় হয়েছে গো!···ভেঙে পড়েছে যেন একেবারে। আয় আয়, দেখি তোকে, পালিয়ে যাস নি।'

চিত্রার একখানা হাত ধরে ফেলে টেনে কাছে নিয়ে আসেন। মাথায় পিঠে সস্নেহে হাত বুলোতে থাকেন। ছেলেমানুষের মতো আদর খেতে লজ্জাই করে চিত্রার, সে হাতে একটু মৃদু টান দিয়ে বলে, 'ছাড়ুন, আপনার চা নিয়ে আসি।'

'আলবৎ! যা যা—শিগগির যা। চা আর বেশ গরম গরম হিঙের কচুরি, কৈলাসকে আনতে বল্। তোদের এ পাড়ায় বেশ ভাল কচুরি পাওয়া যায় জানি।'

চিত্রা চলে গেলে জাহ্নবীর দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে বলেন, 'কী ব্যাপার বলে দিকি?'

জাহ্নবী একে একে সবই বলেন। এতদিনের সমস্ত অপমানের ইতিহাস।

শুনতে শুনতে বসন্ত মহারাজের মুখ গম্ভীর হয়ে ওঠে, 'ইস - এতদিন বলো নি কেন? স্কাউণ্ড্রেল সব, অসহায় মেয়েমানুষের অনিষ্ট না ক'রে থাকতে পারে না।'

ততক্ষণে চিত্রা ওঁর চা আর খাবার নিয়ে এসেছে। কৈলাস এসে একটা হালকা তেপায়াই পেতে দিয়ে গেল। তার ওপর খাবারগুলো নামিয়ে রেখে চিত্রা সেখানে ছাদের ওপরই বসল ওঁর পায়ের কাছে।

চা খেতে খেতে মহারাজ ওকে বললেন 'তোমার মা কেন ডেকে পাঠিয়েছেন আমাকে, জানো চিতু?'

চিত্রা ঘাড় নেড়ে জানাল তা সে জানে।

'তোমার কি মত?'

'আমার মত তো ছিলই। মা আমাকে আগেই জিজ্ঞাসা করেছেন।' চিত্রা বলে আস্তে আস্তে।

'হুঁ।' নিঃশব্দে কয়েক মিনিট ধরে চা পান করেন মহারাজ। দৃষ্টি ওঁর চিত্রার সর্বাঙ্গে ঘুরে বেড়ায়।

কিছুক্ষণ পরে কাপ নামিয়ে রেখে সোজা হয়ে বসেন। বেশ শান্ত গাম্ভীর্যের সঙ্গে বলেন ধীরে ধীরে, ভাখো,, তুমি অনেক বই পড়েছ। ·সাধারণ স্কুলের ছাত্রীদের মতো নও। বয়সও হয়েছে ঢের। দীক্ষা জিনিসটা সোজা নয়। বিশেষত এই কাঁচা বয়স, সারা জীবনই এখন তোমার সামনে পড়ে। দীক্ষা নেওয়া অর্থে একেবারে একটি নতুন জীবন শুরু করা, নতুন রাজ্যে প্রবেশ করা। ধরো আমি যদি তোমার গুরু হই—আমাকে তোমার সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে শ্রদ্ধা করতে হবে—কখনও কোন

কারণে অশ্রদ্ধা বা উপেক্ষা যদি কর তো তোমার ক্ষতি হবে মানে আধ্যাত্মিক জীবনের ক্ষতি। আমাকে কি তুমি গুরু হিসাবে শ্রদ্ধা করতে পারবে? ভাল ক'রে ভেবে ছাখো—'

কথাগুলো ভালই লাগে চিত্রার। পেশাদারী গুরু সম্বন্ধে যেমন ধারণা ছিল তার সঙ্গে মেলে না।

মহারাজ আরও বলেন, 'এটা যদি তোমার অগত্যা হয় তো তার দরকার নেই। কলকাতার কোন বড় ইস্কুলে নিয়ে গিয়ে আমি ভর্তি করে দিচ্ছি, তাদের কাছে তোমার সব পরিচয় দিয়েই রেখে আসব-তাদের অবশ্য হোস্টেল নেই কিন্তু অন্য একটা ছাত্রী-নিবাসের সঙ্গেও জানাশুনো আছে, সেখানেও রাখার ব্যবস্থা করতে পারি···সেখানকার লেডী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আমাদের শিষ্যা—কোন গোলমাল হবেনা। বেশ ভালো ক'রে ভেবে ছাখো—কোন পথে যাবে! যা চাও ক'রে দিতে পারি। ভেবে-চিন্তে মন স্থির ক'রে কাজ করো।'

এক ঝলক দক্ষিণা বাতাস কি উঠল শীতের স্পন্দনহীন স্তব্ধতায়? শ্রাবণের অবিশ্রাম বর্ষণের পর সাদা মেঘ আর সোনালী রোদে কি জাগল মনের আকাশে?

চিত্রার দৃষ্টি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে—লোভে ও প্রত্যাশায়। উৎসুক হয়ে চায় সে মা'র মুখের দিকে। জাহ্নবী তার মুখের দিকে চেয়ে আছেন উদ্‌গ্রীব হয়ে। তাঁর চোখে আশঙ্কা, মিনতি। আশা ও আশঙ্কার দ্বন্দ্ব তাঁর সুন্দর ললাটের প্রত্যেকটি রেখায় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

বাবা মারা গেছেন। তাঁর ইচ্ছার চেয়ে মা'র ইচ্ছার মূল্য ঢের বেশী। বড় করুণ দেখাচ্ছে মা'র এই অসহায়, উৎকণ্ঠা ভাবটি।

চিত্রা মাথা নিচু করে বলল, 'আপনি দীক্ষাই দিন।'

'উঁহু—উঁহু, অত জল্‌দি নয়। আজ তোমার কাছ থেকে কোন উত্তরই নেবো না। কাল তো আছি—আজ সারারাত ভাবো, কাল সমস্ত সকাল—তারপর জবাব নেব। কোন প্রভাব, কারও কোন মনোরঞ্জনের কথা তোমার বিবেচনা করার দরকার নেই, চিতু।'

তারপর একটু চুপ ক'রে থেকে বললেন, 'অবশ্য ভাববে যখন—তখন সব প্রস্ এবং কন্‌স্ ভেবে দেখাই ভালো। এই দীক্ষার দ্বারা কোন বিধিনিষেধ তোমার ওপর চাপাব না। খাওয়া নয়-বেশভূষা নয়—কোন কিছুতেই তোমার স্বাধীনতা খর্ব করতে চাই না। ওসব আমি মানিও না। দীক্ষা নিচ্ছ বলে ভয় পাবার কিছু নেই।'

বসন্ত মহারাজকে আরও ভাল লাগে চিত্রার। বেশ মানুষটি—স্পষ্টভাষী, সাদা-

সিধে। গুরু বলে ভয় পাবার মতো কিছু নয়।

ওসব প্রসঙ্গ ছেড়ে বসন্ত মহারাজ অন্য গল্প শুরু করেন। ওঁদের আশ্রমের গল্প। উনি এবং আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা রবিন মহারাজ দু'জনেই আগে রামকৃষ্ণ মিশনে ছিলেন। কিন্তু বনল না তাঁদের সঙ্গে। বসন্ত মহারাজ বললেন, 'ওঁদের কেবল কাজ আর কাজ। আরে, সন্ন্যাসী হয়েছি কি শুধু কাজ করবার জন্তেই! তাহলে তো ভাল দেখে একটা চাকরিবাকরি কিংবা ব্যবসা-বাণিজ্য ফেঁদে বসতে পারতুম। আধ্যাত্মিক জীবনে কিছু কাজ করব বলেই তো গেরুয়া নেওয়া—নইলে আমাদের অভাব কী? আমাদের কি আর খাওয়া-পরার অভাব ছিল বাড়িতে যে, খেটে খাওয়ার জন্য গেছি ওখানে? রামো!

আশ্রম তাঁরা করেছেন বি-এন্-আর লাইনের কী একটা স্টেশনের কাছে এক নিভৃত গাঁয়ে। চিত্রা প্রশ্ন করলে, 'তা ঐ অজ পাড়াগাঁয়ে গেলেন কেন? নির্জনে সাধন-ভজন করার কি আর জায়গা ছিল না?'

'না—ঠিক নির্জন হ'লেই তো হবে না! অত সস্তায় অত জমি আর কোথায় পাবে? এক মারোয়াড়ী হাজার-দুই টাকা দিয়েছিল—তাইতে রবিন মহারাজ খুঁজে খুঁজে ঐখানে গিয়ে একেবারে পঞ্চাশ বিঘে জমি পেলেন—মোটে পাঁচশ' টাকায়। ঐ টাকাতেই কোনমতে একখানা কুটির বেঁধে ওখানে গিয়ে চাপা হয়েছিল। অবশ্য আজ, বলতে নেই, সাড়ে বারোশ বিঘে জমি করেছি আশ্রমের। দেড়শ' ঝাড় শুধু কলাগাছই আছে। আম কাঁঠাল—নেই কি? ধান ধরো, সম্বচ্ছরের চাল হয়েও কিছু বিক্রী করা যায়। খরচও তো কম নয়—এক একটা উৎসবে আশে-পাশের গ্রাম থেকে সব যারা আসে—সবাই প্রসাদ পায়। সে পঁচিশ মণ ত্রিশ মণ চাল উড়ে যায় এক এক দিনে।'

'বলেন কি? সে যে ভাতের পাহাড় হবে!'

'হবে বৈকি ভাই। ভাই বলি তোকে—এখনও পর্যন্ত তুই হলি নাতনী সম্পর্ক। ওসব না হ'লে তো চলে না। ওরা হ'ল গোলা লোক—ওরা বোঝে একটা ঠাকুর-দেবতার মন্দির, বোঝে প্রসাদ পাওয়া। সে জন্যে ঢালাও প্রসাদের বন্দোবস্ত করেছি যে কোন উপলক্ষে—আর মন্দিরটিও করেছি মনের মতো।'

'তা তাদের ভোলাবার দরকারই বা কি?

'আরে ভাই, নইলে কি আর আশ্রম টেঁকে! ওদের কাছ থেকে কত কি' সুবিধা আদায় করতে হয়। জমি কি আর এমনি বেড়েছে, না ঘর দোর পুকুর পুষ্করিণী এমনি হয়? কলকাতার বাবুরা যে কত তালেবর তা তো জানো না!'

'কিন্তু অত আপনাদের দরকারই বা কি ছিল? আপনারা চেয়েছিলেন নির্জনে সাধনা করতে, তার জন্য এত কাণ্ড করার দরকার কি।...এতেও তো ঝঞ্চাট কম নয়। আপনারা কাজের জন্য মিশন ছেড়ে এলেন, এও তো সে কাজেরই ব্যাপার—'

'হ্যাঁ তা অবশ্য বটে,' একটু যেন অপ্রস্তুত হয়ে পড়েন মহারাজ, 'তবে কি জানিস, এ অন্য ধরনের কাজ। আমরা যে অভাবটা বোধ করেছিলুম, আমাদের পরে যারা আসবে তারা সেটা না পায়—এই ছিল ইচ্ছা। নিশ্চিন্ত আহার আর আশ্রয় পেয়ে কত লোক তার আত্মার উন্নতি ক'রে নিতে পারবে—'

'তবু, অত সম্পত্তি দেখাশুনো করা তো সোজা নয়—তাদেরও খাটতে হবে।'

'তা হোক—আর ধরো, যারা আসে তারাও তো উপদেশ-টুপদেশ পায়—কথকতা কীর্তন এসব শোনে, তাদেরও তো খানিকটা কাজ হয়।'

এরপর তিনি একরকম জোর ক'রেই অন্য সব কথা তোলেন। হালকা হালকা কথা। ওখানে যারা ওঁদের জমিতে চাষ করে তাদের নানা রকমের হাস্যকর মূর্খতা, মানুষগুলোর নানা রকম কুসংস্কার। ওঁদের আশ্রমের কত শিষ্য হয়েছে—তাদের মধ্যে কজন পাঞ্জাবী আছে। মাদ্রাজীও আছে। এই সব ছোটখাটো গল্পে ও হাস্য-পরিহাসে সন্ধ্যা নিবিড় হয়ে আসে। জাহ্নবী পূজায় বসেছেন, শ্রোতা শুধু চিত্রা একাই। তাতে অবশ্য মহারাজের উৎসাহ কমে না। তিনি গল্প করতে করতে মধ্যে মধ্যে হেসে ওঠেন আর জোরে জোরে চিত্রার পিঠে একটা ক'রে কিল মারেন, নয়ত মাথাটা ধরে ঝাঁকি দিয়ে দেন।

॥ তিন ॥

চিত্রা সারারাত ধরেই ভাবল, গভীর ভাবে ভাবল। কিন্তু মাকে ক্ষুণ্ন করতে ওর মন চাইল না...তাছাড়া ওর যে নিজেরও একটা খুব প্রবল আপত্তি আছে দীক্ষা বা সাধনা সম্বন্ধে, তাও না। মন্দ কি, যদি নতুন পথের সন্ধান পাওয়া যায় তো ভালই।

সুতরাং মাসখানেকের মধ্যেই ওর দীক্ষা হয়ে গেল। বসন্ত মহারাজ দীক্ষা দিয়ে দু'দিন ধরে নানা উপদেশ দিয়ে জাহ্নবীর কাছ থেকে আশ্রমের প্রণামী বাবদ শ-দুয়েক টাকা নিয়ে চলে গেলেন।

চিত্রা দীক্ষাটা খুব অন্তরের সঙ্গেই নিতে চাইল।

সে মন দিয়ে জপ করে মন্ত্র, ধ্যান করতে চায় একাগ্র হয়ে। সকালবেলাই

মধ্যাহ্ন-সন্ধ্যা সেরে রাখে না। ত্রিসন্ধ্যা আহ্নিক করে নিয়মমতো। মধ্যাহ্ন-সন্ধ্যা সেরে জল খায়। কৃচ্ছ্রসাধনের অন্ত নেই। মনে মনে অহরহ ইষ্টকে ধারণা করার চেষ্টা করে। বই পড়ার ইচ্ছা হলে ধর্মগ্রন্থগুলো প'ড়ে অর্থ বোঝবার চেষ্টা করে।

এইভাবে মাস তিনেক কাটল। জাহ্নবী খুশী হন—একটু নিশ্চিন্তও হন। প্রতিদিনই নিজের পূজার সময় আর একবার ক'রে মিনতি করেন নিজে ইষ্টের কাছে—ওকে বার বার সঁপে দেন তাঁর চরণে। 'ওকে তুমি তোমারই কাজে লাগাও ঠা'কুর। বিকশিত পদ্মটি তোমারই পুজোয় লাগুক।' আনন্দের সঙ্গে লক্ষ্য করেন, কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনে একটু কৃশতা এসেছে চিত্রার দেহে, মুখখানিতে লেগেছে তপশ্চর্যার একটা জ্যোতি। ওর দৃষ্টিও হয়ে এসেছে অন্তর্মুখী, গভীর। খুশী হন মনে মনে জাহ্নবী, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেন।

কিন্তু যত দিন যায়—চিত্রা খুশী হ'তে পারে না, নিশ্চিন্ত তো নয়ই। কোথায়, মনের কোন্ গহনে বুঝি সংশয়ের একটা অদৃশ্য বীজ ছিল, তাই একটু একটু ক'রে অঙ্কুরিত হতে থাকে।

ও কি একটুও এগোতে পেরেছে ওর ঈশ্বরের কাছে? এগোতে কি চায় ও আসলে?

ইস্কুলের কথা মনে পড়ে, দিদিমণিদের কথা—সুনীতিদি, লীলাদি, করুণাদি, লতিকাদি—ওর বন্ধুদের কথাও মনে পড়ে যায়। মনটা যেন চঞ্চল হয়ে ওঠে। ইস্কুল থেকে পাস করে কলেজে উঠতে পারত—সেখান থেকে আরও উন্নতি হ'ত—হয়ত বাবার আশা পূর্ণ ক'রে একদিন বিলেত যাওয়াও অসম্ভব হ'ত না।

এক কথায় বাইরের বিপুল বিশ্ব ওকে ডাকে। জীবনের নানা রস, নানা সম্ভাবনার আকর্ষণ ওর অন্তরের সমুদ্রে জোয়ার আনে—উদ্বেল হয়ে ওঠে ওর চিত্ত।

তবে কি এসব ব্যর্থ হচ্ছে? ওর মন কোনদিন এ তপস্যায় বসবে না, সিদ্ধি আসবে না ওর কাছে? গুরুদেব বলেছিলেন, 'একটু একটু ক'রে মন আপনিই বসবে—দেখবি এ কী আনন্দের জিনিস, তখন আর চেষ্টা করতে হবে না।'

কিন্তু কৈ, মন তো বসে না! কোন আনন্দই তো সে পায় না—যে আনন্দের তাগিদে আরও এগিয়ে যাওয়া যেত!

তবু চিত্রা হাল ছাড়ে না। আরও কঠিন, আরও দুরূহ কৃচ্ছ্রসাধনের জন্য প্রস্তুত হয় সে। গুরুদেব যদিও বলে গেছেন, 'খাওয়ার জন্যে কিছু ভাবিসনি, যা ইচ্ছে হয় সব খাবি। খাবারের মধ্যে ভগবান নেই—' তবু ও মনে মনে সংকল্প করে—ঐ দিকেই সংযম আনতে হবে। সে হবিষ্যি শুরু ক'রে দেয়। তৃতীয় প্রহরে শুধু হবিষ্যান্ন

—রাত্রে একটু দুধ। মা উদ্বিগ্ন হয়ে বললেন, 'হ্যাঁরে, অমন করলে তোর শরীর টিকবে কেন? এসব কি শুরু করলি?'

চিত্রা হাসিমুখে উড়িয়ে দেয়, 'এতে আমার কোন ক্ষতি হবে না মা- বরং স্বাস্থ্য ভাল হবে, তুমি দেখো—'

এমনি ক'রে আরও মাসখানেক কাটবার পর হঠাৎ একদিন বসন্ত মহারাজ এলেন শিষ্যার খবর নিতে।

'কী রে, এ আবার কি চেহারা ক'রে ফেলেছিস? ব্যাপার কি বল দিকি?'

জাহ্নবী নালিশ করেন, 'খাওয়া-দাওয়া তো ছেড়েই দিয়েছে একেবারে। একবেলা হবিষ্যি—রাত্রে একপো দুধ শুধু। ফল না, মিষ্টি না—কিছু না। একটু ছানা পর্যন্ত খাওয়াতে পারি না।

বসন্ত মহারাজ ঘাড় নেড়ে বলেন, 'না না—এত বাড়াবাড়ি তো ভাল নয় চিত্রু। এমনটা করবার দরকার কি এখন থেকে?'

চিত্রা স্থির দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ ওঁর মুখের দিকে চেয়ে থেকে বলল, 'এ পথের সমস্তটাই দেখে নিতে চাই ভাল ক'রে। কোথাও কোন ত্রুটি না থাকে।'

'তারপর?'

'তার পরের কথা পরেই ভাবব।' চিত্রা ঠাকুরঘরে গিয়ে ঢুকল। গুরুদেব দিন-দুই ওখানে থেকে নানা উপদেশ দিয়ে গেলেন। মনকে কেমন ক'রে অভিনিবিষ্ট করতে হবে সাধনায়, কেমন ক'রে বিক্ষিপ্ত মন নিজেকে বহির্জগতের নানা পাত্র থেকে গুটিয়ে এনে ইষ্টের পদে সমাহিত করতে হবে—তারই নানা উপায়।

চিত্রা একান্ত ভাবে চেষ্টা করে, গুরুদেবের প্রত্যেকটি উপদেশ নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে,—নিখুঁতভাবে।...

আরও এক মাস যায় এইভাবে। সবসুদ্ধ সাড়ে তিন মাস সময় কাটে।

হঠাৎ একদিন চিত্রা তার মাকে এসে বলে, 'হ'ল না মা।'

ছাঁৎ ক'রে ওঠে জাহ্নবীর বুক।

'কী হ'ল না রে?'

'তোমার এ সাধন-ভজন নিয়ে থাকা হ'ল না।'

'সে কি! এরই মধ্যে কী ক'রে জানলি যে হ'ল না? চেষ্টা কর আর একটু—তবে তো বুঝবি।' মুখে বলেন বটে কিন্তু মেয়ের মুখে দৃঢ় প্রতিজ্ঞার যে রেখাটি ফুটে উঠেছে সেটাকে উনি চেনেন। বুঝতেই পারেন মনে মনে যে আর হ'ল না।

চিত্রাও সেই কথাই বলে, 'ঢের দেখলাম মা। ও নিয়ে কাটাতে আমি পারব না।

বহু চেষ্টাতেও তার কোন স্পর্শ আমি পেলাম না মনের মধ্যে। তাঁর প্রতি সে আকর্ষণও অনুভব করতে পারলুম না– যাতে আরও কিছুদিন চেষ্টা করতে পারি। সবটাই আমার দারুণ আত্মপ্রবঞ্চনা বলে মনে হয়।'

তারপর সামান্য একটু হেসে বললে, 'বুদ্ধদেবের মতো—তপস্যা বৃথা জেনে কদিন ধরে বসে শুধু চিন্তা করেছি—অবশ্য বোধি-বৃক্ষতলে নয়, ইট কাঠের ছাদের নিচেই। ..তাঁর মতোই আমি পথ দেখতে পেয়েছি চিন্তা ক'রে ক'রে—তবে সেটাও বৈরাগ্যের পথ নয়। আমি আবার স্কুলেই ভর্তি হবো।'

'কিন্তু—' বাধা দিয়ে জাহ্নবী কি বলতে গেলেন, কথা শেষ করতে দিল না চিত্রা। বললে, 'আর কিন্তুতে কাজ নেই মা, আমি গুরুদেবকে চিঠি লিখে দিয়েছি –তিনি হয়ত কালই এসে যাবেন।'

বসন্ত মহারাজ সত্যিই পরের দিন এসে হাজির হলেন। সব শুনে জাহ্নবীকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, 'তুমি দুঃখ ক'রো না, ও যে আত্মপ্রবঞ্চনা করে নি এতে আমি খুশই হয়েছি। চেষ্টার তো ত্রুটি করে নি ও। ছেলেমানুষ বলেই সত্যটাকে এত সহজে স্বীকার করতে পারলে, তুমি আমি কি আর পাচটা বুড়ো লোক হ'লে ভণ্ডামী-টাকেই আঁকড়ে ধরে থাকতুম, নিজেকেও ঠকাতুম, দুনিয়ার লোককেও ঠকাতুম।—তার চেয়ে এ ঢের ভাল হ'ল। বীজ তো রইল ওর মনের মধ্যে, সময় হ'লে অঙ্কুরিত হবেই। ভয় কি? তার সময়ের হিসেব যে আলাদা!'

তিনি চিত্রাকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে গিয়ে একটা বড় মেয়ে-ইস্কুলে ভর্তি ক'রে দিয়ে এলেন। গোয়াবাগানের কাছে একটা ছাত্রীনিবাসে থাকার ব্যবস্থাও ক'রে দিলেন, যাতে পূর্বের নাটক পুনরভিনীত না হ'তে পারে। ঠিক হ'ল পরের দিনই চিত্রা মালপত্র নিয়ে ছাত্রীনিবাসে চলে যাবে।

জাহ্নবী সারাদিন স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন। তিনিও ভাবছেন বৈকি। তার ইচ্ছাও কি একদা তার স্বামীর পথ ধরে যায় নি? সেটার ব্যর্থতাকে তিনি ঠাকুরের ইচ্ছা বলে মনে ক'রে মনকে এতকাল ভুলিয়ে রেখেছিলেন; কিন্তু ঠাকুরের ইচ্ছার দোহাই যখন আর রইল না, তখন মনের মধ্যে আসল বাসনাটাই বড় হয়ে উঠল।

মেয়েকে মানুষ করতে হবে। ওর বাপের মনের মতো ক'রে। কিন্তু তার জন্য কঠোর আত্মত্যাগ দরকার তাঁর নিজের তরফ থেকে।

সন্ধ্যাবেলা তিনি চিত্রার সামনেই বসন্ত মহারাজের কাছে হাত জোড় ক'রে বললেন, 'মহারাজ, শুধু মেয়ের ব্যবস্থা করলেই চলবেনা—মায়ের ব্যবস্থা ক'রে দিন।'

'সে কি, তোমাব আবার কি ব্যবস্থা ?'

'আমি এখানে আর থাকব না।'

'থাকবে না ? কোথায় যাবে ?'

'যেখানে হোক। কোন একটা তীর্থে আমার একটু থাকবাব ব্যবস্থা করে দিন। বাড়ির দুটো ঘর থাকবে, জিনিসপত্র একটায আব একটায যদি কখনও ছুটির সময় চিতু এসে থাকতে চায তো থাকবে। বাকী বাড়িটা ভাড়া দিয়ে দেব। সেই টাকাতেই চিতুর খবচ চলে যাবে।'

চিত্রা কাছে সবে এসে মা'ব গলা জড়িয়ে ধরে বললে, 'তুমি কি আমাব ওপর বাগ ক'বে চলে যাচ্ছ মা ?'

'বরং ঠিক তাব উল্‌টো বে ! আমি এখানে থাকলে তোর মঙ্গল হবে না। তোকে উঠে দাঁড়াতে হবে নিজেব ওপর ভব করেই। তোব সেই নতুন পবিচযেব মধ্যে আমাব কোন সংস্পর্শ, কোন ছাযা না থাকে। তাই আমি নিজেকে সরিয়ে নিচ্ছি। এখানে থাকলে তোব সঙ্গে আমাব সম্পর্ক বেরিয়ে পডবেই। তুই আর আমার দিকে চাস নি মা। তোব পথ সামনের দিকে, তুই সেইদিকেই এগিযে যা। স্তাখ, চেষ্টা ক'বে যদি তোব বাপেব স্বপ্ন সফল করতে পাবিস। আর সে তো আমারও আনন্দেব হবে মা। কি হবে মিছিমিছি আমাকে জড়িয়ে থেকে।'

'তোমাব মা মিছে বলে নি চিতু। আমাব মনে হয এই পবামর্শই সব থেকে ভালো।' বসন্ত মহাবাজ সান্ত্বনা দেন।

বসন্ত মহাবাজ চিঠি লেখালেখি ক'বে পুবীতে কোন এক মঠে জাহ্নবীব থাকার জন্য একটা ঘব ঠিক ক'বে দিলেন। কৈলাস সঙ্গে যাবে ঠিক হ'ল। ভাড়াটেও পাওযা গেল প্রায সঙ্গে সঙ্গেই—দোতলায় দুটো ঘব বন্ধ বেখে বাকি সব ঘরগুলো ভাড়াটেদের ছেড়ে দেওযা হ'ল। সমস্ত ব্যবস্থা ঠিক ক'রে দিন পনেবোব মধ্যেই জাহ্নবী পুবী চলে গেলেন।

যাবাব দিন দেখাও ক'বে গেলেন না চিত্রাব সঙ্গে। বললেন, 'মিছিমিছি মায়া বাড়িয়ে লাভ নেই। জন্মাবধি আমাকে আঁকড়ে ধরে আছে– চোখের সামনে বিদায় দিতে গেলে বড্ড আঘাত লাগবে। আমারও তো তাই তাব চেয়ে এই ঢের ভাল। আপনি আমার কথা বলে দেবেন মহারাজ, বলবেন যেখানেই থাকি, আমার আশীর্বাদের কোন মূল্য আছে কিনা জানি না—তবে সে আশীর্বাদ নিত্যই তাকে করব আমি। ঈশ্বব তাকে রক্ষা করবেন।'

॥ চার ॥

এর পরের দু-তিনটে বৎসর কাটল এক রকম একটানা ভাবেই। চিত্রা মন দিয়ে পড়াশুনো করে। ওখানে ওকে প্রাইভেট পড়ানোর জন্য মাস্টারও ঠিক ক'রে দিয়েছেন ছাত্রীনিবাসের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট শান্তিদি, জাহ্নবীর অনুরোধে ও অর্থে। কিন্তু জাহ্নবী দেখা করেন নি আর একবারও। মেয়েকেও দেখা করতে দেন নি।

এক একবার চিত্রার অসহ্য লাগত। দীর্ঘকাল ধরেই মা ছাড়া ওর জীবনে আর কেউ ছিল না। আজও নেই। ওর সঙ্গে যারা পড়ে তারা অধিকাংশই ওর চেয়ে বয়সে অনেক ছোট। তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয় না। এখানে ছাত্রীনিবাসে যারা আছে তাদের মধ্যে সমবয়সী হয়ত আছে—কিন্তু তারা কেউ ফার্স্ট ইয়ারে পড়ে কেউ সেকেণ্ড ইয়ারে। সেইটুকু ব্যবধানের জন্যে তারাও চিত্রার সঙ্গে মিশতে পারে না ভাল ক'রে। তাছাড়া বেশীর ভাগ মেয়েই কেমন যেন চটুল হাল্‌কা প্রকৃতির। কোন জিনিস গভীর-ভাবে ভাবা তাদের অভ্যাস নেই, শক্তিও নেই। অথচ চিত্রার প্রকৃতিকে ঈশ্বর নানা আঘাতে পোড় খাইয়ে চিন্তাশীল ক'রে তুলেছেন। সে চায় কোন গভীর সখ্যতা। যে বন্ধুত্ব সুখে দুঃখে অটল থাকবে, যে বন্ধুত্বে কথা বলবার দরকার নেই—অন্তরের কথা অন্তরে যেখানে পৌঁছে যায় আপনিই। কিন্তু এদের কাছে সেটা আশা করাই মূর্খতা।

সবচেয়ে বিশ্রী লাগত ছুটির দিনগুলো। পূজা বা গরমের দীর্ঘ অবকাশ যেন কাটতে চাইত না কিছুতেই। অন্য ছাত্রীরাও বিস্মিত হ'ত। পূজোর সময় ঠাকুর-চাকররা পর্যন্ত থাকত না। শান্তিদির ঝি রান্না করত, সেখানেই খেত চিত্রা। বাড়িতে একটা ঘর ওর ছিল বটে কিন্তু সেখানে গিয়ে থাকতেও ইচ্ছা করত না। ও বাড়িতে মা নেই অথচ সে থাকবে—যেন ভাবতেই পারা যায় না। আর মা-ই যখন নেই, তখন ও পাড়ার স্মৃতি জাগাতে গিয়ে লাভ কি? এক বাড়ি অপরিচিত লোকের মধ্যে—সে বিশ্রী।

একেবারে শেষ বৎসর, পূজার ছুটিতে মা'র কাছ থেকে অনুমতি এল 'বুকে একটা কি ব্যথা ওঠে চিতু, ঠিক বুঝতে পারি না। হয়ত আর বেশীদিন মেয়াদ নেই, তুই বরং একবার আয়, তোকে দেখি। প্রতিদিনের প্রতি মুহূর্ত তোকে দেখতে ইচ্ছা করে, সেই ইচ্ছা চেপেই হয়তো এই বুকের অসুখ। আয় একবার।'

চিত্রার মুখ শুকিয়ে ওঠে, বুক কাঁপতে থাকে। মা'র যদি কিছু হয়? বাপ্‌রে, ভাবতেও পারা যায় না। পুরীতে গিয়ে দেখলে সত্যিই মা'র চেহারা খারাপ হয়ে

গিয়েছে। চিনতে পারা যায় না যেন। অমন সুন্দর মেঘের মত চুল—কাঁচাপাকায় কী রকম হয়ে উঠেছে। সোনার রং পুড়ে কালো হয়ে গেছে। রোগাও হয়ে গেছেন খুব। ব্যথাটাও নাকি আজকাল রোজই ওঠে একবার ক'রে—যখন-তখন। যখন ওঠে তখন আর মনে হয় না যে বাঁচবেন। চোখেও দেখল চিত্রা। যেদিন পৌঁছল সেদিনই রাত আড়াইটের ব্যথা উঠল। উঃ, সে কষ্ট যেন দেখা যায় না। চোখ ঠেলে বেরিয়ে আসে, দর দর ক'রে ঘামতে থাকেন, বাতাস ক'রেও সে গরমে কিছু হয় না। কিছুতেই যেন নিঃশ্বাস নিতে পারেন না। একেবারে ঘণ্টাখানেক পরে সে ব্যথা ছাড়ল। ক্লান্ত হয়ে, প্রায় অজ্ঞানের মতো হয়ে এলিয়ে পড়লেন জাহ্নবী। এই যন্ত্রণা একাই সহ্য করেন! কৈলাসও নেই, এখানে আসার মাসখানেকের মধ্যেই সে মারা যায়।

ডাক্তার যে ডাকা হয় নি তা বলাই বাহুল্য। চিত্রা পরের দিন জোর ক'রে ডাক্তার ডাকল। ডাক্তার এসে বললেন, 'খুব সম্ভব পেটে গ্যাস হয়—তাই থেকেই এ ব্যথা। খুব নিয়মিত থাকা দরকার।' অবশ্য ওষুধ এবং জোলাপও দিয়ে গেলেন কিছু কিছু।

কিন্তু নিয়মিত চলবে কে? জাহ্নবী রান্না করেন না। মন্দির থেকে প্রসাদ আসে। প্রত্যহ উনি স্বর্গদ্বার থেকে মন্দির—দেড় মাইল হেঁটে মন্দিরে যান—আবার খর-রোদে বেলা বারোটা নাগাদ ফেরেন। এসে শুধু একটা ডাব খেয়ে শুয়ে থাকেন। প্রসাদ আসে কোনদিন বেলা তিনটেয়, কোনদিন চারটে পাঁচটাও হয়। তিনটেয় খুব কম। সেই প্রসাদ খান—দিনরাতে ঐ একবার। এ নিয়ম তিনি পালটাতে রাজী নন।

চিত্রা ব্যাকুল হয়ে বলে, 'তুমি কি আত্মহত্যা করতে চাও মা!'

'ছি মা! ও কথা বলতে নেই। জীবনের ওপর মমতা নেই এটা সত্যি কথা—তবে ইচ্ছে ক'রে মরব না।'

'একটা ঠাকুর রাখি—সকাল ক'রে তোমায় রেঁধে দেবে।'

'না না, আর ঝঞ্ঝাট বাড়ালে এসব আমার সইবে না।'

'বেশ, যে কটা দিন আমি আছি রেঁধে দিই। আমার তো দীক্ষা হয়েছে, আমার হাতে খেতে তো আপত্তি নেই!'

'যে কটা দিন আছি প্রসাদই পেয়ে যাই। কেন তা থেকে বঞ্চিত হবো।'

'প্রসাদে তো আপত্তি নেই—কিন্তু অসময় যে।'

'ঐ আমার সময় এখন। একবেলা তো খাই—যখন হোক হ'লেই হবে।'

ওষুধের গুণেই হোক আর চিত্রাকে পেয়েই হোক—জাহ্নবী একটু সুস্থ হয়ে উঠলেন। চিত্রা ফিরে আসবার সময় বলে এল, 'পরীক্ষা দিয়েই আমি চলে আসব

মা। তখন আর কোন কথা শুনব না—নিজে রেঁধে খাওয়াবই। সেই কটা দিন একটু কষ্ট ক'রে বেঁচে থাকো।'

জাহ্নবী হেসে বললেন, 'আচ্ছা।'

ঠিক সেই কটা দিনই কষ্ট ক'রে যেন বেঁচে রইলেন তিনি।

মার্চ মাসে পরীক্ষার শেষ দিনই রওনা হ'ল চিত্রা। কিন্তু গিয়ে দেখল যে আর বেশী দেরি নেই। পাছে চিত্রা উতলা হয় এবং পরীক্ষার ফল খারাপ হয় এইজন্য তাকে একটি কথাও জানতে দেন নি - প্রতি চিঠিতেই লিখছেন, 'ভাল আছি'। ইদানীং পরকে দিয়ে চিঠি লেখাতেন সময়াভাবের অজুহাতে। আসলে লেখারও ক্ষমতা ছিল না। মঠের কেউ কেউ দেখে পাড়ার দু-একটি বৃদ্ধাও খবর নেন, কিন্তু তাতে আর কতটুকু হয়? প্রাণপণে দীর্ঘদিন ধরে মৃত্যু-যন্ত্রণা সহ্য করেছেন নীরবে।

চিত্রা এসে বড় ডাক্তার আনলে দু-তিনজন। কিন্তু তখন একেবারেই শেষ হয়ে এসেছে। তিন-চারদিনের মধ্যেই জাহ্নবীর সব যন্ত্রণার অবসান হ'ল। এখানকার দেনা-পাওনা হয়ত মিটল কিংবা মিটল না কিন্তু তিনি তার দায় থেকে অব্যাহতি পেলেন এটা ঠিক।

জীবনের যে পাপের জন্য জাহ্নবী দায়ী ছিলেন না, সেই পাপেরই প্রায়শ্চিত্ত করলেন, এই দীর্ঘকাল ধরে—তিল তিল ক'রে। তবে হয়ত তাঁর মৃত্যুতেও সে প্রায়শ্চিত্ত শেষ হ'ল না। উত্তরাধিকার-সূত্রে তা চিত্রাতে এসে বর্তাল।

চিত্রা এবার সত্যিই চোখে অন্ধকার দেখল। মা যে কিসে চালাতেন তা সে জানে না, তাঁর কোথায় কি আছে তাও জানা নেই। এখন কি করা কর্তব্য তাই বা কে বলে দেবে? প্রতিবেশী দু-একটা বৃদ্ধা এসে অবশ্য দেখাশুনা করলেন। উপদেশ দিলেন এখানে হবিষ্যি করার প্রয়োজন নেই— মহাপ্রসাদ খেলেই হবে। সেই সঙ্গে প্রত্যেকেই পরামর্শ দিলেন, 'আত্মীয়স্বজন কোথায় কে আছে মা, খবর দাও তাদের—তুমি একা ছেলেমানুষ কী করবে?'

আত্মীয়স্বজন কাকে খবর দেবে চিত্রা? মা'র সম্পর্কে যারা আছে তাদের কাউকেই ও জানে না। মাসীর কথা মনে আছে বটে কিন্তু তার ঠিকানাও জানা নেই। আর তো কেউ নেই ওদের! এক অ্যাটর্নী আছেন ওর মায়ের পরিচিত। মা মধ্যে মধ্যে তাঁর কাছে যেতেন কী সব বৈষয়িক কাজে। কিন্তু তাঁর নাম-ধাম-বিবরণ কিছুই জানা নেই ওর। এক আছেন গুরুদেব, তাঁকেই টেলিগ্রাম করল সে।

বসন্ত মহারাজ দিন তিনেকের মধ্যেই এসে পৌঁছলেন। তিনি পাকা লোক,

এখানে এসেই খোঁজখবর ক'রে বার করলেন যে, এখানকার পোস্ট অফিসে শ'তিনেক টাকা জমা আছে জাহ্নবীর নামে, কিন্তু তা বার করতে বহু বিলম্ব হবে। তবে ভরসার মধ্যে মঠের মোহান্তর কাছে পাঁচশ টাকা উনি এসেই জমা রেখেছিলেন—সেটা পাণ্ডার মুখে শুনে জেরা করতে মোহান্ত তা স্বীকার পেলেন এবং টাকাটা পাঁচজনের সামনে চিত্রার হাতে ফেরত দিলেন। পাঁচশ টাকা, চারখানা গিনি এবং একছড় সোনার হার।

আপাতত তাতেই শ্রাদ্ধশান্তি সারা হ'ল। জাহ্নবীর ঠাকুর ছিলেন, সে ঠাকুর উনি ইতিমধ্যেই মঠের সঙ্গে বন্দোবস্ত করেছেন, সে বাবদ মঠকে মোটা কিছু দেওয়াও হয়েছে—এটার দায়িত্ব থেকে অন্তত চিত্রা বেঁচে গেল। সে দুখানা গিনি মঠের মোহান্তকে এবং বাকী দুখানা পাণ্ডাকে দিয়ে প্রণাম ক'রে পুরী থেকে বিদায় নিলে।

পথে বসন্ত মহারাজ প্রশ্ন করলেন, 'কোথায় উঠবি তাহলে? ছাত্রীনিবাসে, না বাড়ীতে?'

চিত্রা একটু ইতস্ততঃ করে বললে, 'এখন তো গরমের ছুটি শুরু হয় নি, ছাত্রী-নিবাসে বড় ভিড়। ভাল লাগছে না ভাবতে—তার চেয়ে না হয় বাড়িতেই যাই।'

'কিন্তু কৈলাস নেই—সে ঘর কতকাল ধরে বন্ধ হয়ে আছে, সেখানে কি থাকতে পারবি—কে কাজকর্ম করবে—'

'আমিই করব এখন। চলুন, বাড়িতেই যাই।'

আসল কথা, চিত্রা বাড়ির সেই বহুপরিচিত পরিবেশের মধ্যে, বাল্যকালের সেই অসংখ্য স্মৃতিমাখানো আসবাবপত্রের মধ্যে, ওর মাকেই চায় নিবিড় ক'রে অনুভব করতে। বাবা আর মা'র অঙ্গের ও মনেরও পরশমাখা সেই ঘরদোর জিনিসপত্রের মধ্যে বসে একটু একান্তে কাঁদতে চায়।

বসন্ত মহারাজও বোধ হয় তা বুঝলেন। তিনি ওর সঙ্গে সঙ্গে বাড়ি পর্যন্ত এলেন। তারপর ভাড়াটেদের চাকরের সাহায্যে একখানা ঘর ধুয়ে মুছে চলনসই ক'রে নিলেন। পাছে চিত্রা নিজে খাওয়া-দাওয়া না করে সেজন্য সারাদিন থেকে ঐখানেই আহার করলেন। কিছুই যোগাড় ছিল না—উনুন পর্যন্ত কিনিয়ে আনাতে হ'ল; সেজন্য মধ্যাহ্ন-ভোজনটা চুকল বেলা চারটের সময়। চা খেতে খেতে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেল।

তখনও মহারাজের নড়বার কোন চিহ্ন নেই দেখে চিত্রা প্রশ্ন করল, 'আপনি রাত্রে কোথা থাকবেন তাহলে?' আসলে সে একা হ'তে পারলে বাঁচে।

বসন্ত মহারাজ ওর দিকে তাকিয়ে সিগারেট খেতে খেতে একটু হাসলেন। কেমন

যেন একরকমের অর্থপূর্ণ হাসি—অথচ সেটার অর্থ বুঝতে পারে না চিত্রা। খানিক পরে বললেন, 'বলিস তো না হয় এখানেই থাকি। তুই একা থাকবি - প্রথম দিনটা?'

'না, সে আমি ঠিক থাকতে পারব।...তবে যদি আপনার অসুবিধা হয় তো, ও-ঘরটাও খুলে চলনসই ক'রে নিই। আপনি এখানেই থাকুন, আমি ও-ঘরে শোব এখন।'

'না, না, তার দরকার হবে না। আমি হাতীবাগানে নলিনীদের বাড়ি থাকব এখন। তুই থাকতে পারবি তো? আর এ কটা দিন থাকতেই তো হবে আমাকে, তোদের য়্যাটর্নির সঙ্গে দেখা ক'রে বিষয়-আশয়ের একটা বিলিব্যবস্থা করতে হবে তো।'

বাস্তবিক, গুরুদেবের কাছে ওর কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই। উনি না থাকলে চিত্রা কি করত! ভাগ্যিস মা তখন একরকম জোর ক'রেই ওকে দীক্ষাটা দিইয়েছিলেন!

চিত্রা গলায় আঁচল দিয়ে প্রণাম করে ওঁকে। গুরুদেবও পিঠে মাথায় হাত বুলিয়ে আশীর্বাদ করেন। চিবুক ধরে নেড়ে আদর ক'রে বিদায় নেন।

॥ ৫ ॥

দিন সাতেক পরে একদিন বিকেলবেলা ভাড়াটেদের একটি ছেলে এসে খবর দিলে, 'আপনার দাদা এসেছেন কে একজন। তিনি আপনার খোঁজ করছেন।'

'আমার দাদা? আমার দাদা কে খোকা! আমার তো দাদা নেই। নিশ্চয় ওঁদের ভুল হয়েছে।'

'না, আপনার নামই করলেন। আমাকে দেখে বললেন, তুমি বুঝি আমাদের ভাড়াটে? বেশ বেশ।...সঙ্গে একটি মেয়েছেলেও আছেন।'

কিছু বলল না চিত্রা। কিন্তু তবু একটা ভাবী অমঙ্গল এবং সঙ্কটের আশঙ্কায় ওর বুকের ভেতরটা যেন হিম হয়ে এল। সে একখানা বই পড়ছিল, বইটা নামিয়ে রেখে দ্রুত ঘর থেকে বেরোতে যাবে, ত্যাখে ততক্ষণে আগন্তুকরা ওর ঘরের সামনা-সামনি পৌঁছে গেছেন।

রোগা, লম্বা—একহারা গঠনের একটি লোক। বয়স হয়ত খুব বেশি নয়, তবু সারা মুখে অসংখ্য রেখা ফুটে উঠেছে, মাথার চুল পাতলা হয়ে অর্ধেক পেকে উঠেছে। লাম্পট্য ও অন্যান্য অত্যাচারের চিহ্ন সুস্পষ্ট। গলাটা সরু, মুখের সব হাড় ঠেলে বেরিয়েছে মেদের অভাবে। ঘাড় কামানো পরিপাটি ক'রে—হাতে একটা বিড়ি। চিত্রাকে দেখে যৎপরোনাস্তি বিস্ময় এবং একটু বোধ হয় প্রশংসাও ফুটে উঠল

লোকটার চোখে।

প্রায় আধমিনিট চেয়ে রইল সে ওর দিকে, তেমনি অবাক হয়ে। চিত্রাও তথৈবচ। তারপর একটু কাষ্ঠহাসি হেসে এগিয়ে এল, 'ও, তুমিই চিত্তু! বেশ বেশ।…অনেক বড় হয়েছিস। খাসা দেখতে হয়েছিস তো!…আমি তোর দাদা রতন!'

রতন!…কি সর্বনাশ!

এ রতনকে ও কখনো চোখে দেখে নি। ওর জন্মের পূর্বেই সে চলে গিয়েছে এ বাড়ি থেকে। তবে মা'র মুখে শুনেছে দু-একবার নামটা, খুব অনিচ্ছাতে, দৈবাৎ যখন নামটা তাঁর মুখ থেকে বেরিয়ে গেছে!… কিন্তু তার তো কোন পাত্তাই ছিল না —কোন চিহ্ন কোথাও পাওয়া যায় নি। ইদানীং জাহ্নবীর বিশ্বাস হয়েছিল সে মরেই গেছে। তার কথা তাঁরও মনে থাকত না।

চিত্রার মুখে বিহ্বলতা লক্ষ্য ক'রে পিছনের স্ত্রীলোকটি এগিয়ে এলেন, 'কী রে চিত্তু, আমাকে চিনতে পারিস? আমি তোর ছোট মা।'

আব্‌ছা আব্‌ছা বরং এর মুখটা ওর মনে পড়ে বটে। অজস্র অলঙ্কার এবং উৎকট প্রসাধনের মধ্যেও বহু পুরাতন একটা স্মৃতি মানুষটাকে যেন চিনতে পারে—এ ওর সেই মাসি। যাকে ওর মা তীর্থ থেকে এসে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন।

কিন্তু এরা কেন? কী মনে ক'রে এসেছে আবার! চিত্রার কপালে ঘাম দেখা দিল। বড় বড় ঘামের ফোঁটা।

'সর্ সর্, দেখি—ঘরদোরের কী হাল হয়ে আছে—' এই বলে ওকে একরকম সরিয়ে রতন ঘরে ঢুকল। তারপর অনুমতির অপেক্ষা-মাত্র না ক'রে 'আঃ' বলে একটা শব্দ ক'রে চিত্রারই বিছানায় শুয়ে পড়ে সিগারেট টানতে লাগল।

মাসিও ঘরের ভেতরে এসে ঢুকেছে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই।

'ঘরবাড়ি কতদিন মেরামত করায় নি মা—তা দেখছ মাসি! এসব এখনই করা দরকার। হয়ে পর্যন্ত বোধ হয় আর বাড়িতে হাত পড়ে নি।'

'তা, তো বটেই। এদান্তে তো আর ঘরসংসারে মন ছিল না দিদির!' মাসি সায় দেয়।

'দেখি আবার কী সব টাকা পয়সা রেখে-টেকে গেছে। এ ত যা দেখছি ঝেড়ে মেরামত করাতে হবে।'

তারপর খুব সহজ ভাবেই বললে, 'কই, দেখি রে লোহার সিন্দুকের চাবিটা— কী আছে না আছে সব দেখতে হবে তো!'

এতক্ষণে চিত্রার কথা ফুটল। সে বিপন্নমুখে মাসির দিকে চেয়ে বললে, 'কিন্তু

এসব আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। এখানে—এভাবে—মানে এরা অন্য রকম পরিচয় জানে আমার—'

মাসির এতদিনের সমস্ত সঞ্চিত বিষ যেন গলগল ক'রে বেরিয়ে এল। হাত-পা নেড়ে মুখের একটা কুৎসিত বীভৎস ভঙ্গী ক'রে বললে, 'বলি তা জানলে তো চলবে না আর! আমড়া গাছে তো আর ল্যাংড়া ফলে না! তুমি যা, তুমি তাই-ই আছ। দু'দিন নামধাম ভাঁড়িয়ে ইস্কুলে পড়ে তো আর খড়দার মা-গোঁসাই হয়ে ওঠো নি। ও হ'ল গে তার ছেলে, ওরই হক্কের ধন—হিসেব-নিকেশ ওকে বুঝিয়ে দিতে হবে বৈকি।...ও ভেসে ভেসে বেড়াবে অমন ক'রে—আর তুমি মায়ের ধন ষোল আনা ভোগ করবে—তা তো হবে না বাছা। আমরা পাঁচজন থাকতে তা হ'তে দোব না। আমাদের কাছে তুমিও যা রতনও তাই। বরং রতন বেশী, সে ছেলে—তার প্রথম সন্তান।'

'হিয়ার, হিয়ার! ওঃ, মাসি একেবারে পাকা রাঁধুনী' রতন উৎসাহ দিয়ে উঠল।

চিত্রার সংসারের জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা খুব বেশি নয়. কিন্তু এখন এই মুহূর্তে এদের মনোভাবটা ওর কাছে দিবালোকের মতোই হয়ে হয়ে উঠল। হয়ত রতন অনেকদিন ধরেই ওর মাসিদের কাছে যাতায়াত করে—মাসি হয়ত জানেও সব তবে পাছে জাহ্নবী জানতে পারলে আগে থেকে সতর্ক হন, চিত্রার নামে সব উইল করে দিয়ে যান, তাই কোন মতে তাঁকে জানতে দেয়নি রতনের অস্তিত্ব। স্বাভাবিক নিয়মেই সবকিছু চিত্রা পাবে জেনে তিনি লেখাপড়ার কথা ভাবেনই নি—নিশ্চিন্ত ছিলেন। এইবার ওরা এসেছে নিজেদের মতলব হাসিল করতে।

মাসির আছে সেই দীর্ঘকালের ক্ষোভ। ওদের ছায়া পর্যন্ত মাড়াতে দেন নি জাহ্নবী, কোন সম্পর্ক রাখতে দেন নি ওদের সঙ্গে—সে অপমান ওরা ভুলতে পারে নি। এ ওদের সেই প্রতিশোধ। এটা রতনের ওপর প্রীতি নয়। কিংবা হয়ত কোন ভাগেরও ব্যবস্থা আছে।

কেমন একটা আতঙ্ক, একটা অসহায় ভাব, একটা নাম-না-জানা আশঙ্কা বিহ্বল ক'রে দিল চিত্রাকে, সে একবার রতন একবার মাসীর মুখের দিকে চেয়ে দিশাহারা হয়ে ছুটে বেরিয়ে এল ঘর থেকে, তারপর বারান্দা পেরিয়ে সিঁড়ি পেরিয়ে তেমনি পাগলের মতো ছুটে বেরিয়ে পড়ল রাস্তায়। কিন্তু রাস্তায় বেরিয়েও সে থামল না। কে যেন তাড়া ক'রে চলেছে ওকে—এইভাবে যতটা সম্ভব দ্রুতপদে রাস্তা দিয়ে হাঁটতে লাগল। অন্য পথিকরা অবাক হয়ে তাকাতে থাকে—ওর সেই বিস্রস্ত বসন, উত্তেজিত আরক্ত ঘর্মাক্ত মুখ এবং অস্বাভাবিক দ্রুত গতির দিকে। হয়ত বা পাগলই

মনে করে ওকে। কিন্তু ওর তখন আর কোন দিকে লক্ষ্য নেই। কোন মতে পালিয়ে যেতে হবে—তা সে যেখানেই হোক, শুধু এখান থেকে যতটা দূরে হয়।

তবু পা তার অভ্যস্ত এবং জ্ঞাত পথই ধরে, একসময় চিত্রা আবিষ্কার করে যে সে তার ছাত্রী-নিবাসেই এসে পৌঁচেছে। শান্তিদি ওকে ঐ অবস্থায় দেখে অবাক। ভাগ্যে ঠিক তার আগের দিন থেকেই গরমের ছুটি আরম্ভ হয়ে গেছে, তাই আর কতকগুলো জবাবদিহীতে পড়তে হ'ল না চিত্রাকে। শান্তিদি দোতলায় তাঁর নিজের ঘরে একরকম বয়েই নিয়ে গেলেন ওকে, একটা চেয়ার দেখিয়ে বললেন, 'বোসো, সুস্থ হও। তোমার কথা পরে শুনব।' পাখাটা খোলাই ছিল, স্পিড্‌টা বাড়িয়ে দিলেন শুধু।

চিত্রা বসে নয়, চেয়ারে যেন এলিয়ে পড়ল—অজ্ঞানের মতো। ওর পা কাঁপছে থরথর ক'রে, বুকের স্পন্দন যেন থেমে যাবার মতো হয়েছে, এতটা পথ প্রায় ছুটে এসে। শান্তিদি ঝিকে লাইমজুস্ দিয়ে এক গ্লাস শরবৎ ক'রে আনতে বলেছিলেন, খানিকটা পাখার নিচে মড়ার মতো পড়ে থাকবার পর সেই শরবৎটা খেয়ে তবে চোখ মেলে ভাল ক'রে তাকাতে পারল চিত্রা।

শান্তিদি সব কথা শুনে চিন্তিত হয়ে পড়লেন। অনেকক্ষণ চুপ ক'রে বসে থেকে বললেন, 'কাজটা ভাল হ'ল না চিত্রা, ওরা যেটা নিতে এসেছিল, সেটা ওদেরই হাতে তুলে দিয়ে এলে নির্বিবাদে। একটা কাপড়ও তো আনতে সময় পাও নি।…অথচ সত্যিই, আর কীই বা করতে পারতে।'

ওর দিকে তাকিয়ে দেখলেন—যে চারগাছি চুড়ি ওর হাতে থাকত—তাও আজ নেই, একগাছি ক'রে মাত্র আছে—আর সরু একছড়া হার।

'তোমার চুড়িগুলো কী হ'ল? আর বাকী সব গয়না?'

'সে সব খুলে লোহার সিন্দুকেই রেখে দিয়েছিলুম।'

'চুড়িগুলোও? কেন?'

'মা মারা যাওয়ার পর কিছুই যেন ভাল লাগত না শান্তিদি।' মাথা হেঁট ক'রে ধরা গলায় উত্তর দিল চিত্রা।

'ইস্, তাই তো! সবই বোধ হয় এতক্ষণে ওরা বার ক'রে নিলে। চাবি কোথায়?'

'বিছানার তলায়।'

'তোমার মা'র গয়না?'

'অনেক গয়না তিনি বেচেছিলেন জানি। কিছু কিছু সিন্দুকে আছে। আর বোধ হয় দু-একটা জড়োয়া গয়না কারুর কাছে জমা আছে। কিন্তু সে কার কাছে

তাও জানি না।'

'হয়ত তোমার ম্যাটর্নি জানতে পারেন। কিন্তু তিনি কোথায় থাকেন তা তো জানি না। সবচেয়ে ভাল হবে বোধ হয় গুরুদেবকে টেলিগ্রাম ক'রে দেওয়া।'

তারপর একটু থেমে বললেন, 'যাক্, খুব বেঁচে গেছ যে বেরিয়ে আসতে পেরেছ। যত ভাবছি ততই মনে হচ্ছে যে শুধু তোমার বিষয় নয়—তোমাকে হাত করাও ওদের মতলব ছিল। তোমার যা রূপ, তোমাকে হাত করতে পারলে ওদের আয়ের পথটা সুগম হ'ত। গুরুদেবকে ধন্যবাদ দাও——তিনিই রক্ষা করেছেন।'

শান্তিদি নিজে হাত জোড় ক'রে নমস্কার করলেন উদ্দেশে।

এরপর গুরুদেবকে জরুরী টেলিগ্রাম ক'রে দিয়ে অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় রইল না। শান্তিদিই ওকে কাপড় দিলেন পরবার, জামা কিনিয়ে এনে দিলেন। একদিন শুধু গুরুর অনুরোধেই ওকে রেখেছিলেন এটা ঠিক, কিন্তু পরে এই শান্ত নম্র এবং সুদর্শন মেয়েটিকে তিনিও ভালবেসেছিলেন।

পরের দিন বিকেলে ঝি এসে খবর দিলে—কে একটি মেয়েছেলে চিত্রু দিদিমণিকে খোঁজ করছেন।

'মেয়েছেলে? কী রকম মেয়েছেলে? কী নাম বললেন রে?' চিত্রার মুখ কিন্তু বিবর্ণ হয়ে উঠেছে ইতিমধ্যেই।

'ভাল নয় মা। মানুষটা যেন কেমন কেমন!'

চিত্রা আর কিছু বলার আগেই শান্তিদি গম্ভীর কণ্ঠে বলে উঠলেন, 'হুঁ। তুমি এখানেই বসে থাকো চিত্রা, আমি খোঁজ করছি। তাকে অফিস ঘরে বসাগে যা।'

অফিস ঘরে ঢুকে আগন্তুককে যা দেখলেন তাতে আর শান্তিদির কোন সন্দেহ রইল না যে এই স্ত্রিলোকটিই চিত্রার মাসী। বহু অত্যাচারের চিহ্ন মুখে প্রকট, তার ওপরে, সেগুলো ঢাকা দেবার জন্যই বোধ হয় উৎকট প্রসাধন।

'কী চাই আপনার?' কঠিন রুক্ষস্বরে প্রশ্ন করেন শান্তিদি।

'এই য, নমস্কার। দেখুন আমি চিত্রা রায়ের মাসী।...শুনলুম ও কাল এখানেই এসেছে। পাগলী মেয়ে অভিমান ক'রে একেবারে এক কাপড়ে পালিয়ে এসেছে—তাই ওকে নিয়ে যেতে এসেছি—ওর মা মারা গেছে তা শুনেছেন নিশ্চয়ই—এখন আমরাই তো ওর অভিভাবক কিনা।'

'কিন্তু ও কি আপনাদের কাছে যেতে চায়?'

'তা আবার যেতে চাইবে না! তবে কি জানেন, মন্দ লোকের প্ররোচনায় ও

কেমন একটা হয়ে গেছে। তাছাড়া মানুষ এমন অবস্থায় আপন-পর ভাল-মন্দ বুঝতে পারে না। তবে তা বললে তো চলবে না। আমিও ওর আপনার মাসী, তা'পর ধরো ওর নিজের দাদা রয়েছে—না গেলে চলবে কেন? নাবালক মেয়ে, ওকে তো যেখানে খুশি ছেড়ে দিতে পারি না। আর ওকে ধরে রাখলে আপনারও বিপদ আছে—চাই কি গোলমাল হ'লে ছাত্রী-নিবাসেরও বদনাম হ'তে পারে।'

'দেখুন, বাজে কথা বলবার আমার সময় নেই, ইচ্ছেও নেই। আপনাদের মতলব আমি জানি—' শান্তিদির কণ্ঠস্বর আরও কঠিন হয়ে ওঠে, 'আমাকে ভয় দেখাবারও চেষ্টা করবেন না। যা বয়স লেখা আছে ওর স্কুলের খাতায়—তাতে ও আর নাবালিকা নেই। তা ছাড়া ওর কোন দাদা বেঁচে আছে কিনা তাও জানি না। আমিও আপনাদের পরামর্শ দিচ্ছি - এই বেলা সরে পড়ুন, চিত্রা আইন-আদালত করলে সুবিধা হবে না। ওকে এমন ভাবে বিরক্ত করবেন না। ওর গুরুদেব আছেন, স্যাটর্নী আছে, তারাই বস্তুত ওর এখন অভিভাবক।—ওর ঘরে কাল জোর ক'রেএসে ঢুকেছেন—যদি জিনিসপত্র কিছু তছরুপ হয় তো তার জন্যে আপনারা দায়ী হবেন।'

'হু'। আচ্ছা. দেখা যাক। আইন আদালত আমবাও জানি। তিন বচ্ছর স্যাটর্নির কাছে বাঁধা ছিলুম। আমার জানতে কিছু বাকী নেই। সোজা আঙুলে ঘি না বেরোয় আঙুল বাঁকাতেও পারব।—গুরুদেব! সে গুরুদেবকেও চেনা আছে আমার। কে কত সন্নিসী তা আমরা জানি। বলি রামকৃষ্ণ মিশন থেকে ওদের দুজনকে কেন তাড়ালে একবার জিজ্ঞেস ক'বে দেখবেন তো, আমরা পাপমুখে আর না-ই বা বললুম।'

যেন একটা দিগ্বিজয় সম্পন্ন ক'রে ফেললে এইভাবে চোখমুখ এবং হাত ঘুরিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল মাসি।

শান্তিদি ওপরে এসে চিত্রাকে সব কথা বললেন। ভয়ে দুঃখে অপমানে তার চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল। কিন্তু শান্তিদিও চুপ ক'রে থাকবার লোক নন। তিনি চিত্রাকে দিয়ে ভাড়াটেদের নামে একটা চিঠি লিখিয়ে নিলেন, যাতে পত্রবাহকের হাতে চিত্রার ট্রাঙ্কটা দিযে দেন তাঁরা। সদ্য পুরী থেকে এসেছে—তাতেই কাপড়-চোপড় গুছোনো আছে।

চিত্রা ম্লান হেসে বললে, 'দেবে কি ওরা?'

'দেখাই যাক না। যদি তোমাকে হাত করার ইচ্ছে থাকে তো অন্তত এটা আটকাবে না।'

চিঠিটা দিয়ে দারোয়ানকে পাঠালেন শান্তিদি। কিছুক্ষণ পরে সে সত্যিসত্যিই

একটা রিক্সার ওপর ট্রাঙ্কটা চাপিয়ে ফিরে এল। ভাড়াটেরা চিঠিটা পেয়ে গিয়ে বলাতে মাসি নাকি তখনই ট্রাঙ্কটা বার ক'রে দিয়েছে এবং বলেছে, 'ওমা, সে কি কথা! সত্যিই তো, পাগলী মেয়ে অভিমান ক'রে এক কাপড়ে চলে গিয়েছে। তাই বলে কি আর আমরা রাগ ক'রে তার বাক্সটা আটকে রাখব! তার অসুবিধে হচ্ছে বুঝি না আমরা? পাগলী মনে করেছে এতকাল আমরা ইচ্ছে ক'রে ওর খবর নিই নি, তাই এত অভিমান! আমাকে বড্ড ভালবাসত কিনা, ছেলেবেলায় মাসি-অন্ত প্রাণ ছিল। দিদিই তো আলাদা করে রেখেছিল এতকাল! কী করব—তার মেয়ে, আমরা তো আর জোর করতে পারি না!···তা দারোয়ানজি এটা নিয়ে যাও, আর তাকে ব'লো গয়নাপত্র যদি কিছু নিয়ে যেতে চায় তো এসে যেন নিয়ে যায়—কোথায় কি আছে আমরা তো জানি না। মোদ্দা সব থাকতে রাজ্যেশ্বরী মেয়ে আমার ভিখিরীর মতো সেজে থাকবে সেটা বড্ড অপমান!'

শান্তিদি সব শুনে হেসে বললেন, 'গয়নার কথায় ভুলিয়ে একবার কোনরকমে তোকে ঘরে পুরতে চায় চিতু! যাক্, কাপড়গুলো দিয়েছে সেই লাভ! সব আছে তো ঠিক?

কথাটা মনেই পড়ে নি চিত্রার। এখন শান্তিদির কথায় বাক্স খুলে দেখল যে যা যা ছিল সবই ঠিক আছে, নেই কেবল ভাল সিল্কের শাড়ি একখানা—সেটার লোভ বোধ হয় মাসি আর সামলাতে পারে নি। আর নেই ওর মা'র লেখা একতাড়া চিঠি।··· পুরী থেকে যে সোনার হারটা এনেছিল, কাপড়ের তলা থেকে সেটাও বেরোল।

চিত্রা কেঁদে আকুল, 'চিঠিগুলো কেন নিলে ওরা শান্তিদি, এ যে আমার জীবনের সম্বল! তার চেয়ে হারটা নিয়ে চিঠিগুলো দিলে না কেন?'

শান্তিদি ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললেন, 'কাঁদিস নি কাঁদিস নি, চুপ কর্।···হারটা দিয়েছে তোর বিষয়ের ওপর ওদের কোন লোভ নেই এইটে প্রমাণ করতে, আর চিঠিগুলো নিয়ে নিয়েছে এই জন্যে যে যদি ওর ভেতর বিষয়-আশয় সম্বন্ধে কোন নির্দেশ দেওয়া থাকে, পরে তুই সেগুলো দলিলের মতো ব্যবহার করিস —এই ভয়ে।'

'বিষয়-আশয় সব নিক ওরা—আমার চিঠিগুলো ফিরিয়ে দিক। মা'র কোন চিহ্ন থাকবে না আমার কাছে—আমি বাঁচব কেমন ক'রে শান্তিদি!'

॥ ৬ ॥

পরের দিন ভোরবেলাই গুরুদেব এসে পৌঁছলেন। তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, ওদের ম্যাটর্নিকে আমি চিনি। চিত্রাকে নিয়ে যাই একেবারে। হয়ত একটা ব্যবস্থা হ'তেও

পারে। তিনি ওর বাপের খুব বন্ধু ছিলেন, তাছাড়া ওর মাকেও খুব শ্রদ্ধা করতেন জানি।'

কিন্তু ঘটনার বিবরণ সব শুনে অ্যাটর্নি খানিকটা চুপ ক'রে থেকে বললেন, 'একটু মুশকিল হ'ল মহারাজ। বৌদি—মানে চিত্রার মা যদি উইল ক'রে যেতেন আলাদা কথা ছিল কিন্তু এখন তো রতনকে অন্তত তার অর্ধেক শেয়ার থেকে বঞ্চিত করা যাবে না। অবশ্য সে-ই যদি রতন হয়। সেটা কেউ নিশ্চিত জানে?'

তিনি চিত্রার মুখের দিকে তাকালেন।

চিত্রা বললে, 'আমি তো তাকে দেখি নি কখনও। তবে মাসি চেনেন বলেই তো মনে হচ্ছে। তা ছাড়া ঘরবাড়িও যেন তার চেনা বলেই বোধ হ'ল।'

'হাউএভার—সে যে রতন নয় এটা প্রমাণ করাও শক্ত হবে। এত হাঙ্গামা করছে কে? এত বড় বিষয় কিছু নয়।'

'তা অর্ধেক শেয়ার তো চিত্রা পাবে আইনত!'

'অর্ধেক কি সে দিতে আপত্তি করছে? চিত্রাই তো পালিয়ে এসেছে, তারা তো তাড়িয়ে দেয় নি!'

'কিন্তু তাদের সঙ্গে বাস করা যদি ওর পক্ষে অসম্ভব হয়, আপত্তিকর হয়?'

'পার্টিশন্ স্যুট করতে হবে। তার যা হাঙ্গামা, খরচা—তাতে ঢাকের দায়ে মনসা বিকিয়ে যাবে! অথচ এই অবস্থায়—কেউ যে লিটিগেশন সুদ্ধ ওর অংশটা কিনে নেবে সে সম্ভাবনাও তো দেখছি না।'

'তাই তো! তাহলে উপায়?' গুরুদেব প্রশ্ন করেন।

'উপায় এমিকেবলি—মানে আপসে কিছু বার ক'রে নিতে পাবেন কিনা চেষ্টা দেখুন। বাড়িটার কত দাম হবে—তার অর্ধেক, তার জন্যে মামলা-মোকদ্দমা করা কি পোষাবে? কে করবে অত হাঙ্গামা? আমি কেস্‌টা চালাতে পারি কিন্তু তার খরচা আছে তো! তা ছাড়া তাতে যে পাবলিসিটি হবে—সেটার কেথাও ভেবে দেখুন। চিত্রার যে পরিচয়টা গোপন করার জন্যে বৌদি প্রাণপাত করলেন, চিত্রার জীবনটাকে সম্পূর্ণ নতুন পরিচয়ে গড়ে তোলবারই সংকল্প ছিল তাঁর—সে পরিচয় তো আর গোপন রাখা যাবে না। মামলা-মোকদ্দমায় খানিকটা জানাজানি হবেই।'

মিনিট-খানেক চুপ করে থেকে যেন দম নিয়ে আবারও বললেন তিনি, 'আর একটা কথা ··মানে···' গলাটা কেশে সাফ ক'রে নিলেন, 'চিত্রার বাবা-মা তো ঠিক বিবাহিত ছিলেন না। এ ক্ষেত্রে—মানে পতিতাদের সম্পত্তি আইনতঃ সরকারের প্রাপ্য—তিনি যখন উইল ক'রে রেখে যান নি। মামলা-মোকদ্দমা করতে গেলে

কেঁচো খুঁড়তে খুঁড়তে কি সাপ বেরোবে তার ঠিক কি। যদি খানিকটা মোকদ্দমা চলবার পর সরকারী ক্লেম আসে ?'

'তা হ'লে কি কোন উপায় নেই ?' হতাশভাবে প্রশ্ন করেন মহারাজ।

'দেখছি না তো কিছু। এক যদি ওরা আমার কাছে আসে তো ভাঁওতা-টাওতা দিয়ে কিছু আদায় করতে পারি কিনা দেখব ; আর আপনারা যদি পারেন আপসে কিছু করতে, কোন মধ্যস্থ-টধ্যস্থ ধরে—

অর্থাৎ সমস্তটাই অনিশ্চিত এবং সুদূর-পরাহত।

চলে আসবার সময় য়্যাটর্নি বললেন, 'বলেন তো কাগজে একটা বিজ্ঞাপন দিয়ে দেখতে পারি, ওর হাফ শেয়ার কেউ যদি লিটিগেশন সুদ্ধই কিনতে চায়—সামান্য দু-চার হাজার দেয়, তাই দিক না !'

গুরুদেব বললেন, 'দেখুন, যা ভাল বোঝেন—ওর তো আর কেউ নেই। আচ্ছা, আমি যতদূর জানি ওর মায়ের আরও কিছু গহনা টাকাকড়ি কোথাও গচ্ছিত ছিল, সে কোথায়, তা বলতে পারেন ? বাড়ির লোহার সিন্দুক আমরা দেখবার অবসর পাই নি কিন্তু অত ঘর ভাড়াটেদের মধ্যে তিনি যে শুধু চাবির ভরসায় দামী কিছু রেখে গিয়েছিলেন তা তো মনে হয়না।'

'কী জানি,' য়্যাটর্নি অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, 'গহনার কথা তো কিছু জানি না···তবে অনেকদিন আগে হাজার খানেক টাকা আমার কাছে রেখে দিয়েছিলেন, যদি কখনও কোন জরুরী দরকার পড়ে তো লিখবেন এই কথা ছিল। তা থেকে দু'দফায় আটশো টাকা বোধ হয় নিয়েছিলেন— হিসেবটা দেখব ঠিক ক'রে—বাকী যা আছে শ' দুই, বলেন তো ফেলে দিতে পারি ওকে। সে তো কোন লেখা-পড়ার মধ্যে ছিল না - চিত্রাকে দিতে বাধা নেই।'

'দেখুন, সে আপনার দয়া।'

'না না, সে কি কথা দয়া কেন বলছেন, আমারও তো কিছু করা উচিত ছিল ওর জন্যে ; কিন্তু কী করব তা তো ভেবে পাচ্ছি না। আচ্ছা, পরশু-তরশু নাগাদ যদি ওকে নিয়ে একবার আসেন, সে টাকাটা দিতে পারি—'

বাইরে বেরিয়ে গুরুদেব অস্ফুটকণ্ঠে একটা গালাগাল দিয়ে বললেন, 'নিশ্চয়ই ঐ শালার কাছে ছিল জড়োয়া গহনাগুলো, বেমালুম চেপে গেল। নেহাৎ শেষ পর্যন্ত কি একটা বিবেকে বাধল তাই দুশো টাকার কথাটা মানলে।···আমার বিশ্বাস নগদ টাকাও বেশ কিছু ছিল ওর কাছে—'

কথাটা চিত্রার ভাল লাগল না। তার অল্প বয়স, কেতাবি চশমার মধ্য দিয়ে

অশংকে ও দেখেছে এতকাল—কারুর সম্বন্ধে চট্ ক'রে মন্দ ধারণা করতে ওর বাধে; সে বললে, 'আমরা তো ঠিক জানি না, মিছিমিছি একটা লোকের সম্বন্ধে খারাপ ধারণা করার কি অধিকার আছে!'

'হু'। দেখলে না লোকটা চোখ তুলে তাকাতে পারল না। তোমার মা যে মরবার সময় না গেলেন কিছু বলে, না গেলেন লিখে। কে জানে হয়ত ঐ লোহার সিন্দুকেই লেখা-টেখা ছিল কিছু। তুই তো দেখিসও নি—'

সারাদিন ধরে ভাবল চিত্রা। বরং বলা চলে সারা দিন রাত ধরেই ভাবল। তবে সে সব এলোমেলো ভাবনা। কিছু ঠিক ক'রে গুছিয়ে ভাববার ওর ক্ষমতা নেই। উপর্যুপরি এতগুলো আঘাতে এবং এই অসহায় অবস্থায় পড়ে ওর মনের মর্মমূল পর্যন্ত যেন নড়ে উঠেছে। কিছুই আর ঠিক নেই, কোন আশা ভরসার স্বপ্ন পর্যন্ত দেখতে পারে না ও। কোন প্রবল সমস্যার সামনে দাঁড়িয়ে কী করবে এটা ঠিক করে মানুষ—ভবিষ্যতের কোন কল্পনার উপর ভিত্তি ক'রেই। সে ভবিষ্যৎই ওর আজ অন্ধকার। কোথাও কোন আলোর রেখা এমন নেই যাতে ও পথ দেখতে পায়।

পরের দিন সকালে শান্তিদি ওকে ডেকে পাশে বসিয়ে এই প্রশ্নই করলেন, 'তাহ'লে এখন কি করবে ঠিক করলে চিতু?'

চিত্রার চোখ এই দু দিনেই বসে গিয়েছে, চোখের কোলে সুগভীর কালি। উদ্‌ভ্রান্তের মতো দৃষ্টি। সে একবার গুরুদেবের একবার শান্তিদির মুখের দিকে অসহায় দৃষ্টি মেলে বললে, 'আমি তো কিছুই ভেবে পাচ্ছি না শান্তি দি, আপনারাই বলে দিন আমি কি করব?'

'তুমি জোর ক'রে গিয়ে ওবাড়ি দখল করতে পারবে, দাদার সঙ্গে ঝগড়া ক'রে?'

চিত্রা সে সম্ভাবনার কল্পনাতেই শিউরে উঠল।

'মামলা-মকদ্দমা করতে চাও?'

'না। তাছাড়া, সে ক্ষমতাই বা কৈ?'

'তাহলে?'

'কি জানি কী করব।' আবার একটা নিস্তব্ধতা।

গুরুদেব প্রশ্ন করলেন, 'তুমি তোমার এখানে কোন কাজটাজ দিয়ে ওর পড়াটা চালিয়ে নিতে পারো না শান্তি—বি. এ.-টা পর্যন্ত—? চিতু না হয় দু-একটা টিউশনী করত?'

শান্তিদি বিমর্ষ ভাবে ঘাড় নেড়ে বললেন, 'কিছুদিন থেকেই আমার মধ্যে মধ্যে

লোকসান যাচ্ছে, এ অবস্থায় আমি আর সাহস পাই না। না হ'লে বলতেই বা হবে কেন? ওর জন্তে আমার যে কি কষ্ট হচ্ছে তা অন্তর্যামী জানেন। অবশ্য দুটো একটা মাস আমি অত মাইণ্ড করি না; কিন্তু চার বছরের ভার নেওয়া—'

বাক্যের অর্ধপথেই তিনি থেমে গেলেন।

গুরুদেব বললেন, 'কোথাও যদি কাজটাজও করতে হয়—ম্যাট্রিকের ফল না বেরোলে তো কিছু করা যাচ্ছে না। ম্যাট্রিকটা তো পাস করা চাই।'

শান্তিদি তাড়াতাড়ি বললেন, 'সে তো আর মাস দেড়েক-দুইয়ের মধ্যেই বেরিয়ে যাবে। ততদিন চিত্রু এখানেই থাক। এখন তো আমার বাড়ি খালিই পড়ে আছে—'

'না। তারই বা দরকার কি! বরং আমার সঙ্গে এখন আশ্রমেই চলুক। এ দুটো মাস ওখানে থাক—ম্যাট্রিক পাস করে তো এখানে এনে কোথাও রেখে কাজটাজের চেষ্টা দেখব। আর দৈবাৎ না করতে পারলে—বলা যায় না তো—তখন বরং তোমার দরকার হবে, যেমন ক'রেই হোক আর একটা বছর রেখে পাস করাতে হবে। প্রয়োজনের বেশী তোমার ভদ্রতার ওপর অত্যাচার করা ঠিক নয়।'

তারপর একটু হেসে চিত্রার পিঠে হাত রেখে বললেন, 'আশ্রমেই চল্ তাহ'লে, কী বলিস? এককালে তো সন্ন্যাসিনী হ'তেই চেয়েছিলি—দ্যাখ, যদি ভাল লাগে আশ্রমের জীবন তো, থেকেই যাবি—অবশ্য কাজ করলে সেখানেও করবার ঢের আছে বৈকি!'

চিত্রা অভিভূতের মতোই ঘাড় নেড়ে সায় জানাল। বোধ হয় তার কাছে যে কোন প্রস্তাবই করা হ'ত সে সায় দিত। তবে একটা কথা ওর হঠাৎ ক'রে মনে পড়ে গেল—মা'র কথা—ঈশ্বরকে দিতে চেয়েছিলেন, তাই বুঝি অন্য সমস্ত পথে এমন ক'রে বাধা আসছে।

আশ্রমটা প্রথম প্রথম চিত্রার খুব খারাপ লাগল না।

কলকাতার মেয়ে—এই উন্মুক্ত প্রসারতা ও প্রকৃতির মধ্যে এসে যেন প্রাণ জুড়োল ওর। নিশ্বাস ফেলে বাঁচল। বাগান পুকুর চাষের মাঠে—অবারিত আনন্দ ওর দৃষ্টির সামনে। সবই বিস্ময়কর, সবই চমকপ্রদ ওর কাছে। চিত্রা যেন ওর এত আঘাত, এত বড় শোকও খানিকটা ভুলে গেল এখানে এসে। সে ছুটোছুটি করে বাগানে; পুকুরে নেমে সাঁতার কাটবারও ইচ্ছা হয়, সাহসে কুলোয় না নেহাৎ, তাই নিবৃত্ত থাকে।

তবে এটাকে সন্ন্যাসীর আশ্রম, তপস্বীর সাধনক্ষেত্র বলে কিছুতেই মনে হয় না ওর

—রীতিমতো একটা সংসার বলে মনে হয় বরং। চাষবাস, হিসাব-নিকাশ, বাড়ীঘর তৈরী—এই নিয়েই সকলে ব্যস্ত। বসন্ত মহারাজের আরও দু-চারজন সন্ন্যাসী গুরুভাই আছেন, দু-একজন সন্ন্যাসী শিষ্যও আছেন, কিন্তু কাউকেই ভগবানের কাঙাল বলে মনে হয় না ওর, পাকা ব্যবসাদার বলে মনে হয়। সকলেই সমাগত গৃহীদের মধ্যে নিজের নিজের শিষ্য সংগ্রহে ব্যস্ত। তার জন্যেই উপদেশ এবং বক্তৃতার জাল বোনা চলে। সে সব আলোচনা শ্রুতি-সুখকর—কিন্তু বড়ই বাহ্য এবং ভাসা-ভাসা। নিতান্ত মামুলী গতানুগতিক কথা। না আছে তাতে কোন গভীরতা না আছে মৌলিকতা।

সম্পন্ন গৃহী—যারা আশপাশের গ্রাম থেকে আসে এখানে, বিশেষত—কলকাতা বা শহর অঞ্চল থেকে যারা আসে—তাদের বড় যত্ন, তাদের থাকা খাওয়া ইত্যাদি নিয়ে সবাই ব্যস্ত।

মন্দির একটি আছে কিন্তু তার মধ্যেও সকলকে সন্তুষ্ট করার একটা আপ্রাণ চেষ্টা। অর্থাৎ তাতে রাধাকৃষ্ণ আছেন, শিব আছেন, কালী আছেন—ষষ্ঠী, শীতলা, মনসাও আছেন। ফলে উৎসব এবং বিশেষ পূজা লেগেই আছে। তাতে আয়ও হয়—আশ্রমের প্রচারকার্যও জোর চলে।

মন্দিরের ঠিক লাগাও লম্বা ব্যারাকমত একসার খড়েছাওয়া পাকা ঘর। এখানে থাকেন বসন্ত মহারাজ, দু-একজন সন্ন্যাসী কর্মী এবং জনা-তিনেক স্থায়ী আশ্রম-বাসিনী। এরই ভেতর একটি ঘরে চিত্রার থাকার ব্যবস্থা হ'ল। বসন্ত মহারাজ ঠিক তাঁর পাশের ঘরটি খালি করিয়ে চিত্রাকে দিলেন। তাতে চিত্রা একটু বিস্ময় এবং কুণ্ঠা প্রকাশ করাতে হেসে বললেন, 'আগুন নিয়ে কারবার, বুঝলে না? আগুনকে চোখে রাখতে হয়।

এই বলে চিত্রার দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে হাসলেন। লজ্জায় অরুণ-বরণ হয়ে উঠল চিত্রা।

এই ব্যারাক ছাড়াও অনেকগুলি ঘর আছে। জোড়া জোড়া ঘর, তাতে সন্ন্যাসীও থাকে, অপর কর্মীরাও থাকে। সব চেয়ে ভাল পাকা ইমারত যেটি সেটি হ'ল আশ্রমের 'গেস্ট হাউস'—শহরবাসী ভক্ত এবং শিষ্যদের জন্য।

স্থায়ী আশ্রমবাসিনী বলতে জন-তিনেক বিধবা মহিলা। দুজনকে বৃদ্ধাই বলা চলে, আর একজন মধ্যবয়সী। এঁরা নিত্য পূজার কাজ করেন, মন্দির মার্জনা করেন—দরকার হ'লে ভোগের যোগাড় দেন। রান্নার জন্য পাচক ব্রাহ্মণ আছে অবশ্য—ঝিও আছে, তারা আসে এই গ্রাম থেকেই।

এই মহিলাদের সঙ্গে চিত্রার পরিচয় হ'ল কিন্তু আলাপ হ'ল না। প্রথমত এঁরা

সকলেই ব্যস্ত, তা ছাড়াও কে জানে কেন, প্রথম থেকেই এঁরা চিত্রাকে খুব প্রীতির চোখে দেখলেন না। বরং কথাবার্তা ও ব্যবহারে একটা বিরুদ্ধভাবই প্রকাশ পেতে লাগল। সন্ন্যাসীরা সকলেই চিত্রাকে একটু বেশী খাতির করেন—এই যেন সে নীরব অভিযোগের কারণ।

তবে চিত্রা বাঁচল, ও যাবার দু-চার দিনের মধ্যেই রাণী বলে একটি মেয়ে এসে পড়ায়। রাণী সধবা, তার স্বামী যেন রেলে কী একটা বড় চাকরি করেন। বয়সও ওর বেশী নয়—কিন্তু শোকে তাপে একেবারে পাগলের মতো হযে পড়েছে। তিন-চারটি শিশু হয়েই মারা যায়, সে দুঃখ অতটা বাজে নি -কিন্তু সম্প্রতি একটি ছেলে পাঁচ'ছ বছর হয়ে মারা যাওয়াতে ওর সংযম এবং সহ্যের বাঁধ ভেঙে পড়েছে। ঐ অবস্থা দেখে ওর স্বামী এনে আশ্রমে রেখে গেলেন - পূজার্চনা এবং গুরুসঙ্গে যদি ওর মন একটু শান্তি পায়।

রাণী মেয়েটি বেশ। দেখতেও সুশ্রী, স্বভাবটিও ভাল। শান্ত, মিষ্ট। সেও চিত্রাকে পেযে বাঁচল। ওকে ধরে কোন-একটা গাছতলায় নয়ত কোন পুকুর ঘাটে টেনে নিয়ে গিয়ে গল্প করে। তার ঘরকন্নার গল্প, তার ছেলেদের গল্প। কেমন সুন্দর দেখতে হয়েছিল খোকাটা, কত কি কথা বলত – কেমন পাকা পাকা জ্ঞানবানের মতো কথা। বলে আর হাউ হাউ ক'রে কাঁদে। চিত্রারও চোখ ছল্‌ছলিয়ে আসে ওর কান্নায়, সে নীরবে চোখ মোছে। তবে রাণী কেঁদেই শান্ত হবে ক্রমশ, এটা বুঝে ও বাধাও দেয় না।

মধ্যে মধ্যে রাণীর খেয়াল হয ওর কথা। চিত্রার কথা, ওর পরিচয় জিজ্ঞাসা করে।

চিত্রা মাথা হেঁট ক'রে বলে, 'আমার কথা আর কি শুনবেন, কেউ কোথাও নেই, অনাথা। তাই গুরুদেব এনে আশ্রয় দিয়েছেন।'

গুরুদেবের প্রসঙ্গে রাণী উৎফুল্ল হযে ওঠে, 'সত্যি ভাই, উনি না থাকলে যে কি করতুম। আমি তো পাগল হয়েই গিয়েছিলুম, ওখানে থাকলে এতদিনে বোধ হয় কাপড় ফেলে রাস্তায বেরিয়ে পড়তুম পাগল হয়ে। গুরুদেবই বললেন, রাণীকে আমার কাছে দিয়ে যাও অমুক, ওকে শান্ত ক'রে দেব।...বাস্তবিক এই কদিনেই যেন কতটা সুস্থ হয়ে উঠেছি, না? কী অদ্ভুত মানুষ বলো তো ভাই! কি মজার মজার গল্প করেন, কত হাসিঠাট্টা অথচ তার মধ্যে কত উপদেশ থাকে।'

রাণী গুরুদেবের সেবাও করে খুব। অত পারে না চিত্রা। ভোরে উঠে শিশুর মতোই ওঁর মুখ ধোওয়ানো, তেল-মাখানো, স্নান-করানো—ওঁর চা জলখাবার দেওয়া, ওঁর পূজার যোগাড়—নিটোল এবং নিরেট সেবা। ওঁর একটি কাজও আর কাউকে

করতে দেয় না—ওর যা কিছু গল্প বা অন্য কাজ চলে গুরুদেবের সেবার ফাঁকে ফাঁকে।

চিত্রাও কিছু কাজ করতে চায়—মন্দিরের কাজ করতে বা পূজার যোগাড় দিতে চেষ্টা করে কিন্তু সেখানে সেই প্রবীণা আশ্রমবাসিনীরা সবটাই জোড়া করে বসে থাকেন, ও কী করবে ভেবে পায় না।

এক আধবার হয়ত বলতে যায়, 'দিদি, আমায় কিছু কাজ দিন না'—সোনার মা কি বরদা অমনি কাষ্ঠহাসি হেসে বলেন, 'না বোন—আমরাই তো রয়েছি, দুদিনের জন্য এসে তুমি আর এসব করতে যাবে কি জন্যে? ছেলেমানুষ, তোমাদের এখন হেসে-খেলে বেড়াবার সময়—'

রান্নাঘরে গিয়ে মধ্যে মধ্যে কুটনো কোটা, ডাল-মশলা বাছার কাজে সাহায্য করে। সেখানে যেসব মেয়েরা আছে, তারা এই গ্রামেরই—পয়সার জন্যে কাজ করে, যতটা বোঝা কমে যায় তাদের পক্ষে ততই ভালো। কিন্তু বরদা কি কালী কি সোনার মা এসে পড়লে ওকে আর কিছু করতে দেন না। ওর কাজে খুঁৎ ধরেন, প্রচ্ছন্নভাবে বিদ্রূপ করেন ওকে। সেসব চিত্রার ভাল লাগে না। একদিন সে গুরুদেবকে কথাটা বললেও, তিনি কিন্তু হেসে উড়িয়ে দিলেন, 'ওরে পাগলী, তোরই তো ভাল, কী দরকার মিছিমিছি খেটে মরবার? যতদিন গায়ে হাওয়া লাগিয়ে থাকতে পারিস থাক না!'

'কিন্তু আমিই বা চুপচাপ বসে থাকি কি ক'রে বলুন তো?'

'বইটই পড় না। আশ্রমে তো ধর্মগ্রন্থ বিস্তর আছে। একটু সাধনভজন কর্—সন্ধ্যেবেলা আমার কাছে এসে বসিস, আমি কিছু পথ বাত্‌লে দেব—কেমন?'

॥ ৭ ॥

কথাটা চিত্রার প্রাণে লাগল। পরের দিন থেকে সে পূজা আহ্নিকের সময় বাড়িয়ে দিলে। যতটা সময় পারে ধ্যান বা জপে কাটায়, বাকি সময়টা কোন একটা বই নিয়ে গিয়ে একটা গাছতলায় পড়তে বসে। সন্ধ্যাবেলা মেয়েরা যখন গুরুদেবের কাছে গিয়ে বসে তখন সেও এক-একদিন যায় কিন্তু সেখানে যে সব প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা হয় তা ওর ভাল লাগে না। সবই যেন ভাসা-ভাসা। বাজে কথাই বেশি—হাসি ঠাট্টা, দু-একটা বা ভগবৎ-প্রসঙ্গ আলোচিত হয় তা ছেলেমানুষী বলে মনে হয় চিত্রার।…বইগুলো পড়েও খুব শান্তি পায় না। মনে হয় বড় বেশী বাহ্য, বড় বেশী হাল্কা। অধিকাংশের মধ্যেই কোন একটি দেবতার বা কোন একটি তথাকথিত

মহাপুরুষের বিজ্ঞাপন। প্রতিবেশীর বা সমকালীন মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নতির চেয়ে নিজের নিজের মত বা গুরুর প্রচার কার্যের দিকেই ঝোঁক বেশী। এমন কি পুরাণগুলিরও সেই অবস্থা। এক একজন এক একটা দেবতাকে নিয়ে এমন বাড়িয়েছে যাতে সেই বিশেষ দেবতাকে ভগবান বলে মনে হয়। বাকী সব দেবতা তার কাছে তুচ্ছ। এমন কি একই ঘটনা এক এক পুরাণে এক একটি দেবতার মহিমার উপর আরোপ করা হয়েছে।

তবু সে চেষ্টা করে প্রাণপণে। বিশ্বাস করার চেষ্টা করে ওরই মধ্যকার কতক কথা। পূজায় বা জপে বসে মনের মধ্যে ইষ্টকে ধারণা করার চেষ্টা করে একান্তভাবে। ভগবানকে ডাকে আকুলভাবে, 'এ মন তুমিই তোমার দিকে ফিরিয়ে নাও ঠাকুর—তুমিই পথ দেখিয়ে নিয়ে যাও।' সে আকুলতায় ওর চোখে জল এসে যায়, মনে মনে আশ্বাস লাভ করে কেমন একটা—হয়ত এবারে ও ব্যর্থ হবে না।

কিন্তু জ্যৈষ্ঠের অলস মধ্যাহ্নে যখন এক-একদিন বাগানের কোন একটা গাছ-তলায় বসে সুদূর দিগন্তে চেয়ে থাকে, নির্মেঘ আকাশ থেকে খররৌদ্রের অগ্নিবর্ষণ হতে থাকে দিক্-দিগন্তরে, তখন মন যেন কী এক অজানা দুঃখে, অজ্ঞাত ব্যর্থতায় হু-হু ক'রে ওঠে: কী কাজ ওর বাকী আছে, ওর এই জীবনের কোন এক সার্থকতায় ওকে পরিপূর্ণ হয়ে উঠতে হবে—কেবলই এই কথাটা ওর মনে হয়। যেন ওর কত আত্মীয় কোথায় কোথায় ছড়িয়ে আছে, তাদের খুঁজে বার করতে অন্তত কোন এমন একটি মানুষ—যার কাছে প্রাণের সব কথা বলা যায়, সব কথা না বললেও যাকে চলে, প্রাণের কোন্ নিগূঢ় যোগাযোগে সহানুভূতির ঠিক সুরটি বেতার-বার্তার মতো যার হৃদয়যন্ত্রে আপনি বেজে উঠবে।

পরিপূর্ণ, সহজ, সুন্দর নারীজীবন! যার আভাস মাত্র ও পেয়েছে ইস্কুলের অপর ছাত্রী বা শিক্ষয়িত্রীদের কথাবার্তায়: সাধারণ সংসারের প্রাত্যহিক জীবন-যাত্রা, তার সমস্ত সুখ-দুঃখ, মাধুর্য-বেদনা সুদ্ধ যে জীবনে তার অধিকার আছে কি নেই আজও সে বুঝতে পারে নি—সেই পারিবারিক জীবনই একটা অমোঘ আকর্ষণে টানে ওকে। টানে আর উতলা ক'রে তোলে; যার পরিচয় সে প্রত্যক্ষভাবে পায় নি কখনই, তারই রহস্য তাকে উন্মনা বিভ্রান্ত ক'রে তোলে।

তবে কি সে-ই ওর পথ!

এই জ্যৈষ্ঠের আকাশ, এই স্তম্ভিত প্রকৃতি—ঈশ্বরের বিভূতির এই রুদ্র প্রকাশে কি সেই বার্তাই ঘোষিত হচ্ছে? ওর এ তপস্যা, ঈশ্বরের দিকে নিজেকে ফেরাবার, তাঁর পায়ে নিজেকে সঁপে দেবার এই প্রয়াস, এটা কী তা'হলে ব্যর্থ হল আবারও? ওর

জীবনের চরম মূল্য কি তাতে শোধ হবে না ?

কে দেবে উত্তর ওকে ? যিনি দিতে পারতেন, যিনি অজ্ঞান অন্ধকারে জ্ঞানশলাকা দিয়ে অন্তর্দৃষ্টি উন্মীলিত করার ভার নিয়েছেন—তাঁর কাছে এ প্রশ্ন নিয়ে যেতে চায় না চিত্রা। কেমন যেন মনে হয় এর উত্তর দেবার অধিকার তাঁর নেই। যে স্তরের সন্ন্যাসী হ'লে সাধক হ'লে এ উত্তর দিতে পারতেন—সে স্তরের উনি নন্। এটা ভাবা হয়ত ওর অপরাধ, সেজন্যে কুণ্ঠিত হয়ে পড়ে নিজের মনে মনেই, তবু না ভেবে পারে না।

এ হয়ত ওর একটা দুর্বলতাই। জোর করে মনকে শাসন ক'রে চিত্রা—এক একদিন এগিয়ে যায়, কাছে গিয়ে বসে ওঁর, কিন্তু সেই সব চিরাভ্যস্ত দুর্বল রসিকতায়, নানা প্রাকৃত আলাপে মন আবার নিজের খোলসের মধ্যে সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে, শামুকের মতো গুটিয়ে নেয় নিজেকে।

বলা হয় না। বলা যায় না।

গুরুদেব হয়ত ঠাট্টা করবেন, 'কী গো, নবীনা ভৈরবী, নবীন তপস্বিনী। কী যেন বলি বলি ক'রেও বলতে পারছ না ? খুলে বলোই না। তপস্যার কিছু বিঘ্ন ঘটছে কি ? স্নো পাউডার ইত্যাদির অভাবে কি ইষ্টপূজায় ঠিক মন বসছে না ? বলো বলো খুলে বলো - ভয় কি ? অভয় দিচ্ছি।'

উপস্থিত শ্রোতারা হয়ত এ রসিকতায় হেসে ওঠে। গুরুদেব আবারও বলেন, 'চিত্রু যেন এই কদিনে বড় রোগা হয়ে গিয়েছে, না ? ময়লাও হয়ে গিয়েছে। বলি ওগো তপস্বিনী, নিজের দেহটার দিকেও একটু নজর রেখো। বিধাতা পরিপূর্ণ শতদল ক'রে ফুটিয়ে তুলেছেন তোমাকে—সেটাই যদি নষ্ট ক'রে ফেল অযতনে তো তাঁর পূজায় কি লাগাবে ?'

লজ্জায় রাঙা হয়ে ওঠে চিত্রা, পালাতে পথ পায় না। মনের প্রশ্ন বাইরে আসতে গিয়েও এসব ক্ষেত্রে নিজেই অপ্রতিভ হয়ে ফিরে যায়।

একদিন দুপুরবেলা ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণখানা হাতে ক'রে নিয়ে চিত্রা একটা আম-গাছের তলায় গিয়ে বসেছিল। জায়গাটা ওদের মন্দিরের পিছনে এবং একেবারে বাগানের এক প্রান্তে, অপেক্ষাকৃত বেশী নির্জন। তাছাড়া একটা বড় করমচা গাছে এবং পেয়ারা গাছে জড়াজড়ি সেখানটায়, তাতে একটা বন-ধুঁধুলের লতা উঠে দুটো গাছকেই ঢেকে মধুর একটি ঝোপ এবং ছায়ার সৃষ্টি করেছে। জায়গাটি ওর বড় প্রিয়, দুপুরবেলা একান্তে থাকবার মতোই সে স্থান।

কিন্তু বইয়ে সেদিন কিছুতেই মন বসল না। বোধ হয় অসহ্য গরমও তার একটা কারণ। জোর ক'রে পড়বার চেষ্টা করতে করতে একসময়ে সে ঘুমিয়েই পড়ল।

ঘুম যখন ভাঙল তখন কিরকম একটা অদ্ভুত অনুভূতি হ'ল যেন। কে যেন ওর মাথাটা কোলে তুলে নিয়েছে, মুখ মুছিয়ে দিচ্ছে ওর, যেমন ছেলেবেলায় ওর মা দিতেন। মা—মা—

তবে কি ওর মাকেই স্বপ্ন দেখছে ও ?

কিন্তু না তো! অবাক হয়ে চোখ চেয়ে দেখলে কখন স্বয়ং গুরুদেব এসে ওর পাশে বসেছেন এবং তিনিই ওর মাথাটা কোলে তুলে নিয়েছেন—সযত্নে এবং সস্নেহে তাঁর গেরুয়া বহির্বাসের প্রান্ত দিয়ে ওর ললাট কণ্ঠ কপোলের ঘাম মুছে নিচ্ছেন।

বিষম অপ্রতিভ হয়ে সে ধড়মড় ক'রে উঠে বসল। তাড়াতাড়ি ওঁর পায়ের ধুলো নিলে।

'ছি ছি! ও কি করছেন? ওতে যে আমার অপরাধ হয়!'

'দূর পাগলি। এতে আবার অপরাধ কি। যাচ্ছিলাম এখান দিয়ে, দেখি ঘামে ভেসে যাচ্ছে তোর দেহ, আর তুই অগাধে ঘুমোচ্ছিস! দেখে বড় মায়া হ'ল—যা, এখন ঘরে যা, এই গরমে রোদ্দুরের ঝাঁঝে বসে থাকতে হবে না।'

তারপর একটু হেসে, ওর একটা শিথিল হাত নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে একটু চাপ দিয়ে বললেন, 'কী মনে হচ্ছিল জানিস তখন তোকে দেখে? মনে হচ্ছিল সত্যিই ননীর দেহ তাপে গলে যাচ্ছে—'

হাতটা টেনে চিত্রা উঠে দাঁড়াল। কী ছাই এই পোড়া দেহটারই বার বার প্রশংসা করেন উনি, ওঁর মুখ থেকে যেন বড় অশোভন ঠেকে।

সে বইখানা কুড়িয়ে নিয়ে চলে যাচ্ছিল, গুরুদেব ডাকলেন পিছন থেকে, 'এই শোন্—'

ফিরে দাঁড়াল চিত্রা, 'কিছু বলছেন?'

'হ্যাঁ—তুই কি কচ্ছিস না কচ্ছিস আমি একটু দেখতে চাই। এক কাজ করিস, সন্ধ্যার পর তোর আহ্নিক সেরে তুই আমার ঘরে যাস। আমি শুনব তোর কাছ থেকে—দরকার হয় কিছু বলবও।'

'আচ্ছা', বলে ঘাড় হেলিয়ে সম্মতি জানিয়ে চিত্রা চলে গেল। ওর সেই গতি-পথের দিকে চেয়ে গুরুদেব স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন।

চিত্রা ঘরে গিয়ে ক্লান্ত হয়ে শুয়ে পড়ল। আজ যেন বড্ড বেশী মার কথা মনে হচ্ছে। কি স্নেহে কি সতর্কতার সঙ্গে ওকে মানুষ করেছেন—প্রতিটি দিন রাত্রি ধরে তাঁর কি সজাগ সতর্কতা। কিন্তু মা কি জানতেন না তিনি চলে গেলে চিত্রা কি

অসহায় হয়ে পড়বে? তবে কেন তিনি নিজেকে অমনভাবে ক্ষয় করে আনলেন তিলে তিলে—? তবে কি তারই কিছু অপরাধ হয়েছিল?

'মা মা! মাগো!' অনেকদিন পরে মাকে স্মরণ ক'রে কাঁদল চিত্রা বহুক্ষণ ধরে।··

খানিক পরে দোর ঠেলে রাণী ঘরে ঢুকল।

'এসো রানীদি।' চোখ-মুখ মুছে উঠে বসে চিত্রা।

'ওমা, তোর চোখ এত লাল কেন রে চিত্রা? কাঁদছিলি বুঝি? ছি ছি, কি হ'ল আবার রে?' তারপর ওর চৌকির ওপরই বসে পড়ে বলে, 'তোর মনটা বুঝি খুব অশান্ত হয়েছে? তাই গুরুদেব বলছিলেন আজ সন্ধ্যায় বিশেষ ক'রে তোকেই শুধু কি সব উপদেশ দেবেন। বেশ, বেশ—খুব ভাল হবে দেখবি!'

রাণীর কণ্ঠে কি ঈষৎ ঈর্ষার সুর? আশ্চর্য? এতেও মানুষের ঈর্ষা হয় নাকি? চিত্রা অবাক হযে ভাবে।

রাণী একটু থেমে বলে, 'ক'দিন আমাকে উপদেশ দিচ্ছিলেন কি না? আমি ওঁর পদসেবা করি আর উনি আস্তে আস্তে কত কি বলে যান। কখনও উপদেশ দেন গল্প করেন, কখনও হাসি-তামাসা করেন। সব কি ছাই বুঝি? কিন্তু কি মিষ্টি যে লাগে! আমি যেন সব ভুলে যাই। বাস্তবিক এই ক'দিনেই—বোধ হয় এক মাস এসেছি, না?—যেন অনেকটা মানুষের মতো হয়ে উঠেছি। না রে?

চিত্রা হেসে বললে, 'তবে এতদিন কিসের মতো ছিলে রাণীদি? জন্তুর মতো?'

'না, পাগল তো হয়ে গিয়েছিলুম। বাকী কি ছিল। এখন কিন্তু আর অত দুঃখ নেই। ওঁর কৃপায় মনে বেশ একটা শান্তি এসেছে। একটা অলৌকিক শক্তি আছে ওঁর মধ্যে, এটা মানতেই হবে। তুই কি বলিস? নেই?'

একটা অস্ফুট শব্দ ক'রে চিত্রা উত্তর দেবার দায় এড়িয়ে গেল। তাতেই উৎসাহিত হযে রাণী বললে, 'আমি এখন আর কিছুদিন সংসারে ফিরে যাব না, হয়ত আর কোন দিনই যাব না। ওকেও বলে দিয়েছি সে কথা। ওকে আসতেও বারণ ক'রে দিয়েছি। কে জানে ওকে দেখেই হয়ত আমার আবার সব কথা মনে পড়ে যাবে, পাগলের মতো হয়ে উঠব—'

এমনিই কত কি বকে যায় রাণী—আপন মনেই। চিত্রা কতক শোনে কতক শোনে না। মনে মনে ভাবে যে কেন এদের মতো সহজ ভক্তি এবং বিশ্বাস আসে না ওর মনে?···

সন্ধ্যার পরে গুরুদেবের ঘরের ভেজানো দোর ঠেলে ঘরে ঢুকল চিত্রা। ঘরে খুব মৃদু একটা আলো জ্বলছে, বোধ হয় শেজের আলো। কিছু পূর্বেই ওঁর সন্ধ্যা সারা

হয়েছে, এক পাশে আসন ইত্যাদি তখনও পাতা। উনি বিছানায় একটা তাকিয়া ঠেস দিয়ে অর্ধশায়িত হয়ে বসে, রাণী পা টিপে দিচ্ছে।

চিত্রা যেতেই রাণী উঠে দাঁড়াল, দু হাতে গুরুদেবের দু'পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে দোর ভেজিয়ে দিয়ে বেরিয়ে গেল। বোধ হয় এই রকমই নির্দেশ ছিল।

চিত্রা আস্তে আস্তে গিয়ে রাণীর জায়গাটিতেই বসে ওঁর পায়ে হাত দিলে।

'উঁহু উঁহু, ওখানে নয়, আমার কাছটিতে এসে বসো। তোমার অনেক কথা যে শুনতে হবে।' গুরুদেব যেন ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। ওর একটা হাত ধরে একরকম টেনেই কাছে এনে বসালেন, একেবারে গায়ের কাছে। চিত্রা একটু বিব্রত বোধ করল। ছেলেবেলায় অনেক বার এমন বসেছে কিন্তু এখন বড় হয়ে—কেমন যেন লাগে।

'তারপর বলো তো দেখি—কি বলবার আছে তোমার?'

প্রথমটা চিত্রা ভেবেই পায় না কি বলবে, কেমন ক'রে গুছিয়ে বলবে। যা বক্তব্য তা তো ওর মনের মধ্যেও অস্পষ্ট, ঝাপসা ঝাপসা। তখনও কোন পরিষ্কার রূপ নেয় নি। তবু থেমে থেমে, একটু একটু করে বললে চিত্রা—ওর সংশয় এবং তার ফল-স্বরূপ ব্যর্থতার বেদনার কথা। কিছুতেই যেন শান্তি পায় না, কিছুতেই ইষ্টে মন বসাতে পারে না। একান্ত আত্মনিবেদনের তৃপ্তি নেই ওর অন্তরে—কেবলই সংশয়। ঠিক পথে চলছে কি না—কোনদিন সার্থকতা পাবে কি না; ভগবানে চরম আত্মোৎসর্গ করা কোনদিন ওর পক্ষে সম্ভব হবে কি না। এও জানতে চায় সে—কেমন ক'রে মনকে সংহত ক'রে নিয়ে আসতে পারবে আরও। চারিদিকের অসংখ্য মরীচিকার পেছনে ছোটা ওর কবে বন্ধ হবে।

বলতে বলতে ক্রমশঃ চিত্রা নিজের চিন্তার মধ্যে নিজেই ডুবে গিয়েছিল, যেন অকস্মাৎ একসময় সচেতন হয়ে দেখলে গুরুদেব একদৃষ্টে ওর দিকে চেয়ে আছেন, ওষ্ঠে তাঁর অতি সূক্ষ্ম হাসি। বোধ হয় সেটা বিদ্রূপেরই। চিত্রা থেমে গেল।

তিনি ওর একটা বাহুমূলে চাপ দিয়ে বললেন, 'তুই একটা আস্ত পাগলি। এখন থেকে অত সংশয় অত চিন্তা কেন? ক'রে যা যা-কিছু নিত্য করণীয়। অভ্যাসও একটা যোগ। করতে করতেই মনে বল আসবে, বিশ্বাস আসবে। জপাৎ সিদ্ধি, জপাৎ সিদ্ধি।'

তারপর একটু থেমে বললেন, 'আর তোর অত চিন্তাই বা কি? গুরুই হচ্ছেন ভবের কাণ্ডারী, সে গুরু আমি যখন তোর ওপর খুশী আছি তখন আর ভাববার কি আছে? জানিস তো ইহলোকে গুরু গোবিন্দের চেয়েও বড়। গুরু তুষ্ট থাকলে অন্য ভজনের দরকার কি?'

চিত্রা ঘাড় নাড়ল, বোধ হয় কিছু একটা সায় দেওয়া দরকার এই কর্তব্যবোধেই।

তিনিও উৎসাহিত হয়ে ওকে আরও কাছে টানবার চেষ্টা ক'রে ওর গাল টিপে একটু আদর করলেন। তারপর ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে অকস্মাৎ অতর্কিতভাবে একেবারে ওকে বুকে টেনে নিলেন।

কিছুক্ষণ সত্যিই বিহ্বলভাবে ছিল চিত্রা। এ ওর ধারণারও অতীত, সুদূর কল্পনাতেও কোনদিন আশঙ্কা করে নি। কিন্তু কয়েক মুহূর্ত মাত্র। তারপরেই এক ঝটকায় নিজেকে মুক্ত ক'রে নিয়ে উঠে দাঁড়াল চিত্রা। রাগে, ক্ষোভে, দুঃখে, হতাশায়, উত্তেজনায় থরথর করে কাঁপছে—তবু তারই মধ্যে ওর কণ্ঠ থেকে একটা তীব্র স্বর বেরিয়ে এল—চাপা অথচ কেমন তীক্ষ্ণ, ঘৃণা ও আত্মগ্লানির মর্মান্তিক কণ্ঠস্বর, 'ফের যদি কোনদিন এ চেষ্টা করেন সেদিন গলায় দড়ি দেব আপনার সামনে। এর আগে আমার মৃত্যু হওয়াই উচিত ছিল।'

ওঘর থেকে একরকম ছুটেই এঘরে এসে দোরে খিল দিয়ে মেঝেতে লুটিয়ে পড়ল চিত্রা। সত্যি সত্যিই প্রথম কিছুক্ষণ নিরতিশয় আত্মধিক্কারে ও আকণ্ঠ গ্লানিতে মেঝেয় মাথা ঠুকতে লাগল।

'মা গো মা, আমাকে নাও—আর পারি না!'

তারপর প্রাথমিক আবেগ ও উত্তেজনা স্তিমিত হয়ে এলে শ্রান্ত হবার সঙ্গে সঙ্গেই ওর প্রথম প্রতিক্রিয়া হ'ল ছুটে কোথাও পালিয়ে যাবে কিনা। এখান থেকে, এই আশ্রম থেকে বেরিয়ে যেখানে হোক, এ রাত্রি প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গে এই আশ্রমের দুঃস্বপ্ন যেন মুছে যায় দৃষ্টির সামনে থেকে—

কিন্তু কোথায় যাবে?

এখনও পরীক্ষার ফল বেরোয় নি। বেরোলেই বা কি, এখনই সে কোথায় কি কাজ পাবে? তাছাড়া যেখানে যাবে সেখানেই এই ব্যাপার চলবে ওকে ঘিরে। এটা চিত্রা বুঝে নিয়েছে সংসারে বিশেষ না মিশেও। তার রূপে এমন দাহিকা শক্তি আছে যে মানুষের পতঙ্গ-বৃত্তি জাগ্রত হয় নিমেষে। কোথাও আজ আর ওর নিরাপদ আশ্রয় নেই। চিরকাল সতর্ক হয়ে এবং যুদ্ধ ক'রেই বেঁচে থাকতে হবে ওকে। সন্ন্যাসীরও যখন প্রৌঢ় বয়সে তপোভঙ্গ হ'ল, তখন আর কার ওপর ভরসা করবে ও?

ওর আশ্রয়ই বা কোথায়? শান্তিদি? তিনি এমনিই যথেষ্ট বিব্রত, তার ওপর আবার বোঝা হয়ে গিয়ে চাপা? না, সে হয় না।

সারারাত ধরে আকাশপাতাল ভাবল ও। রাত্রে রাণী ডাকতে এসেছিল খাবার

জন্যে, কিন্তু মাথা ধরার অজুহাতে ওঠে নি। সমস্ত রাত ভেবে আর কেঁদেও কোন কূলকিনারা পেল না চিত্রা, একেবারে শেষ রাত্রে একান্ত শ্রান্তিতে ওর সমস্ত স্নায়ু যখন অবসন্ন হয়ে পড়ল তখন স্বপ্ন দেখল, ওর মা যেন শিয়রে এসে বসে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলছেন, 'এই তো জীবনযুদ্ধের শুরু মা, এখনই হার মানলে চলবে কেন ?'

আচ্ছন্ন ভাবটা কেটে গেল নিমেষে। ধড়মড়িয়ে উঠে বসল চিত্রা। তখন সবে ভোর হচ্ছে। আয়নায় নিজের মুখ দেখে নিজেই শিউরে উঠল। এ কি চেহারা হয়েছে ওর, আশ্রমের লোকেরা দেখলে কি মনে করবে !

তাড়াতাড়ি গামছাটা টেনে নিয়ে গিয়ে পুকুরে পড়ে সেই অন্ধকারেই অনেকক্ষণ ধরে স্নান করল। তারপর আবক্ষ জলে দাঁড়িয়ে উদয়দিগন্তের আশ্চর্য জ্যোতির্ময়তার দিকে তাকিয়ে হাত জোড় ক'রে প্রণাম জানাল বহুক্ষণ ধরে, 'ঠাকুর, তুমিই রক্ষা করো, তুমি বল দাও।' পাগলের মতো আপন মনেই অস্ফুট কণ্ঠে বলল বার বার।

সিক্তদেহের শীতল আর্দ্রতার উপর দিয়ে কয়েকটা ফোঁটা উষ্ণ জলও গড়িয়ে পড়ল কপোল বেয়ে।

কিন্তু এবারে সে সত্যিই শান্তি পেল একটা।

॥ ৮ ॥

পরীক্ষার ফল বেরোল। চিত্রা ফার্স্ট ডিভিসনেই পাশ করেছে। শান্তিদি টেলিগ্রাম ক'রে জানালেন।

গুরুদেব ওকে ডেকে পাঠিয়ে বললেন, 'তারপর ? এখন কি করবে ?'

সেদিনের সে ঘটনার পর থেকে গুরুদেবও আর কোনদিন কোনপ্রকার ঘনিষ্ঠতার চেষ্টা করেন নি, চিত্রাও তাঁর সঙ্গে নির্জন সাক্ষাৎ এড়িয়ে গেছে। তবে দুজনেই দুজনকার সঙ্গে বাহ্যিক সহজ ব্যবহার বজায় রাখায় আশ্রমের লোক কিছু বুঝতে পারে নি।

এই প্রথম তিনি ওকে আবার ঘরে ডেকে পাঠিয়েছেন।

চিত্রা মাথা নিচু ক'রে বললে, 'আমাকে একটা উপার্জনের কোন পথ ক'রে দিন। কোন মাস্টারী বা অফিসের কোন কাজ—'

'অফিসের কাজ শুধু ম্যাট্রিক পাস করলে পাওয়া শক্ত। স্টেনোগ্রাফীটা জানলে অনেক সময় সহজ হয় ব্যাপারটা। আর মাস্টারী পেলেই বা কত মাইনে পাবে ? ম্যাট্রিক পাস মাস্টারনীর বড়জোর কুড়ি-পঁচিশ টাকা মাইনে, তাতে কি হবে ?'

'সে যেমন ক'রে হোক চালাব। তারপর শর্টহ্যাণ্ড শিখে নিয়ে কিংবা প্রাইভেটে আই-এ দিয়ে উন্নতির চেষ্টা করব।'

উৎসুক দৃষ্টিতে তাকায় চিত্রা। গুরুদেব কিছুক্ষণ মৌন হয়ে রইলেন। কি যেন বলতে চান অথচ ভরসা হচ্ছে না, এই মুখের ভাব।

শেষে বলেই ফেললেন কথাটা, 'তুমি না হয় ওখানে থেকে আই-এ-টা পড়ো, আমিই যেমন ক'রে হোক খরচা চালাব'খন। আই-এ পড়ো আর সেই সঙ্গে শর্টহ্যাণ্ডটা শিখে নাও।'

চিত্রা বেশ দৃঢ়ভাবেই ঘাড় নাড়ল, 'না, দেখুন, গলগ্রহ হযে আর দীর্ঘকাল অনিশ্চয়তাব মধ্যে থাকবার আমার ইচ্ছে নেই। আপনি শান্তিদিকেও লিখে দিন— আর আপনি চেষ্টা করলে বোধ হয় খুব অসম্ভব হবে না। যত কম মাইনেই হোক আমি ঠিক চালিযে নেব।'

গুরুদেব ওর মুখের ভাব দেখে আর জোর করলেন না। শুধু বললেন, 'তা বরং শান্তিব ওখানে যদি থাকবার ব্যবস্থা হয তো ওখানেই কয়েক মাস থেকে না হয় স্টেনোগ্রাফীটা শিখে নাও– '

'একান্ত যদি আর কোন ব্যবস্থা না হয় তো তাই করতে হবে, কিন্তু আগে যদি এমন একটা কিছু করা যায় যে—সামান্য কিছুও উপার্জন করতে পারি, তা হ'লে সবচেয়ে ভাল হয়। দু-এক মাস আরও না হয় এখানেই অপেক্ষা করি।'

আশ্চর্য, এখানেও যে তার যাবতীয় খরচ গুরুদেব চালাচ্ছেন সে কথাটা ওর মনেও হ'ল না।

তিনিও সে কথার ইঙ্গিত-মাত্র করলেন না, বরং সামান্য একটু হেসে বললেন, 'আচ্ছা, তাই হোক। দেখি কি করতে পারি।'

আসলে আশ্রমের মধ্যে চিত্রাকে রাখাও বিপজ্জনক হযে পড়ছিল। চিত্রার মধ্যে সেই তদ্গত ভক্তি ও শ্রদ্ধার অভাব—যেটা ওঁর আশ্রম গঠনের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। দুষ্টরোগের বীজাণুব মতোই চিত্রার স্বতন্ত্রতা বিপজ্জনক হয়ে উঠেছিল।...

তবুও এর পর আরও মাস দুই কাটল এমনি ভাবেই। চিত্রার অসহ্য লাগে এই নিষ্ক্রিয়তা— এবং অন্ধকার ও অনিশ্চিত ভবিষ্যতেব ওপর বরাত দিয়ে এই ভাবে বসে থাকাটা। অথচ কীই বা করতে পারে? লেখাপড়া করারও কোন উপায় নেই— এখানে যে লাইব্রেরী আছে তাতে ওর পড়ার মতো বই নেই। অনেক ক'রে গুরুদেবকে বলে কলকাতা থেকে ইণ্টারমিডিয়েটের দু-একখানা বই আনিয়েছে— প্রাণপণে তাই-ই পড়ে যায় কিন্তু তার অর্ধেক কথাই ও বুঝতে পারে না। কে

পড়াবে এখানে ?

এই যখন অবস্থা—তখন আর একটা ঘটনার ঢেউ ওকে এখান থেকে অকস্মাৎ উন্মূলিত ক'রে অজানা ভবিষ্যতের পথেই বার ক'রে দিলে।

কিছুদিন ধরেই চিত্রা লক্ষ্য করছিল রাণীর অসুস্থতা। কি যে অসুখ তা বোঝা যায় না, তবে দিন দিন কেমন যেন বিবর্ণ হয়ে উঠছে। আহারে রুচি নেই—তারপর শুরু হ'ল বমি, যা কিছু খায় সঙ্গে সঙ্গে বমি করে। পেটেরও গোলমাল। চিত্রা উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে, রাণীকে বার বার বলে, 'রাণীদি, তোমার পেট ভাল যাচ্ছে না। তুমি ভাল একটা ডাক্তার দেখাও।...তোমার রীতিমতো হজমের গোলমাল হচ্ছে, বমিও তাই থেকে—'

রাণী কিন্তু কেমন যেন নিশ্চিন্ত, নিরুদ্বিগ্ন। সে হেসে বলে, 'দূর পাগলী, ডাক্তার দেখাব কি ? ও কিছু না। ঠিক হয়ে যাবে।'

চিত্রা আরও বিস্মিত হয়ে লক্ষ্য করে যে বাকী যে দু-তিনজন মহিলা আশ্রমিকা আছেন তাঁদেরও যেন এ সম্বন্ধে কোন উদ্বেগ নেই। বরং তাঁরা কেমন একরকম ক'রে মুখ টিপে টিপে হাসেন—রাণী পিছন ফিরলে হাসাহাসি করেন ওকে উপলক্ষ্য ক'রেই—। ব্যাপারটা বুঝতে পারে না চিত্রা। এর মধ্যে কোথায় যেন একটা কি রহস্য আছে এবং সে ব্যাপারে চিত্রা সম্পূর্ণ নির্বোধ।

ইতিমধ্যে একদিন রাণীর স্বামী এলেন।

এতদিন রাণী এসেছে, তার ভেতর তিনি দুবার মাত্র এসেছেন, তাও খুব অল্পক্ষণের জন্য। একদিন কি একবেলা মাত্র থেকে চলে গেছেন এবং তারই মধ্যে চিত্রা লক্ষ্য করেছিল বেশ হাসিখুশি মানুষটি। কিন্তু এবার এলেন যেন আষাঢ়ের মেঘের মতো মুখ ক'রে। তিনটের ট্রেনে এসে পৌঁছলেন—এসেই সোজা গুরুদেবের ঘরে গিয়ে দোর দিলেন। বেরিয়ে এলেন সন্ধ্যারও পর। এসেও পুকুরপাড়ে বসে রইলেন বহুক্ষণ, একা। ওদের বহু অনুরোধেও কিছু খেতে রাজী হলেন না—অতি কষ্টে শুধু এক কাপ চা খাওয়াতে পারল ওরা।

খানিক পরে গুরুদেবের সন্ধ্যাহ্নিকের সময় পার ক'রে আবার বিশ্বনাথবাবু গিয়ে ঢুকলেন তাঁর ঘরে। এবার রাণীও ছিল। ওঁরা ঘরে গিয়েই দরজা বন্ধ ক'রে দিলেন।

অর্থাৎ কি একটা গুরুতর রকমের কিছু ঘটেছে। চিত্রা কিছুই বুঝতে পারে না, তবে ওর মনে হয় এ অজ্ঞতা শুধু ওরই—বাকী সকলেই যেন ব্যাপারটা জানে। এতে মনে মনে কেমন যেন অপ্রতিভ হয়ে পড়ে চিত্রা নিজের নির্বুদ্ধিতায়। রাত ক্রমশ গভীর হয়ে এল, আশ্রমবাসী ও অতিথিদের খাওয়াদাওয়ার পাট সারা হয়ে গেল, তবুও

ঘরের দোর খোলে না। এমন কী ঘটেছে, এত কিসের পরামর্শ ? নাকি বিশ্বনাথবাবুর অধ্যাত্মজীবনেই কোন বেদনা বা অসন্তোষের কারণ ঘটেছে তাই সাধনার উপদেশ নিচ্ছেন স্বামী-স্ত্রী মিলে ? কিছুই বোঝে না চিত্রা, কিন্তু প্রবল কৌতূহলও ওকে স্থির থাকতে দেয় না সে জেগেই বসে থাকে বহু রাত্রি পর্যন্ত।

অবশেষে এক সময় খুট্ ক'রে দোর খোলার আওয়াজ হয়। মুহূর্ত কয়েক পরেই ঝড়ের মতো রাণী এ ঘরে ঢুকে দরজাটা বন্ধ ক'রে দেয ভেতর থেকে, ভাল ক'রে। তারপব ওর বিছানায এসে যেন আছড়ে পড়ে।

'কী হয়েছে, ও বাণীদি ? কি হ'ল তোমার ?' ব্যাকুল কণ্ঠে প্রশ্ন করতে পাকে চিত্রা।

অনেকক্ষণ পরে রাণী উঠে বসে। চোখের কোলে তার ইতিমধ্যেই কে যেন কালি মেড়ে দিয়েছে, চুলগুলো উস্‌কোখুস্‌কো, বেশভূষা আলুথালু। কেঁদে কেঁদে চোখ লাল হয়ে ফুলে উঠেছে।

'ওরা কেন এসব কথা বলছে ভাই। এ পাপ নয় ? কেন আমি এ পাপ করব ? আমি তো অন্যায কিছু করি নি।'

'কী বলছে ওরা রাণীদি, কি করতে বলছে ওরা ?

'ওরা নয়—উনি বলছেন। আব গুরুদেবও তাইতে সায় দিচ্ছেন। কেন, কেন তা দিচ্ছেন উনি ? তিনি নিষেধ করতে পারছেন না ?'

'কিন্তু ব্যাপারটা যে আমি কিছুই বুঝতে পারছি না ভাই। সব খুলে বল না আমায।'

'ওরা বলছে ছেলেটাকে নষ্ট করে ফেলতে। কিন্তু কেন তা ফেলব আমি ? ভ্রূণ-হত্যা করা অপরাধ নয় ভাই ?'

'ছেলে ? কোন্ ছেলে ?' তবুও বোকার মতো চেয়ে থাকে চিত্রা।

'যেটা আমার হবে। পেটে ছেলে এসেছে না ? সেইটে !'

'ও -আপনি পোয়াতি হয়েছেন। তাই—'

এতক্ষণে রাণীর বমি করা এবং বৃদ্ধাদের হাসাহাসি ও নিরুদ্বিগ্ন ভাবটা স্পষ্ট হয় ওর কাছে।

রাণীর কিন্তু সেদিকে লক্ষ্য নেই। সে বিহ্বল ভাবে চেয়ে থাকে কিছুক্ষণ চিত্রার মুখের দিকে, তারপর সহজ ভাবেই বলে যায়, 'আমি তো অন্যায় কিছু করি নি ভাই। গুরুদেবই তো আমাকে বলেছেন কতবার—গুরুসেবা করে সন্তান লাভ করা আমাদের দেশে বহুদিনের প্রথা। কিছুতেই ছেলে হয়ে বাঁচে না তাই গুরুদেব দয়া ক'রে

আমাকে সন্তান দান করেছেন। এতে ওঁর সাধনায় কত বিঘ্ন হয়েছে—তবুও। তবে—তবে কেন আমি সেই সন্তান নষ্ট করতে দেব? কেন ও এত রাগারাগি করছে ভাই?'

কথা যেন বেদনায়, ক্ষোভে, বিস্ময়ে এলিয়ে আসে রাণীর কণ্ঠে। তেমনি কিছুকাল চিত্রার কণ্ঠেও কোন স্বর বেরোয় না। এ যে অবিশ্বাস্য!

'রাণীদি, রাণীদি—সত্যি সত্যিই তুমি—? তুমি কী করেছ?

কথাটা শেষ করতে পারে না চিত্রা।

রাণী যেন আহত হয় ওর কথার ধরণে, সেইভাবেই ওর দিকে তাকিয়ে বলে, 'এতে অন্যায়টা কি হয়েছে ভাই? গুরুদেবকে অদেয় কি আছে? তিনি ইহকাল পরকাল সমস্তরই মালিক, তাই নয় কি? আর এ তো তিনি আমারই ওপর দয়া করেছেন। তিনিও তো অশাস্ত্রীয় কিছু করেন নি—'

আর শুনতে পারে না চিত্রা। ওর যেন দম বন্ধ হয়ে আসছিল। এক একবার অন্ধ একটা ক্রোধ, একটা আক্রোশ যেন পেয়ে বসছিল, ওর ইচ্ছা হচ্ছিল দু-হাতে রাণীর মাথাটা ধরে দেওয়ালে ঠুকে দেয়। একটা রক্তারক্তি করতে পারলে যেন বেঁচে যায় চিত্রা। এত সরল এত বোকা মানুষ যে হয় এও যেন অবিশ্বাস্য।…ওর ঐ রকম শাস্তি হওয়াই উচিত। একটা নিষ্ঠুর কিছু, পাশবিক কোন শাস্তি—

কিন্তু কিছুই করা হয় না। বরং চিত্রাই ছুটে বেরিয়ে যায় ঘর থেকে—অন্ধ, অবোধ কি একটা আবেগে, কোনো দিকে না চেয়ে, নিজেকে কোনো প্রশ্ন না ক'রে। অন্ধকার বাগানের মধ্যে দিয়ে পাগলের মতো ছুটতে থাকে নিরুদ্দেশ ভাবে।

বহুক্ষণ এমনি ক'রে ঘুরে বেড়াবার পর শারীরিক শ্রান্তিতে একসময় ও ঘাটের সিঁড়িতে বসে পড়তে বাধ্য হয়।

কী করবে ও? আত্মহত্যা করবে? সামনেই কালো, শীতল, শান্ত জল। পরিপূর্ণ শান্তি ও বিশ্রামের মতো অন্ধকারে স্থির হযে রয়েছে।

গরমে ও পরিশ্রমের দরুন সমস্ত জামাকাপড় ভিজে উঠেছে ওর ঘামে, তবু যেন সর্বাঙ্গে আগুন ছুটছে। এমনিতেই ইচ্ছা হয় এলিযে পড়ে জলের মধ্যে। শ্রান্ত দেহ ডুবিয়ে দেয ধীরে ধীরে ওর ঐ অতল রহস্যময়তায়—

কিন্তু তখন চিত্রার যা বয়স তাতে জীবনের আশাবাদই প্রবল। আত্মহত্যার ইচ্ছা থাকে না বেশীক্ষণ। ওরও রইল না।

তবে এখন কি করবে? ঘুরে-ফিরে সেই প্রশ্নই আসে। এখানে থাকা অসম্ভব। তা ও পারবে না। আর নয়। কাল প্রভাতে আর ও গুরুদেবের কাছে মুখ দেখাতে

পারবে না। পারবে না ওঁর দিকে তাকাতে। প্রণাম করা তো আরও অসম্ভব ওর পক্ষে। অথচ দেখা হ'লেই—

না, পালাতে হবে ওকে এখান থেকে। আর এখনই।

কোথায়? যেখানে হোক। না হয় পথে পথে ভিক্ষা করবে। না হয় বাসন মাজার কাজ করবে।

কিন্তু এখানে আর না। যেতে হবে এবং এখনই। রাত দেড়টা নাগাদ একটা গাড়ি যায় এখান দিয়ে, শুনেছে ভোর চারটে সাড়ে চারটেয় কলকাতায় পৌছায়। সেটাতেই যেতে হবে। কেউ ওঠবার বা কেউ জানতে পারবার আগেই।…

চিত্রা ক্লান্ত পা দুটোকে নিয়ে চলল ওর ঘরের দিকে। রাণী নেই, বোধ হয় ওঁরাই এসে ডেকে নিয়ে গেছেন। তখনও গুরুদেবের ঘরে আলো জ্বলছে, অস্ফুট একটা শব্দ পাওয়া যাচ্ছে কথোপকথনের। কার যেন একটা চাপা কান্নার সুর—

রাণীকে নিয়ে যাবে নাকি এখান থেকে? জোর ক'রে? একবার ওর মনে হয় কথাটা।

তা যে সম্ভব নয়, পরক্ষণেই বোঝে। সে অনেক হাঙ্গামা। অনেক বেশী জোরের দরকার। দৈহিক ও মানসিক দু'রকম জোরেরই। অত জোর চিত্রার নেই।

বাক্স-বিছানা পড়ে থাকে। ওর ছোট্ট একটা সুটকেস ছিল; তাইতে খান চার-পাঁচ কাপড়, অত্যন্ত আবশ্যকীয় দু-একটা জিনিস, কিছু টাকা আর সোনার হারটি, যা ওর ইহলোকের সম্বল—তাই গুছিয়ে নিয়ে আবার ও নিঃশব্দেই বেরিয়ে পড়ল। আশ্রমের ফটক বন্ধ আছে নিশ্চয়ই, সেদিক দিয়ে যাবার চেষ্টাই করল না চিত্রা, পেছন দিককার বেড়া খানিকটা ভাঙা ছিল, সেখান দিয়ে বেরিয়ে নক্ষত্রের আলোয় পথ চিনে চিনে স্টেশনের দিকে চলল।

পথে বদলোক পিছু নিতে পারে, কুকুর শেয়ালে তাড়া করতে পারে, এমন কি বনদেশে বাঘ থাকাও অসম্ভব নয়—ট্রেনে মন্দলোকের পাল্লায় পড়তে পারে—এসব কোন আশঙ্কাই ছিল না ওর মনে—শুধু ওকে এখনই চলে যেতে হবে, এখান থেকে যতদূর হোক, এই কথাটাই তখন মনের মধ্যে সবচেয়ে প্রবল ও একমাত্র কথা।

অন্য কোথাও, অন্য কোথাও—

॥ ৯ ॥

শান্তিদি ওর মুখের চেহারা এবং বিস্রস্ত বেশভূষা দেখে শিউরে উঠলেন, 'তুই কোথা থেকে রে? এত ভোরে? ব্যাপার কি? আয় আয়, উপরে আয়।'

ওপরে ওঁর ঘরে গিয়ে পাখার নিচে কিছুক্ষণ বসে থাকবার পর সুস্থ হয়ে চিত্রা যখন সব কথা বলতে গেল, খানিকটা শোনবার পরই শান্তিদি কানে আঙুল দিলেন।

'চুপ কর্, চুপ কর্, চিতু। তিনি আমারও গুরু—গুরুনিন্দা শুনতে নেই।'

'কিন্তু এ আবার গুরুনিন্দা কি শান্তিদি? এ কাজ যিনি করতে পারেন তাঁকেও কি গুরু বলে মানতে হবে?

'ত্যাখ চিতু, তোর বয়স কম, অভিজ্ঞতাও কম। আর একটু বয়স হ'লে বুঝবি, ও ব্যাপার নিয়ে পরকে ধিক্কার দেওয়া সহজ কিন্তু নিজের প্রলোভনের ক্ষেত্র উপস্থিত হলে তবে বোঝা যায় ওটাকে সংযত করা কত শক্ত। পুরাণ তো পড়েছিস, কত মহর্ষির পদস্খলনের ইতিহাস পড়েছিস বল বল তো? অমন যে উগ্রতপা বিশ্বামিত্র, তাঁরও তপস্যার বিঘ্ন ঘটল মেনকাকে দেখে তাতে মানুষ ছোট হয়ে যায় না, যদি সে আবার নিজেকে সামলে নিতে পারে। ও গল্পগুলো দেওয়াই হয়েছে আমাদের শিক্ষা দেবার জন্য। যেন আমরা মানুষকে ভুল না বুঝি।'

চিত্রা কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থাকে। এঁদের এই যুক্তিহীন ভক্তি তার ভাল লাগে না। তার মন সায় দেয় না এতে। সে ধীরে ধীরে বলে, 'তবু—তবু এঁকেই গুরু বলে ভক্তি করি কী ক'রে শান্তিদি?'

'সে বিচারের আর আমাদের অধিকার নেই ভাই। আগে পরীক্ষা ক'রে দেখে নেওয়া চলত কিন্তু একবার যখন গুরু বলে মেনে নিয়েছি তখন আর তাঁর বিচার করা চলে না। সে মহাপাপ!·· তা ছাড়া ভেবে দেখ্ তো চিতু, মানুষটা মোটের উপর তোর উপকারই বেশী করেছেন কিনা?'

তা বটে। চিত্রাকে মাথা হেঁট করতে হয় এরপর। পূর্বাপর সবটা ভেবে দেখলে ওর কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই ওঁর কাছে। প্রসঙ্গটা সেখানেই চাপা পড়ল। শান্তিদি বললেন, 'যাক গে। এসেছিস যখন এখানেই থাক। আমি ওঁকে একটা চিঠি লিখে দিচ্ছি। তুই ছেলেমানুষ, আদর্শবাদে আঘাত লাগায় ঝোঁকের মাথায় একটা কাজ ক'রে ফেলেছিস্, তিনি অপরাধ নেবেন না নিশ্চয়ই।'

এতদিন পরে কলকাতায় এসে যেন বাঁচল চিত্রা। যেন এতদিন জীবনের পিছনদিকে ছিল ও, আবার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। থেমে যাওয়া নয়—চলমান জীবনের স্পর্শ পাচ্ছে চারিদিক থেকে।

কিন্তু তবু হাত পা মেলে যেন কলকাতাকে উপভোগ করতে পারে না। ও যে পরের গলগ্রহ হয়ে আছে সে কথাটা ভুলতে পারে কৈ? ছাত্রীনিবাসে জায়গা নেই—শান্তিদিরই ঘরের একপাশে বিছানা পেতে ওকে আশ্রয় নিতে হয়েছে। যথার্থ পরাশ্রয়

—আর সেটা এক মুহূর্তও ভোলবার উপায় থাকে না। শান্তিদি কিছুই বলেন না—কিন্তু প্রতিটি ভাতের দানা যেন কাঁটার মতো বেঁধে ওকে।

এমন ক'রে আর কতদিন চলবে?

শান্তিদিকে পীড়াপীড়ি করে, 'এখানকার বহু ছাত্রী তো বহু ইস্কুলের টিচার কি হেড.মিস্ট্রেস হয়ে আছে। তাদের চিঠি লিখে দেখুন না, নিচের ক্লাসের মাস্টারীও কি একটা জুটবে না কোথাও?'

অগত্যা শান্তিদিকে একগাদা চিঠি লিখতে বসতে হয়। কিন্তু তিনি খুব ভরসা দিতে পারেন না। বরং ওকে বুঝিয়ে দেবারই চেষ্টা করেন যে এরকম ভাবে কোন কাজ হয় না। চিঠিগুলো ডাকে দেবার পর থেকে চিত্রা তবু উৎকর্ণ হয়ে থাকে আর ভগবানকে ডাকে। তিনি কি কোনদিনই কিছু করবেন না ওর জন্যে! মাঝে মাঝে ডাকে মনে মনে—যদি পরলোক থাকে, মা ওব কথা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন। তিনিও কি কিছু করতে পারেন না সেখান থেকে? ছেলেমানুষের মতোই ভাবে সে।

কিন্তু খুব অপ্রত্যাশিত ভাবেই হঠাৎ চিত্রার সৌভাগ্য দেখা দেয়। একটি চিঠির উত্তর এসেছে। কলকাতারই উপান্তে শহরতলীর একটি মেয়ে-ইস্কুল, এম. ই. ইস্কুল অবশ্য - তারই হেডমিস্ট্রেস চাই। পঁচিশ টাকা মাইনে, তবে সেক্রেটারীর বাড়িতে একটা থাকার ঘর সে বিনা ভাড়ায় পেতে পারে আর যদি সকালে তাঁর নাতনীদের একটু-আধটু পড়া দেখিয়ে দিতে রাজী থাকে তো সেই সঙ্গে আরও পাঁচ-সাত টাকা।

শান্তিদি চিন্তিত মুখে বললেন, 'পারবে এ ভাবে চালাতে? ঐ সামান্য টাকা—তার ওপর পরের বাড়ি থাকা। কে কেমন লোক হবে তার ঠিক নেই—'

চিত্রা ততক্ষণে যেন হাত বাড়িয়ে স্বর্গ পেয়েছে। সে কোন আশঙ্কা বা সংশয়কেই মনে স্থান দিতে প্রস্তুত নয়।

'আপনি আর দু-মত করবেন না শান্তিদি, ঐটেই ব্যবস্থা ক'রে দিন আমাকে।'

সেক্রেটারীর কন্যা এককালে শান্তিদির হোস্টেলে থাকতেন—সেই সম্পর্কেই যোগাযোগ। সুতরাং ব্যাপারটা অল্পেই মিটে গেল। গুরুদেবকে চিঠি লিখে জানানো হ'ল—তিনিও সেক্রেটারীকে চেনেন, একখানা চিঠি লিখে দিলেন ওঁর কাছে।

এতদিনে চিত্রা যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। স্বাধীন ভাবে যদি একবেলা খেয়ে থাকতে হয়, একবস্ত্রে কাটাতে হয় তো সেও ঢের ভাল।

নতুন ক'রে সংসার পাতে চিত্রা। শান্তিদি এসে গুছিয়ে দিয়ে যান। সেই হার-ছড়াটা এতদিন পরে বিক্রী করতে হয়। একটা চৌকি কেনে, কিছু কিছু জিনিসপত্রও

কিনতে হয়—গৃহস্থালীর খুঁটিনাটি সাজসরঞ্জাম। অনভ্যস্ত হাতে রান্না করতে পারে না—শান্তিদি বসে দেখিয়ে দিয়ে যান। পাছে ও না রাঁধে - এজন্যে শান্তিদি যেচে প্রথম দিন নিমন্ত্রণ নেন।

সেক্রেটারীর বাড়িটা প্রকাণ্ড। বাগানও আছে চারিদিকেই। কিন্তু যে ঘরখানা চিত্রা পেল সে ঘরটার একমাত্র উত্তরদিক খোলা—বাকী তিন দিকই বন্ধ। একতলার ঘর, ওটা বোধহয় এককালে চাকরদের জন্যেই করানো হযেছিল, এখন বাগানের এক প্রান্তে লোহার চাল দিযে আলাদা ঘর হয়েছে তাদের জন্য। তবে একটা সুখ এই যে —এদিকটা সম্পূর্ণ বাড়ির পিছন দিক বলে গৃহস্বামীদের দৃষ্টির একেবারেই বাইরে থাকতে পারে সে। এদিকে আলাদা একটা বাথরুমও আছে কিন্তু রান্নার জাযগা নেই। তোলা-উনুন বাগান কি বাথরুম থেকে ধরিযে এনে ঘরেই রাঁধতে হয়। শান্তিদি দেখেশুনে পরামর্শ দিয়ে গেলেন একটা কুকার কিনতে, 'অধিকাংশ দিনই তাতে রান্না চলতে পাবে, যেদিন অন্য কিছু খেতে সাধ যাবে কিংবা ছুটির দিন হবে উনুনে রেঁধো।'

সেক্রেটারী অম্বিকাপদবাবু মানুষটি ভাল। ওকালতি করেন, তাঁরই মায়ের নামে ইস্কুলটি করেছেন। যদিও কমিটি একটা আছে—বস্তুত স্কুলটা ওঁরই মালিকানায থাকে। ইস্কুল ছোট, মেযেও কম--তবু এসব ব্যাপারে চিত্রার কোন অভিজ্ঞতাই নেই। হেড্‌মিস্ট্রেস—তা হোক না কেন মাইনর ইস্কুলের ম্যাট্রিক পাস হেডমিস্ট্রেস্—তারও কতগুলো বিশেষ দায়িত্ব আছে। চিত্রা যেন অগাধ জলে পড়ে যায় দেখেশুনে। কিন্তু অম্বিকাবাবু ওকে সস্নেহে সব বুঝিয়ে দেন—বেশ ধৈর্যের সঙ্গেই। চিঠি-পত্র লেখাও ওর অভ্যাস ছিল না, ইংরেজীতে ভুল হয়—সেগুলোও অম্বিকাবাবু শুধরে দেন। হিসাবপত্রের খাতা কিভাবে লিখতে হবে বুঝিযে দেন। মধ্যে মধ্যে তিরস্কারও করেন। তবে তার ভেতর স্নেহ মাখানো থাকে।

চিত্রার বেশ ভাল লাগে ওঁকে। সে কাকাবাবু বলতে গিয়েছিল ওঁকে কিন্তু অম্বিকাবাবু নিজেই নিষেধ করেছেন, 'কাকাবাবু কিরে মেয়ে? দাদু। দাদু বলবি। তোর বাবা বেঁচে থাকলে কি আর আমার চেয়ে বয়সে বড় হ'ত?' আমার ষাট পেরিয়েছে যে অনেক দিন—তার খোঁজ রাখিস?

আরও খুশী হয়ে দাদুই বলে সে ওঁকে।

কাজ নতুন—অভিজ্ঞতা নেই। অথচ দায়িত্ব একটা তো আছেই। তবু মোটের ওপর ভালই লাগে চিত্রার। পদে পদে ঠেকে দেখতে হয়—ভুল-ত্রুটিও হয় কিছু কিছু।

তা হোক—ছোট ছোট মেয়েদের উজ্জ্বল মুখ চারিদিক থেকে ঘিরে ধরে যখন ওকে, তখন সব কিছু ভুলে চিত্রা নিজেও যেন উচ্ছল প্রাণচঞ্চল হয়ে ওঠে। তাছাড়া মেয়েগুলো মোটের ওপর ভালোই—অবাধ্য বা ঠিক অসভ্য নয়। একটু চেষ্টা করলেই তাদের ওপর প্রভাব বিস্তার করা যায়।

শুধু মুশকিল বাধল চিত্রার বাড়ির ছাত্রী দুটি, অর্থাৎ অম্বিকাবাবুর নাতনীদের নিয়ে। বড়লোকের মেয়ে, কারুর কথা শোনার অভ্যাস নেই, লেখাপড়াতে মন তো নেই-ই। সেটা আশাও করে না চিত্রা, কিন্তু বেশির ভাগ সময় ঝি-চাকরদের সাহচর্য লাভ করায় মেয়ে দুটো সভ্যতা বা ভদ্রতার রীতিনীতিও শিখতে পারে নি। অত্যন্ত চঞ্চল ও মুখর, তাদের সামলাতে পারে না চিত্রা কিছুতেই। এক এক সময় ওদের কথা শুনলে চিত্রার ইচ্ছা করে ওদের মাথাগুলো নিয়ে পরস্পরের সঙ্গে সজোরে ঠুকে রক্ত বার করিয়ে দেয়। তবে শেষ পর্যন্ত সাহসে কুলোয় না—বহুদিন পরে আশ্রয় পেয়েছে, এ গেলে যে সহজে কিছু মিলবে সে সম্ভাবনা কম।

তবে সুবিধার মধ্যে তারা পড়তে আসেই না অর্ধেক দিন। নানা অজুহাত ছুতোয় সেটাকে এড়িয়ে চলে। আগে আগে কর্তব্যবোধে চিত্রা গিয়ে ধরে জোর ক'রে—এখন আর অনর্থক সে চেষ্টা করে না। ওদের তো পড়াশুনে না, মিছিমিছি নিজে অশান্তি ভোগ ক'রে লাভ কি?

অবশ্য মেয়েদের অভিভাবকরাও যে তা নিয়ে কেউ মাথা ঘামাতেন বিশেষ, নয়। খবর নিত শুধু মধ্যে মধ্যে অভয়পদ—অম্বিকাবাবুর বড় ছেলে এবং ঐ ছাত্রী দুটির বাবা। প্রথম প্রথম লোকটিকে মন্দ লাগে নি চিত্রার। মেয়েদের খোঁজ করতে আসত, সেই উপলক্ষে দু-একটি কথা কয়ে চলে যেত। বেশ মিষ্টি হাসি, অন্তরঙ্গ অথচ সশ্রদ্ধ ব্যবহার। 'কী, আপনার ছাত্রীরা পড়ছে কেমন? সুবিধা নয়—না?' কিংবা 'এরা দেখছি আপনাকে বড্ড জ্বালায়। বড়ই অসভ্য হয়েছে এরা। এই—ফের দুষ্টুমি করছিস।' এমনি দু-একটা ভদ্র সম্ভাষণ।

কিন্তু দিন কতক পরেই চিত্রা লক্ষ্য করল যে মেয়েরা উপলক্ষ—আসলে লক্ষ্য সে নিজেই।

বরং মেয়েরা যেদিন থাকে না, সেই দিনগুলো যেন আড়াল থেকে লক্ষ্য ক'রেই অভয়পদ দেখা দেয়। এসেই বিস্ময়ের ভান করে, 'এরা আসে নি? আপনার ছাত্রীরা? সে কি, কোথায় গেল? না, এদের লেখাপড়া শেখানো দেখছি সরস্বতীরও অসাধ্য।'

অবশ্য তারপরও ফিরে যাবার জন্য কোন ব্যস্ততা দেখা যায় না। বরং আবাহন বা নিমন্ত্রণের কোন অপেক্ষা না রেখেই চেপে বসে চিত্রার বিছানাতে। নানা এটা-

সেটা বাজে কথার পর হয়ত বলে, 'এটা কি রাঁধছেন, আলুভাজা? দিন দিক খানকতক।...ওঃ, গরম আলুভাজা যে কতকাল খাই নি।' কিংবা মাথাটাথা চুলকে বিনয় করে বলে, 'একটু চা দিতে বললে কি খুব রাগ করবেন? বাস্তবিক যা ফাইন চা করেন আপনি! কাঙালকে শাকের ক্ষেত দেখিয়েছেন কিনা—এখন তো ভুগতেই হবে। চাকর-বাকরের হাতে অশ্রদ্ধার চা খেয়ে খেয়ে পেটে চড়া পড়ে গেছে।'

চা হাত থেকে নেবার সময় ইচ্ছে ক'রেই ওর আঙুলগুলো ছোঁয় অভয়পদ।

চিত্রা কিছুদিন পরে কাপ বা থালা পাশে নামিয়ে রাখতে শুরু করল কিন্তু সেটা যেন বুঝতে না পেরেই মধ্যপথে ধরে নিতে গিয়ে আরও বেশী ক'রে বিভ্রাটের সৃষ্টি করে। বেশী করে অনুভব করে ওর হাতখানা।—অভয়পদের বয়স চল্লিশের কম নয়—অনেকগুলো ছেলেমেয়ে হয়ে গেছে, তবু এ বয়সে এ কাঙালপনা দেখে চিত্রার গা শাস্তি।রি করে, কিন্তু ভয়ে কিছু বলতে পারে না।

তাতে রূবে বেশীদিন আর না বলেও চলল না। চিত্রা লক্ষ্য করল বড় বৌ অর্থাৎ তার হবে উমুনেব মা ইদানীং চর পাঠাতে শুরু করেছেন এদের গতিবিধি লক্ষ্য করার জন্য। সেত্রে অকারণে ঝি পাঠান ওর কাছে; অভয়পদ থাকলেই যেন বেশী দরকার পড়ে ইস্কুলটি ক ঝি এসে বাবুকে দেখলেই জিভ কেটে মুচকি হেসে চলে যায়। রামে মারলেও থাকে বে, রাবণে মারলেও মারবে—চিত্রার হয়েছে সেই মারীচের অবস্থা। অগত্যা অবাধ্য হয়েই তাকে একদিন মুখ খুলতে হ'ল।

সেদিনও ঐ রকম অনিমন্ত্রিত ভাবে অভয়পদ এসে বসেছে। চা খাওয়াও হয়েছে; তবু নড়ে না--চিত্রা ইচ্ছা ক'রেই ওর দিকে পিছন ফিরে একমনে রান্না ক'রে যাচ্ছে, ওর কথার জবাব দিচ্ছে না বিশেষ। কিন্তু তাতে অভয়পদর উৎসাহের অভাব নেই, একসময়ে উঠে সামনে ঘুরে গিয়ে দাঁড়িয়ে বলে উঠল, 'দেখুন, কিছু মনে করবেন না। ছবি আঁকার ক্ষমতা থাকলে আমি আপনার একটা ছবি আঁকতুম। বাস্তবিক আপনি রান্না করছেন, আগুনের তাপে আপনার মুখ হয়ে উঠেছে রাঙা, ললাটের প্রান্তে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিয়েছে, তার সঙ্গে দু-এক গাছি চুল জড়িয়ে গেছে, চাঁপার কলির মতো আঙুলগুলি কালো খুন্তির সঙ্গে জড়িয়ে কড়ার ওপর ওঠা-নামা করছে, যেন শিল্পীর কল্পনা—even worthy of Rapheal!' কণ্ঠস্বর গাঢ় হয়ে উঠল শেষের দিকে।

চিত্রার মুখ-চোখ আগুনের মতোই লাল হয়ে উঠেছে ততক্ষণে। আজ আর ও মেজাজ সামলাতে পারল না। খুন্তি ফেলে উঠে দাঁড়িয়ে প্রায় রুদ্ধ কণ্ঠে বলল, 'দেখুন বহু দুঃখের পর আপনাদের এখানে একটু আশ্রয় পেয়েছি। এ আশ্রয় যদি ঘোচে

তো আমার আর দাঁড়াবার ঠাঁই থাকবে না কোথাও। আপনি কি চান আমি আত্মহত্যা করি?'

'সে কি! আপনি কি বলছেন ··আমি তো—আমি তো'—যেন তোৎলা হয়ে যায় অভয়পদ।

'বেশ বুঝতে পারছেন আমি কি বলছি। আপনার বাড়ীর মেয়েরা সুদ্ধ মনে করতে শুরু করেছেন যে আমি আপনাকে বকিয়ে দিচ্ছি।'

'অবিশ্যি আমি সেসব কিছু ভাবি নি—য়্যাম্ ভেরি সরি, রিয়্যালি সরি—'

যেন এক-পা এক-পা ক'রে পিছিয়ে বেরিয়ে যায় অভয়পদ।

এর পর অনেকদিন আর আসে নি অভয়পদ। চিত্রা ভাবল, বুঝি এতদিনে ওর লজ্জা হয়েছে। কিন্তু হপ্তা-তিনেক পরেই আবার একদিন সামান্য কি একটা ছুতোয় সে এসে উপস্থিত। অবশ্য সেদিন আর ঘরের মধ্যে ঢুকল না, বাইরে দাঁড়িয়ে থেকে দু-একটা কথা বলে গেল। অর্থাৎ তার হাত থেকে একেবারে অব্যাহতি পেল না চিত্রা—তবে আগের চেয়ে অবস্থাটা কিছু নিরাপদ বোধ হ'ল।

কিন্তু পৃথিবীতে অভয়পদ কি একা?

এদের দলই যেন বেশী। চিত্রার মনে হয়, তার চারদিকেই এরা ঘিরে রয়েছে। এক এক সময় মনে হয়, এ-ছাড়া বুঝি ওদের আর কোন চেহারা, আর কোন সত্তা নেই। এদের সেই মিলিত লোলুপ দৃষ্টি থেকে নিজেকে আড়াল করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়ে চিত্রা। বুঝতে পারে না, এ কিসের লালসা ওদের—কেন এই উগ্র লোলুপতা? সত্যি সত্যিই সে বিস্মিত হয়।

অম্বিকাবাবু আগে আসতেন কদাচিৎ, এখন প্রায়ই আসেন এবং চেয়ারখানা একেবারে ওর পাশে টেনে নিয়ে বসেন। প্রত্যহ আসার ফলে কাজ থাকে সামান্যই —বেশির ভাগই চলে ওঁর রসিকতা। নাতনী সম্পর্কের সূত্র ধরে এমন সব রসিকতা করেন, যা ঠিক রুচিসম্মত নয়। শুধুই কি রসিকতা? এক এক দিন এমন ভাবে ওকে আদর করেন যে চিত্রা রীতিমতো অস্বস্তি বোধ করে। কিন্তু সব সময়েই এমনভাবে দাদু-নাতনীর সম্পর্কটাকে ধরে থাকেন যে চিত্রা মুখে কিছু বলতে পারে না। এমন কি মনে মনেও ঠিক অভিযোগ করতে পারে না। আবার এর ওপর এক নতুন উপদ্রব। অম্বিকাবাবুর এক কেরানী ছিল। ঠিক ছোকরা না হ'লেও প্রৌঢ়ও নয়—ইস্কুল সম্বন্ধে তার আগ্রহ বেশী বেড়ে গেছে যেন। তার আসা-যাওয়া এবং মেয়েলী ধরনের ঘনিষ্ঠতা করার চেষ্টা শুধু বিরক্তিকর নয়—ক্লান্তিকরও বটে।···

এমন কি—চিত্রা হাসবে কি কাঁদবে ভেবে পায় না যেন, অভয়পদর ভাই শক্তিপদ এম. এস-সি পাস ক'রে বিলেত গিয়েছিল কি একটা কাজ শিখতে, চিত্রা এ-বাড়ি আসার মাস-তিনেক পরেই সে ফিরে এল। উচ্চশিক্ষিত এবং অশেষ গুণান্বিত ছেলে—তার বিদ্যা বুদ্ধি ও চরিত্রের প্রশংসা তিন মাস ধরেই বাড়িসুদ্ধ সবাইকার কাছে শুনেছে চিত্রা—সকলকারই নয়নের মণি—এ-হেন শক্তিপদকে দূর থেকেই সসম্ভ্রম কৌতূহলের সঙ্গে চেয়ে দেখেছিল চিত্রা—কথা কইবার কোন আশা বা চেষ্টাও প্রকাশ করে নি। কিন্তু শক্তিপদ নিজে সে সব দূরত্ব বজায় রাখতে দিলে না। বিলেতে কি কি ধরনের স্বাধীনতা মেয়েরা পছন্দ করে, উচ্চশিক্ষার কি কি জৌলুস মেয়েদের মধ্যে থাকা দরকার—এবং কেমন ক'রে ইস্কুল চালানো উচিত—এই সম্বন্ধে ওকে ওয়াকিবহাল করতে প্রায় উঠেপড়েই লাগল শক্তিপদ। একদিন একরাশ শিশুমনস্তত্ত্বের বই এনে ওর কাছে ফেলে দিয়ে বললে, 'বুঝতে না পারেন তো আমি আপনাকে তর্জমা ক'রে বুঝিয়ে দেব। অবশ্য আপনিই বুঝতে পারবেন, একটু চেষ্টা করলেই, বেশ সোজা ইংরেজী।·· না না, এ লাইনে যখন নেমেছেন তখন ভাল ক'রে সব জেনে-শুনে নেওয়াই ভাল। চিলড্রেনকে এডুকেট করার দায়িত্ব তো কম নয়, মনে রাখবেন একটা নেশনকে আপনি তৈরী করছেন ভবিষ্যতের জন্যে। আমাদের দেশের মেয়েদের শিক্ষিত করার চেষ্টা—রীতিমত আপহিল টাস্ক।'

ওর খুব ভাল লেগেছিল মানুষটিকে, হয়ত আরও লাগত—কে জানে। কিন্তু দু-চারদিনের মধ্যেই শক্তিপদর দৃষ্টিতেও সেই লোলুপতা দেখতে পায়—যা অভয়পদদের মধ্যে দেখে দেখে সে ক্লান্ত। বিলেত-ফেরত, উচ্চশিক্ষিত শক্তিপদ! হে ঈশ্বর, তুমি ওকে কী দিয়ে তৈরী করেছ—আর কেন? কেন?

ভাগ্য ভাল চিত্রার যে শক্তিপদ সম্বন্ধে বাড়িসুদ্ধ সকলকারই টনক খুব অল্পকালের মধ্যে নড়ে গেল। তাঁরাই শক্তিপদকে সামলে নিলেন।

এ যেন আর পারে না চিত্রা। উদয়াস্ত খাটুনি, ইস্কুলের সহস্র কাজ, নিজের রান্না খাওয়া টিউশনী—তার ওপর নিদারুণ অর্থকৃচ্ছ্রতা। প্রতিটি পয়সা হিসেব ক'রে খরচ করতে হয়—এ জীবনের যেন কোন অর্থই খুঁজে পায় না চিত্রা। এক এক সময় মনে হয়, কী দরকার এই জীবনটাকে টেনে নিয়ে বেড়াবার? কী সার্থকতা এমন ক'রে বেঁচে থাকার? দ্বন্দ্ব কি শুধু দারিদ্র্যের সঙ্গে? সহস্র বিপদের সঙ্গে দ্বন্দ্ব—প্রতিদিন অহর্নিশি—ঘরে বাইরে সর্বত্র। অথচ উপায়ই বা কি?

এক এক সময় মনে হয় ইচ্ছা ক'রে দেহটাকে বিকৃত, বিকলাঙ্গ ক'রে দেয়। সুখে না হোক, শান্তিতে থাকতে পারবে। কিন্তু তা কি সত্যিই কেউ পারে? নিজে

মনে ক'রে নিজেই শিউরে ওঠে।

তা ছাড়া সবচেয়ে ওর যেন কষ্ট লাগে—ও যে বড় একা, বড় অসহায়।

মনের দুঃখ জানাবারও একটা লোক দরকার হয়। সহানুভূতি না দেখাক, অন্তত চুপ ক'রে শোনবার একটা লোক।

একা—একা। সারা জীবনই একা থাকবে। পরামর্শ দিতে পারে, উৎসাহ দিতে পারে, বুদ্ধি দিতে পারে—এমন একজনও নেই। অসুখ হ'লে স্নেহ-কোমল হাতে ওর ললাট স্পর্শ করবে কেউ—এ তো দুরাশা। কেউ প্রশ্নও করে না ওর মায়ের মতো—'হাঁরে, তোর মুখ অত শুকনো কেন রে? অসুখ করেছে নাকি?' এক এক সময় এই একাকীত্বই অসহ্য লাগে ওর। ইচ্ছা হয় কারুর সঙ্গে খুব খানিকটা চেঁচিয়ে ঝগড়া করতে—তা পারলেও যেন বেঁচে যেত। হাসবে নাকি আপন মনেই —হা-হা ক'রে? এমনি চেঁচিয়ে উঠবে?

আবার ভয় হয়, ও কি পাগল হয়ে যাচ্ছে?

এক একটা ছুটির দিন দ্বিপ্রহরে বেরিয়ে পড়ত বাড়ি থেকে। সম্পূর্ণ উদ্দেশ্যহীন ভাবেই। এই সব দিনগুলোতে ওর শান্তিদির কাছেও যেতে ইচ্ছে করত না। হয় চৌরঙ্গী কি গড়ের মাঠে পড়ে আপনমনেই হাঁটত কিংবা গঙ্গার ধারে গিয়ে চুপ ক'রে বসে থাকত। কত স্টীমার যাচ্ছে, জেলেরা মাছ ধরছে, এপার ওপার করছে যাত্রী বা মাল নিয়ে। কোথাও কোন মাল্লা রাঁন্না করতে করতে হয়ত ওকে আড়ে দেখে কোন রসের গান ধরেছে। কলের ধোঁওয়ায় আকাশ আচ্ছন্ন, স্টীমারের কুৎসিত বাঁশী বাজছে মাঝে মাঝে, তারই মধ্যে দূর আকাশের প্রান্ত থেকে চি চি করে ভেসে আসছে চিলের ডাক—সবটা জড়িয়ে মধুর, অলস একটা ছবি। মন্দ লাগত না চিত্রার। কিন্তু বেশীক্ষণ বসে থাকাও চলত না। অন্ধকার হবার আগেই চলে আসতে হ'ত। তাও বিপদে পড়বার মতো হয়েছে বৈ কি এক-আধদিন! কিন্তু সে বিপদ গ্রাহ্যই করে না ও আজকাল।

দীর্ঘ, নিরানন্দ দিন, আশাহীন, আনন্দহীন, বৈচিত্র্যহীন।

রাতে বিছানায় শুয়ে শুয়ে এক এক দিন বহুক্ষণ ধরে কাঁদে চিত্রা আপনমনেই।

॥ ১০ ॥

সেটা বোধ হয় পৌষ মাস হবে। এমনিই একটা ছুটির দিনে গঙ্গার ধারে বসে থাকতে থাকতে চিত্রার হঠাৎ দারুণ লোভ হ'ল জলে নামবার। এ যে কী লোভ তা বোঝানো যায় না! রহস্যময় শীতল জল কী যেন এক অর্থহীন দুর্বার অপ্রতিহত প্রভাবে টানতে

থাকে ওকে। ডুববে? ডুবে মরবে? না, তাও তো নয়। খুব ঠাণ্ডা জলে ডুবে থাকতে ইচ্ছে করছে ওর।

ক্রমশ সে ইচ্ছাটা সমস্ত যুক্তি-তর্কের সীমা লঙ্ঘন ক'রে ওকে দুর্দমনীয় বেগে আকর্ষণ করল জলের দিকে। কারণ অকারণ সব কিছু একাকার হয়ে গেল মনের মধ্যে। পরে কি হবে, কেমন ক'রে কি ভাবে বাড়ি ফিরবে—কোন কথাই মনে রইল না। শুধু মনে হ'তে লাগল ওর সর্বাঙ্গ যেন জ্বলছে—আর সে জ্বালা থামবে ঐ শীতল জলে। ঐখানে আছে এক নিবিড় অতল শান্তি। ওকে নেমে যেতে হবে গঙ্গার ঐ শীতল শান্ত জলের মধ্যে। মায়ের বুকে যে শান্তির ছোঁয়াচ থাকত হয়ত সেই শান্তিই আছে ওখানে। এসব কথাও হয়ত ঠিক ভেবে দেখে নি, হয়ত ভাববার অবকাশ ছিল না। তখন কোন কথাই ভাল ক'রে বোঝবার শক্তি ছিল না, শুধু মনে হয়েছিল ঠাণ্ডা হ'তে চায় একটু, খুব ঠাণ্ডা স্পর্শ চায় ওর দেহমনের চারদিকে।··· অবশেষে একসময় ব্যাগ আর জুতোটা পাড়ে রেখে কাপড় জামা সব সুদ্ধ জলে নেমে গেল।···

রইলও অনেকক্ষণ। হয়ত আরও থাকত—যদি না চারিদিকের বিস্মিত মাঝি-মাল্লার অসংখ্য চোখের মিলিত দৃষ্টি বিব্রত ক'রে তুলত। নেমেছিল একটা ঝোঁকের মাথায়, কিন্তু উঠতে গিয়ে নির্বুদ্ধিতাটা ধরা পড়ল। ভিজে কাপড়ে সহস্র কৌতূহলী দৃষ্টির সামনে দিয়ে ওঠা যায় না, অত্যন্ত লজ্জা লাগে। জুতোটা হাতে ক'রে চলতে আরও লজ্জা বোধ হয়—অগত্যা পরতে হ'ল কিন্তু কাপড় ও দেহের জলে সেটা নিমেষে ভিজে চপ্-চপ্ করতে লাগল। কিসে যাবে সেও এক সমস্যা। ট্রামে-বাসে এ অবস্থায় ওঠা যায় না। হেঁটে যাওয়া আরও অসম্ভব। ভিজে কাপড় সর্বাঙ্গে সেঁটে ধরেছে, এই অবস্থায় কলকাতার রাজপথে দিনের বেলা হেঁটে যাওয়া—ছিঃ!

তবে?

ট্যাক্সি করবে নাকি? আছে, গোটা ছয়েক টাকা বোধ হয় ব্যাগে আছে এখনও।

ট্যাক্সি ডাকলও একখানা কিন্তু গদি খারাপ হয়ে যাবার ভয়ে সে নিতে রাজী হ'ল না। ওর দিকে একবার তাকিয়ে 'মাফ কিজিয়েগা বহিনজী, মেরা গদি বিলকুল গিলা হো জায়গা' বলে চলে গেল।

অগত্যা মোটা টাকার লোভ দেখিয়ে একটা রিক্সাই করতে হ'ল। শীতের হাওয়ায় ভিজেকাপড়ে দীর্ঘ পথ যেতে কাপড়খানা গায়ে শুকিয়ে গেল বটে কিন্তু ওর যে কাঁপুনি ধরল সে কাঁপুনি আর থামল না।

বাসায় পৌঁছে এক কাপ চা করে খাবারও শক্তি রইল না। কোনমতে সে

কাপড়টা ছেড়ে একটা শুকনো কাপড় জড়িয়ে লেপের মধ্যে শুয়ে পড়ল। ঘরটা উত্তরদ্বারী, শীতের দিনে অসম্ভব ঠাণ্ডা থাকে, একবারও রোদ পায় না। সুতরাং কাঁপুনি সারারাতেও গেল না। পরের দিন সকালে বুঝতে পারল ওর জ্বর হয়েছে।

দিন দুই অম্বিকাবাবুরা দেখাশুনা করলেন। তৃতীয় দিনে জ্বর বাড়ল বিষম, অজ্ঞান অচৈতন্য হয়ে পড়ল চিত্রা। অম্বিকাবাবু বেগতিক দেখে একটা ট্যাক্সিতে চাপিয়ে হাসপাতালে দিয়ে এলেন।

শান্তিদিকে খবর দেওয়ার কথা তখন ওঁদের মনে ছিল না। তিনি যখন খবর পেলেন তখন হাসপাতাল থেকে চিকিৎসা শুরু হয়ে গেছে দেখে মিছিমিছি ও ঝঞ্ঝাট আর ঘাড়ে নিলেন না—মধ্যে মধ্যে এসে দেখে যেতে লাগলেন মাত্র।

নিউমোনিয়া রোগ, সারতে দেরি লাগবে। জ্বরটা একটু কমবার পর চিত্রা চারিদিকে তাকিয়ে দেখল। হাসপাতাল সম্বন্ধে বরাবরই ওই একটা আতঙ্কের ভাব ছিল, কেমন যেন গা-বমিবমি করত এই গন্ধটা নাকে এলে, মাথা ঘুরে উঠত। সেই হাসপাতালেই যে থাকতে হবে তা কে জানত!...ওর নিজেরই কেমন অবাক্ লাগে। এখন অবশ্য আর ততটা অসহ্য লাগে না, বিশ্রী লাগে শুধু অন্য রোগিণীদের দিকে তাকালে। তাদের যন্ত্রণা-কাতর রোগপাণ্ডুর মুখের দিকে চাইলে মাথা আরও ঝিম্‌ঝিম্ করে—চিত্রা প্রাণপণে চোখ বুজে থাকবার চেষ্টা করে।

নার্সদের বেশ লাগে ওর। শুধু এক একবার যখন হৃদয়হীন উপেক্ষার ভাব দেখে, তখন যেন একটু বিস্মিত হয়। কেন এমন হয় ওরা? ওদের একটু দয়ামায়া নেই? আবার নিজের মনেই জবাবটা পায়— দেখে দেখে আর কাতরানি শুনে শুনে ওদের মনেও কড়া পড়ে গেছে—দুঃখ কিংবা সহানুভূতির আর স্থান নেই সেখানে।

আর ভাল লাগে ওর নবীন ডাক্তারবাবুটিকে।

নরেশ নাম ওর—তা ইতিমধ্যেই জেনে নিয়েছে চিত্রা। নরেশ বাগ্‌চি। বাড়ি মুর্শিদাবাদ জেলায়। এই ইস্কুল থেকেই পাস ক'রে এখন শিক্ষানবীশ ডাক্তার হিসেবে এখানে বেগার দিচ্ছেন। একাহারা সুশ্রী চেহারা, প্রায়-ফরসা শ্যাম বর্ণ, বুদ্ধিতে উজ্জ্বল মুখে সামান্য যেন একটু বিদ্রূপের হাসি। নরেশ সকলেরই প্রিয়—এ ঘরের অন্যান্য রোগিণীরাও যেন ওকে দেখে সজীব হয়ে ওঠে—প্রতীক্ষা করে ওর আগমনের। কারণ প্রত্যেকের সঙ্গেই মিষ্টি কথা কয় হেসে, অদ্ভুত একটা সান্ত্বনা দিয়ে চলে যায় সে।

ওর সঙ্গে আলাপও একদিন এইভাবে শুরু হ'ল। ওর বিছানার কাছে এসে দাঁড়িয়ে বলল, 'কী, আজ অনেকটা সুস্থ আছেন, না? মুখচোখও তো বেশ

পরিষ্কার দেখাচ্ছে।'

তারপরই পাশের টুলটাতে বসে পড়ে বলল, 'নিউমোনিয়া বাধালেন কি ক'রে? হঠাৎ? এমনি তো আপনাকে দেখলে বেশ সবল মানুষ বলেই বোধ হয়।'

কারণটার কথা মনে করতে গিয়েই চিত্রার মুখ লাল হয়ে উঠল লজ্জায়। সেই বিচিত্র বর্ণ-শোভার দিকে চেয়ে নরেশ বলল, 'ভয় নেই, শুনেছি শুনেছি। আর বলতে হবে না।...পৌষ মাসের শীতে গঙ্গায় ডুবে ভিজে কাপড়ে বাড়ি ফিরলেন। ধন্য শখ বটে আপনার!'

তারপরই, চিত্রা আরও বেশী বিব্রত বোধ করছে দেখে চট ক'রে উঠে পড়ল, 'আচ্ছা, আপনি এখন বিশ্রাম করুন। আমি আসি।'

এর পর থেকে রোজই মিনিট-দুই ক'রে ওর কাছে বসে নরেশ। খুচরো খুচরো আলাপ হয়। হালকা হাসি-তামাশা। তারই মধ্যে একটু একটু ক'রে চিত্রার ঠিকানা, ওর পেশা প্রভৃতির বিবরণ সংগ্রহ ক'রে নেয়।

জ্বর যেদিন একেবারে ছাড়ল সেদিন চিত্রা প্রশ্ন করল ওকে দেখে, 'আজ তাহ'লে আমার ছুটি তো?'

'আজই'? কেন—এখানে ফেরবার এত তাড়া কেন? জায়গাটা কি এতই ভাল লেগেছে?'

আমতা আমতা ক'রে বলে চিত্রা, 'কেন—এখানে তো নয়—আমি তো চলে যেতেই চাইছি।'

'হাঁ—তাই তো। এত তাড়া ক'রে গেলে আবার তখনই ফিরে আসতে হবে যে।...তার চেয়ে আর দুটো দিন দেখুন। সুস্থ হয়ে ফিরতে পারবেন।...আর আমাদের মুখদর্শন করতে হবে না।'

'মুখদর্শন করতে তো ক্ষতি নেই—তবে এখানে না আসতে হলেই বাঁচি।'

'কেন? না এলে আর আমাদের দেখবেন কেমন ক'রে বলুন?'

'কেন? আপনাদের কি কোন ব্যক্তিগত জীবন নেই? আপনি আমার ওখানে এক-আধদিন যদি পায়ের ধুলো দেন তাহলেই দেখা হবে।'

'কী যে বলেন—ওতে আমাদের অপরাধ হয়। তা নয়, কিন্তু সে তো আমার সৌভাগ্য। ও অনুমতি চাইবার সাহস আমার অন্তত হ'ত না।'

'বা রে, আপনি এত ক'রে চিকিৎসা করলেন—'

'এ আর কি! এ তো আমাদের কর্তব্য।'...

ছুটি পাবার দিন চিত্রা আবার কথাটা স্মরণ করিয়ে দিলে, 'তাহলে আসছেন তো

একদিন ?'

'নিশ্চয়ই। চা খাওয়াবার লোভ দেখিয়েছেন যখন তখন কি আর কথা আছে। তবে জানেন তো আমাদের এখান থেকে ছুটি পাওয়া কঠিন। তবু যাব একদিন ঠিকই।···সাবধানে থাকবেন খুব, এ রোগটা ভারী বিশ্রী একবার ছুঁলে অথম ক'রে রেখে যায়।'

তারপর ওর সঙ্গে সঙ্গে বাইরে পর্যন্ত এসে বললে, 'যাবেন কিসে ?'

চিত্রা একটু ইতস্তত ক'রে বললে, 'তা তো জানি না।···একটা রিক্সা-টিক্সা ক'রে—'

'রিক্সা ক'রে এতটা পথ ? পাগল নাকি। চলুন আমি ব্যবস্থা ক'রে দিচ্ছি। আমার চেনা গাড়ি আছে এখানে, টাকা খুব কম নেবে—নামমাত্র।'

কিন্তু তাকে ব্যবস্থা করতে কিছু হ'ল না। কারণ দেখা গেল অম্বিকাবাবু তাঁর পুরোনো ফোর্ড গাড়িখানা পাঠিসে দিযেছেন। সেই গাড়িতেই ওকে উঠিয়ে, গাড়ির কপাট বন্ধ ক'রে দিয়ে নরেশ বললে, 'আচ্ছা তবে যান –খুব সাবধানে থাকবেন কিন্তু। আবার না আসতে হয় এখানে!'

যে চিত্রা হাসপাতালে গিয়েছিল সে চিত্রা আর ফিরল না। সেই নিরানন্দ এক-তলার উত্তরদুয়ারী ঘর, সেই নিঃসঙ্গ একঘেয়ে জীবনের মধ্যেই ফিরে আসতে হ'ল বটে কিন্তু এবার তার মনের মধ্যে অবর্ণনীয় কি একটা প্রতীক্ষা, কি একটা আশা তাকে উন্মুখ চঞ্চল ক'রে রাখত দিনরাত। অধীর আগ্রহে যেন কিসের একটা অপেক্ষা করছে সে। যেন অভাবনীয় কিছু একটা ঘটবে ওর জীবনে—আর তার যেন দেরিও নেই।

অম্বিকাবাবু এলেন খবর নিতে—চিত্রার মনে হ'ল যেন কোন পরমাত্মীয় এল। সে নিজেই আজ তাঁর কাছ ঘেঁসে বসল। তিনি যখন বললেন 'শরীরটা ভাল নেই', তখন সে নিজে থেকেই মাথায় হাত বুলিয়ে দিলে তাঁর চেয়ারে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে।

এমন কি অভয়পদকেও অভ্যর্থনা করল চিত্রা বেশ একটু আন্তরিকতার সঙ্গেই।

অভয়পদ বলল, 'যাক বাবা—সুস্থ হয়ে ফিরে আসবেন এটা আর আশাই করি নি'—

চিত্রা মুখ টিপে হেসে বলল, 'তবু তো খবর নিতে যান নি একবারও—'

অভয়পদ যেন তার কানকে বিশ্বাস করতে পারে না। লাল হয়ে উঠে, হাঁপিয়ে তুৎলিয়ে বলে, 'আমি, মানে—মাইরি বলছি বিশ্বাস করুন—মানে সাহস হয় নি।

আপনি আবার কী ভাববেন হয়ত—'

'থাক্ হয়েছে। চা খাবেন ? বসুন তাহলে একটু।'

'চা ? না, না'—ব্যস্ত হয়ে ওঠে অভয়পদ, 'না না, আপনার শরীর খারাপ—আর ও-সবে কাজ নেই।'

'ভয় নেই—উনুন ধরাচ্ছি না। সে তো দাদু একহপ্তা অন্ততঃ নিষিদ্ধ করেই দিয়ে গেছেন। আপনাদের ওখানেই ব্যবস্থা হয়েছে দুবেলা। এ-একটু স্পিরিট-ল্যাম্প জ্বেলে চা করা বই তো নয়।'

চা খেতে খেতে অভয়পদ বলে, 'আচ্ছা বলুন তো, একথা কি সত্যি যে আপনি গঙ্গাস্নান ক'রে ভিজে কাপড়ে এতটা এসেছেন রিক্সা ক'রে—এই ঠাণ্ডায় ?'

মাথা হেঁট ক'রে চিত্রা বলে, 'সত্যিই।'

'হঠাৎ এমন পাগলামি হ'ল কেন ?'

'পাগলামিরই তো বয়স এটা কাকাবাবু। তাছাড়া একে যৌবনের স্পর্ধা ভাবছেন না কেন!'

'কাকাবাবু' শব্দটা চাবুকের মতো আঘাত করে অভয়কে, কিন্তু চিত্রা যেন আজ সকলকার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করবার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছে। অভয়পদকে সে মার্জনা করেছে। তাকেও সে আর দূরে সরিয়ে রাখতে চায় না—তাই এমন সম্ভাষণে ওর কাছে গিয়ে দাঁড়াল, যে সম্ভাষণ বা সম্বোধনই ওকে খানিকটা আশ্রয় ও নিরাপত্তা দেবে।

অভয়পদর স্ত্রীকেও গায়ে পড়ে 'কাকীমা' সম্বোধন করে এতকাল পরে। অভয়পদর সম্বন্ধে ও উল্লেখ করে বার বার 'কাকাবাবু' বলে। হঠাৎ যেন অন্তরে অন্তরে খুশী হয়ে উঠেছে চিত্রা—তাই আর কোথাও কোন গ্লানি, কোনও তিক্ততা রাখতে চায় না। ফলে অভয়পদর স্ত্রী আজ খেয়ে ফেরবার সময় ওকে একেবারে বুকে টেনে নিয়ে চুমু খায়; বলে, 'আর যেন এ সব পাগলামি করিস নি কখনও। বাব্বা, যা ভয় হয়েছিল!'

চিত্রা লজ্জিত স্মিতমুখে দাঁড়িয়ে থাকে। এ অনুযোগ ঠোঁটের ডগায় এলেও প্রকাশ করে না যে, সে ভয় বা উৎকণ্ঠার কোন বহিঃপ্রকাশ এতকালের মধ্যে দেখা যায় নি।

আজ ও আর কোন আঘাত করবে না কাউকে—কারণ থাকলেও না।

বিছানায় শুয়ে শুয়ে ভাবতে চেষ্টা করে সে, এমন হঠাৎ এ খুশির জোয়ার মনে এল কেন ?

মনকে নিজেই বোঝাবার চেষ্টা করে যে মৃত্যুর দ্বারপ্রান্ত থেকে ফিরে আসার জন্য

একটা সানন্দ কৃতজ্ঞতা মাত্র এটা। অল্প বয়সে শুধু বেঁচে থাকারই আনন্দ আছে, অকারণ অবোধ আনন্দ। আর কৃতজ্ঞতা? সে যেন সাধারণভাবে সকলকার কাছেই, সমস্ত-কিছুর কাছেই—

চিত্রা কিন্তু এটা প্রথমে কিছুতেই নিজের কাছে স্বীকার করে নি যে, সেইদিন অপরাহ্ণেই নরেশকে ও দেখবার আশা করেছিল। বিকেল থেকেই উৎসুক হয়ে বাগানের কাঁকর-ফেলা রাস্তার দিকে চেয়ে শুয়েছিল। তারপর সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে যখন রাত্রি গভীর হয়ে এলো তখন মনের সমস্ত আনন্দ ও খুশির মধ্যেও কেমন একটু আশাভঙ্গের বেদনা অনুভব ক'রে অবশেষে নিজের মনের কাছে স্বীকার করতে বাধ্য হ'ল যে, এতক্ষণ ধরে ও নরেশেরই আগমন প্রতীক্ষা করছিল।

নরেশ সেদিন তো এলই না, পরের দিনও না। চিত্রা যেন একটু অভিমান বোধ করে। আবার শেষ পর্যন্ত নিজেকেই বোঝাতে চেষ্টা করে, কেনই বা আসবে নরেশ! সে হাসপাতালের ডাক্তার, ওর মতো বহু রোগিণীকেই নিত্য দেখতে হয়, মিষ্টি কথাও কইতে হয়। তার চেয়ে বেশী দাবী কিসের ওর?…সৌজন্য ক'রে বলতে হয় তাই বলেছে—তাই বলে সত্যি সত্যিই সে আসবে নাকি?—কেন? বরং মনের এই ঔৎসুক্যের জন্য লজ্জিত হওয়াই উচিত। জোর ক'রে মনকে শান্ত করে চিত্রা। তবুও কিন্তু ওর অজানা প্রতীক্ষার শেষ হয় না।

শেষ পর্যন্ত তিনদিনের দিন কাঁকর-ফেলা পথে কার জুতোর আওয়াজ পাওয়া গেল।

'কী, কেমন আছেন? কোন গোলমাল নেই তো?' অত্যন্ত সহজ, প্রসন্ন ভঙ্গী নরেশের।

'বেশ মানুষ তো আপনি!' অভিমান-রুদ্ধ কণ্ঠে কথা কটা আপনি বেরিয়ে আসে, 'খুব তো এলেন!'

'কেন, এই তো এসেছি।' বিস্মিত হয়ে বলে নরেশ, 'এর চেয়েও আগে এলে আপনি কি ভাবতেন? আমিই বা মনকে কি বোঝাতুম, বলুন তো? সেইজন্য বলে কত কষ্টে নিজেকে ক'দিন সংযত ক'রে রেখেছি।'

চিত্রার দুর্বল পাণ্ডুর মুখে কে যেন একরাশ লাল রং ঢেলে দিল, 'যান, কী যে বলেন।'

তারপরই সেটা ঢাকবার জন্য তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'দাঁড়ান, চা করি।'

'উঁহু, উঁহু', বাধা দিয়ে ওঠে নরেশ, 'পাগল নাকি! এই আপনার দুর্বল শরীর——এখন চা কি? আর একদিন বরং এসে খেয়ে যাব।'

'না না। এক কাপ চা ক'রে দিলে কিছু ক্ষতি হবে না। চা খাবার সবই

অবিশ্যি ওঁরা ক'রে পাঠিয়ে দিচ্ছেন কদিন দয়া ক'রে ; কিন্তু কাল থেকে আমিই রান্না করব স্থির করেছি। ঋণের বোঝা আর অকারণে বাড়াব না।'

স্পিরিট স্টোভ জ্বেলে অল্প সময়ের মধ্যেই চা ক'রে দিলে চিত্রা। নরেশ ওরই বিছানায় বসে চশমাটা খুলে হাতে ক'রে নাড়তে নাড়তে ওর কর্মরত মূর্তির দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইল। অকারণ বাচালতা করল না, ঘনিষ্ঠ হবার চেষ্টা করল না, এমন কি ওর কোন রকম একটা প্রশংসা করবারও চেষ্টা করল না। এতে চিত্রা মনে মনে বেশ খুশী হয়ে উঠল।

আর লক্ষ্য করল যে, কাপটা ওর হাত থেকে নেবার সময়ে অকারণে ওর হাতটা ছোঁবারও কোন চেষ্টা করল না সে, সহজ ভাবেই পিরিচের অপর প্রান্তটা ধরে নিয়ে নিল। অর্থাৎ গায়ে পড়ে অন্তরঙ্গ হবার এতটুকু চেষ্টা নেই কোথাও ওর কোন আচরণে।

চা-পানান্তে দু-একটি খুচরো সম্ভাষণ ক'রে এক সময় নরেশ উঠে পড়ল।

'আবার আসছেন তো ?'

দোরের কাছ থেকেই শান্ত, স্থির দৃষ্টিতে ওর দিকে চেয়ে নরেশ বললে, 'অনুমতি দিচ্ছেন ?'

'দিচ্ছি বৈকি।'

'কিছু মনে করবেন না তো ?'

'না না, মনে করব কেন ?'

এর পর আবারও তিন-চারদিন এল না নরেশ। আসাটা যে সঙ্গত হ'ত না চিত্রাও বোঝে। তবু সে যে দিনরাত তারই আগমন-প্রতীক্ষা করছে সে কথাটা কিন্তু সে নিজের মনে মনে স্বীকার না ক'রে পারে না।

বিস্ময় নিজের কাছেই। একটু লজ্জিতও হয়। আজন্ম-অর্জিত সংস্কার শাসন করতে চায় ইচ্ছাকে কিন্তু ওর মনে যে জোয়ার এসেছে এতকাল পরে, সে জোয়ার তার চন্দ্রের দিকেই ধেয়ে যেতে চায় দিনরাত। তাকে ঠেকাবার সাধ্য নেই চিত্রার।

অবশেষে বোধ হয় পাঁচদিন পরে এল নরেশ। এই ক'দিনেই চিত্রা যেন ওর আসা সম্বন্ধে হতাশ হয়ে, কখনো আর কোনও দিন যে ও আসবে, এ আশাও ছেড়ে দিয়েছিল। তবু সে আজ আর কোন অসতর্ক অভিমান প্রকাশ করল না। সহজ ভাবেই বলল, 'আসুন।'

সেদিন নিজেই কৈফিয়ৎ দিলে নরেশ, 'হাসপাতাল থেকে বেরোনো এত

মুশকিল। কাল আসব মনে ক'রেও আসা হ'ল না—ঠিক বেরোবার আগের মুহূর্তটিতেই একটা এমার্জেন্সি কেস এসে পড়ল।'

এর পর থেকে মধ্যে মধ্যেই আসে নরেশ। রোজ নয়—যেন হিসেব ক'রেই—দু-একদিন অন্তর। কোন কোন দিন বিশেষ আমন্ত্রণ থাকলে পর পর দু'দিন হয়। নইলে নিজে থেকে আসে না সে।

নরেশের সাহচর্য ওর অদ্ভুত ভাল লাগে। অধিকাংশ সময়ই সে চুপ ক'রে বসে থাকে। পা-দুটো ওপরে তুলে হাঁটু মুড়ো ক'রে বিচিত্র ভঙ্গীতে বসে নরেশ, চশমাটা হাতে ক'রে দোলায় এবং পায়ের বুড়ো আঙুলটা নাড়ে মধ্যে মধ্যে। চেয়ে থাকে ওর দিকে এক দৃষ্টে, তাতে না ফোটে লোভ, না ফোটে কোন স্তুতি। ঠাট্টা তামাশা করে মধ্যে মধ্যে—কথা যতদূর সম্ভব বেশী না কয়ে। তবু চিত্রার মনে হয় নরেশের সুগভীর একটা সহানুভূতি সে পেয়েছে। ভেতরে ভেতরে ওর একটা অদ্ভুত বুঝে নেবার শক্তি আছে, তাইতে কথা না কয়েও সবটা অনুভব করতে পারে। সেইজন্যে ওর সামনে চিত্রার যেন কোন কিছুতে লজ্জা করে না। নিজের জন্যেই বসে বসে রান্না করে; একটু আধটু তরকারী রাঁধলেও প্লেটে ক'রে ওকে খেতে দেয়। তাতেও খব উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে না নরেশ। শুধু হয়ত বলে, 'আমার মেসের ঠাকুরটাকে কি তাড়াতে চান?'

বিস্মিত হয়ে বলে চিত্রা, 'কেন?'

'এর পরে সে রান্না খেলে কি রকম মনোভাব হবে বলুন, তাকে তাড়িয়ে দিতে ইচ্ছে করবে না?' এই পর্যন্ত। হয়ত একটু মুখ টিপে হাসে এর সঙ্গে।

ওর কাছে চিত্রার যেন কোন কিছুই গোপন করার থাকে না। মনের সব নিভৃত দলগুলি কেমন ক'রে একে একে নিজেদের মেলে দেয় এই প্রায়-অপরিচিত সূর্যের সামনে, আশ্চর্য। সব কথাই সে নরেশকে বলে একে একে—নিজের পরিচয়টা পর্যন্ত। আর সেই পরিচয়কে কেন্দ্র ক'রে ওর নানা লাঞ্ছনা, অপরিসীম দুঃখের ইতিহাস।

নরেশ চুপ ক'রে শোনে। সহানুভূতির বৃথা বাগাড়ম্বর কোথাও কোনদিন প্রকাশ পায় না—কিন্তু ওর হৃদয়ের উষ্ণতা নিজের মনে মনেই অনুভব করে চিত্রা—এবং কৃতজ্ঞ হয়।

ওদের প্রথম 'তুমি' বলার ইতিহাসটা চিত্রার কাছে স্মরণীয়। ওপর থেকে অম্বিকাবাবুর স্ত্রী পাটিসাপ্‌টা ক'রে দুখানা পাঠিয়ে দিয়েছিলেন কাকে দিয়ে। নরেশ

তখন ওর ঘরে বসে। চিত্রা প্লেটসুদ্ধই এনে ধরল তার সামনে। ও বোধ হয় আশা করেছিল নরেশ একখানা তুলে নেবে, কিন্তু সে অন্যমনস্ক ভাবে প্লেটটাই ওর হাত থেকে নিয়ে নিল এবং কথা কইতে কইতে প্রথমখানা শেষ ক'রে দ্বিতীয়খানাতেও কামড় লাগাল।

চিত্রা সব বুঝেও চুপ ক'রে সকৌতুক দৃষ্টিতে চেয়ে ছিল, এতক্ষণ পরে বলল, 'বাঃ, বেশ লোক তো আপনি—আমার জন্যেই পাঠালে, আর আমাকে খেতে দিলেন না?'

'আরে? এতে আপনারও ছিল বুঝি! যাঃ, ভারী অন্যায় হয়ে গেল তো।... কী হবে, আমি কামড়েও ফেললুম যে! আপনি আর একটু আগে বলতে পারলেন না?

'আচ্ছা, যেটুকু আছে ঐটুকুই তো দিন। ওটা আবার মুখে পুরছেন কেন?'

'এটা? এটা যে আমি এঁটো করেছি—'

'তাতে কি হয়েছে। ঐ ছুতোয় সবটা আপনি খেয়ে নেবেন তা হবে না। দিন্—'

চিত্রা হাত বাড়িয়ে নিতে গেল প্লেটটা।

নরেশ কিন্তু বিষম বিব্রত হয়ে উঠল, 'না না—ছি! এটা খাওয়া উচিত নয়! আমি ডাক্তার হযে কিছুতে য়্যালাও করতে পারি না—'

আঃ—দাও দেখি, অত আর ডাক্তারি ফলাতে হবে না।'

নিজের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারেই কথাটা বেরিয়ে গেল চিত্রার মুখ দিয়ে—সে জোর ক'রে ওর হাত থেকে প্লেটটা কেড়ে নিল।

'তাহলে ঐটুকু বাদ দিয়ে অন্তত—'

বলতে বলতে চিত্রা সবটা মুখে পুরে দিয়ে বলল, 'কতটুকু বা রেখেছেন বাপু, তার আবার বাদ দেবো!'

কিন্তু ততক্ষণে ওরও আকস্মিক আবেগ কেটে গেছে। দেখতে দেখতে এই দুঃসাহসের প্রগল্‌ভতার লজ্জা ওকে যেন বিমূঢ় বিব্রত ক'রে দিয়ে গেল। নিমেষে সে ঘেমে উঠল। আর নরেশও—এই প্রথম তাকে লজ্জিত ও অপ্রতিভ দেখলে চিত্রা।...

একটু পরে নরেশই অবশ্য নিজেকে সামলে নিলে প্রথম, বললে, 'মুখ থেকে যা বেরিয়ে গেছে তা আর ফিরিয়ে নেওয়া চলবে না কিন্তু—'

মনে পড়ে যায় চিত্রারও, তবু সে আরও লাল হয়ে বলে, 'কি বলেছি? কৈ আমি তো—কি বলছেন আপনি—'

'হুঁ, আপনি নয়—তুমি। একটু আগে সেইটেই বলা হয়েছে '

'না—যান! আপনি ভারি দুষ্টু। সে একটা কি হঠাৎ ঝোঁকের মাথায়—সে

আমি পারব না'

'না, পারতেই হবে। নইলে আজ থেকে অসহযোগ।'

'বাঃ রে! বেশ লোক তো আপনি। কখন কি বলে ফেলেছি—'

নরেশ গম্ভীরভাবে দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে বসে।

'ও আবার কি হচ্ছে?' হেসে ফেলে চিত্রা।

নরেশ নিরুত্তর।

'শুনছেন?...এ কি ছেলেমানুষী আপনার, বলুন তো?'

শেষে আবারও হেসে ফেলে, বললে, 'আচ্ছা, আচ্ছা, হয়েছে। আমাকেও কিন্তু "তুমি" বলতে হবে তাহলে, মনে থাকে যেন!'

'সেইটেই তো বলতে চাই। এতদিন অতিকষ্টে ভদ্রতা রেখেছি। বাঁচলাম। একফোঁটা মেয়ে, তাকে আবার ভদ্রতা ক'রে "আপনি" বলতে হবে!'

নরেশ এদিকে ফিরে বসে।

'বসো দিকি স্থির হয়ে। এতদিনের ভদ্রতা ভুলে একটু সহজ ভাবে কথা কওয়া যাক্।'

মুখে কাপড় দিয়ে হাসে চিত্রা, 'এতই যদি মনে ছিল, আপনি তো—'

'উঁ—?'

'আচ্ছা আচ্ছা, অমনি এক কথায় বলা যায়? নিজে তো বললেই পারতে। একফোঁটা মেয়েকে খাতির করবার কি দরকার ছিল?...সেইটেই তো স্বাভাবিক হ'ত। আমাকে যদি লোকে নিন্দে করে?'

'করুক। নিন্দে এমনিই করতে পারে। একটা জলজ্যান্ত পুরুষমানুষ রোজ এসে আড্ডা মারে—'

চিত্রার মুখ প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ম্লান হয়ে আসে। চকিতে লক্ষ্য ক'রেই নরেশ বলে, 'ওঃ—শুরু হয়ে গেছে বুঝি?'

ঘাড় হেঁট করে চিত্রা বলে, 'অনেকদিন। যুবরাজই বেশী প্রবল তার মধ্যে। তাঁর রসনা শানিত হয়েই আছে।'

'হ্যাঁ—সেটা বুঝতে পারি বৈকি!..."কাকাবাবু" বলেও ঠেকানো গেল না?'

'বরং তাইতেই তো আক্রোশটা বেশী।'

নরেশ গম্ভীর হয়ে যায়। আপন মনেই কি যেন ভাবে।

তারপর হঠাৎ বিনা সম্ভাষণেই উঠে চলে যায়।

এমনিই তার স্বভাব। আবাহনও নেই, বিসর্জনও নেই।

এর পরের ইতিহাস খুবই সংক্ষিপ্ত। সৌজন্যের একটা বাধা থাকে, তার বাহ্য প্রকাশ ঐ 'আপনি' সম্বোধনে। সে বাঁধ ভাঙলে হৃদয়াবেগকে সংযত করা কঠিন।

অবশেষে ওরা যে পরস্পরের প্রেমে পড়ে নি—মাত্র নৈমিত্তিক পরিচয় দুজনের—এ অভিনয়টা বন্ধ হয়ে যায় এক সময়। দুজনের মনের ভাব বাইরের আচরণেও গোপন করা সম্ভব হয় না আর।

চৈত্রের এক রবিবারে নরেশ দুপুরবেলাই এসে হাজির। হেসে বললে, 'হাসপাতালের পাট আজ চুকিয়ে দিয়ে এলাম চিত্রা। এখন পরিপূর্ণ ছুটি।'

আশার চেয়ে আশঙ্কাই বেশী বাজে চিত্রার মনে, যেন চমকে উঠে বলে, 'তার মানে? দেশে যাওয়া তো এবার?'

'উঁহু', চোখে কৌতুক খেলে যায় নরেশের, চাকরির চেষ্টা দেখতে হবে। এখন কি দেশে যাবার সময় আছে? বাবাকে সেই কথাই লিখে দিলুম। মেসও একটা ঠিক ক'রে ফেলেছি। হাসপাতালের ঘর তো ছাড়তে হবে!'

নিশ্বাস ফেলে বাঁচে চিত্রা।

'চলো একটু গঙ্গার ধারে বেড়িয়ে আসি।' নরেশই প্রস্তাব করে।

'চলো।' সামান্য একটু প্রসাধন শেষ ক'রেই বেরিয়ে পড়ে চিত্রা। ট্রাম থেকে নেমে হাঁটতে হাঁটতে বলে, 'আচ্ছা, সেই তুমি ডুবে মরতে গিয়েছিলে, সেই জায়গাটা কোথায় যেন?'

'আবার বাজে কথা! বয়ে গেছে আমার ডুবে মরতে। ডুব দেওয়া আর ডুবে মরা কি এক?'

'আচ্ছা আচ্ছা, ডুব দেওয়াই হ'ল। চলো—'

চিনে চিনে সেই জায়গাটায় গিয়ে বসে ওরা পাশাপাশি। মধুমাসের ক্লান্ত দ্বিপ্রহর। গঙ্গার বুকেও শেষ বসন্তের যেন একটা আবেশবিহ্বল তন্দ্রা নেমেছে। নৌকোতে নৌকোতে মাল্লারা ঘুমে অচেতন। শ্রমিকের দল আশেপাশে ছাতু খাওয়া শেষ ক'রে গামছা বিছিয়ে বিশ্রাম করছে।

ঠাণ্ডা হাওয়া আসছে গঙ্গার ওপর দিয়ে। সে হাওয়াতে যেন নেশা লাগে।

'সত্যিই যদি অসুখ তোমার না সারত!' হঠাৎ একসময় বলে ওঠে নরেশ। সেই সম্ভাবনাটা স্মরণ ক'রে যেন শিউরে ওঠে। চিত্রার কাঁধের একাংশ ছিল ওর বুকে ঠেকে, সে শিহরণ চিত্রাও অনুভব করে।

উত্তর দিতে গিয়ে গলায় যেন স্বর বেরোয় না, কেমন একটা বিকৃত কণ্ঠে চুপি চুপি বলে, 'সেই তো ভাল হ'ত। কী লাভ আমার বেঁচে বলতে পারো? আমার —আমার হয়তো সেদিন ডুবে মরাই উচিত ছিল।'

'ছি! ওর একটা হাত নিজের হাতের মুঠোর মধ্যে নিয়ে আস্তে আস্তে চাপ দেয় নরেশ, 'তোমার জীবনের মূল্য তুমি ছাড়াও হয়ত কারও কাছে আছে চিত্রা।'

'কে জানে!'

কিসের একটা অজ্ঞাত বেদনায় চিত্রার চোখের কূল ছাপিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে। ওর চুলের স্পর্শ লাগছে নরেশের মুখে, তারই দু'একগাছি কপালে জড়িয়ে আছে সামান্য দু'এক বিন্দু ঘামের সঙ্গে—চোখের জল গড়িয়ে পড়ছে গালের সুন্দর তিলটি বেয়ে—মিলিয়ে যেন কি এক নেশা লাগে নরেশের। সে স্থান-কাল-পাত্র ভুলে যায়। অকস্মাৎ এক হাতে জড়িয়ে একেবারে বুকের মধ্যে টেনে এনে প্রগাঢ় একটি চুম্বন করে চিত্রাকে।

চিত্রা প্রবল কোন বাধা দেয় না, তবে মুহূর্ত কয়েকের মধ্যেই নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে সোজা হয়ে বসে। রুমাল বার ক'রে চোখ মুছতে যায়, কিন্তু হাত কাঁপছে থরথর ক'রে—কিছুতেই হাত যেন স্থির করতে পারে না।

নরেশও কিছু অপ্রতিভ, কিছু উত্তেজিত এবং বিবশ হয়ে পড়েছিল; সেও তেমনি স্তম্ভিতভাবে মাটির দিকে চেয়ে বসে রইল। অবশেষে চিত্রারই সম্বিৎ ফিরে এল আগে, সে চোখ মুছে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'চলো। দু'একজন চেয়ে আছে কেমন ক'রে।'

ফেরবার পথটা দু'জনেই চুপ ক'রে রইল সমস্তক্ষণ। একেবারে বাড়িতে ফিরে চিত্রা বলল, 'ছাখো, মনের ওপর জোর হারিয়েছি। আর আমাদের না দেখা হওয়াই ভাল।'

'সে আর হয় না চিতু।...অনেক দূর এগিয়েছি আমরা দু'জনেই। ...আমি যদি বা সহ্য করতে পারি, তুমি পারবে না।'

'সহ্য করতেই হবে। নইলে উপায় কি বলো? তুমি—তুমি তো আর আমাকে বিবাহ করতে পারবে না।'

কোনমতে কথাটা বলে ফেলেই যেন মরমে মরে যায় চিত্রা। এ কি নির্লজ্জতা ওর!

'কেন পারব না?' বিস্মিতভাবে চায় নরেশ, 'নইলে তুমি কি মনে করেছিলে আমি তোমার সঙ্গে ফ্লার্ট করছি শুধু শুধু! আর পাঁচটা লম্পটের মতো? ছি! শুধু আর্থিক সঙ্গতি নেই বলেই অপেক্ষা করছিলুম—'

'কিন্তু আর অপেক্ষা করা ঠিক হবে না। হয় এখনই বিবাহ করতে হবে, নইলে এখান থেকেই বিদায় নিতে হবে।'

'কেন? আমাকে কি বিশ্বাস করো না?'

'তা নয়, বিশ্বাস নেই নিজের ওপরই—একটুও।'

খানিকটা চুপ ক'রে থেকে নরেশ বললে, 'বেশ, তবে তাই হোক। কিন্তু কিছুদিন তো এভাবেই থাকতে হবে। আমার তো আলাদা বাসা করবার সঙ্গতি নেই। বাবার কাছে টাকা চাইব কি অজুহাতে?'

'তার দরকারই বা কি! আমি যেমন চাকরি করছি তেমনিই করব। তুমিও যেমন আছ তেমনিই থাকো। ওটা শুধু—'

তারপর খানিকটা চুপ ক'রে থেকে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বললে চিত্রা, 'কিন্তু এখনও ভেবে দেখো, ভুল করছ না তো?'

'তুমি তো জানোই চিতু, আমি না ভেবে কিছু করি না।'

'কি পরিচয় দেবে তুমি আমার?'

'তুমি আমার স্ত্রী, এই পরিচয়ই যথেষ্ট।'

বিয়ের কথা নরেশ তার বাবাকে জানাতে চাইল না। বললে, 'এখন জানতে পারলে তিনি রাজী তো হবেনই না—আমাকে ছিনিয়ে নিয়ে যাবার জন্য জবরদস্তি করবেন। তার চেয়ে ঘটনাটা আগে ঘটে যাক—আমিও একটা উপার্জনের পথ বেছে নিই। যখন আর তাঁর কিছুই করবার বা বাধা দেবার উপায় থাকবে না, তখন হয়ত ব্যাপারটা মেনে নিতে পারবেন।'

চিত্রা মাথা হেঁট ক'রে বলেছিল, 'দেখো কিন্তু আমার জন্যে তোমার পারিবারিক জীবনটা একেবারে নষ্ট হয়ে না যায়। তোমার মা বাবা চিরকাল আমাকে অভিশাপ দেবেন হয়ত।'

'ওরে পাগল, আমার পারিবারিক জীবন তোমাকে আর তোমার সন্তানকে নিয়ে। প্রকৃতির নিয়ম এই।'

অসহনীয় সুখের পুলকে সেদিন থর-থর ক'রে কেঁপে উঠেছিল চিত্রা। এ স্বপ্ন ওর সুদূর প্রত্যাশারও অতীত। সেই দুর্লভ সৌভাগ্য যখনই একেবারে সামনে উপস্থিত হয়েছে, তখন কি আর অজানা ভবিষ্যতের কথা ভেবে কেউ পারে তাকে প্রত্যাখ্যান করতে?...চিত্রাও পারে নি। অনেক কথা অনেক সমস্যা হয়ত সে ভাবতে পারত, কিন্তু ইচ্ছা ক'রেই ভাবে নি।

অবশেষে একদিন সত্যিই বিয়ে হয়ে গেল।

আয়োজন সামান্য, প্রস্তুতির অবসর নেই, প্রয়োজনও নেই। তবু স্বপ্নের ঘোর লাগে মনে—চোখেও। বুক কাঁপে দুরু দুরু। কোথা দিয়ে কি হয়ে যায়, চিত্রা ভেবেও পায় না। শুধু এক সময় আবিষ্কার করে সে নরেশের আইনানুসারে বিবাহিতা স্ত্রী।

অম্বিকাবাবুই সব ব্যবস্থা ক'রে দিলেন। প্রথমটা তিনি ভেবেছিলেন যে তাঁর ইস্কুলের হেডমিস্ট্রেসকে ভাঙিয়ে নিচ্ছে নরেশ, তাই একটু বিরূপতা দেখিয়েছিলেন। কিন্তু যখন শুনলেন চিত্রার এখন চাকরি ছাড়বার কোন সম্ভাবনা নেই, তা ছাড়া নরেশও এখানে এসে থাকবে না—তখন তিনি প্রসন্নমনেই বিবাহের বন্দোবস্ত ক'রে দিলেন, এমন কি রেজেষ্ট্রী অফিসে নিজে গিয়ে সাক্ষী হিসেবে সই করলেন।

অভয়পদ দুদিন আগে কী একটা কাজে বাইরে চলে গিয়েছিল, কিন্তু তার স্ত্রী খুশী হয়ে আগের দিন আইবুড়ো-ভাত খাইয়ে দিলে চিত্রাকে।

॥ ১২ ॥

এরপর ক-টা দিন কাটল একটা নিরবচ্ছিন্ন সুখ-স্বপ্নের মধ্যে দিয়ে। জীবনের যে এত সুখ তা চিত্রা কোন দিন ভাবে নি, কল্পনা করে নি। কোথাও কোন লোকলজ্জা বা বিবেকের বাধা থাকবে না, এত সহজে ও নিজেকে প্রিয়তমের কাছে সঁপে দিতে পারবে—এ কোনদিন স্বপ্ন দেখতেও সাহস করে নি। যে চোর আড়াল থেকে ভয়ে ভয়ে গৃহস্থবাড়ির ঐশ্বর্য দেখেছিল, তাকে এনে একেবারে অন্তঃপুরে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। চিত্রার দিনরাত কাটে একটা একটানা নেশার ঘোরে।

অবশ্য নরেশকে সে বেশীক্ষণ পায় না এটা ঠিক। রাত্রে সে থাকে না—কদাচিৎ এক আধ দিন ছাড়া। দিনেও চাকরির চেষ্টায় ঘোরে—তার বন্ধুবান্ধব আছে, আড্ডা আছে। তেমনি আছে চিত্রার ইস্কুল। কিন্তু এই স্বল্প অবসরেই যেন আনন্দ বেশী। চিত্রা ভাবে আগেকার বধূরা দিনের বেলা স্বামীকে দেখতে পেত না, নানা ছল-ছুতো ক'রে চকিতের মতো হয়ত কোনদিন দেখা মিলত—সে দৈবাৎ—কিন্তু তাতে আনন্দ বেশী ছিল। দিনরাত পেলে এমন একান্ত প্রতীক্ষার আনন্দ, এমন প্রতিদিন নতুন ক'রে পাওয়ার অসহ পুলক—এটা তো অনুভব করা যেত না।

দিনের বেলা খাওয়াও হয় না। রাতে সবদিনই নরেশ খায় ওর কাছে। আর খায় রবিবার বা ছুটির দিনগুলোয়। এই সব দিনে চিত্রা নিজে হাতে ওকে স্নান করিয়ে দেয়, খাওয়ার পর শুইয়ে পা টিপতে বসে। নরেশ হয়ত অনুযোগ করে, 'ও

আবার কি ?'

চিত্রা হেসে বলে, 'সর্ব কালের সমস্ত রমণীর মনের আনন্দকে আমি উপভোগ করতে চাই। স্বামী-সেবার যে কি আনন্দ—তুমি কি বুঝবে ? আমার তো ধারণা আধুনিক কালের চেয়ে সেকালের মেয়েদেরই রসজ্ঞান ছিল বেশী !'…

এমনি করে দিন কেটে যেতে থাকে। একটু একটু ক'রে চিত্রা নিজের সেই অবিশ্বাস্য সুখ-সৌভাগ্যকে নিজের অনুভূতির মধ্যে সহজে স্বীকার ক'রে নিতে পারে। মনে হয় সত্যিই বুঝি ওর জীবনে দুঃখের দিন কেটেছে।

এখন শুধু নরেশের চাকরিটা পেলেই হয়।

মাঝে মাঝে দুঃস্বপ্নের মতো মনে হয় অবশ্য, তার মা-বাবা ঘরবাড়ির কথা, কিন্তু মনের মধ্যেটা ভয়ে ভয়ে অবশ হয়ে আসতে চায় বলে জোর ক'রে সে চিন্তাকে মন থেকে সরিয়ে বর্তমান সুখকেই আঁকড়ে ধরে। কিছুদিন পরে একটা আশ্বাসও আসে মনের মধ্যে, নির্ভরতা জাগে নরেশের প্রখর স্থিরবুদ্ধির ওপর। ও-ই যা হোক্ একটা কিছু উপায় ক'রে নেবে।

মাস-দুই পরে হঠাৎ নরেশ একদিন দুপুরবেলা এসে হাজির, শুকনো মুখ, রুক্ষ চুল। সেটা ইস্কুলের কি একটা বিশেষ ছুটির দিন, চিত্রা খাওয়াদাওয়া সেরে একটু দিবানিদ্রার আয়োজন করছিল, ওকে অসময়ে ঐভাবে আসতে দেখে ধড়মড়িয়ে উঠে বসল, 'এ কি, এমন হঠাৎ ? এ কী অবস্থা তোমার ? অসুখবিসুখ করে নি তো ?… বসো, বসো।· খাওয়া হয় নি নিশ্চয় এখনও ?

নরেশ বললে, 'বসতে গেলে চলবে না, এইমাত্র টেলিগ্রাম পেলুম, মা মরণাপন্ন। আমি এগ আড়াইটের গাড়িতেই রওনা হচ্ছি। তোমাকে জানাতে এসেছি, আর সময় নেই।'

'সে কি, কিছু খেয়েও যাবে না। একটু বসো। এই তো সবে একটা—চট্ ক'রে স্টোভ জেলে একটু কিছু ক'রে দিচ্ছি, মাথায় জল দিয়ে নাও একটু—'

কিন্তু অজ্ঞাত কি একটা আশঙ্কায় বুক কেঁপে ওঠে চিত্রার। ও জানবার আগেই ওর মুখে সে আশঙ্কার ছায়া পড়ে।

একটু বিরক্ত হয়েই নরেশ বলে, 'অমনি মুখ শুকিয়ে উঠল ? সব মেয়েই সমান দেখছি।'

'না, তা নয়।' অপ্রতিভ ভাবে বলে চিত্রা, মা'র অসুখ—কি হবে সেটাও তো একটা ভাবনা।'

'হ্যাঁ, সে ভাবনায় তো তোমার ঘুম হচ্ছে না। আমার ফিরতে কত দেরী হবে সেইটাই তোমার বড় কথা।'

ওর এই আকস্মিক রূঢ়তায় চিত্রার চোখে জল আসে, 'সেটা কি অস্বাভাবিক খুব? আমার আর কে আছে বলো!' ব'লে সে প্রাণপণে চোখের জল চাপে।

নরেশও কথাটা বলে অপ্রতিভ হয়ে পড়েছিল, এখন প্রসঙ্গটা ঘুরিয়ে নিল। চিত্রা আর কথা না ব'লে ওর চুলে তেল মাখিয়ে দিল, তারপর নরেশ মাথায় জল দিয়ে বসতে, মাথা-গ্না মুছিয়ে নিজের হাতে চুল আঁচড়ে দিল। স্টোভ জেলে তাড়াতাড়ি কয়েকখানা লুচি ও একটু চা ক'রে এনে বলল, 'একটু খেয়ে নাও দিকি, এখনও ঢের সময় আছে।'

কিন্তু খাওয়া সেরে যখন 'আচ্ছা আসি' বলে নরেশ উঠে দাঁড়িয়েছে তখন আর মনের কথাটা চাপতে পারল না, একেবারে চৌকাঠের কাছে এসে বলে ফেলল, 'হ্যাঁ গো, অসুখের কথাটা মিছে নয় তো?'

'মিছে! মিছে কেন হবে?'

'তোমাকে এখান থেকে নিয়ে যাবার জন্যে—অনেকদিন যাও নি তাই—' জড়িয়ে জড়িয়ে বলে চিত্রা, আসল আশঙ্কাটা কিছুতেই প্রকাশ করতে পারে না।

'পাগল! তার দরকার কি, আমাকে এমনি যেতে বললে কি আর যেতুম না!'

নরেশ বেরিয়ে যাবার পর চিত্রা বহুক্ষণ সেইখানেই দাঁড়িয়ে থাকে পাথরের মতো। পাথরের মতো স্থির আছে ওর দেহটাই—মনের মধ্যে যেন ঝড় বইছে। কত কি দুশ্চিন্তা, অমঙ্গলাশঙ্কা— কত অজানা ভবিষ্যতের দুঃস্বপ্ন।

জোর ক'রে মনকে প্রকৃতিস্থ করল চিত্রা। যা ঘটেছে তার সরল অর্থ করাই ভাল —মিছিমিছি ধোঁয়া নিয়ে মন খারাপ ক'রে লাভ কি? সে সহজভাবেই কাজকর্ম ক'রে যেতে লাগল।

চার-পাঁচদিন পরে নরেশের একটা কার্ড এল, দু ছত্র——'মা ভাল আছেন, দিন-কয়েকের মধ্যেই যাচ্ছি।'

এই বলতে গেলে ওর স্বামীর প্রথম চিঠি। প্রেমপত্র বলাই উচিত। চিত্রা ম্লান হাসি হেসে কার্ডখানা খানিকটা নাড়াচাড়া ক'রে বাক্সয় তুলে রাখল। আশ্চর্য, নরেশের আর কোন চিঠিই ওর কাছে নেই।

আরও চার-পাঁচদিন পরে নরেশ ফিরল। যেমন অকস্মাৎ গিয়েছিল তেমনই অকস্মাৎ ফিরল। ঝড়ে যেন ওকে উড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিল, ঝড়েই ফিরিয়ে দিয়েছে— এমনি ওর চেহারা। ঠিক তেমনি ক্লান্ত, রুক্ষ। চুলগুলো উস্‌কো-খুস্‌কো, চক্ষু কোটরগত। ঘামে জামাটা সুদ্ধ ভিজে।

শিউরে উঠলো চিত্রা, 'ইস, এ কী চেহারা হয়েছে এই কদিনে? ভাল ছিলে তো তো সেখানে?···মা কেমন আছেন? খুব রাত জাগতে হয়েছিল?'

কোন উত্তর দেয় না নরেশ। কেমন যেন একটা অদ্ভুত দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে চিত্রার দিকে।

চিত্রা এসে ওর হাত ধরে ওকে বসিয়ে ভিজে তোয়ালে দিয়ে মুখ মাথা মুছিয়ে দিলে, তারপর জামা জুতো খুলে দিয়ে বাতাস করতে করতে আবারও প্রশ্ন করলে, 'হ্যাঁ গো, সেখানে ভাল ছিলে তো? অসুখ করে নি তো?···নাকি কোন খারাপ খবর আছে? তোমার এমন চেহারা কেন?'

নরেশ আস্তে আস্তে ওর একটা হাত ধরে বললে, 'এখন একটু চুপ ক'রেই থাকি না, পরে বলব।'

আর কোন প্রশ্ন করে না, একটা কিছু হয়েছে, গুরুতর কিছু আঘাত পেয়েছে হয়ত, কিন্তু তার জন্য অপেক্ষা করা চলতে পারে। স্বামীকে যখন কাছে পেয়েছে তখন আর কোন ভয় নেই চিত্রার—সে পারবে অপেক্ষা করতে।

সে খাবার ক'রে দিতে গেল, নরেশ নিষেধ করল, শুধু এক কাপ চা।

'কিছুই খাবে না?'

'খেতে ইচ্ছে নেই এখন। একটু চা-ই দাও।'

চা খাবার পর নরেশ বললে, 'চলো একটু বেরুই।'

'কোথায় গো?'

'চলো একটু গঙ্গার ধারে ঘুরে আসি।·· সেই—যেখানে আমরা সেদিন গিয়েছিলুম —সেখানে।'

ওর কণ্ঠস্বরে কী একটা ছিল। চকিতে ফিরে দাঁড়িয়ে চিত্রা বললে, 'কী ব্যাপার বলো তো? কি হয়েছে আমাকে বলো না? অমন করছ কেন?'

'বলব সেখানে গিয়ে।'

চিত্রার এবার কেমন ভয় হয় একটা। হাত কাঁপে ওর প্রসাধন করতে গিয়ে। কোনমতে শাড়িটা পাল্‌টে নিয়ে বেরিয়ে পড়ে।

সমস্ত পথটাই নিঃশব্দে যেতে হয়। বাসে ও থাকে মেয়েদের সীটে, নরেশ

সামনে বসে, ওর দিকে পিছন ফিরে। তার মুখের ভাবটাও চিত্রা দেখতে পায় না। কী শুনবে, অভাবনীয় কী দুঃসংবাদ—তা অনুমান মাত্র করবার উপায় নেই।

গঙ্গার ধারে পৌঁছেও নরেশ অনেকক্ষণ চুপ ক'রে বসে থাকে, গঙ্গার দিকে নির্নিমেষ নেত্রে চেয়ে। চিত্রাও প্রশ্ন করতে পারে না, ও যেন সমস্ত সাহস হারিয়েছে অকস্মাৎ।

অনেকক্ষণ পরে নরেশ বলল, 'চিতু, একদিন এইখানে ডুবে মরতে গিয়েছিলে, খন সাহস আছে ?'

'তা—তার মানে ?' বিহ্বল চিত্রার কণ্ঠ থেকে অতি কষ্টে স্বর বেরোয়।

'তুমি আর আমি দুজনেই অবশ্য এবার। আর কোন উপায় নেই আমার চিতু।'

চিত্রা এবার যেন ভেঙে পড়ে, 'কেন গো ? কি হয়েছে তোমার বলো না ? নইলে বুঝব কি ক'রে ? আমি যে আর ভাবতে পারছি না। তুমি কি কাউকে খুন ক'রে এসেছ ?'

'সে বরং ভাল ছিল। আমি—আবার বিবাহ ক'রে এসেছি।'

'কী—কী ক'রে এসেছ ?' আর্তস্বর বেরোয় চিত্রার কণ্ঠ থেকে।

উত্তর দেয় না নরেশ, উত্তরের প্রয়োজনও ছিল না।

চিত্রার ওটা প্রশ্ন নয়—বুকফাটা কান্নাই।

চিত্রার চোখ দিয়ে কিন্তু জল বেরোয় না, পাষাণের মতোই শুকিয়ে গেছে যেন ওর চোখ। কথাও কইতে পারে না, শুধু ঠোঁট দুটো কাঁপে নিঃশব্দে। আর যে দুঃসংবাদই হোক—ঠিক এর জন্য প্রস্তুত ছিল না সে।

নরেশই একটু পরে বললে, চুপি চুপি, যেন নিজেকেই শুনিয়ে, 'ওঁরা খবরটা কি ক'রে পেয়েছিলেন, এখান থেকেই কেউ বেনামী চিঠি লিখেছিল—বোধহয় তোমার সেক্রেটারীর ছেলে—তাই ওঁরা সমস্ত ব্যবস্থা ঠিক ক'রে টেলিগ্রাম করেছিলেন। যেদিন পৌছলুম সেইদিনই রাত্রে বিয়ে। আমার চিন্তা করার অবসর ছিল না, ভাল ক'রে সবটা বোঝবারও না। একটু বেঁকে দাঁড়াতে বাবা মা আমার পায়ের কাছে মাথা খুঁড়তে লাগলেন।...ঠিক রাখতে পারলাম না নিজেকে—বাবার স্নেহ যা আমি পেয়েছি এর আগে—জগতে তার তুলনা নেই।...কি ক'রে কঠিন হবো বলতে পারো ? বুঝিয়ে বলতে গেলুম যে আমার আগেই বিয়ে হয়ে গেছে, এ বিবাহ অসিদ্ধ হবে—কোন কথাই বিশ্বাস করলেন না। তাঁদের ধারণা—বিয়ের কথাটা মিথ্যা, এমনি একটা ঘনিষ্ঠতা হয়েছে তোমার সঙ্গে—'

বহুক্ষণ নিষ্পলক চোখে পশ্চিম দিগন্তের দিকে চেয়ে বসে রইল চিত্রা। ওপারের

বাড়িঘরের পেছনে সূর্য অস্ত যাচ্ছে—শুধু আলোর একটা মায়া মাত্র লেগে আছে আকাশে। আলো নেই আসলে।

অনেকক্ষণ পরে চিত্রা শুধু বললে, 'তার পর ?'

'তার পর ?...মৃত্যু ছাড়া আর তো আমি কোন পথ দেখতে পাচ্ছি না।...আর কেমন ক'রে বাঁচব ? সেই এক মুহূর্তের কাপুরুষতার ঋণ সারাজীবন ধরে টেনে বেড়াব ? সে আমি পারব না।...তুমি আর আমি দুজনেই একসঙ্গে সব শেষ ক'রে দিই, এসো—'

চিত্রা একেবারে উঠে দাঁড়াল, 'মরতে গেলে আমাকেই মরতে হয়, কারণ তোমার জীবন এখন আরও একজনের কাছে বাঁধা পড়েছে। তোমার বিবাহ হয়ত অসিদ্ধ হয়েছে, কিন্তু সে মেয়েটার তো হয় নি। তার কি দোষ ? জেনে শুনে তার জীবন নষ্ট করতে চাও কি সাহসে ? সে তো হিন্দুমতে বিয়ে করেছে—তার তো আর বিবাহের সম্ভাবনা নেই।...সুতরাং আমারই মরে তোমাদের পথ নিষ্কণ্টক ক'রে দেওয়া উচিত। কিন্তু সে উপায় আমার নেই, আমার—আমার গর্ভে হয়ত তোমার সন্তান আছে।'

'চিত্রা—!' ওর দিকে চাইতেও সাহস করে না নরেশ, অপরাধীর ভঙ্গিতে অসহায়ভাবে ডাকে শুধু।

'চলো উঠি; এ বড় লোভের স্থান। এখানে থাকলেই মরতে ইচ্ছা হবে। সেইজন্যই চলে যাওয়া দরকার।'

'কিন্তু এর পর কি ক'রে আমি বাঁচব, বলতে পারো ?' ব্যাকুল ভাবে প্রশ্ন করে নরেশ।

তীক্ষ্ণ একটা বিদ্রূপ ফুটে ওঠে চিত্রার গলায়, 'আমি কি ক'রে বাঁচব সেইটেই সমস্যা। তোমার পথ তো সহজ উন্মুক্ত, তোমার জন্যে চিন্তা কি ? তবে কি জানো, ছোটবেলা থেকে আঘাত সয়ে সয়ে পাথর হয়ে গেছি—আমার সবই সইবে।...বাড়ি চলো।'

॥ ১৩ ॥

ভালবাসার সমস্ত ভিত্তিটা আছে একটা অক্ষয় আশাবাদের ওপর। তাই বহু কান্নাকাটি মান-অভিমানের পর চিত্রা আবারও নরেশের কাছে আত্মসমর্পণ করে, এবং আশা করে যে নরেশ ওরই স্বামী হয়ে থাকবে। সুদূর মুর্শিদাবাদের কান্দী মহকুমার এক

গ্রামে আর একটি বালিকার কি হবে, তা নিয়ে ওর মন-মাথা ঘামাতে চায় না, কারণ ভালবাসা শুধু আশাবাদী নয়—স্বার্থপরও।

এর মাসখানেকের মধ্যেই নরেশ একটা চাকরি পেয়ে গেল। বীরভূম জেলার এক গ্রামের একট হাসপাতালে—কলকাতারই কোন এক ধনী ব্যবসায়ীর পয়সায় চলে, যদিচ দেখাশুনো করে ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড। আপাতত একশ পঁচিশ টাকা মাইনে, বাইরে প্র্যাক্টিস করা চলবে। অবশ্য তাতে কত আয় হবে সে বিষয়ে নরেশের যথেষ্ট সন্দেহ আছে, সে নাকি একেবারে অজ পাড়াগাঁ! তবে একশ পঁচিশ টাকায় দুজনের সংসার পাতা চলবে। ওরা একটা কোয়ার্টারও তৈরী করাচ্ছে—শেষ না হওয়া পর্যন্ত চিত্রাকে নিয়ে যাওয়া চলবে না। আপাততঃ নরেশ একাই যাবে।

চিত্রা খুশী হ'ল -সেই সঙ্গে একটু ভয়ও করতে লাগল। বলল, 'কিন্তু ওখান থেকে ওঁরা তোমাকে জোর ক'রে ধরে নিয়ে যাবেন না তো?'

একটু তিরস্কারের দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে নরেশ বলল, 'তাহলে কি এখান থেকেই নিয়ে যেতে পারতেন না? চেষ্টা যে কম হয় নি তা তো তুমি জানো!'

তা বটে। চিত্রা লজ্জিত হয় ওর এই এক মুহূর্তের অবিশ্বাসের জন্য। ওরই মনটা নীচ।

শুধু যাবার দিন একবার সে প্রশ্ন করলে, 'ওদেশে তো শুনেছি মাটির বাড়ি হয় সব -তুমিই তো বলছিলে সেদিন—তাহলে কোয়ার্টার কবে নাগাদ তৈরি হয়ে যাবে মনে করো?

'মাটির ঘর বলেই দেরি হবে—এটা যে বর্ষাকাল চলেছে তা ভুলে যাচ্ছো কেন?'

'ও!' সংক্ষেপে শুধু বলে চিত্রা।

'এত তাড়া কি?' দুষ্টুমির হাসি হেসে বলে নরেশ, 'এখনও তো চার-পাঁচ মাস।'

'যাও, ভারী দুষ্টু তুমি।' চিত্রা হেসে ফেলে।

প্রথম প্রথম চিঠি আসত নিয়মিত। মাসখানেক পরে নরেশ একদিন এসে ঘুরেও গেল। এ অবস্থায় কি খাওয়া উচিত, কি কি ওষুধ খাওয়া উচিত—তাও বলে গেল।

চিত্রা বললে, 'কিন্তু আমার বেশীদিন তো আর চাকরি করা চলবে না। কিছুদিন ছুটি নিতে হবে অন্ততঃ।'

'ছুটি ? ছুটি আর কি হবে ? তুমি চাকরি ছেড়েই দাও। অম্বিকাবাবুকে একটা ফেয়ার নোটিশ দাও, উনি লোক খুঁজে নিন। আর ভাবনা কি, আমি তো এখন টাকা পাঠাতেই পারব।'

চিত্রা নিশ্চিন্ত হয়েই নোটিশ দিলে। অম্বিকাবাবু প্রথমটা আপত্তি করেছিলেন, কিন্তু পরে নিজেই ভেবে দেখলেন যে তিন-চার মাসের ছুটি দিলে অন্য লোক রাখতে হয়—সে বিস্তর খরচা। তা ছাড়া শেষ পর্যন্ত চিত্রা হয়ত স্বামীর ঘর করতেই চলে যাবে। সুতরাং তিনি কাগজে নতুন লোকের বিজ্ঞাপন দিলেন।

মাসখানেক পরে ওকে ঘটা ক'রে 'ফেয়ারওয়েল' দিলে ইস্কুলের মেয়েরা। সকলেই সুখী চিত্রা এতদিনে ঘরবাসী হ'ল। অম্বিকাবাবু ওর মাথায় হাত দিয়ে অনেক আশীর্বাদ করলেন। বললেন, 'নরেশ ছোক্‌রার ওপর রাগ করি মিথ্যে—ও না হোক, যে কেউ এমন জিনিসটি নিয়ে যেতো। তুমি কি আর চিরকাল চাকরি করতে আমার ইস্কুলে ?'

পরের মাসের গোড়াতেই নরেশ টাকা পাঠালে পঞ্চাশটা। কিন্তু তারপর থেকেই চিঠিপত্র কমতে শুরু হ'ল। চিত্রা বার বার উদ্বিগ্ন হয়ে চিঠি লেখে—একটা জবাব আসে হয়ত দশদিন পরে, তাও খুব সংক্ষিপ্ত। তার পরের মাসে আর টাকা এল না, চিঠি আসাও বন্ধ হয়ে গেল।

চিত্রার বুক শুকিয়ে গেল। এধারে হাতে যা টাকা ছিল তাও সব খরচ হয়ে গেল পূজোতে। পূজোর মধ্যে একবার আসা উচিত ছিল নরেশের—কিন্তু তার কোন পাত্তাই নেই। এধারে ওর দেহ ভারী হয়ে আসছে—একটা কিছু স্থির করা দরকার। এখানেই যদি ছেলেপুলে হয় তো হাসপাতালে যেতে হবে। তারই বা কি ব্যবস্থা।

পূজোটায় না আসাতে তত চিন্তিত হয় নি, কারণ বাপ-মা'রও তো একটা দাবী আছে। কিন্তু তারপরও কি একদিন আসতে পারল না ?

নানারকম আশঙ্কা হ'তে লাগল এবার। পৃথিবীটা যেন অন্ধকার বোধ হ'তে লাগল। নিজের আচরণেরও নির্বুদ্ধিতাটা নিজের কাছেই ধরা পড়ল একটু একটু ক'রে। নরেশকে বিশ্বাস ক'রে ওখানে ছেড়ে দেওয়াটাই ওর ভুল হয়েছে হয়ত।

সে নতুন বৌও হয়ত পূজোয় দেশে এসেছিল। সে কেমন দেখতে কে জানে। হয়ত—নবীনা কিশোরীর রূপ নতুন রঙ লাগিয়েছে চোখে। হয়ত—। নানা কুটিল সংশয়ে ক্ষত-বিক্ষত হতে থাকে চিত্রা।

শেষে মরীয়া হয়ে সে টেলিগ্রাম করল। টেলিগ্রাম ফিরে এল। হাসপাতালের কর্তৃপক্ষের কাছে টেলিগ্রাম করল—প্রিপেড—জবাব এল সে লোক চাকরি ছেড়ে

চলে গেছে।

সত্যি সত্যিই চোখে অন্ধকার দেখল চিত্রা।

কার কাছে যাবে ; কাকে বলবে এসব কথা ?

বাড়িওয়ালারা তো এখন থেকেই মুখ টিপে টিপে হাসছেন। হাতে পয়সা নেই, চাকরি নেই—দেহেও সামর্থ্য নেই চাকরি করার মতো।

এখন কি করবে ও ? কী করা উচিত কে বলে দেবে ? এখনও যে ভাল ক'রে বিশ্বাসই হয় না কথাটা। সত্যিই নরেশ ওকে ত্যাগ করবে !···

অনেক ভেবেচিন্তে শান্তিদির কাছেই গেল। সব কথা বলতে হ'ল তাঁকে। তিনি হাসলেন না, এমন কি শুনতে শুনতে একটু বিদ্রূপের আভাস ওষ্ঠপ্রান্তে ফুটে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই মিলিয়ে গেল। তিনি গম্ভীর হয়েই বললেন, 'এ ধরনের বিবাহের এই রকমই ফলাফল হয় চিত্রা। এ আমি আগেই জানতুম। কিন্তু নরেশ যখন আবার বিবাহ করলে তখনই আমাকে জানাও নি কেন ? তখন তাকে অনায়াসে ক্ষমা করলে ?·· তখন একটা গোলমাল করলে, নালিশ করবার ভয় দেখালে ওর বাবা সুদ্ধ একটা বন্দোবস্ত করতে বাধ্য হতেন। এতদিন বিবাহটা গোপন রাখাও অন্যায় হয়েছে।'

তারপর একটু থেমে বললেন, 'তুমি যাই বলো না কেন চিত্রা, নরেশকেও আমার খুব নির্দোষ বলে মনে হচ্ছে না। তার মতলব গোড়া থেকেই ভাল ছিল না। ও শুধু তোমাকে নিয়ে খেলা করেছে—'

চিত্রার চোখে জল এসে গিয়েছিল। তবু সে কতটা দুঃখে আর কতটা নরেশের সম্পর্কে এই অপমানকর ইঙ্গিতে তা বলা আজও কঠিন। প্রাণপণে উদ্গত অশ্রু দমন ক'রে মাটির দিকে চেয়ে বললে, 'আমাকে এখন কি করতে বলেন ?'

'কী বলব তাই তো ভাবছি। নরেশ যদি তোমার সঙ্গে ঘর না করে তো জোর ক'রে করাতে পারো না। দ্বিতীয়বার বিয়ে করার জন্য ক্রিমিন্যাল কেস করতে পারো বড় জোর। তাতেই বা কি লাভ ? আর পারো খোরপোশ আদায় করতে। কিন্তু আমি বলি কি একবার তুমি সেখানে যাও, নিজেকে এসার্ট করার চেষ্টা করো। ভয় দেখাও নালিশ করবার—'

'আমি যাবো ? কোথায় যাবো ?' যেন চম্‌কে ওঠে চিত্রা।

'তোমার শ্বশুরবাড়ির দেশে।'

'সেখানে ? একা ?'

'দোষ কি ? নইলে কে-ই বা যাবে তোমার সঙ্গে ?'

'কিন্তু ··তাঁরা মানে, তিনি··· যদি এখন বলেন···আমার পরিচয়ের দোহাই দেন ? যদি বলেন যে আমি তাঁর কাছে আগে গোপন করেছিলুম —'

রেজেষ্ট্রি করা বিয়ে—অত সহজ নয় চিতু। ও বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থাকো।'

॥ ১৪ ॥

বাড়িতে এসে অনেক ভাবল চিত্রা। একটা কিছু না করলেই নয়—আর এখনই। এরপর হয়ত তার পক্ষে চলাফেরা করাও অসম্ভব হবে।

খাগড়া ঘাট স্টেশনে নেমে বাসে করে খানিকটা গিয়ে গোরুর গাড়ি ক'রে ওদের দেশে যেতে হয়—নরেশের মুখে বহুবার শুনেছে চিত্রা। ওরা ওখানকার সম্পন্ন গৃহস্থ —বাড়ি খুঁজে পেতেও কষ্ট হবে না। কিন্তু তাছাড়াও যে অনেক প্রশ্ন—অজানা অচেনা জায়গায় স্বামী-পরিত্যক্তা-রূপে এমন করে নিজেকে উপস্থিত করতে একটা দুর্নিবার লজ্জা অনুভব করে সে।

অথচ উপায়ই বা কি। সত্যিই আজ ওর কোথাও দাঁড়াবার স্থান নেই। বিবাহ করেছিল ও স্ব-ইচ্ছায়। কারুর পরামর্শ না নিয়েই—এখন সে বিবাহ যদি ব্যর্থ হয় কোন্ মুখে আবার সে লোকের অনুগ্রহ ভিক্ষা করতে যাবে :—

অথচ টাকা পয়সা তো হাতে নেই বললেই হয়। বাড়িওয়ালা এতদিন কিছু বলেন নি কিন্তু চিরকাল কি আর চুপ করে থাকবেন ? তিন মাসের ভাড়া তো তিনি দাবী করতে পারেন যে-কোন দিন।

অবশেষে হেমন্তের এক অপরাহ্ণ বেলায় তাকে সত্যি-সত্যিই একদিন নিজের শ্বশুরবাড়ি গিয়ে নামতে হল। অদৃষ্টের বিড়ম্বনা। বধূ এল প্রথম শ্বশুরবাড়ি, শাঁখ বাজল না, উলুধ্বনি পড়ল না। কেউ বরণ করে নিতেও এগিয়ে এল না। শুধু ভিড় ক'রে এসে দাঁড়াল একপাল উলঙ্গ কৌতূহলী ছেলেমেয়ের দল।

গাড়ির সাড়া পেয়ে ভেতর থেকে যিনি বেরিয়ে এলেন চিত্রা অনুমানে চিনল ইনিই তার শ্বশুর। নরেশের মুখে বহুবার বর্ণনা শুনেছে সে।

'কে গা ? অ গাড়োয়ান, কোথা থেকে আসছ ?'

চিত্রা এগিয়ে গিয়ে প্রণাম করল।

'কে, কে আপনি ?' বিস্মিত মহেশবাবু দু পা পিছিয়ে গেলেন। কপালে কুটিল সন্দেহের ভ্রূকুটি ঘনিয়ে উঠেছে তাঁর।

'আমি আপনার পুত্রবধূ।'

'কে ? আমার কে ?' তীক্ষ্ণকণ্ঠে প্রশ্ন করেন ভদ্রলোক, 'ও, সেই ডাইনী মাগী, খোকার ঘাড়ে চেপেছিলেন যিনি ! তা এখানে কি মনে ক'রে বাছা ?'

চিত্রা নীরবে নতমুখে দাঁড়িয়ে ঘামতে লাগল। চারদিকে ভিড় জমছে।

'এখানে কিছু হবে-টবে না। সরে পড়ো এই বেলা।...এই গাড়োয়ান, ফিরিয়ে নিয়ে যা, যেখান থেকে এনেছিস—'

মরীয়া হয়ে চিত্রা বলে ওঠে, 'দেখুন, আমার সঙ্গে ওঁর রেজেষ্ট্রি ক'রে বিয়ে হয়েছে আগে, বিশ্বাস না হয় সার্টিফিকেট দেখতে পারেন। আমার সঙ্গেই আছে। আমি এখানে আমার নিজের অধিকারে এসেছি।'

'উ—বিয়ে হয়েছে রেজেস্টারী ক'রে!' ভেংচি কেটে ওঠেন মহেশবাবু, 'ওসব বুজরুকি আমার কাছে খাটবে না! যেখানে খাটাতে হয় খাটাও গে। আর অধিকার ? অধিকারটা কি বাপু ? যতদিন আমি আছি আমার সম্পত্তি-সে বেটার কানাকড়িও নেই। পারো তাকে জেলে দাও, তার কাছ থেকে আদায় করো গে—'

তারপরই ধমক দেন প্রচণ্ড—'এই গাড়োয়ান, কথা শুনছিস না ? মার না খেলে নড়বি না বুঝি ? ত্যাখো বাপু, আমার বাড়ি, আমার গ্রাম—ভাল চাও তো সরে পড়ো। নইলে অপমানের সীমে থাকবে না·· পুত্রবধূ! বেউশ্যে মাগী বলে পুত্রবধূ! ছেলেপুলে বয়সকালে অমন কত কি ক'রে থাকে, তা বলে সবাই কি স্ত্রী হয়ে বসবে নাকি ! খসে পড়ো, খসে পড়ো।'

অশ্রুতে অন্ধ হয়ে যায় চোখ, হাতড়ে হাতড়ে গাড়িতে চাপে চিত্রা।

গাড়োয়ানটা গজগজ করে, 'কেমন ধারা মেয়েমানুষ বাছা তুমি, ওরা মানে না তুমি ওদের বাড়ি এসে জুলুম করো ! মিছিমিছি আমার অবমান !

আবার বাস-এ চেপে খাগড়াঘাট স্টেশন। এখন ট্রেন নেই, ট্রেন সেই অনেক রাত্রে। আর দাঁড়াতে পারে না সে—পা দুটো যেন ভেঙে আসে। পেটে ব্যথা ধরেছে একটা, কিসের ব্যথা কে জানে ! প্ল্যাটফর্মের কাঁকরের ওপরেই নিজের স্যুটকেশটায় ঠেস দিয়ে বসে পড়ে সে। দু-চারজন লোক যারা সব সময়ে স্টেশনে ঘোরাফেরা করে, তারা তাকে ঐভাবে অন্ধকারে বসে থাকতে দেখে অবাক হয়ে চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

কিছুই হ'ল না। খবরটা পর্যন্ত জানা হ'ল না সে কোথায় আছে, কী করছে। ওখানে ছিল না নিশ্চয়, তাহলে গলার আওয়াজ পেয়েও কি বেরিয়ে আসত না

একবার? কে জানে! সেটুকু ভদ্রতাও তার আছে কি না।···

কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ ওঠে আটটা নাগাদ। একটি দুটি ক'রে লোক এসে জমে স্টেশনে —তারাও এই ট্রেনে যাবে। চেয়ে চেয়ে ছাখে তারাও।

হঠাৎ চিত্রার মনে হ'ল, আচ্ছা সেখানেই নেই তো? সেই কর্মস্থলে? টেলি-গ্রামের ব্যাপারটা সবটাই হয়ত মিথ্যে—সবটা সাজানো। জবাব হয়ত নরেশ নিজেই লিখে দিয়েছিল।

একবার যাবে সেখানে? অন্তত তার খবরটাও পাওয়া যেতে পারে।

কলকাতা ফিরেও তো কোন পথ আর খোলা নেই। গঙ্গার ঠাণ্ডা জল ছাড়া আর কোন আশ্রয় তার নেই কোথাও। শেষ একবার দেখে যেতে বাধা কি?

অস্নাত অভুক্ত চিত্রা শেষ রাত্রে ট্রেন বদল ক'রে বোলপুর স্টেশনে নেমে আবার গাড়িতে চাপল। ওর চেহারা হয়ে উঠেছে পাগলের মতো। ক্ষুধাতৃষ্ণার কথা মনেও নেই অবশ্য। চলছে ফিরছে অভিভূতের মতো, আচ্ছন্নের মতো। গাড়োয়ানও ওর বেশ-ভূষার দিকে সন্দিগ্ধদৃষ্টিতে চেয়ে আগে গাড়িতে তুলতে অস্বীকার করেছিল, হাতে টাকা গুঁজে দিতে তবে সে গরু আনল।

যেতে যেতে তার কাছেই খবর পাওয়া গেল, যে ছোকরা ডাক্তার এসেছিল হাস-পাতালে সে-ই আছে এখনও। না, বাসা করেছে কি না তা সে বলতে পারলে না।

তবে কি ফিরে যাবে চিত্রা? আর লাভ কি এতটা পথ গিয়ে? শান্তিদির অনুমানই ঠিক—এটা তো বোঝাই গেল।

না। শেষ না দেখে যাবে না। এ নাটকের যবনিকা পড়া চাই আজই।

বেলা তিনটে নাগাদ হাসপাতালের দরজায় গিয়ে গাড়ি থামল। চাকরকে প্রশ্ন করতে সে জানাল ডাক্তারবাবু তাঁর বাসায় আছেন এখন। সঙ্গে গিয়ে সে বাসা দেখিয়েও দিল। মাটির দেওয়াল, খড়ের চালা নতুন বাড়ি—হাসপাতাল থেকে সামান্য দূরেই। নতুন হয়েছে দেখলেই বোঝা যায়। এই তাহলে কোয়ার্টার! একদা যেখানে গৃহস্থালী পাতবার স্বপ্ন দেখেছিল চিত্রা। কল্পনায় যার গৃহসজ্জা পর্যন্ত ঠিক ক'রে রেখেছিল।

পা যেন চলে না, অপমানে লজ্জায় মাথা নুয়ে আসে। তবু চলতে হয়।

জানলায় পর্দা। ওকি, কে যেন ওদের পায়ের শব্দ পেয়ে চকিতে উঁকি মেরে গেল না!

নরেশ!

চিত্রার বুকের স্পন্দন থেমে আসে। সে দু হাতে বুকটা চেপে ধরে দাঁড়ায় একটু।

কিন্তু বারান্দায় ওর পায়ের শব্দ পেয়ে দোর খুলে যে বেরিয়ে আসে সে পুরুষ নয়, স্ত্রীলোক। আঠারো-উনিশ বছরের একটি বিবাহিতা মেয়ে। রংটা ফরসা—ওরই মধ্যে লক্ষ্য করে চিত্রা—তবে তা ছাড়া রূপ-গৌরব কিছুই নেই।

'কে? কী চাই আপনার?'

'আমি ডাক্তারবাবুর সঙ্গে একটু দেখা করব। কলকাতা থেকে আসছি।'

'ডাক্তারবাবুর সঙ্গে এখন দেখা হবে না। তিনি—তিনি এখানে নেই। আমি তাঁর স্ত্রী, যা বলতে হয় আমার কাছে বলুন।'

কণ্ঠস্বরে অসহ্য একটা স্পর্ধা! অপরিসীম ঔদ্ধত্য।

অকস্মাৎ একটা তীব্র বিদ্বেষে যেন জ্বলে ওঠে চিত্রা। স্থানকালপাত্র সব ভুলে সে বলে ওঠে, 'আমিই তাঁর স্ত্রী। আপনি নন। আপনার বিবাহ আইনত অসিদ্ধ।'

'ও!' কটু-মিষ্টকণ্ঠে বলে ওঠে মেয়েটি, 'কলকাতার সেই ধাড়ী! আস্পদ্দা! বামন হয়ে চাঁদে হাত!

তারপর হাত-পা নেড়ে মুখ ঘুরিয়ে বলে, 'যাও, যাও, এখানে ওসব চালাকি করতে এসো না। চাকর দিয়ে অপমান ক'রে তাড়িয়ে দেব। জোর থাকে আদালতে গিয়ে দাঁড়াও গে। এখানে এসেছ কেন? জানি জানি সব—জানতে আর বাকি নেই। বেহায়া কমনেকার। ঐ কালামুখ নিয়ে আবার এখানে এসে দাঁড়াতে লজ্জা করল না! যাও, বেরোও বলছি!'

সহসা কেঁদে ফেলে চিত্রা বলে, 'কিন্তু আপনিও মেয়েছেলে—মেয়েছেলের এত বড় সর্বনাশ—'

'ইল্‌লো! সব্বনাশ! তোমাদের আবার সব্বনাশ কি বাছা? এক দোর যাবে শতেক দোর খোলা!'

এখানেও ভিড় জমতে থাকে। চিত্রা আর দাঁড়ায় না, তার প্রাণদণ্ড তো পেয়েছে সে আগেই, ঐ পর্দার-আড়ালে-অপস্রিয়মান এক নরদেহের গতির আভাসে। আর কেন! মিছিমিছি এত লোকের সামনে বার বার অপমানিত হওয়া। সত্যই এ তার ধৃষ্টতা।

টলতে টলতে কোনমতে আবার গাড়িতে এসে বসে সে।

'কোথায় যাবে মা এখন?'

'কোথায় যাবে?' হাসে চিত্রা, তারপর অশ্রুবিকৃতকণ্ঠে চুপিচুপিই প্রায় বলে, 'বোলপুরেই পৌঁছে দাও বাবা আপাতত। তারপর আর জানি না—'

বহুদূর চলে আসবার পর একটি লোক সাইকেল ক'রে পিছন থেকে এসে পৌছল।

'দেখুন, শুনছেন ?'

চমকে ওঠে চিত্রা।

'কী ? আমাকে বলছেন ?'

'হ্যাঁ, চিঠি আছে একটা।'

'আমার চিঠি ? কে দিলে ?'

'ডাক্তারবাবু।'

আবারও বুকের স্পন্দন থেমে আসে। চিঠিখানা হাতে নিয়েও খুলতে সাহস হয় না। চোখ বুজে ছইতে ঠেস দিয়ে বসে থাকে।

সাইকেল আরোহী ততক্ষণে ফিরে গেছে। গাড়োয়ান বললে, 'গাড়ি কি তা'হলে ঘোরাতে হবে মা ?'

'না বাবা। তুমি চলো যেমন যাচ্ছিলে—'

অবশেষে চিঠিটা খোলে। চিঠির মধ্যে পাঁচখানা দশ টাকার নোট। আর একছত্র লেখা—'আমাকে মাপ করো।' সম্ভাষণ নেই, স্বাক্ষর নেই। আইন বাঁচাবার জন্য সমস্ত সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে।

চোখের জল আর পড়ে না। দীর্ঘনিঃশ্বাসও না। কেমন একটা হাসিই ফোটে বরং।

কুঁচি কুঁচি করে ছিঁড়তে থাকে চিত্রা চিঠি আর নোটগুলো। ছিঁড়ে বাতাসে ছড়াতে থাকে।...

একটানা শব্দ করে গোগাড়ি চলে মন্থর গতিতে।

ক্রমে বীরভূমের দিগন্তজোড়া মাঠে অন্ধকার ঘনিয়ে আসে।

তবু প্রাণপণে সেই মাঠের দিকেই একদৃষ্টে চেয়ে বসে থাকে। অবশেষে যখন আর কোন কিছুই নজরে পড়ে না—ঘন জমাট অন্ধকার সর্বপ্রকার দিক্-চিহ্নকে লেপে মুছে দেয় দৃষ্টির সামনে থেকে, তখন অকস্মাৎ দু চোখ জ্বালা ক'রে জল ভরে এসে কিছুকালের জন্য অন্ধ ক'রে দেয় চিত্রাকে।

॥ ১৫ ॥

হয়ত আত্মহত্যা করাই উচিত ছিল তার—নিজের মনে মনে সে-কথা চিত্রাও স্বীকার করে বার বার—তবু পারল না সে কিছুতেই। হাওড়া স্টেশন থেকে বেরিয়ে এসে

ইক্ষণ গঙ্গার ধারে চুপ করে বসে রইল। মনকে বোঝাতে লাগল যে তার বাঁচার আর কোন প্রয়োজনও নেই সার্থকতাও নেই। বাঁচবার উপায়ও নেই। মরতে তাকে হবেই। তখন মিছিমিছি কী দরকার এই অপমানের কালি মুখে মেখে সেই সরব বা নীরব বিদ্রূপের সামনে গিয়ে দাঁড়াবার? এই তো সামনেই সকল-শান্তিদায়িনী গঙ্গার শান্ত শীতল জল—শুধু নেমে যাওয়ার অপেক্ষা। এই ভাবে, এখনই - সবসুদ্ধ—যেমন একদিন সে গিয়েছিল। এইটেই তার নিয়তি—সেই জন্যই বোধ হয় অদৃশ্য অমোঘ আকর্ষণে মা জাহ্নবী তাকে টানেন!

মা জাহ্নবী।

মা'র কথা মনে পড়ে যায় চিত্রার। কত আদরের মেয়ে তোমার—আজ কী দুর্দশা হয়েছে তার একবার দেখে যাও! মা, মাগো! আকুলি বিকুলি ক'রে ওঠে ওর সমস্ত অন্তরটা।

বোধহয় মা জানতেন এসব। ওর পরিণাম তিনি দেখেছিলেন আগেই, তাই চেয়েছিলেন তাকে সন্ন্যাসিনী করতে। সংসারকে তিনি চিনেছিলেন ভালো ক'রেই, জানতেন যে সংসারের কিছুই দেবার নেই চিত্রাকে—তাই চেষ্টা করেছিলেন সংসার থেকে ওর মন ফিরিয়ে নিয়ে ভগবানকে দেওয়াতে। সেইখানে আশ্রয় নিতে, যেখানে সংসারের আঘাত এবং অবমাননা পৌঁছতে পারবে না কোনদিন।

কিন্তু চিত্রা সে কথা শোনে নি। ফলে আজ আর তার বোধ করি কোন দোরই কোথাও খোলা নেই—এক এই মৃত্যুর দ্বার ছাড়া। মা জাহ্নবীই তার একমাত্র অবলম্বন—কী ইহলোকে কী পরলোকে। মা'র কোল আর তার নেই—সকল-বিপদ-থেকে-আড়াল-করা আশ্রয় নিয়ে—সে কোল, সে আশ্রয় পেতে হ'লে পর-লোকেই যেতে হবে।

কী দরকার আর এই লাঞ্ছনা, এই দুঃখ—বেঁচে থাকার এই বিড়ম্বনাকে বিলম্বিত ক'রে? লাভ কি? মৃত্যুই ভাল, মৃত্যুই তার কাম্য।...

পেটের মধ্যে সন্তানটা সবলে একদিক থেকে আর একদিকে চলে যেতে চেষ্টা করে, ঠেলে ওঠে ডান দিকটা—বেদনায় বিবর্ণ হয়ে যায় ওর মুখ। যন্ত্রণা অথচ সুখ, যন্ত্রণার এত সুখ তা কে জানত!

সন্তান!

তার পেটে যে সন্তান আছে! তাকেও নষ্ট করবার কী অধিকার আছে ওর?

মানুষ নিজের মর্জিমতো, প্রয়োজনমতো বাইরের আবহাওয়ার ব্যাখ্যা করে। আশা করে সে নিজের তাগিদে। গঙ্গার কল্লোল গান ওর মনের মধ্যে সহসা কী যেন

আশার সুরে গুন্‌গুনিয়ে ওঠে। কল্পনা আবারও চিত্রার পাণ্ডুর কপোলে সুখের রক্তাভা মাখিয়ে দিয়ে যায়। জীবনের অঙ্কুর মাথা তোলে হতাশার শ্মশান থেকে। হিরোশিমার আণবিক বোমায় ঝলসে যাওয়া মহীরুহের কাণ্ডে দুটি সবুজ পাতা মাথা তোলে!

একথা ও একবারও ভাবল না যে সে সন্তানকে বাঁচানোও ওর পক্ষে অসম্ভব। কী পরিহাস! জীবনে কোন্ অবলম্বন দিতে পারবে সে তাকে, শিক্ষাদীক্ষায় মানুষ ক'রে তুলতে পারবে কি না—সে সংশয়ও ওর মনে জাগল না, শুধু বার বার যে দুর্ঘটনা এইমাত্র ঘটতে পারত সেই সম্ভাবনাটা স্মরণ ক'রে শিউরে উঠল সে।

বালাই, ষাট!

না, তা সে পারবে না। কিছুতেই না।

ক্লান্ত, উপবাস-খিন্ন বহুরাত্রি-জাগরণ-ক্লিষ্ট শিথিল দেহটাকে অবশেষে একসময় যেন টেনে নিয়ে উঠে দাঁড়ায়। বাস-এ আর যেতে পারবে না সে।

এখনও কিছু টাকা-দেড়েক আছে ওর কাছে। একটা রিক্সাই ডেকে নেয়।

ওর ফিরে আসার সংবাদ পেয়ে অম্বিকাবাবু গম্ভীর মুখে এসে চৌকিটার ওপর বসেন। পূর্বের স্নেহের লেশ মাত্র নেই কণ্ঠে, শুধু প্রশ্ন করেন, 'তার পর? নিলে না বুঝি তোমাকে?'

গলা শুকিয়ে যায় উত্তর দিতে। প্রশ্নটার জ্বালায় দুই কান জ্বলতে থাকে। তবু মিথ্যা সে বলতে পারে না কিছুতেই, 'না।'

'হুঁ'

অম্বিকাবাবুর দৃষ্টি রুক্ষতর হয়ে ওঠে, কণ্ঠে ফুটে ওঠে নিদারুণ বিদ্রূপ, 'এ সবই আমরা জানতুম বাছা। দুদিন খেলা ক'রে চলে যায়, ওরা হ'ল প্রজাপতি। বলি তুমিও তো এমন কিছু ছেলেমানুষ নও যে এসব কথা জানতে না! অবিশ্যি হ্যাঁ— ফাঁদে ফেলতে গেলে অনেক সময় নিজের পা-ই ফাঁদে জড়ায়। জুয়া খেলার ব্যাপার বৈ তো নয়।...তা এখন কি করবে?'

'কী করব বলুন?' অপমানিত মাথা তুলতে পারে না চিত্রা, অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে কথা ক'টা কোনমতে বলে।

'আমি? আমি কি বলব বাছা? ইস্কুলে নতুন হেড্‌মিস্ট্রেস নিয়েছি—তাঁর তো কোন দোষ নেই যে তাকে তাড়াব।...তুমি তো এখন মাস-কতক কাজও করতে পারবে না। তাছাড়া তোমার বড় দুর্নাম হয়ে গেছে পাড়ায়, আর আমি রাখতে পারবও না।'

দুজনেই চুপ ক'রে থাকেন।

একটু পরে গলা-খাঁকারি দিয়ে অম্বিকাবাবু বললেন, 'রেজিস্টি করা বিয়ে, নালিশ-মকদ্দমা অবিশ্যি করা যায়। তবে সে কোমরের জোর বুঝে। প্রথমত অনেক টাকা-পয়সা লাগবে। সে জোর থাকে তো চেষ্টা ক'রে দেখতে পাবো।'

আরও একটু চুপ ক'রে থেকে তিনি উঠে দাঁড়ালেন, অত্যন্ত বিরস কণ্ঠে বললেন, 'তোমাকে দুঃসময়ে বিপন্ন করতে চাই নে। বাড়ি ভাড়া যা বাকী পড়েছে আমি নেব না—তুমি কিন্তু এ ঘর আমার ছেড়ে দেবার চেষ্টা করো। নতুন হেড মিস্ট্রেস রোজই তাগাদা দিচ্ছেন—'

অম্বিকাবাবু উঠে গেলেন। চিত্রার চোখে জলের বন্যা নামল।

ওর কাছে যা আছে সব বিক্রী করলেও দুটো মাস বড় জোর। তারপর কোথায় যাবে, কি করবে?

এ বাড়ি ছেড়ে দিতে হবে। অম্বিকাবাবুর কণ্ঠে এমন কোন প্রশ্রয় কোথাও নেই যে সামান্য মাত্র আশাও রাখতে পারে। কোথায় দাঁড়াবে? সত্যি সত্যিই কি—?

মকদ্দমা!

মামলা করলে হয়ত টাকার দাবী করা যায়, হয়ত জেল খাটানোও যায়। হয়ত নরেশের মনে অন্য জোর আছে, হয়ত সে ভেবেছে যে চিত্রার জন্মপরিচয় দিয়ে ত্যাগ করবার কৈফিয়ত দিতে পারবে আদালতে। কিন্তু যতদূর জানে চিত্রা—'আগে জানতুম না' বলে বিবাহ-বিচ্ছেদের দরখাস্ত করা যায় কিন্তু তার আগে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করা যায় না। সুতরাং খুব সহজে অব্যাহতি পাবে না নরেশ। নরেশকে সরল বিশ্বাসে যে সব-থেকে-গোপন কথাটা খুলে বলে ফেলেছিল সে—পরিপূর্ণ প্রেমের একান্ত নির্ভরতায়—হয়ত নরেশ সে কথা তার বাবার কাছে বলেছে। হয়ত হাসাহাসি করেছে ওর স্পর্ধা নিয়ে, হয়ত বলেছে সে তার স্ত্রী—তার দ্বিতীয়পক্ষের স্ত্রীর কাছেও—তাই ওদের কণ্ঠে এত বিদ্রূপ, এত ঔদ্ধত্য। এ ঔদ্ধত্য ওদের সে ভেঙে দিতে পারে এক কথাতেই। আর তাই দেওয়াই উচিত।

ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে ওঠে চিত্রা। কল্পনায় দেখে যে নরেশের বাবা আর বধূ হাঁটু গেড়ে বসে দয়া ভিক্ষা করছে ওর কাছে। যে-দয়া ভিক্ষা করবার চেষ্টা করছিল সে সেই বধূটির কাছে—

ছি, ছি,! সেই অসহায় মুহূর্তের কথাটা মনে হলে লজ্জায় ধিক্কারে, আত্মগ্লানিতে যেন নিজের গালে চড় মারতে ইচ্ছা হয় নিজেরই। ভাগিস সে আরও মিনতি করতে যায় নি!

না, মোকদ্দমা করবে সে যেমন ক'রে হোক। ভিক্ষে ক'রেও যদি খরচ জোটাতে

হয় তো জোটাবে। তারপর না হয়—যখন ওরা এসে দয়া প্রার্থনা করবে চিত্রার কাছে, তখন যা করা ওরা করে নি সেই দয়াই ওদের ওপর সে করবে। নরেশকে অব্যাহতি দেবে সে—কিছু মাসোহারার পরিবর্তে। নরেশকে আর তার দরকার নেই। এত বড় বিশ্বাসঘাতক কাপুরুষকে নিয়ে যে সুখী হয় হোক—চিত্রা হতে পারবে না। ঐ পাড়াগাঁয়ের অশিক্ষিত অভদ্র মেয়েটা নিক তাকে। তার ওপর আর চিত্রার লোভ নেই।

কিন্তু দিনের আলো যখন উত্তরদুয়ারী ঘরটাকে ম্লান অন্ধকার ক'রে উঠানের কৃষ্ণ-চূড়া গাছটায় গিয়ে আশ্রয় নেয়, সময় যখন অনেকটা অতিবাহিত হয়ে যায়—সারাদিনের ক্ষুধা-তৃষ্ণায় অবসন্ন দেহের আধারে আগুনও নিভে আসে অনেকটা। আবারও ওর শীর্ণ, বিবর্ণ গণ্ডের কোল বেয়ে জলধারা নামে। যে বিদ্বেষ, যে প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তিকে সে এতক্ষণ অবলম্বন করেছিল—তার মধ্যেও আর আশ্রয় খুঁজে পায় না সে।

টাকা ?

টাকাই যদি দরকার তো এই নিঃস্ব অবস্থায় সে এই মাত্র পাঁচখানা দশ টাকার নোট ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে এল কেন ?

এতখানি ভালবাসাকে যে অনায়াসে জীর্ণ পুরাতন পাদুকার মতো ত্যাগ ক'রে গেল—নিজের সন্তানের কথাটাও ভাবল না—তার কাছ থেকে টাকা নেবে সে হাত পেতে ?

ছি! তার আগে মৃত্যু ভাল।

মৃত্যু তো সহজ—কিন্তু, কিন্তু ওর গর্ভের সন্তান ?

তারও সন্তান এটা ঠিক। হয়ত এককালে বাপের মতোই নিষ্ঠুর, বাপের মতোই বিশ্বাসঘাতক হয়ে উঠবে। তবু ওরও সন্তান। তার প্রেমের অমৃত ফল। হয়ত বাকী সারা জীবনের একমাত্র অবলম্বন। ওর নিজের ভালবাসায় তো কোন খাদ্ ছিল না। তাছাড়া—এ সন্তান সৃষ্টির জন্য সেও তো দায়ী—তবে কোন্ অধিকারে তাকে নষ্ট করবে সে ?

কিছুই স্থির হয় না—বাইরের ছায়া নিবিড় হয়ে অন্ধকার নামে।

সে অন্ধকার কি ওর মনের আঁধারের চেয়েও বেশি ?

অবশেষে শান্তিদির কাছেই যেতে হয়। সমস্ত শুনে তিনি যেন জ্বলে ওঠেন। বলেন, 'আমি এমনিই একটা আশঙ্কা করেছিলুম চিতু, নরেশ জেনেশুনেই তোমার

সঙ্গে খেলা করেছে। ও জানত যে সাধারণ ভাবে তুমি ধরা দেবে না, তাই ও তোমার মনের মতো মানুষ হবার অভিনয় করেছিল। রাস্কেল, ব্ল্যাগার্ড।

আজও চিত্রার মুখ রাঙা হয়ে ওঠে, দুঃখে ও অপমানে। সে বলে, 'হয়ত খুব বেশী দুর্বল। ওদের চাপ বেশী ছিল—এড়াতে পারে নি।'

'হ্যাঁ, তাই দু-পাঁচটা টাকাও তোমাকে পাঠাতে পারে নি! সে লেখাপড়া জানা লোক, এটুকু রেস্‌পন্‌সিবিলিটি জ্ঞান তার কাছ থেকে আশা করব না! লুকিয়েও তো কিছু টাকা পাঠাতে পারত—বিশেষ সে যখন জানে যে তোমার গর্ভে তার সন্তান আছে!'

'কিন্তু এই পঞ্চাশ টাকা।' ক্ষীণকণ্ঠে তবু নরেশের পক্ষ সমর্থনের চেষ্টা করে চিত্রা।

'এটা সেই মুহূর্তের বিবেকদংশন। তোমার যা চেহারা হয়েছে তাতে পাষাণেরও প্রাণ গলত।...এক্সকিউজ মি চিত্রা—তুমি আর তার হয়ে ওকালতি ক'রো না।'

চিত্রা মাথা হেঁট ক'রে থাকে।

একটু পরে শান্তিদিই কথা বলেন আবার, 'তাহলে এখন কি করবে?'

'বলুন কি করব।' অসহায়ভাবে উত্তর দেয় চিত্রা।

'তোমার কিন্তু নালিশ করাই উচিত। এভাবে তাকে প্রশ্রয় দেওয়া ঠিক নয়।'

'নালিশ করলে কি ফল হবে বলতে পারেন? বড় জোর কিছু খোরাকীর টাক —নয়ত বিবাহবিচ্ছেদ,—আর একটা বিবাহের স্বাধীনতা।—'

'ওর শাস্তি হতে পারে।'

'ভেবে দেখুন শান্তিদি—তাতে আমার লাভ আছে কিছু? সে মেয়েটার জীবনের কথা ভাবুন।'

'তার কথা ভাববার তোমার দরকার কি? তোমার কথা সে ভেবেছে? তোমার অধিকারে দাঁড়িয়ে তোমাকেই অপমান করেছে!'

'তা হোক্ শান্তিদি। তার আর অপরাধ কি!'

'তবে?'

হঠাৎ ব্যাকুল হয়ে শান্তিদির পায়ের কাছে বসে পড়ে চিত্রা, 'আমাকে এই কটা মাস কোন রকমে বাঁচতে দিন—আমি আপনার টাকার ঋণটা অন্ততঃ যেমন ক'রে হোক শোধ করব।'

'ছিঃ!...ওঠ—ওঠ—বোকা মেয়ে। তার জন্যে নয়—আমার অবস্থাও যে সসে- মিরে। যাই বলিস ও পঞ্চাশটা টাকা মেজাজ দেখিয়ে ছিঁড়ে ফেলা তোর ঠিক হয়

নি। যখন এমন অস্তোভক্ষ ধনুর্গুণো অবস্থা।'

তা চিত্রাও ভেবেছে কাল সারা রাত। কিন্তু কীই বা করতে পারত সে—সেই মুহূর্তে?

ওর মনের কথারই যেন প্রতিধ্বনি ক'রে শান্তিদি বললেন, 'অথচ কীই বা করতে পারতিস, সে মুহূর্তে অন্য কোন কথা মনে আসে না, এটা ঠিক।'

তিনি উঠে পড়লেন। 'চল্, আগে তোকে কোন হাসপাতালে ভর্তি করার ব্যবস্থা করি। আর তো মোটে সময় নেই।'

॥ ১৬ ॥

ঠিক এই অবস্থায় অম্বিকাবাবুরা খুব বেশী রূঢ় হতে পারলেন না। বোধহয় শান্তিদিও গোপনে কিছু অনুরোধ করেছিলেন। এমন কি এর তিন-চার দিন পরে প্রসব বেদনা হ'তে ওঁরাই গাড়ি ক'রে পৌঁছে দিলেন হাসপাতালে।

চিত্রার একটি ছেলে হ'ল। অত ক্ষুদ্র শিশুর মুখাবয়ব ঠিক ক'রে বোঝা শক্ত—তবে রংটা চিত্রার মতোই উজ্জ্বল গৌর হয়েছে। এখন তো কাগজের মতো সাদা।

এত দুঃখ, এত দুশ্চিন্তার মধ্যেও চিত্রা কেমন এক রকমের আনন্দ আর গৌরব অনুভব করে। ছেলেকে যখন খাওয়াবার জন্য দিয়ে যায় মধ্যে মধ্যে, তখন তার মুখের দিকে চেয়ে সে সব কিছু যেন ভুলে যায়। আবার সেই ক্ষুদ্র মানবকের অতটুকু অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দিকে চেয়ে মধ্যে মধ্যে একটা হতাশাও অনুভব করে। এই ছেলে কতদিনে বড় হবে—তবে মায়ের দুঃখ লাঘব করবে! এই এতদিন ধরে পারবে কি তাকে মানুষ করতে চিত্রা? মানুষ কোনদিন হবে কিনা তাই বা কে জানে।

হাসপাতালের নিয়ম অনুসারে সাতদিনের মধ্যে 'বেড্' ছেড়ে দেবার কথা। তারপর কোথা যাবে? অন্ততঃ আরো দুটো সপ্তাহ পরিপূর্ণ বিশ্রাম চাই তার। তারও পরে? এই শিশু নিয়ে কীই বা কাজ করবে সে?

যতই ভাবে কথাগুলো, ততই যেন ওর হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে আসে। বুকের মধ্যে কেমন একটা শৈত্য অনুভব করে—মনে হয় মৃত্যু ছাড়া আর কোন উপায় নেই।

শান্তিদিও ভাবছেন খুব। ওর নিজের ঘরে (অবশ্য এখনও যদি নিজের ঘর বলা যায়) গিয়ে ওঠা চলবে না। অম্বিকাবাবুরা কোন তত্ত্বাবধানের ভার নিতেই প্রস্তুত নন। অগত্যা শান্তিদিকেই নিতে হ'ল। ছাত্রীনিবাসের মধ্যে এভাবে কোন প্রসূতিকে নিয়ে যাওয়া উচিত নয় তা চিত্রা খুবই বোঝে। সে যে সেই আরব্য

উপন্যাসে পড়া সিন্ধুবাদ নাবিকের ঘাড়েচড়া বৃদ্ধের মতোই হয়ে উঠছে ক্রমশঃ, এটা দিনরাতের প্রতিটি মুহূর্তেই অনুভব করছে সে, আর লজ্জায় ঘৃণায় তার সেই সমস্ত মুহূর্তেই মরতে ইচ্ছা করছে। মৃত্যু যদি কোন স্বাভাবিক নিয়মে আসত তো একটুও দুঃখিত হ'ত না সে, কিন্তু নিজের হাতে এই প্রথম যৌবনেই জীবনের ওপর যবনিকা টেনে দেওয়া, এটা কিছুতেই পারে না। বিশেষত এই শিশু নতুন ক'রে যেন সহস্র বন্ধনে বেঁধেছে ওকে।

শান্তিদি নিজের ঘরের মধ্যেই কোন মতে ওর একটু শয্যার ব্যবস্থা ক'রে দিলেন। শিশুপালনের কোন অভিজ্ঞতাই ওদের নেই—অপটু হস্তে তবু শান্তিদিকেই সব ব্যবস্থা ক'রে দিতে হয়। কত কি জিনিস লাগে, অর্থব্যয়ও কম হয় না। অধিকতর লজ্জিত হওয়া সম্ভব হ'লে চিত্রা হ'তে পারত সত্যি, শান্তিদি তার কে? কোন সম্পর্কই নেই। তাঁর ব্যবসা যে ভাল চলছে না, তা বহুবারই শুনেছে চিত্রা, অথচ এইভাবে তাঁরই ওপর সমস্ত দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে বসে থাকা ছাড়া ওরই বা কি উপায় আছে!

শিশুটি কিন্তু যেন বেশ নিশ্চিন্ত। সে হাত-পা ছোঁড়ে, কাঁদে হাসে। কেমন একরকম অজ্ঞাতসারেই মায়া বিস্তার করে শান্তিদির ওপর। শান্তিদি তার পরিচর্যা করতে যান আনাড়িভাবে—গোলমাল ক'রে ফেলেন- অপ্রতিভভাবে হাসেন। কিন্তু তবু সে হাসিতে স্নেহ ও আকর্ষণই প্রকাশ পায়।

হোস্টেলের কৌতূহলী দু-একটি মেয়েও সাহস ক'রে এগিয়ে আসে পর্দা ঠেলে। পাছে কোন অবাঞ্ছিত প্রশ্নের উত্তর দিতে হয় এই ভেবে আশঙ্কায় বিবর্ণ হয়ে থাকে চিত্রা, শান্তিদিও গম্ভীর হয়ে যান কিন্তু তবু তাদের ঠিক বাধা দেওয়াও যায় না। একটা সুবিধা, প্রায় সব ছাত্রীই নতুন, তারা জানে চিত্রা একরকম বোন হয় শান্তিদির।

একদিন চিত্রা বলে ফেলে, 'আচ্ছা শান্তিদি, আপনার তো এতগুলো ঝি রাঁধুনী রয়েছে আমি যদি একটার জায়গায় লেগে যাই—? আমাকে একটু স্থান দিতে পারেন না?'

বলে ফেলেই যেন মনে হয় বড় বেশী প্রগল্‌ভতা প্রকাশ পেয়ে গেল। সে নিজেই লজ্জিত হয়ে পড়ে।

শান্তিদিও তিরস্কারের সুরে বলেন, 'সে যে সম্ভব নয় তা তো তুমিও জানো। প্রথমত ঐ শ্রেণীর কাজ তুমি করতে পারবে না, আমিও করাতে পারব না। তাছাড়া তোমার খোকাকে নিয়ে তো থাকাই হবে না। ছাত্রীনিবাস নাম দিয়েছি—জানো তো এখানে ইউনিভার্সিটির কর্তৃপক্ষ হামেশা আসা-যাওয়া করেন। কত কি প্রশ্ন উঠবে, নানা রকমের জবাবদিহি—শেষে আমার অন্নই মারা যাবে। এই কদিনই তো

কাঁটা হয়ে যাচ্ছি পাছে কেউ এসে পড়েন।'

তিরস্কৃত—এ একরকমের তিরস্কারই বলা উচিত—হয়ে মাথা হেঁট ক'রে থাকে চিত্রা।

এখানে আসবার দিন-আষ্টেক পরে শান্তিদি একদিন দুপুর বেলা অফিস-ঘর থেকে উঠে এলেন মেঘের মতো মুখ ক'রে।

'আর এক দুঃসংবাদ আছে চিত্রা, প্রস্তুত হও।'

আবারও দুঃসংবাদ! চিত্রার রক্তহীন মুখ বিবর্ণ হয়ে ওঠে। সে ভরসা ক'রে প্রশ্নও করতে পারে না।

'পাছে তুমি গিয়ে আবার ঐ ঘরে ওঠো এবং শেষে না ছাড়ো—এই ভয়ে অম্বিকা-বাবুরা বেশ চমৎকার ব্যবস্থা করেছেন। তোমার মালপত্র ওঁদের ঘরে সরিয়ে রেখে নতুন হেড্‌মিস্ট্রেসকে ঘরের দখল দিয়ে দিয়েছেন। জানেন তুমি নালিশ করতে পারবে না। ট্রেস্‌পাসের ভয় দেখানো চলবে না—কারণ চাবি তুমি স্বেচ্ছায় ওঁদের কাছে দিয়েছিলে। তাছাড়া ভাড়াটে তুমি নও। ইস্কুল ছাড়বার পর ভাড়া দেবার কথা ছিল কিন্তু সে মৌখিক—এক মাসের ভাড়া যা দিয়েছ তার রসিদ নাও নি। সুতরাং জোর ওঁদেরই।'

'তা—তার মানে আমার আর কোথাও কোন বাসা রইল না।' কেঁদে ফেলে চিত্রা একান্ত হতাশায়।

'সে বাসাই বা কদিন থাকত? চিরদিন কি তোমাকে ওঁরা একটা ঘর ছেড়ে দিয়ে রাখতেন?'

শান্তিদির কথাগুলো সত্য—কিন্তু অবোধ মন বোঝে না, অনেকক্ষণ ধরে আকুল হয়ে কাঁদে চিত্রা।

'আমি কোথায় দাঁড়াবো শান্তিদি? সত্যিই কি পথে পথে ভিক্ষা করতে হবে?'

'দুই আশ্রয় তোমার আছে চিতু, আমি অনেক ভেবে দেখেছি। এক গুরুদেবের কাছে গিয়ে থাকা। কিন্তু সে তুমি বোধহয় পারবে না। আর এক আছে—তোমাকে হাসপাতালের ডাক্তাররাও বলে দিয়েছেন, শরীর অত্যন্ত খারাপ—কিছু দিন বিশ্রাম নেওয়া প্রয়োজন, গর্ভাবস্থায় শরীরের দিকে একেবারেই নজর রাখো নি—তার ফলে শরীর ভেঙে এসেছে—সুতরাং এখন তোমার বাইরে কোথাও গিয়ে থাকা ভাল। তোমার মা যে মঠে থাকতেন মনে আছে? গুরুদেব আমাকে লিখেছেন যে তোমার মা অনেক টাকা তাঁদের দিয়েছিলেন এই শর্তে যে একটা ঘর তিনি যতদিন থাকবেন ওরা তো ছেড়ে দেবেই—তাঁর মেয়েও যদি কখনও থাকতে চায় তো যতদিন

থাকবে বিনা ভাড়ায় থাকতে দেবে। এ নাকি সে মঠের মোহান্তও স্বীকার করেছেন। আমি বলি কি তুমি সেখানেই গিয়ে দিনকতক থাকো। মঠেই প্রসাদ পেতে পারো। কিংবা নিজের মতো একটু রান্না ক'রে নিতে পারো। মাসে মাসে যা পারি আমিই পাঠাবো। এখানে থাকলেও তো খরচ হ'ত সে টাকাটা, না হয় পাঠিয়েই দিলুম। তোমায় শরীরটাও ভাল হবে, বাচ্চাটারও।'

অর্থাৎ একেবারেই ভিক্ষুকের অবস্থা।

পরের আশ্রয়ে পরের গলগ্রহ হয়ে তার প্রদত্ত ভিক্ষায় জীবনধারণ করা!

অথচ উপায় বা কি?

আবারও দরদর ধারে ওর চোখের জল গড়িয়ে পড়ে।

শান্তিদি বৃথা জেনেই ওকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করেন না। মেয়েছেলে তিনিও, এ শ্রেণীর সাহায্যে জীবন-ধারণ করার অপমান তিনিও জানেন। কিন্তু তিনিই বা কি করতে পারেন?

শুধু একটু পরে বলেন, 'আর একটা খবর আছে চিত্রু। তোমাকে না জানিয়েই আমি নরেশের নামে একটা চিঠি পাঠিয়েছিলুম হাসপাতালের ঠিকানায়, তোমার সন্তান হবার খবরটা জানিয়ে। ভয় নেই—আর কিছুই লিখি নি, ভয়ও দেখাই নি, ভিক্ষাও চাই নি।'

চিত্রার বুকের কাছটায় ধড়াস্ ক'রে উঠে কিছুকালের মতো যেন নিঃশ্বাস রোধ হয়ে আসে।

'তার পর?' অতি কষ্টে প্রশ্ন করতে পারে শেষ পর্যন্ত।

'আজ আমার নামে চল্লিশটি টাকা মনিঅর্ডার এসেছে। কুপনেও একছত্র কিছু লেখা নেই—বোধ হয় ভাবছে ওতেই আইন বাঁচাচ্ছে সে – ফুল্! যাই হোক্—অনেক ভেবে সে টাকা আমি আর ফেরৎ দিতে পারলুম না। এই তো অবস্থা। অভিনয় দেখানোর সময় এটা নয়।'

এই সুরেই তিনি কথাগুলো বললেন, যাতে বোঝা যায় বাদ-প্রতিবাদের অবসর রাখতে চান না এর ভেতর। ভেবে দেখেছেন আর ভেবেই কাজ করেছেন—চিত্রা যেন আর কোনও কথা না কয়।

কীই বা বল্‌বে চিত্রা!

সেদিনকার পঞ্চাশ টাকার নোট ছিঁড়ে ফেলাটা শুধুই নির্বুদ্ধিতা। এই চল্লিশ টাকা নেবার পর সে ভাবতেই পারবে না চিত্রা আগের নোটগুলো ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছে।...অথচ টাকার অভাবে কী কষ্টই না পেয়েছে তার পর।

অপমানে নতুন ক'রে জল নামে চোখের কোল বেয়ে। কথা কইতে পারে না সে—কিন্তু তার মর্মান্তিক যন্ত্রণা শান্তিদি বোঝেন। এ যে কতখানি আঘাত—তা অপর ব্যক্তির পক্ষে যতটা অনুভব করা সম্ভব ততটাই তিনি করেন।

কাছে এসে বসে মাথায় হাত বুলিয়ে বলেন, 'কী করবি বল্ বোন। আমার যে সঙ্গতি নেই—নইলে এ অপমান আমিই কি মাথা পেতে নিতুম। অথচ তোরও তো খরচের এই সবে শুরু!'

॥ ১৭ ॥

চিত্রা একাই শিশুসন্তানকে নিয়ে পুরীতে এসে নামে। অন্য লোক সঙ্গে এলে খরচ দিতে হ'ত। গুরুদেব হয়ত সঙ্গে আসতে পারতেন কিন্তু আর তাঁকে জীবনের সঙ্গে জড়াতে চায় না চিত্রা। এই দীর্ঘ সময়ে সে মনকে স্থির করেছে, আবারও করেছে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাবান—কোনদিন কোন ব্যবহারে সে শ্রদ্ধাকে সে আর হারাতে রাজী নয়। গুরুদেব তার কম উপকার করেন নি, আজও আড়াল থেকে তাকে সাহায্য করছেন—সুতরাং ঋণই তাঁর কাছে বেশী। তাই থাক, জীবনে বহু দুঃখ পেয়েছে, অকূলেই ভাসছে সে, কিন্তু এই পরম ও চরম আশ্রয় হারাতে সে পারবে না। গুরু এবং ইষ্ট এই তো এখন তার শেষ আশ্রয়।

মঠের মোহান্ত চিত্রা আসাতে খুশী হন নি—তা বলাই বাহুল্য। জাহ্নবী কী শর্ত করেছিলেন এতকাল পরে যে সেই দাবী নিয়ে সতিাই কেউ এসে হাজির হবে তা তিনি কখনও কল্পনা করেন নি। যে ঘরে জাহ্নবী থাকতেন সে ঘরটা ভাল, হাওয়া-আলো দুই-ই ছিল তাতে, কিন্তু চিত্রা ওখানে পৌঁছে দেখল যে সে ঘরে লোক বোঝাই। মোহান্ত বিরসবদনে জানালেন সে আগে থেকেই ভাড়াটে ছিল, তাকে তো আর তাড়ানো যায় না। অবশ্য ওর বদলে অন্য ঘর তিনি ঠিক ক'রে রেখেছেন।

ভেতরের দিকে একটা প্রায় অন্ধকূপের মতো ঘর, একটিই মাত্র তার জানলা।

শুষ্ক, পাংশু মুখে একবার তাকিয়ে দেখল চিত্রা। কিন্তু প্রতিবাদ সে কী ক'রে, কার কাছে! সঙ্গে তার দ্বিতীয় লোক পর্যন্ত নেই। আর এই প্রায়-সদ্যোজাত শিশু। অগত্যা তাকে গিয়ে সেই ঘরেই উঠতে হ'ল। পরে ওর মা'র ঘরের অধিবাসাদের মুখ থেকে শুনেছিল চিত্রা—গুরুদেবের চিঠি পাবার পরই মোহান্ত ওদের ভাড়া বসিয়েছেন। ভাল ঘরে বেশী ভাড়া পাওয়া যাবে। বিনামূল্যে অমন ঘর ছেড়ে দেওয়া যায়?

এরপর শুরু হয় বৈচিত্র্যহীন একঘেয়ে জীবন।

পুরীতে এসে পৌঁছবার পর ছাব্বিশটি টাকা মাত্র সঙ্গে ছিল। খোকার জন্য অনেক বাজার ক'রে দিয়েছেন শান্তিদি—আর নগদ বিশেষ কিছু দিতে পারেন নি। নরেশের দরুন টাকাটা সঙ্গে ক'রেই বেরোতে হয়েছে।

স্বামীর টাকা।

তাই বটে। ম্লান হাসি ফুটে ওঠে আজও ওর মুখে।···

এ মাসের এখনও আঠারো দিন বাকী। শান্তিদি স্পষ্টই বলে দিয়েছেন যে, মাসকাবার না হ'লে কিছু পাঠানো সম্ভব হবে না। সুতরাং প্রতিটি পাই-পয়সা গুনে গুনে চালাতে হয়। দুধ কিনতে হয়—ওর দেহে পর্যাপ্ত দুধ নেই। নিজের জন্যে একবেলা রাঁধে কোন কোন দিন. রাত্রে প্রসাদ আনায়। কাপড় জামা শান্তিদি দু-চারটে কিনে দিয়েছেন কিন্তু এগুলো ছিঁড়লে কি হবে তা ভাবতেও পারে না। মাসকাবারেই বা কত টাকা পাঠাবেন তিনি কে জানে! তাঁর ব্যবসার অবস্থা চোখে দেখেই এসেছে চিত্রা। হোস্টেলের অর্ধেক মেয়েই নিয়মিত টাকা দেয় না, কোন কোন পাওনা একেবারেই খরচা লিখে ফেলতে হয় সেক্ষেত্রে—

উপার্জন করতে পারত চিত্রা। এখানেও হয়ত ঘুরলে দু-একটা টিউশনী জোটে। কিন্তু খোকা? খোকাকে কোলে নিয়ে গিয়ে কী কাজ করবে সে?

স্বামীর উপর দারুণ আক্রোশ অনুভব করে এক এক সময়।

অপমানই কি শুধু? শুধুই কি সীমা-পরিমাণহীন ক্ষতি? এ যে চরম শত্রুতা! এই শিশুকে গলায় বেঁধে দিলে জগদ্দল পাথরের মতো। উপার্জন করবার, স্বাধীনভাবে শান্তিতে থাকবার পথও নষ্ট ক'রে দিলে চিরকালের জন্য!

কথাটা ভাবে হয়ত অন্যমনস্কভাবেই। আবার এক সময় সচকিত হয়ে উঠে খোকাকে বুকে চেপে ধরে—বাপ্‌রে! এটুকু অবলম্বন জীবনে না থাকলে কী করত সে!

কোন কোন উন্মাদ-মুহূর্তে আবার এমনও ভাবে—কোন ভাল ফোটোগ্রাফারকে দিয়ে ছবি তুলিয়ে নরেশের ঠিকানায় পাঠিয়ে দিলে কি হয়। এ শিশুকে দেখার পরও কি ছেড়ে থাকতে ইচ্ছা করবে!

কিন্তু সে টাকাই বা কই?

আর—আর হয়ত এতদিনে সে মেয়েটাও সন্তান-সম্ভবা হয়েছে।

একটা প্রবল দীর্ঘনিঃশ্বাস পাঁজরের কোণে কোণে মাথা কুটে বেড়ায়, বেরোবার পথ খুঁজে পায় না।

পরের মাসে শান্তিদি পাঠালেন কুড়িটি টাকা। আর এল একটা রি-ডাইরেক্ট্

করা মনিঅর্ডার—দশ টাকার। হাতের লেখাটা নরেশেরই। অতি পরিচিত। কিন্তু কুপনে একটা কালির আঁচড় পর্যন্ত নেই।

শান্তিদি লিখেছেন, 'আমার বাড়িওলা ইজেক্ট্‌মেণ্টের ভয় দেখিয়েছে, পাঁচ মাসের ভাড়া পাবে। ঠাকুর চাকর যে কত মাসের মাইনে পায় নি তা হিসেব করতেও ভয় করে। এ মাসে তো কোনমতে পাঠালুম, আসছে মাসে হয়ত গুরুদেবেরই শরণাপন্ন হ'তে হবে।...সেই জন্যেই নরেশের টাকাটা ফেরত দিতে ভরসা হ'ল না।...মাত্র দশ টাকা পাঠিয়েছে সে, adding insult to injury! · কোনরকম লজ্জার বালাই নেই, অথচ শিক্ষিত বলেই বাজারে চলবে এই সব লোক।...তুমি মাথা ঠাণ্ডা ক'রে ভেবে দেখো। টাকাটা নেবে না ফেরত দেবে। চট্‌ ক'রে আবেগের বশে কিছু একটা ক'রে বসো না।...দিনকাল বড় খারাপ। ছেলেকে মানুষ করে তোলবার জন্যে যত হিউমিলিয়েশ্যনই হোক্ সহ্য করা উচিত।'...ইত্যাদি।

চট্‌ ক'রে কিছু ক'রে বসবে সে জোর আর কই চিত্রার!

কুড়ি টাকা শান্তিদি পাঠিয়েছেন। এর ভেতর পনেরো টাকা তো খোকার জন্যেই লাগবে। বাকী পাঁচ টাকায় তার কি হবে?"

মরতে ওর আপত্তি নেই। কিন্তু খোকা? খোকার জন্যেও অন্তত বাঁচতে হবে যে ওকে।

ঝাপ্‌সা চোখে যেন হাতড়ে নরেশের মনিঅর্ডারটা সই ক'রে নেয় সে। এ টাকার প্রতিটি কপর্দক ওকে আগুনের মতো জ্বালাবে—তা সে জানে। তবুও—ওর যে কোন পথ আর কোথাও খোলা নেই...

পরের মাসে মনিঅর্ডারটা সোজা ওর নামেই এল। বোঝা গেল যে শান্তিদিই ঠিকানাটা জানিয়েছেন তাকে। আর দশটি টাকা মাত্র এল শান্তিদির কাছ থেকে—তিনি কুপনে শুধু লিখেছেন, 'গুরুদেব যদি কিছু পাঠান তো নিতে ইতস্তত ক'রো না চিতু। তাঁকে যেমন অদেয় কিছু নেই, তেমনি তাঁর কাছ থেকে নিতেও কোন সঙ্কোচের কারণ নেই। তিনি তোমার ইহকাল ও পরকাল দুইয়েরই ভার নিয়েছেন। তিনিই তোমার পিতা, তিনিই তোমার ভগবান।'

অর্থাৎ শান্তিদি নিজের অক্ষমতা গুরুদেবকে লিখে জানিয়েছেন।

লজ্জায় চিত্রার কান দুটো সেই নির্জনেই জ্বলতে লাগল। শিষ্য-শিষ্যারা গুরুকে দক্ষিণা দেয় প্রাণপণসাধ্যে, তাঁর কাছ থেকে নেয় অপার্থিব বস্তু—এই-ই নিয়ম, এই-ই সে শুনে আসছে চিরকাল। আজ তার অদৃষ্টে সবটাই উল্‌টো হ'ল।

গুরুদেবের কাছ থেকে দু-তিন দিন পরেই পনেরোটি টাকা এল। সঙ্গে একখানি চিঠিও। চিত্রা যেন অকারণ সঙ্কোচ বোধ না করে—এটা সে বরং ঋণ বলেই নিক। পরবর্তী জীবনে যখন হোক শোধ করতে পারবে।

আর একটি সংবাদ দিয়েছেন তিনি। গুরুদেব রতনকেও খুঁজে বার করার চেষ্টা করেছিলেন। রতন সে বাড়ি ন্যায্যমূল্যের অর্ধেকেরও কম দামে বেচে দিয়ে সরে পড়েছে কোথায়। পাছে কোনদিন চিত্রা কোন গোলমাল করে, বোধ হয় সেই ভয়েই তার এত তাড়া।...ওর বাবার য্যাটর্নি বন্ধু চিত্রার অবস্থা শুনে কিছু সাহায্য করতে রাজী হয়েছেন—তবে সেটা কত বা কবে করবেন তা কিছু জানা যায় নি। অর্থাৎ ওদিকে যদি বা কোন ক্ষীণ আশা চিত্রার মনে জেগে থাকে তো তা যেন সে ত্যাগ করে।

আশা ?

আশা আর চিত্রার কোথাও কারও ওপর কিছু নেই। শুধু এই খোকা। কত-দিনে, কত দীর্ঘ দিনে এ বড় হবে তা কে জানে !

ততদিন কি পারবে চিত্রা এই সংগ্রাম চালিয়ে যেতে ?

আর, আর বড় হয়ে এ ছেলেও যদি বিশ্বাসঘাতকতা করে তার সঙ্গে ? কিংবা যদি মানুষ না হয় ?

এইখানে এসে জোর ক'রে চিন্তাটা থামিয়ে দেয় চিত্রা।

এর পর ভাবতে হ'লে সে পাগল হয়ে যাবে।

॥ ১৮ ॥

অবশেষে মাস কয়েক ধরে চেষ্টা ক'রে একটা উপার্জনের পথ খুঁজে বার করে সে। পাড়ায় ঘুরে ঘুরে উড়িয়া ছাত্র-ছাত্রী ছোট ছোট কতকগুলি যোগাড় করে। তারা বাড়িতে এসে বাংলা পড়বে ওর কাছে—মাসিক এক টাকা হিসেবে মাইনে। দু-চারটি বাঙালী ছেলেমেয়েও পাওয়া গেল—তাদের মাইনে কিছু বেশী। কিন্তু স্থান নিয়েই মুশকিল হ'ল—বাড়িতে না পড়ালে ওর চলে না। অথচ ওর যা ঘর, তাতে চার-পাঁচটি ছেলে-মেয়ে বসানোই অসম্ভব। মোহান্ত মঠের মধ্যে এক ইঞ্চি অতিরিক্ত স্থানও ছাড়তে রাজী নন।

শেষে পাশের একটি মন্দিরের বারান্দা ভাড়া করলে সে মাসিক তিন টাকায়। সকালে দু ঘণ্টা ও বিকালে তিন ঘণ্টা হিসেবে পড়াবার ব্যবস্থা। ছেলেকে নিয়ে

মন্দিরে যাওয়া নিষেধ—যদি কোন অপকর্ম করে। কিন্তু তারও একটা বন্দোবস্ত হ'ল—মঠেরই একটি ঝি - চিত্রার প্রতি দয়া-পরবশ হয়েই হোক অথবা শিশুটির প্রতি মমতাবশতই হোক—রাজী হয়েছে চিত্রার অনুপস্থিতিতে শিশুটির দিকে সামান্য একটু নজর রাখতে। একটা দোলনা শান্তিদিই কিনে দিয়েছিলেন আসবার সময়, তাতেই এখনও ছেলে থাকে—কিন্তু বেশীদিন আর রাখা যাবে না। অথচ ঝি যে সমস্তক্ষণ তাকে দেখবে সে সময় কোথায়? সে মঠেরই ঝি - মঠের কর্তারা চটে যাবেন। নেহাৎ খুব পুরোনো ঝি বলেই এটুকু প্রতিশ্রুতি দিতে সাহস করেছে।

পাঠশালা চলল। প্রথম মাস শেষ হ'তে পাঁচ-সাত দিন ধরে আদায় হ'ল মোট তেরটি টাকা। তিন টাকা ভাড়া ও এক টাকা ঝিকে দিয়ে থাকে ন-টি টাকা মোট। তবু সে গুরুদেবকে সব খুলে চিঠি লিখে দিলে যে আব টাকা পাঠাতে হবে না, এইতেই সে যেমন করে হোক চালিয়ে নেবে। তবে যে-মাসে এটুকুও হবে না সে-মাসে চিত্রা নিজেই চিঠি লিখে জানাবে।

অবশ্য দু-একটি ক'রে ছাত্র বাড়তেই লাগল মধ্যে মধ্যে। তেমনি ক্রমশ খরচও বাড়ল। ছেলে দামাল হয়ে উঠেছে, তাকে আর রাখা যায় না। একটি ঝিকে রাখতে হয়েছে তিন টাকা দিয়ে। তাতেও নিশ্চিন্ত থাকতে পারে না—পড়াতে পড়াতে এসে দেখে যেতে হয় ঝি ঠিক নজর রাখছে কি না।

বাইরের ভাল ঘরটি—যে ঘরে তার মা ছিলেন—সে ঘরটার জন্যে চিত্রা মোহান্তকে দু-চার টাকা ভাড়াও দিতে চেয়েছিল। সে ঘড় বড়, তাতে ঘরের মধ্যেই ইস্কুল বসাতে পারে সে—কিন্তু মোহান্ত রাজী হন নি।

কেন হন নি—ক্রমশই সেটা প্রকাশ পায়।

দু-চার জন ধনী ব্যক্তি আসেন মধ্যে মধ্যে মোহান্তর কাছে। তাঁদের নজর পড়েছে চিত্রার দিকে। আগে আগে সেটা হাবে-ভাবে প্রকাশ পেত, এখন ক্রমশঃই স্পষ্ট ও উগ্র হয়ে উঠছে তাঁদের মনোভাব।

আর সেই সঙ্গে মঠের কর্তা-শ্রেণীর লোকদের আপ্রাণ চেষ্টা চলে চিত্রার দৈনন্দিন জীবনকে যৎপরোনাস্তি বিড়ম্বিত ক'রে তোলার। এক মুহূর্তও এখানে থাকা অসম্ভব হয়ে ওঠে। অথচ কোথায়ই বা যাবে? আশেপাশে যা বাড়ি আছে তার কোন-টারই ভাড়া কম নয়। বাঙালীবাড়ির খড়ের ঘরও একখানা দশ টাকার কম পাওয়া যাবে না।

প্রাণপণে আত্মরক্ষা করে চিত্রা, আর দুর্ভাগ্যের সঙ্গে লড়াই করে।

কিন্তু ক্রমশঃই উগ্রতর হয়ে ওঠে ওদের বিষ আর বিদ্বেষ। চক্রান্তের বিষধর পুরুভুজ ওকে যেন চারিদিক থেকে পেষণ করতে থাকে—

যে ঝি ওর ছেলে দেখত, তার প্রবেশ নিষিদ্ধ হ'ল মঠে। আগেকার বুড়ী ঝি'র চাকরি গেল তুচ্ছ কারণে।

উড়িয়া ছাত্র যে ক-টি ছিল, তাদের সংখ্যা কমতে শুরু হ'ল একে একে। কারণ জিজ্ঞাসা করলে কোন সদুত্তর পাওয়া যায় না।

এর মধ্যে একটা রবিবারে ছেলেকে কোলে ক'রে সমুদ্রের ধারে বেড়াতে বেরিয়েছে ফিরে এসে দেখল ঘরের তালা ভাঙ্গা। ঘরে যা দু-একখানা ভাল কাপড় ওর ছিল আর দু-একটা টাকা এবং স্যুটকেস—উধাও!

সারারাত উপোস ক'রে পড়ে পড়ে কাঁদল সে। চেঁচিয়েই কাঁদল - ছেলে-মানুষের মতো। সম্ভাব্য শ্রোতাদের মধ্যে সে কান্নার কোন মূল্য নেই জেনেও। না কেঁদে পারল না বলেই।…

পরের দিন আবার লাজ-লজ্জার মাথা খেয়ে গুরুদেবকেই চিঠি লিখতে হ'ল।

তিনি গোটা-কুড়ি টাকা পাঠিয়ে লিখলেন যে, তাঁর শরীর খারাপ কোমরের ব্যথায় শয্যাগত, নইলে নিজে গিয়ে যা হয় একটা ব্যবস্থা করতেন। কিন্তু চিত্রা যেন পত্রপাঠ কোন বাঙ্গালী ভদ্রলোকের বাড়ি উঠে যায়। সবচেয়ে ভাল হয় যদি সে আশ্রমেই চলে আসে। যদিও তিনি অসুস্থ - তবু এইটাই ওর নিরাপদ আশ্রয়।

এত বিপদেও আশ্রমে ফিরে যেতে ঠিক মন চাইল না। গুরুদেবের সান্নিধ্যে সে আর যাবে না—তা তার অদৃষ্টে যাই থাক। অন্ততঃ একেবারে রাস্তায় বসবার আগে যাবে না।

একবার একথাও মনে হয়েছিল যে নরেশকে খুলে লিখবে ওর এই বিপদের কথা -- কিন্তু পরক্ষণেই মনে হ'ল—ছিঃ!

তার চেয়ে ছেলেকে বুকে নিয়েই সমুদ্রের জলে গিয়ে নামবে।…

ঘর একখানা কাছাকাছিই পাওয়া গেল। সমুদ্রের ধারে নয়, কিন্তু পাড়ার মধ্যে। খড়ের ছাউনি, পাকা ঘর—মাসিক ছ'টাকা ভাড়া। বাড়িওয়ালা বৃদ্ধ ভদ্রলোক; অর্থাৎ নিরাপদ আশ্রয়।

কিন্তু যেদিন উঠে যাবে, সেদিন শুনলে যে তাকে রাখা সম্ভব নয়। তার নাকি স্বভাবচরিত্র খারাপ। তাছাড়া চুরি করা অভ্যাস আছে—এই সব। ওঁরা বিশ্বস্তসূত্রেই খবরটা শুনেছেন। ইত্যাদি—

দীর্ঘনিঃশ্বাসও আর ফেলে না চিত্রা। বুকে যেন নিঃশ্বাসও ফুরিয়ে গেছে।

শুধু আবারও শান্তভাবে ঘর খুঁজে বেড়ায়।

এধারে উড়িয়া ছাত্র-ছাত্রী সকলেই আসা বন্ধ করেছে। বাঙালী ছাত্রদের সংখ্যাও মোট পাঁচটি। তাতে আয় হয় সাত টাকা—তার মধ্যে থেকে ঘরের ভাড়া বেরিয়ে যায় অর্ধেক। পাঁচটি ছেলেকে বসাবার স্থান হয়ত ওর ঘরেও হয় কিন্তু ভরসায় কুলোয় না। মঠের লোকদের ওপর আর এতটুকু আস্থা নেই। এমন কোন দুর্ব্যবহার হয়ত ক'রে বসবে, যার ফলে আর মুখ দেখানো যাবে না ছাত্রদের অভি-ভাবকদের কাছে।

এইখানেই বহু মঠ আছে—সেখানে লোকে শান্তিতে সাধনভজন করে। সেখানেও বহু লোক থাকে। কই, কোথাও তো এমন ব্যবহার করে ব'লে শোনা যায় নি। সবই কি তার অদৃষ্টে বিপরীত হয়?

এর ওপর দুঃসংবাদ আসে নানা দিক থেকেই—

শান্তিদির বাড়িওলা ডিগ্রি পেয়েছে। বাড়ি ওঁকে ছেড়ে দিতে হবে। অন্য বাড়ি খুঁজছেন। কিন্তু সেখানে টাকা আগাম দিয়ে, এখানের দাবী মিটিয়ে উঠে যেতে প্রায় দু হাজার টাকা লাগবে। অত টাকা কোথায়? শান্তিদি প্রাণপণে চাকরি খুঁজে বেড়াচ্ছেন। এ মাসেও দশ টাকা পাঠিয়েছেন কিন্তু আর বোধহয় পাঠাতে পারবেন না।

গুরুদেবও শয্যাগতই হয়ে পড়েছেন। আর কোনদিন উঠতে পারবেন কিনা সন্দেহ। তিনিই বা কতদিন সাহায্য করতে পারবেন?

এধারে একদিন মঠের এক নূতন ঝি মারফৎ মূল্যবান একটি সিল্কের শাড়ি ও নূতন ছ-গাছা চুড়ি এসে পৌছল।

এক ধনী ব্যক্তির নজর এটা। এ শুধু নাকি ওর প্রসন্নতার জন্যে, এর মধ্যে কোন চুক্তি নেই।

যদি চিত্রা প্রসন্ন হয় তো ছ হাজার টাকা দিয়ে তিনি চিত্রার নামে নতুন বাড়ি কিনে দেবেন। আর গা-মোড়া গহনা।

অর্থাৎ নিশ্চিন্ত ও আরামের জীবন।'

মন প্রলুব্ধ হয় বৈকি।

এই টানাটানি, এই ভিক্ষান্নে জীবন ধারণ, এই অর্ধাশন—আর যেন সহ্য হয় না।

চোরের মতো হীন হয়ে এখানে থাকা, প্রতিদিন এতগুলি লোকের প্রতিকূলতার সঙ্গে যুদ্ধ করা। এর কি কোন অর্থ হয়?...

মা জাহ্নবী? অভিমানে উদ্বেলিত হয়ে ওঠে ওর সমস্ত মন।

কেন তুমি এমন সৃষ্টিছাড়া ক'রে মেয়েকে মানুষ ক'রে তুলতে গেলে মা? কেন স্বধর্মে টিকে রইলে না? এমন ভয়াবহ পরধর্মের পথে কেন চালাতে গেলে তাকে?...

তবু এতদিনের শিক্ষা ও সংস্কার!

সারারাত ভেবে পরের দিন শাড়ি ও গহনা ফেরতই দেয় চিত্রা।

'আর কখনও এমন কথা বলিস নি বসনের মা। তাহলে তোকে পুলিসে দেব।'

কিন্তু তার ফলে জীবন আরও দুর্বহ হয়ে ওঠে।...

পরের মাসে শান্তিদি টাকা পাঠাতে পারেন না। গুরুদেব দশ টাকা পাঠান। নরেশের টাকা প্রতি মাসই চার তারিখে আসে, তারও এবার দেরি হয়। গয়লা নগদ পয়সা না পেলে দুধ দেবে না। খোকাকে সুদ্ধ উপবাস ক'রে থাকতে হয় একদিন। এমন এক মুঠো চালও নেই যে ভাত খাইয়ে ছেলেটাকে রাখবে। হয়ত সে মরেই যেত—কোন রকমে ব্যাপারটা অনুমান ক'রে মঠেরই একটি বৃদ্ধ লোক গোপনে চারটি চিঁড়ে আর সাগু দিয়ে গেল সন্ধ্যা নাগাদ তাই রক্ষা; পরের দিন ছাত্রদের একজন একটি টাকা অগ্রিম দিলে।

ওর মনে পড়ে যায়, ওদের বৃদ্ধ পুরোহিত বলত একটা কথা, 'মা, আমাদের নিত্য ভিক্ষা তনু রক্ষা!' চিত্রার সেই অবস্থাই হয়েছে।

নরেশের টাকা এলেও কুলায় না। কোথায় নাকি যুদ্ধ বেধেছে ইউরোপে—জিনিসপত্রের দাম চড়ছে একে একে। ছাত্র বাড়ানো যাচ্ছে না কিছুতেই। নিজে একদিন অন্তর খায়—তার ফলে শরীর দুর্বল হয়ে পড়ছে দিন দিন, সকালে উঠতে গেলে মাথা ঘোরে। তবু তাও সহ্য হ'ত—কিন্তু খোকা? খোকা বড় হয়ে উঠেছে, ভাত খেতে শিখেছে। দুধের কথা কল্পনাও করে না—কিন্তু তাকে একটু ভাত অন্তত দুবেলা না দিলে চলে কি ক'রে?

অবশেষে একদিন এমনি এক সঙ্কট মুহূর্তে, সন্ধ্যার পর উপবাসী ছেলেকে নিজের শীর্ণ, শুষ্ক বুকে চেপে স্তব্ধ হয়ে বসে আছে চিত্রা, হঠাৎ কোথা থেকে বসনের মা প্রকাণ্ড একটি ধামা এনে নামায় ঘরের মেঝেতে।

দস্তুরমত সিধা একটা। চাল, ডাল, চিনি, আনাজ, সাগু, সুজি, ঘি—আরও কত কি।

বগল থেকে একটি পেস্টবোর্ডের বাক্সও বার ক'রে পাশে রাখে। তাতে আগের বারের চেয়েও দামী শাড়ি এবং দামী নেকলেস ও চুড়ি।

তিরস্কার করবার একটা ক্ষীণ উদ্যম করে চিত্রা কিন্তু অসহায় কণ্ঠে স্বর বেরোয় না।

কি বলবে, রাগ করবে, না আনন্দ করবে—চলে যেতে বলবে, না বকশিশ দেবে, কিছুই ভেবে পায় না। অপমান বোধ করে অবশ্যই কিন্তু তাতে পূর্বের জ্বালা যেন আর খুঁজে পায় না। অন্তরে অন্তরে শিউরে উঠে চিত্রা আবিষ্কার করে যে আজ আর লোভের সঙ্গে যুদ্ধ করবার মতো অপমানবোধ ওর অবশিষ্ট নেই। এতগুলি খাদ্য দেখে ও খুশীই হয়েছে কোথায় মনে মনে।

কিছুই বলা হয় না—কিছুই করা হয় না। বিহ্বল দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে থাকে শুধু। অপমান-বোধ না থাকায় অপমানে লজ্জায় সে দৃষ্টিটা শুধু ক্রমে ঝাপ সা হয়ে আসে।

বসনের মা পাকা লোক।

সিধার মধ্যে একটা ঘটি ভর্তি ক'রে দুধও এনে ছিল, সেইটে বার ক'রে সামনে ধরে।

'গরম দুধ, খাঁটি গরুর। নিজে খানিক খাও, ছেলেকে খাওয়াও।'

আর সেই সঙ্গে কিছু মিষ্টিও। কোন বাঙালীর দোকানের ভাল সন্দেশ বার ক'রে দুধের পাশে রেখে আস্তে আস্তে বেরিয়ে যায়। প্রশ্ন করে না, কথা কয় না। কে দিয়েছে, কোথা থেকে এসেছে এ সব বাহুল্য তথ্য জানাবারও চেষ্টা করে না। ওর মানসিক অবস্থা নির্ভুলভাবে অনুমান ক'রে নিয়ে নিঃশব্দে সরে যায়।

আরও কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে চিত্রা। কোলের মধ্যে ছেলেটা ঘুমিয়ে পড়েছে বটে কিন্তু কোথায় যে ওর পেটটা ঢুকে গেছে তা যেন খুঁজেই পাওয়া যায় না। নিজেরও মাথা ঝিম্ ঝিম্ করছে। হাত-পা অবশ হয়ে আসছে। আজকের এই কষ্ট সহ্য ক'রে থাকলে কাল কোথাও থেকে কিছু পাওয়া যাবে এমন সম্ভাবনাও নেই।

অবশেষে এক সময় নিজের অজ্ঞাতসারেই চিত্রা এগিয়ে আসে দুধের ঘটির দিকে।

ছেলেকে ডেকে দুধ খাওয়ায়।, একটু সন্দেশও, তারপর নিজেও খানিকটা দুধ সন্দেশ খেয়ে দোরে খিল দিয়ে শুয়ে পড়ে। কাপড় গহনা সিধা তেমনি সাজানো থাকে—তোলবার বা গুছিয়ে রাখবার চেষ্টাও করে না।

গরম দুধ পেটে যাওয়ার পর তার বলবর্ধক উষ্ণতা একটু একটু ক'রে ওর শিরা-

উপশিরায় যেমন সঞ্চারিত হ'তে থাকে তেমনি ওর শুষ্ক চোখেও জল নামে আষাঢ়ের ধারার মতো।

মা, মাগো!

পরের দিন বসনের মা সকালবেলা এসে পাকা গিন্নীর মতো জিনিসপত্রগুলো গুছিয়ে তোলে, ঘরদোর ঝাঁট দিয়ে দেয়। কোন প্রশ্নই করে না—অনুমতিও নেয় না। ধরেই নেয় চিত্রার সম্মতি।

চিত্রা কাল শেষরাত্রে মনে মনে অনেক সঙ্কল্পই করেছিল। একবার ভেবেছিল সত্যি-সত্যিই সমুদ্রে গিয়ে ডুববে। আবার ভেবেছিল রাত্রি শেষ হবার আগেই কোথাও পালিয়ে যাবে ছেলেকে বুকে ক'রে। কোন দূর দেশে গিয়ে ভিক্ষে ক'রে খাবে—যেখানে এই ভদ্রতা বাঁচাবার আপ্রাণ চেষ্টায় সমস্ত রকম নীচতাকে বরণ করতে হবে না।

কিন্তু কিছুই করা হয় না।

আড়ষ্ট বিহ্বল হয়ে বসে থাকে—যেন কতকটা নির্লিপ্ত নৈর্ব্যক্তিক ভাবে চেয়ে থাকে বসনের মা'র দিকে।

বসনের মা রান্নার যোগাড় ক'রে দেয়। খাঁটি দুধ নিয়ে আসে ঘটি ভরে।

ফিস্ ফিস্ ক'রে শোনায়, 'তোমার জন্যে বড় বাগানবাড়ি সাজাচ্ছে, নতুন নতুন আসবাব আসছে। সাত হাজার টাকা নগদ আজই রাত্তিরে আগে তোমার সামনে ধরে দেবে, তবে তোমার কাছে আসবে। কোন ভয় নেই। ঐ বাগান-বাড়িটাও তোমাকে লিখে দেবে বলছে—'

কথাগুলো কতক শোনে চিত্রা, কতক শোনে না। ওর বিবেক যে আজও পীড়িত হয়, আজও ওর সংস্কার ধিক্কার দিতে থাকে ওকে—ও যেন তাতে মনে মনে একটা বিক্ষুব্ধ বিদ্রোহ অনুভব করে। কেন, কী অন্যায় করছে সে? সত্যি-সত্যিই পথের রুগ্ন কুকুরটার মতো না খেয়ে উপোস ক'রে মলেই বুঝি সম্মান বাঁচত, ধর্ম বাঁচত? সে মানবে না কোন কথা। তার এই তো যৌবনকাল, জীবন উপভোগ করবার এই তো বয়স। নিজের বিনা দোষে কেন সে এমন ক'রে বঞ্চিত হবে—সম্ভোগের সমস্ত রকম উপকরণ থেকে!

তবুও—

তবুও রান্না করতে আর ভাল লাগে না। খানিকটা দুধ গরম ক'রে ছেলেকে খাওয়ায়, নিজেও খায়। কিছুতেই রুচি নেই। অবশ্যম্ভাবী মহা সর্বনাশের সামনে

দাঁড়ালে মানুষ এক প্রকার সীমাহীন ক্লান্তি অনুভব করে—সেই ক্লান্তিই নেমেছে ওর সর্বাঙ্গে এবং সমস্ত মন ছেয়ে।

বসনের মা জোর ক'রে ভাত চাপিয়ে দেয়। ডালভাতে আলুভাতে আর ভাত। অগত্যা নামিয়ে নিতে হয় ওকে।...

দুপুরের দিকে এক সময় বসনের মা আর একটা কী বাক্স নিয়ে আসে চুপি-চুপি। ওর সামনে এনে সাজিয়ে ধরে। উৎকৃষ্ট তাঁতের শাড়ি দুখানা, আর মূল্যবান প্রসাধন সামগ্রী। স্নো, ক্রীম, পাউডার, এসেন্স—আরও কত কি! সবই দামী, প্রথম শ্রেণীর।

নিজের সাধ্যের বাইরে বলে কেনে নি কখনও, তবু এদের মূল্য জানে সে।

বসনের মা তার দন্তহীন মাড়ি বিকশিত ক'রে আধা উড়িয়া আধা বাংলাতে বলে, 'লড়াই লেগেছে বলে এ সব জিনিসও নাকি উঠে গেছে বাজার থেকে। অনেক কষ্টে, অনেক দাম দিয়ে ঠাকুর মশাই যোগাড় করেছে এ সব!'

লোভের আগুনে প্রাণপণে ইন্ধন যোগাচ্ছে বসনের মা—তা চিত্রাও বোঝে। ঠিক পর পর যুগিয়ে যাচ্ছে সে, আগুনকে কোন মতে স্তিমিত হতে দেবে না। বসনের মা পাকা খেলোয়াড়।

কিন্তু চিত্রাও মন স্থির ক'রে ফেলেছে। ওর মাসীর কথা আজ মনে পড়ে। ঠিকই বলেছিল মাসী, 'আমড়া গাছে তো আর ল্যাংড়া ফলে না।...দুদিন নাম-ধাম ভাঁড়িয়ে ইস্কুলে পড়ে কিছু আর খড়দর মা-গোঁসাই হয়ে ওঠো নি!...তুমি যা তা-ই আছ।'

স্বধর্ম তার যা তাই ধরে থাকবে সে।

গুরু, ইষ্ট, ভগবান্—সে সুদূর, বহুদূর। ক্ষুধা, তৃষ্ণা—বিলাসের ও স্বাচ্ছন্দ্যের নানা উপকরণ—এগুলো প্রত্যক্ষ। যার কথা কিছুই জানে না, যা কোনদিন তার পূর্ণ অর্থ নিয়ে ওর কাছে প্রকটিত হবে কিনা ঠিক নেই—তারই জন্য এমন ক'রে তিলে তিলে শুকিয়ে মরতে পারবে না সে!...

সন্ধ্যার কিছু আগে, আবছায়া অন্ধকারে চিত্রা যেখানে স্তব্ধ হয়ে বসে আছে ফাঁসীর আসামীর মতো—মৃত্যু নয় বটে, মৃত্যুর অধিক কোন অপমানের প্রতীক্ষায় —যেন বাতাসে ভেসে নিঃশব্দে এসে দাঁড়াল বসনের মা।

'ঠাকুর মশাই সব দিক ভেবে ঠিক ক'রে রেখেছে দিদিমণি। তোমার ছেলের জন্যেও পাকা বন্দোবস্ত ক'রে ফেলেছে। ওই ওধারে যে অনাথ আশ্রম আছে,

সেখানেই তোমার ছেলে মানুষ হবে—তার জন্যে উনি অনাথ আশ্রমকে বছরে পাঁচশ টাকা ক'রে দেবে। কেউ জানতে পারবে না—অথচ টাকা দেবে তো—যত্নেরও অভাব হবে না।'

চমকে ওঠে চিত্রা, 'ছেলে—ছেলে কোথায় যাবে?'

'ওমা, তা ছেলেটার একটা ব্যবস্থা করতে হবে না? বেশ লোক তো তুমি!'

'ছেলে তো আমার কাছেই থাকবে!'

'তাই কি হয়! যে মানুষ এতগুলো টাকা খরচ ক'রে তোমাকে রাজরাণী ক'রে নিয়ে যাচ্ছে, সে তোমার ধরো গে, ছোটছেলের ঝামেলা সইবে কেন? ঐটুকু ছেলে, হাগবে মুতবে—ঘরদোর নোংরা করবে—চ্যাঁ ভ্যাঁ! সে কথনও ওরা সহ্য করে? তাও তার ছেলে হলে হ'ত - কে না কে—কার ছেলে! · আর এ তো তোমার ভালই হচ্ছে। ছেলেও রাজার হালে থাকবে - মানুষ হবে, তোমার কোলে তো শুকিয়ে মরছিল!'

চিত্রা সজোরে খোকাকে বুকে চেপে ধরে।

'না না, ছেলে আমি কোথাও ছেড়ে দিতে পারব না!'

'তা কি হয়? ছেলে সে নিয়ে যেতে দেবে না।···সে মানুষও একরোখা।'

'তবে আমি যাবো না।'

বসনের মা'র মুখে হাসিতে-বিকীর্ণ-রেখাগুলি কী এক অদ্ভুত জাদুবলে কঠিন হয়ে ওঠে, এতটুকু সংকুচিত না হয়েই!

'এখন আর যাবো না বললে তো হবে না বাছা। তার জিনিস নিয়ে তার টাকা খেয়ে বসে আছ! ··বেশী গোলমাল ক'রো না বলছি দিদিমণি, এ মঠের সবাই ঠাকুর মশায়ের হাতের লোক। ছেলেকে যদি জীবনে রক্ষা করতে চাও তো - '

অকস্মাৎ চিত্রা যেন ক্ষেপে ওঠে, 'আমি যাবো না, যাবো না। - কোন কথা শুনতে চাইনে - যাবো না আমি। আমার খুশি।···জিনিস?' হাঁপাতে হাঁপাতে বলে, 'জিনিস? নিয়ে যা তোর জিনিস -'

পাগলের মতো কাপড় গয়না প্রসাধনের জিনিসগুলো সব উঠোনে ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলতে থাকে সে। শিশিগুলো ভেঙ্গে স্নো, ক্রীম, এসেন্স ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে। বিয়ের শিশিটা ছিটকে গিয়ে সামনের দেওয়ালে লেগে চুরমার হয়ে যায়। চাল ডাল ছড়িয়ে সারা উঠোনময় ছত্রাকার হয়ে পড়ে।

চিৎকার ও শিশিবোতল ভাঙ্গার শব্দে অনেকেই ছুটে আসে। কিন্তু চিত্রার সেই রণ-রঙ্গিনী মূর্তি দেখে কেউ আর এগোয় না। বসনের মাও ভয় পেয়ে একপা একপা

ক'রে পেছোতে থাকে।

যখন হাতের কাছে ছোড়বার মতো আর কিছুই রইল না তখন চিত্রা বঁটিখানা তুলে নিলে ঘরের কোণ থেকে, 'আর কখনও তুই আমার এ দিকে আসবি না বলে দিলুম। খুন করব। যে আসবে তাকে খুন করব। তিন-চারটেকে খুন ক'রে এই বঁটি নিজের গলায় বসাবো তা বলে দিলুম। খবরদার!'

প্রায়ান্ধকার ঘরে স্পষ্ট ওকে দেখা যাচ্ছিল না কিন্তু ওর গলায় আওয়াজে এবং হাতের আস্ফালনে ওর মনোভাব সম্বন্ধে কারুর কোন সংশয় রইল না। কাছে কেউ যাবার চেষ্টাও করলে না। বাইরে ভিড়-করা অতগুলো লোকের মধ্যেও এক অদ্ভুত নীরবতা বিরাজ করতে লাগল।

অবশেষে একসময় এই প্রবল উত্তেজনার প্রতিক্রিয়ায় পর পর এতগুলি মনোভাবের সংঘাতে চিত্রা ভেঙে পড়ে। কোনমতে দরজায় খিল লাগিয়ে বিছানায় লুটিয়ে পড়ে সে। কেমন একটা মূর্ছাতুর অবস্থায় আচ্ছন্ন হয়ে থাকে ছেলেটার অবিরাম কান্নাও যেন কানে আসে না ওর!

॥ ১৯ ॥

পরের দিন সকালে একটু ভয়ে ভয়েই চিত্রা দোর খুলেছিল কিন্তু যে রকম সাংঘাতিক বিরোধের আশঙ্কা করেছিল ও, তার কোনটাই দেখা গেল না -বরং মনে হ'ল কোন এক মন্ত্রবলে রাতারাতি মঠের কর্মকর্তাদের মনোভাবের আমূল পরিবর্তন হয়েছে।

মুখ-হাত ধুয়ে এসে বসতেই একটি লোক খবর দিয়ে গেল যে আজ মঠ থেকেই দুপুরবেলা তাদের প্রসাদ দেওয়া হবে। প্রথমটা চিত্রা একটু চমকেই উঠেছিল - বিষটিষ দেবে না তো? কিন্তু পরে নিজেই হেসে উঠল নিজের আশঙ্কায়। অকারণে তাকে খুন ক'রে ওদের কোন লাভ নেই—বাঁচিয়ে রাখলেই লাভ।

দুপুরবেলা মোহান্ত নিজে দেখা দিলেন। চিত্রা যদি এখান থেকে চলে যেতেই চায় তো তাঁকে বলে নি কেন? তাঁর সুপারিশ পেলে কে না ঘর ছেড়ে দেবে?··· তিনি নিজেই ওর জন্যে ঘর ঠিক করেছেন- এই কাছেই, পাকা বাড়ি। তার একটি ঘরে সে বিনা ভাড়াতেই থাকতে পারে যদি বাকী ঘরগুলো ভাড়া দিয়ে টাকাটা নিয়মিত বাড়িওলাকে পাঠায়। ভাল বাড়ি, কুয়া আছে। বাড়িওলাও একটু ব্যস্ত হয়েছেন। খালি বাড়ি পেয়ে যদি এ. আর. পি'তে নিয়ে নেয়—তাহলে ভাড়া পাবেন বটে কিন্তু খুচরো ভাড়াটে বসালে যত ভাড়া পান তার কিছুই পাবেন না।

চিত্রা যেন তার কানকে বিশ্বাসই করতে পারে না। এ কি সে সত্যিই শুনছে

সব ? কিন্তু তার আর অত ভাববারও সময় নেই। এ বেড়াজাল থেকে অব্যাহতি পেতে পারলে বাঁচে সে—

চিত্রা সাগ্রহে সম্মতি দেয়। মধুর হেসে এবং অভয় দিয়ে মোহান্ত চলে যান। সে দিনই ব্যবস্থা হ'তে পারবে, তাও জানিয়ে যান।

সন্ধ্যাবেলাই মোহান্ত মহারাজ নিজে লোকজন সঙ্গে দিয়ে সে বাড়িতে পাঠিয়ে দিলেন। সঙ্গে কিছু চাল-ডালও দিয়ে দিলেন। নতুন জায়গা, গুছিয়ে নিতে দেরি হবে তো।

চিত্রা ভাবলে সে এতদিন একটা ঘর জোড়া ক'রে বসে ছিল, ছেড়ে দিচ্ছে সহজে —এ তারই কৃতজ্ঞতা।

বেশ বড় বাড়ি। তবে পাড়াটা একটু নির্জন। আশেপাশে বাড়িগুলো দূরে দূরে। আর সবই খালি। বর্ষা নেমেছে, এখন কয়েক মাসই এ সব বাড়ি খালি থাকবে।

এ বাড়ির বৃদ্ধা বাড়িওয়ালী তখনও ছিলেন। তিনি যেন কেমন বিরস বদনেই চিত্রাকে অভ্যর্থনা করলেন। কিন্তু তবু চিত্রা মোটের উপর খুশীই হ'ল। যে ঘর সে পেয়েছে তা বিনা ভাড়ার হ'লেও একবারে অচল ঘর নয়। বরং একপাশে, বেশ ভাল ঘরই। সামনেই ওর নিজস্ব রান্নাঘর এবং স্নানের ঘেরা জায়গা। যেন আধুনিক ফ্ল্যাট একটা রীতিমত।

বুড়ী গিন্নী দিন-তিনেক আরও রইলেন। তারপর একদিন সব কটা ঘরে তালা লাগিয়ে চাবির থোকাটা ওর হাতে দিয়ে বিদায় নিলেন। এইবার নিজের নির্বুদ্ধিতাটা চিত্রার কাছে স্বচ্ছ এবং প্রকট হয়ে উঠল। বলতে গেলে জনহীন একটা পাড়ার মধ্যে সে একা। কাছাকাছি এমন কোন লোক নেই যার কাছে বিন্দুমাত্র সাহায্য পেতে পারে। চিৎকার ক'রে মরে গেলেও কেউ শুনতে পাবে না।

বুড়ী গেল সকাল বেলার প্যাসেঞ্জারে। দুপুরবেলাই সে বসনের মাকে বাড়ির পাশ দিয়ে অন্যমনস্কভাবে চলে যেতে দেখলে। এ পাড়ায় এখন কেউ নেই যে কোন কাজে সে আসবে। এ শুধু ওকেই দেখতে আসা—তা চিত্রা বোঝে।

খানিক পরে গুটি-দুই গুণ্ডা গোছের লোক—

তারা উদ্দেশ্যহীনভাবে ওরই বাড়ির সামনে পায়চারি করতে লাগল।

কি করবে ? থানায় যাবে ? ওরা যদি পেছু নেয় ? থানাই বা কি করবে ? সত্যি সত্যিই তো ওকে রক্ষা করবার জন্যে তারা পুলিস বসাতে পারে না ! কী সাক্ষী প্রমাণ

আছে ওর ?······

উঃ, কী চতুর আর কি সাংঘাতিক লোক ঐ মোহান্তটা!

মঠে বহু লোক সাক্ষী থাকবে—কোন গোলমাল কি অত্যাচার করার নানা অসুবিধা। তাই বুঝেই ওকে সুকৌশলে সরিয়ে দিয়েছে। আর চিত্রাও না বুঝে স্বেচ্ছায় ও সাগ্রহে সেই ফাঁদে পা দিলে। শুধু তো মঠের নিজস্ব লোকই না—ভাড়াটেও আছে দু-চারজন।

কিন্তু এখন উপায় কি? ঐ ভীমকান্তি লোকদুটো যদি রাত্রে দোর ভেঙ্গে তাকে নিয়ে যায়—জোর ক'রে?···যদি ছেলেটাকে আছড়ে মেরে ফেলে?

ভয়ে যে এমন হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে যায় তা চিত্রা আগে কোনদিন টের পায়নি। নিজের হাত নিজের গায়ে পড়লে চম্‌কে উঠতে হয়।

সন্ধ্যার অনেক আগেই সাবধানে সে সদর দরজা বন্ধ ক'রে দিল। তারপর নিজের ঘরে এসে দোর দিয়ে এক কাণ্ড করল। প্রাণপণে তক্তপোশটা ঠেলে এনে দরজায় ঠেকিয়ে রাখল, তার সঙ্গে ট্রাঙ্কটা লম্বালম্বিভাবে রেখে এমনই একটা রেখা রচনা করল যে খিল ভেঙে ফেললেও কপাট খুলবে না। কপাট তক্তপোশে, তক্তপোশ ট্রাঙ্ক দেওয়ালে আটকাবে।··এ ছাড়া সে আরও একটি ব্যবস্থা রেখেছিল। উঠোনের এক কোণে কতগুলো ইঁট ছিল জড়ো করা—সেগুলো সন্ধ্যার আগেই বয়ে এনে ভেতরে রেখে দিয়েছিল অর্থাৎ শেষ ব্যবস্থা। যদি শেষ পর্যন্ত ঘরে ঢোকে তো প্রাণপণে ছুঁড়তে পারবে। দুটো একটাকে না মেরে মরবে না সে কিছুতেই—

তবু ঘুম এল না সারারাত। ঘুমোবার চেষ্টাও করে নি অবশ্য। ঘুমন্ত ছেলেটাকে প্রাণপণে বুকে চেপে ধরে ঘরের আলো নিভিয়ে বসে রইল দরজা জানলা বন্ধ ক'রে।

গভীর রাতে ধুপ ক'রে ভারী কোন জীবের উঠোনে লাফিয়ে পড়বার শব্দ হ'ল।

একটা পদশব্দ সিঁড়ি বেয়ে বারান্দায় উঠল, ওরই দোরের সামনে এসে থামল। তারপর মৃদু করাঘাত দোরে।

আতঙ্কে হয়ত চিৎকার ক'রেই উঠত চিত্রা যদি কণ্ঠে স্বর ফোটা সম্ভব হ'ত। ঘামে সর্বাঙ্গ ভেসে যেতে লাগল, হাত পা কাঁপতে লাগল ঠক্ ঠক্ ক'রে—কাঠের মতো আড়ষ্ট হয়ে বসে রইল সে।·না, ইঁট সে বৃথাই ঘরে তুলেছে। দোর ভেঙ্গে যদি ঘরে ঢোকে কেউ তো ইঁট ছোঁড়বার সামর্থ্য ওর থাকবে না।

ওর ভয় ছেলেটা না উঠে পড়ে। যদি কেঁদে ওঠে! যেন তা হ'লেই শুধু উপস্থিতিটা প্রমাণ হবে, নইলে নয়। নিজের কাছেই নিজের নির্বুদ্ধিতা ধরা পড়ে। তবু মনকে বোঝাতে পারে না।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত দোর ভাঙবার চেষ্টাও কেউ করল না। প্রথম কয়েকবার দোর ঠেলার পর ঘণ্টা-খানেক সব চুপচাপ ছিল। কিন্তু চলে যে যায় নি তা চিত্রা টের পেয়েছিল ফিস্ ফিস্ ক'রে কথা বলার শব্দে ও দেশলাই জ্বালার আওয়াজে আর বিড়ির গন্ধে।

ঘণ্টা-খানেক পরে আর একবার কপাটে ঘা পড়ল। এবার একটু জোরে। বিগত এই একঘণ্টা আতঙ্কের যে যন্ত্রণা সহ্য করেছে চিত্রা তাতে তখন যেন নতুন ক'রে ভয় পাবারও শক্তি ছিল না। কেমন একরকম বিস্ময়-বিহ্বলভাবে বসে রইল স্থির হয়ে।

কিন্তু এবারেও অল্পে কাটল ফাঁড়া। লোকগুলো আবার পাঁচিল টপকে ধুপ ক'রে রাস্তায় পড়ে চলে গেল।

চিত্রা বুঝল যে এটা শুধু ওকে ভয় দেখানোরই আয়োজন। এখনই চরম কিছু করবার ইচ্ছা নেই ওদের।

এমনি ক'রে বসে বসেই ক্রমে ভোর হয়ে এল। দোর খুলতে হ'লই শেষ পর্যন্ত। কিছু খেতে হবে –ছেলেকে কিছু খাওয়াতে হবে। কিন্তু খানিক পরেই সদরে ঘা পড়ল জোরে।

'কে !' চমকে চেঁচিয়ে উঠল চিত্রা।

'আমি গো !' বসনের মা'র চাপা গলা শোনা গেল।

ভয়ে কণ্ঠস্বর বিকৃত শোনায় নিজের কাছেই, তবু চেঁচিয়ে ওঠে চিত্রা, 'এখানে কেন এসেছ ? চলে যাও বল্‌ছি, নইলে ইঁট ছুঁড়ব !'

বসনের মা অনুনয়ের সুরে বলে, 'মাইরি দিদিমণি—কোন খারাপ কথা নয়। একবার দোরের ভেতরেই –জানলায় এসে নয় দাঁড়াও। বাইরে থেকে দুটো কথা বলে চলে যাবো।'

'কী বলো।' চিত্রা সদরের কাছে এগিয়ে যায়।

'ছেলে সুদ্ধই চলো -সে লোক রাজী আছে। আট হাজার টাকা গুনে দেবে তার ওপর।'

'জানি।' দাঁতে দাঁতে চেপে বলে চিত্রা, 'সেখানে গিয়ে নিজেদের হাতে পেয়ে ছেলেটাকে খুন ক'রে ফেলবে। তাছাড়া ও ভুল আমার ভেঙ্গে গেছে, ঠাকুর বাঁচিয়ে দিয়েছেন। আর না।'

কঠিন হয়ে ওঠে বসনের মা'র কণ্ঠ, 'কিন্তু এমনি ক'রেই কি বাঁচতে পারবে দিদি ? খেতে হবে না ? বেরোতে হবে না ? কালই তো নিয়ে যাচ্ছিল—দয়া ক'রে ঠাকুর ছেড়ে দিয়েছে তাই ! এখনও ভেবে ত্মাখো—'

চিত্রা কথার উত্তর না দিয়ে সরে আসে। ঘরে এসে বসে পড়ে বিছানায়। সত্যিই, এমন ক'রে আর পারে না সে। ঘুম নেই, খাওয়া নেই—ভয় আর ভয়। সে যে পাগল হয়ে যাবে।

বসনের মা'র দেহ দূর বালির বাঁকে অদৃশ্য হয়ে যায়। সে দাঁড়িয়ে থেকে থেকে ফিরে চলে যাচ্ছে সেখানে জানাতে। তার পর ?

খানিকটা পাথরের মতো বসে থেকে হঠাৎ যেন পাগলের মতোই লাফিয়ে উঠল চিত্রা। কোন মতে ছেলেটাকে কোলে তুলে নিয়ে দরজায় তালা লাগিয়ে সদর খুলে প্রাণপণে ছুটতে লাগল পাকা রাস্তা ধরে—লোকালয়ের দিকে, যেখানে এখনও বহু বাসিন্দা আছে। সেখানে গিয়ে কি করবে তা জানে না। শুধু এই ভয় থেকে যে মুক্তি পাবে—এইটেই জানে।

খানিকটা গিয়েই স্টেশনের পথ। মোড়টা ঘুরতেই ওর চোখে পড়ল পর পর দুটি রিক্সাতে চারটি তরুণ ছেলে চলেছে স্বর্গদ্বারের দিকে। সঙ্গে সামান্য মালপত্র। অর্থাৎ এখানে থাকবে দু-একদিন।

ভাববার অবসর ছিল না। এক রকম আর্তকণ্ঠে চিত্রা ডাকল, 'শুনুন।'

ছেলেগুলি চমকে উঠল। রিক্সা থামিয়ে একজন নেমে পড়ে বলল, 'আমাদের বলছেন ?'

'হ্যাঁ—দেখুন আপনারা কোথায় উঠবেন ?'

'দেখি যদি সস্তায় কোথাও হোটেল-টোটেল পাই—কেন বলুন তো ?'

'আমার বাড়িতে ঘর আছে। খুব সস্তায় দেবো। ভাড়া না দিলেও আপত্তি নেই। দয়া ক'রে যদি থাকেন।'

প্রস্তাবটা এতই অপ্রত্যাশিত —এমন বিচিত্র যে সন্দিগ্ধ হয়ে ওঠাই স্বাভাবিক। এসব তীর্থক্ষেত্র সম্বন্ধে বহু গুজবই কলকাতায় প্রচারিত—তা তাদের কানেও এসে পৌচেছে দু-একটা। সুতরাং তারা এই সহজ অনুরোধের পিছনে কী আছে তাই বোঝবার বৃথা চেষ্টায় বিমূঢ়ের মতো দাঁড়িয়ে পরস্পরের দিকে তাকাতে লাগল।

এই গত এক বছরে চিত্রারও শিক্ষা কম হয় নি। জীবন থেকে যে পাঠ সে নিয়েছে তা বই পড়ে পেতে দশ বছর লাগত। সে আকুলকণ্ঠে বললে, 'দেখুন, আমার কোন কুমতলব নেই, এই আমি ছেলেকে ছুঁয়ে বলছি। আমার পাড়াটা বড় নির্জন—সব্বাই চলে গেছে—ভয়ে আমার রাত্রে ঘুম হয় না।'

একজন বলে ফেলল, 'আপনি একা থাকেন কেন ?'

মাথা হেঁট ক'রে চিত্রা বলল, 'সে আমার ভাগ্য। কিন্তু আপনাদের কোন ব্যাপারে জড়াব না, জগন্নাথের নাম নিয়ে বলছি। কোন ভয় নেই আপনাদের—'

সুন্দরী তরুণীর চোখের জল—যুগ যুগ ধরে সমস্ত তরুণ ছেলেরই যুক্তিতর্ক ভাসিয়ে দিয়েছে। তা ছাড়া এ তাদের বিপদকে উপেক্ষা করার—অজানা আশঙ্কাকে এগিয়ে গিয়ে বরণ করারই বয়স।

ওদের মধ্যে সবচেয়ে বয়োকনিষ্ঠ যেটি, সে বলল, 'চলুন—তাই যাই।'

চারজনের মধ্যে যেটি দলপতি গোছের সে শুধু একটু আপত্তি তুলেছিল—'কিন্তু খাওয়া-দাওয়া? আমরা তো রেঁধেখাবার কোন সরঞ্জামই আনি নি।'

চিত্রা বললে, 'আপনারা বাজার ক'রে দেবেন আমি রেঁধে দেব। তার জন্যে কোন চার্জ দিতে হবে না আপনাদের। আপনারা দয়া ক'রে আসুন।'

কণ্ঠে তার করুণ মিনতি। সে মিনতিকে উপেক্ষা করার শক্তি ওদের রইল না।

॥ ২০ ॥

আশঙ্কা ও সংশয় একটু ছিল বৈকি। কৌতূহল তো বটেই। কিন্তু, সে কৌতূহল মেটাতে না পারলেও, ক্রমে ক্রমে আশঙ্কাটা কমেই আসে। চিত্রা অকারণে ওদের সঙ্গে কথা কয় না—কাছে যাবার চেষ্টাও করে না। ছেলেগুলিকে বারান্দার একেবারে অপর প্রান্তের ঘরই সে দিয়েছে। তারা যা খুশি করুক। হৈ হল্লা করতেই বিদেশে এসেছে তারা, তা চিত্রাও বোঝে।

তারাও ওর সেবায় মুগ্ধ। চা জলখাবার প্রভৃতি ঠিক সময়ে এবং পরিপাটি ভাবে পরিবেশন করে সে। এবং বার বার বলে, 'যার যখন যা দরকার হবে বিনা দ্বিধাতে বলবেন। চা আপনারা অনেকবার খান তা জানি—যখনই ইচ্ছে হবে বলবেন, কোন সঙ্কোচ করবেন না—উনুন জ্বলছে, চা করতে এক মিনিটের বেশি লাগে না।'

ওদের মধ্যে বয়সে ছোট যে ছেলেটি, কমল তার নাম, সে চিত্রাকে 'দিদি' বলে ডাকে এবং সেই স্নেহের সম্পর্কে রান্নাঘরে এসে বসে মধ্যে মধ্যে। কমলই ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছে, 'রান্না সব একসঙ্গে হবে দিদি, আপনি যেন আবার বেশী পাকামি ক'রে আলাদা করতে যাবেন না। আমি সকলের মতোই বাজার করেছি।'

'ওমা, তা কখনও হয়।' চিত্রা প্রতিবাদ করেছিল প্রথমটা।

'কেন হবে না। হোটেলে থাকলে তারা লাভ নিত না? রাঁধুনী রাখলে তার মজুরি দিতে হ'ত না? ধরে নিন এটা আপনার মজুরি। এতে কুণ্ঠিত হবার কি আছে?'

অগত্যা চিত্রা রাজী হয়। বরং বেঁচেই যায় সে। তারও তো বলতে গেলে হাতে কিছুই নেই।

কমল আর তার বন্ধুরা খোকার জন্যেও নানান্ জিনিস আনে। কমল বলে ভাগ্নে। দুধ চায়ের মতো সামান্য নেবার কথা—ব্যাপারটা বুঝে নিয়েই কমল আধসের দুধের ব্যবস্থা করেছে এবং সকালে ছেলেকে দুধ না খাওয়ানো পর্যন্ত সে কোন কাজ করতে দেয় না চিত্রাকে।

চিত্রা বেঁচেছে এই কদিন। বহুদিন পর যেন এই কদিন স্বস্তিতে নিঃশ্বাস ফেলেছে।

বসনের মা রোজই একবার ক'রে যায় এই পথ দিয়ে কিন্তু ডাকতে সাহস করে না।

সেই গুণ্ডার মতো লোক দুটো প্রথম দিন সন্ধ্যার পর এসেছিল—কিন্তু ছেলেদের অট্টহাসির শব্দে চমকে ফিরে গিয়েছিল, আর আসে নি।

একটা বিজয়গর্ব ও কৌতুক অনুভব করে চিত্রা। দুর্বলের ক্ষণিক বিজয়-গর্ব।...

এক এক সময় মনকে প্রবোধ দেয় যে এবার হয়ত ওর আশা তারা ছেড়েই দেবে!

কিন্তু বসনের মা'র কামাই নেই একদিনও। অকারণেই প্রত্যহ এই পথ দিয়ে সে চলে যায় মন্থর গতিতে। উদাসভাবে একবার তাকায় বাড়িটার দিকে, হয়ত বা খানিক বসে ঝাউগাছের ছায়ায় বালির ওপরেই—আবার চলে যায়।

এধারে ছেলেগুলির যাবার সময় হয়ে আসে। ওরা সকলেই চাকরী করে, কমল পর্যন্ত। কমল বি-এসসি পরীক্ষা দিয়েই সরকারী দপ্তরে কাজ নিয়েছে। ছদিনের ছুটি ওদের, এক রবিবার থেকে আর এক রবিবার পর্যন্ত মেয়াদ। ক-টা দিনই বা। দেখতে দেখতে সে রবিবার ঘনিয়ে এল।

অথচ পাড়ার কোন বাড়িতে জন-মানবের চিহ্ন নেই। দু-একটা বাড়িতে চাকর বা মালী আছে। তারা সন্ধ্যার পরই দোর-তালা এঁটে শুয়ে পড়ে। কোন ঝঞ্চাটের গন্ধ পেলে তো একেবারেই বেরোবে না। তাছাড়া—তাদেরও টাকা পয়সা দিয়ে হাত করেছে কি না কে জানে!

অবশেষে রবিবার সকালে কমল যখন রান্নাঘরে অভ্যাস মতো চৌকাঠে বসে পড়ে বলল, 'আজ ভাল ক'রে খাইয়ে দিন দিদি, আজই তো শেষ!' তখন আর চিত্রা থাকতে পারল না, বলে ফেলল, 'আপনাদের কি কারুর আর কিছুদিন থাকবার উপায় নেই ভাই?...আপনি, আপনি পারেন না আর দু-একটা দিন থাকতে? আর ক-টা দিন ছুটি পাবেন না?'

'কেন বলুন তো?' তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চিত্রার মুখের দিকে চায় কমল, 'কী ব্যাপারটা ঠিক ক'রে খুলে বলুন দিকি আগে। আমি আপনাকে দিদি বলি, আমার কাছে গোপন করবেন না। আপনার কোথায় কি বিপদ খুলে না বললে বুঝবই বা কি ক'রে?'

ছোট ভায়েরই মতো। বয়োকনিষ্ঠ তাতে সন্দেহ নেই। ওর বলিষ্ঠ চেহারার মধ্যেও বয়সের স্বল্পতা অনায়াসেই চোখে পড়ে। বাইশ-তেইশের বেশি হবে না কিছুতেই। স্নেহই হয় মনে। তবু নিজের ভাইয়ের কাছেও যে এসব কথা বলতে সঙ্কোচ হয়। অপমানে মুখ রাঙা হয়ে ওঠে চিত্রার, চোখের কোলে জল ভরে আসে।

সেদিকে চেয়ে মুগ্ধও হয়, ব্যথিতও হয় কমল। তাড়াতাড়ি বলে, 'ও কি, আরে—আপনার চোখে জল এসে গেল। তাহ'লে না হয় থাক্।—না-না, কিছু বলতে হবে না আপনাকে। অতটা আমি ভাবি নি-'

বিষম অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে সে।

চিত্রা আঁচলে চোখ মুছে বলে, 'না বলেও উপায় নেই ভাই। আপনি—আপনাকেই বলব সব কথা।'

তবু বলতে গিয়েও থেমে যায়। প্রবল সঙ্কোচের কারণ আছে অনুমান ক'রে নিয়ে কমলই কথাটা পাড়ে, 'আপনার তো সধবার মতো বেশভূষা। আপনার স্বামী কোথায় থাকেন? কীকরেন?'

আবারও চোখ জ্বালা ক'রে জল ভরে আসে। রুদ্ধকণ্ঠে কোন মতে চিত্রা বলে, 'তিনি আবার বিয়ে করেছেন।'

'আবার বিয়ে করেছেন? আপনার মতো- মানে আপনাকে ছেড়ে? সে কি? কেমন ক'রে সম্ভব হ'ল তা?'

'আমাকে বিয়ে করেছিলেন তিনি সকলের অমতে, সকলকে গোপন ক'রে। তারপর তাঁর বাবা যখন টের পেয়ে জোর ক'রে আর একটা বিয়ে দিলেন তখন উনি না বলতে পারেন নি।·· এখন সেই স্ত্রী নিয়েই ঘর করছেন।'

খোকার দিকে একবার তাকিয়ে কমল প্রশ্ন করে, 'ছেলের বয়স তো বেশী নয়। এরই মধ্যে তাঁর শখ মিটে গেল? মাপ করবেন—এ ধরনের কথা বলছি বলে। কিন্তু তিনি কী ক'রে আপনাদের ছেড়ে থাকতে পারলেন।'

'আছেন তো!'

'তারপর? খরচ দেন না?'

'দশ টাকা ক'রে মাসে।'

'দশ টাকা ?…তাঁর আয় কত ?'

'দেড়শ টাকা মাইনে শুনেছি। আরও কিছু আছে হয়ত। ঠিক জানি না। তিনি ডাক্তার।'

বিষম উত্তেজিত হয়ে ওঠে কমল, 'আর আপনাকে দেন মোটে দশ টাকা ? আপনি নালিশ করেননি কেন ?'

'কি দিয়ে করব ? নালিশ করবার খরচটাও করার আমার সাধ্য নেই তা জেনেই বোধহয় নিশ্চিন্ত আছেন। তা ছাড়া লোকই বা কৈ ? আমার কেউ নেই কোথাও।'

'আপনার বাবা মা ? ভাই—কেউ নেই ?'

'এক দাদা আছেন—তিনিও নিরুদ্দেশ।'

'চলছে কিসে ?'

'টিউশনী ক'রে চলত এতদিন। এক টাকা, আট আনা মাইনে। এইখানকার স্থানীয় ছাত্র সব—এর বেশী কেউ দিতে চায় না। তবু কোনমতে তাতেই দিন চলছিল, কিন্তু এ বাড়িতে এসে তাও বন্ধ হয়েছে। কেউ তো আসে না।'

'তবে এখানে এলেন কেন ?'

গভীর সহানুভূতি আর ভদ্র কথায়—প্রশ্ন করার আন্তরিক সুরে, সঙ্কোচের ভাবটা ক্রমেই কমে আসে। দীর্ঘ ইতিহাস একে একে সবই খুলে বলে চিত্রা, নিজের জন্ম-পরিচয়টুকু মাত্র গোপন ক'রে—সবটাই। মা মরবার পর অসহায় অবস্থা, গুরুর আশ্রয়, ত্যাগ, চাকরি, নরেশের সঙ্গে পরিচয়, বিবাহ—কোন কথাই গোপন করে না। তারপর এখানকার এই অবিরাম যুদ্ধের ইতিহাস—দারিদ্র্যের সঙ্গে, অনাহারের সঙ্গে, বিদ্বেষের সঙ্গে—অকারণ লাঞ্ছনার সঙ্গে যুদ্ধের বিচিত্র ইতিহাস শেষ ক'রে যখন থামে সে, তখন শুধু যে চিত্রার চোখ দিয়েই দরদর ধারে জল গড়িয়ে পড়ছে তাই নয়, কমলের চোখও সজল হয়ে উঠেছে। বেশ কিছুক্ষণ সময় লাগল তার নিজেকে সামলে নিতে।

তাই খানিকটা অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে চুপ ক'রে বসে থেকে শুধু সে আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে বললে, 'আপনি ভাববেন না দিদি, আপনাকে এ বিপদের মধ্যে ফেলে রেখে কোথাও যাবো না। আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি।'

ঝোঁকের মাথায় চিত্রাকে আশ্বাস দিয়ে ফেললেও কমল নিজের প্রতিশ্রুতির ফলাফল সম্বন্ধে খুব অচেতন ছিল না—সেজন্য অনেকখানি ইতস্তত ক'রেই গিয়ে সঙ্গীদের কাছে কথাটা পাড়ল, 'আমার আজ যাওয়া হবে না। তোমরা যাও, আমি

আর এক সপ্তাহ লিভ নেব।'

ফলটা—সে যা আশঙ্কা করেছিল তার চেয়ে বেশীই খারাপ দাঁড়াল। প্রথমে নীরব বিদ্রূপের হাসি, তারপর সরব টিটকিরির ঝড় বয়ে গেল।

'জানি বাবা—ও ছেলেধরায় ধরেছে, সহজে নিস্তার নেই।' একজন বললে।

আর একজন তারই সুরে সুর মিলিয়ে বললে, 'তবু ভাল যে তোর ওপর দিয়েই গেল। হাজার হোক কচি মাংস তো—ওইদিকেই লোভ বেশি!'

বাকী যিনি—তিনি বললেন, 'কেন বাওয়া বেঘোরে প্রাণটা দেবে—বাপ-মায়ের এক ছেলে। ও কাঁচা-খেগো দেবতা—খসে পড়ো, খসে পড়ো। পৈতৃক প্রাণটা যদি বাঁচাতে চাও তো সরে পড়ো—'

আসলে ওর রান্নাঘরের আড্ডাটা যে ইদানীং বেড়ে যাচ্ছিল তা এদের কারুরই চোখ এড়ায় নি—এবং ইতিপূর্বেই ঈর্ষামিশ্রিত বিদ্রূপের সঙ্গে তা নিয়ে আলোচনাও হয়ে গেছে। নিজেদের অনুমান মিলে যাওয়ার জন্যে ওদের কণ্ঠে একটু গর্বেরও আভাস ফুটে উঠল।

'এ বাবা আমরা জানতাম। অমনি অমনি কি বাড়িতে ডেকে এনেছেন ঠাকরুন। বোকা পেয়ে ঝোপটা যে তোর ওপরই পড়েছে তাও আমাদের চোখ এড়ায় নি রে। এ শম্মারা কলকাতার ছেলে, সাত হাটের কানাকড়ি।'

কথাগুলো খুব আস্তে কেউই বলছিল না—এবং রান্নাঘরও খুব দূরে নয়। চিত্রা শুনতে পাবে এই সম্ভাবনাতেই কমলের মুখ-চোখ লাল হয়ে উঠল। তবু সে হাসি-হাসি মুখেই বলল, 'তোমরা খুব ওস্তাদ তা জানি। কিন্তু কতকগুলো জিনিস আছে যা কোন হিসেবের মধ্যে পাওয়া যায় না। সব মানুষ কি সমান?'

'তবু হিসেবটা কি শুনিই না দাদা!'

পাছে আরও তেতো হয়ে ওঠে ব্যাপারটা এই ভয়ে কমল কিছুতেই তাতল না। বরং মিনতি ক'রে বলল, 'সিক্রেটটা আমার হ'লে বলতুম। লক্ষ্মী ভাই, তোরা যা ভাবছিস তা নয়। তোরা যা—আমি এক হপ্তা পরেই গিয়ে পড়ছি।'

কোনমতে বুঝিয়ে সুঝিয়ে ওদের স্টেশনে তুলে দিয়ে এল কমল, কিন্তু ওরা যে তবুও নিজেদের মতোই ঘটনাটার টীকা ক'রে নিলে তা বুঝতে দেরি হ'ল না। এবং এর ফলে কলকাতার আকাশ বাতাস কী পর্যন্ত বিষাক্ত হয়ে উঠবে তাও কল্পনা ক'রে আশঙ্কায় কণ্টকিত হয়ে রইল সে।

কথাটা শেষ-অবধি বিকৃত হয়ে ওর বাবা মার কানে পৌঁছলে কী হবে—সেটা সে অনুমান করতেও সাহস করল না।

কিন্তু চিত্রার আশঙ্কাও যে অমূলক নয় তারও প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া গেল সেই দিনই রাত্রে।

বসনের মা বোধ করি ওদের সবাইকে স্টেশনের দিকে চলে যেতে দেখেছিল কমলকে ফিরতে দেখে নি। বিশেষ ক'রে ওরা যে ঘরে এই আটদিন ছিল সে ঘর আবার তালা বন্ধ দেখেছে কারণ চিত্রা কমলের জিনিসপত্র নিজের ঘরের পাশের ঘরে এনে রেখেছিল, একা যখন থাকবে তখন একটু কাছাকাছি থাকাই ভাল।

যে কারণেই হোক—অপর পক্ষ কমলের অস্তিত্ব টের পায় নি। কিন্তু সে জেগেই ছিল। ধুপ করে উঠোনে লাফিয়ে পড়ার শব্দ হ'তেই 'কে' বলে হাঁক দিয়ে একেবারে বাইরে বেরিয়ে পড়ল। এ ধরনের অভ্যর্থনার জন্য লোক দুটো বোধ হয় প্রস্তুত ছিল না। কোন মতে সদরের খিল খুলে অন্ধকার পথে মারল প্রাণপণে দৌড়।

চিত্রাও বেরিয়ে এসেছিল কমলের সাড়া পেয়ে। ভয়ে ওর মুখ আজও বিবর্ণ হয়ে গিয়েছিল, পা দুটো কাঁপছিল থর থর করে। সে বলল, 'অমন শুধু-হাতে বেরিয়ে আসা আপনার ঠিক হয় নি। ওরা যদি রুখে উঠত!'

কমল নিজের ব্যায়ামপুষ্ট হাত দুটোয় একবার হাত বুলিয়ে হেসে বলল, 'রাত হয়েছে, এবার নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোন গে, ব্যাটারা আজ আর কেউ আসবে না। আচমকা যা ভয় পেয়েছে!'

॥ ২১ ॥

কমল বাপমায়ের এক ছেলে হ'লেও খুব কড়া নজরে মানুষ হয়েছিল। সেই জন্য পাঠ্যাবস্থায় পড়ার বই, ব্যায়াম আর খেলাধুলা—এর বাইরে তাকাবার অবসর পায় নি। পড়া শেষ হ'তেই বাবা চাকরিতে ঢুকিয়ে দিলেন, সে অবসর আর মিললই না। সেই কারণেই তার সহপাঠী এবং সহকর্মী বন্ধুরা যে সব আলোচনা করত সর্বদা, তার অর্ধেক কথাই সে বুঝত না, শুধু বোকা বনবার ভয়ে বোঝবার ভান করত এবং বোকার মতোই হাসত।

ওর বাবার দাপট ছিল অত্যন্ত বেশী। সে জন্যে মাও ছেলেবেলায় খুব একটা প্রশ্রয় দিতে পারেন নি। বোন ছিল না, কোন নিকট-আত্মীয় বাড়িতে থাকতেন না, সুতরাং স্নেহের প্রশ্রয় বস্তুটি ওর কাছে ছিল প্রায় অজ্ঞাত।

এত শিগ্‌গির চাকরিতে ঢোকবারও ওর ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু ওর বাবা খুব সংক্ষেপে বুঝিয়ে দিলেন যে পড়াশুনোর যত সাধ আছে ওর তত সাধ্য নেই—

সেটা এই তিনটে পরীক্ষার ফলেই বোঝা গেছে। মিছিমিছি এম. এসসি. পড়ে লাভ কি? তাঁর শরীর খারাপ, ভাল মন্দ কিছু হলে ওদের দাঁড়াবার উপায় থাকবে না। একটা বাড়ি আছে বটে মাথা গোঁজবার মতো, কিন্তু বাড়ি কামড়ে তো আর কেউ খেতে পারে না। এমন কোন লোক নেই যে ওকে চাকরি ক'রে দিতে পারে তিনি মরবার পর। ব্যবসা? সে পুঁজি তাঁর নেই, আর ওর ওপর সে আস্থাও নেই। ব্যবসা করারও একটা শিক্ষা আছে সে শিক্ষা ইস্কুল কলেজে পাওয়া যায় না। অতএব চাকরিই যখন অনিবার্য ও অবশ্যম্ভাবী, তখন শুভস্য শীঘ্রম্।

অবসর যেমন মেলে নি, তেমনি সুযোগও বিশেষ ছিল না। বোন নেই, সুতরাং সে সম্পর্ক ধরে যে সব তরুণীদের সাহচর্য পাওয়া যেতে পারত, দিদির ননদ বা বোনের জা—তার একটাও ভাগ্যে জোটে নি ওর। বন্ধুদের বাড়ি যাওয়া-আসার তত বেশী উপায় ছিল না। বাবা সময়ের হিসেব রাখতেন—তাছাড়া সামান্য খেলাধুলো ক'রেই পড়বার সময় পাওয়া যেত না। যতটা ওর পড়ার ইচ্ছা ততটা শক্তি সত্যিই ওর ছিল না। অনেক বেশী সময় লাগত পড়তে। কাজেই পাড়া-সম্পর্কের তরুণী কেউবা বন্ধুর বোন—বাঙালীর ঘরের মরুভূমিতে যে সব ওয়েসিস্‌গুলি সাধারণত দেখা যায়, তার একটিও ওর জীবনে আসে নি কোনদিন। কোন তরুণীর সাহচর্য তো দূরের কথা, সান্নিধ্যই পায় নি কখনও।

ফলে—কমল চিত্রার সান্নিধ্যে এসে অভিভূত হয়ে পড়ল। ওর মনে হ'ল পৃথিবীতে বিধাতা এমন নারী এই একটি মাত্র তৈরী ক'রে পাঠিয়েছেন। সে অভূতপূর্ব, কল্পনাতীত।

চিত্রার সেবা, স্বাচ্ছন্দ্য দেবার একটা সতর্ক ও অবিরাম চেষ্টা, তার মিষ্ট কথা ও মিষ্ট হাসি—সবই ওর কাছে অভিনব এবং মনোরম। স্নেহ পাবার যে সহজাত লোভ মানুষের মনে থাকে তা মেটে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মা'র দ্বারা—কিন্তু কমলের ক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম হয়েছিল বলেই বোধ হয় তার অন্তরে একটু কাঙালপনা ছিল। তাই রূপের চেয়েও বোধ করি চিত্রার স্নেহময় ব্যবহারই তাকে বেশী আকৃষ্ট করেছিল প্রথম। প্রথম যেদিন চিত্রা ওর চুলে অপর্যাপ্ত জল দেখে মৃদু অনুযোগের সঙ্গে নিজের হাতে ওর মাথা মুছিয়ে দিলে, সেদিন থেকে মাথা মোছাই প্রায় ছেড়ে দিলে কমল। রোদে ঘুরে মুখ লাল ক'রে ফেরার পর তিরস্কার করেছিল চিত্রা এবং জোর ক'রে ছায়ায় বসিয়ে বাতাস করেছিল—সেই থেকে নিতাই ইচ্ছে ক'রে রোদে দাঁড়িয়ে ঘর্মাক্ত দেহে ফেরে সে।

এমনি ছোটখাটো কাঙালপনায় চিত্রার মনও আর্দ্র হয়ে ওঠে। ভাবে, আহা

কখনও বোনের কি বৌদির সেবা পায় নি। বেচারী! আমার দ্বারা যতটুকু হয় হোক। তাছাড়া চিত্রারও ছোট ভাই নেই। স্নেহ দেবারও সাধ মানুষের কম নয়।

এই ভাবেই ওরা নিজেদের মনকেও বুঝিয়েছিল। বুঝিয়েছিল যে পরস্পরের সাহচর্যে যে আনন্দ ওরা অনুভব করে তা সরল স্নেহের সম্পর্ক ছাড়া আর কিছুই নয়। তাই, পৃথিবীর যে-কোন তরুণ-তরুণী পরস্পরের সান্নিধ্যে সকল সম্পর্কের বাইরে যে একপ্রকার মোহ অনুভব করে, সেই মোহই যে ওদের অবচেতন মানসকে ধীরে ধীরে আচ্ছন্ন, মুগ্ধ ক'রে তুলছিল তা ওরা কেউই বুঝতে পারে নি।...

কিন্তু পৃথিবীর বাকী লোক অত নির্বোধ নয়। অপরে তা বুঝেছিল এবং বুঝিয়েছিল।

কমলের চেয়ে-নেওয়া মেয়াদী এক সপ্তাহের জন্তে চিঠি লিখতে হয়েছিল বাবাকে তিন পৃষ্ঠা। কিছুদিন থেকেই যে একটা স্নায়বিক দুর্বলতা অনুভব করছিল কমল— ওঁরা চিন্তিত হবেন বলে যে দুর্বলতার কথা ওঁদের কিছু বলে নি—সেটা এখানে এসে আশ্চর্য রকম ভাবে কমে গেছে বলেই আর সাত দিন থাকতে চায় সে...ইত্যাদি, ইত্যাদি।

কিন্তু সে সাতদিন যে কত দ্রুত কেটে গেছে তা কমল টের পায় নি। বন্ধুরা চলে যাবার দুদিন পর থেকেই বাইরে যাওয়া ওর বন্ধ হয়ে গেছে। সমুদ্রে স্নান করতে যায় শুধু পাঁচ-সাত মিনিট—আর মধ্যে একদিন মাত্র বাজারে গিয়েছিল। বিকেলে বেড়াতে যায় না—চিত্রার বিপদের অজুহাতে চিত্রাকেই নিরস্ত করে। বলে, 'বলা তো যায় না, বেড়াতে বেরিয়ে ঘুরতে ঘুরতে কোথায় গিয়ে পড়ব, হয়ত একটু দেরি হয়ে যাবে, আর সেই ফাঁকে ওরা যদি তোমাকে ধরে নিয়ে যায়? হয়ত ওৎ পেতে থাকে ধারে-কাছেই, আবছা অন্ধকারে কেউ অত লক্ষ্যও করবে না। তার চেয়ে এই বারান্দায় বসেই হাওয়া খাই।'

অবশ্য বসা আর বেশীক্ষণ হয় না। চিত্রা এসে কাছে বসলেই কোলের কাছে শুয়ে পড়ে বলে, 'কৈ, মাথায় একটু হাত বুলিয়ে দাও, মাথাটা আজও যেন কেমন ধরেছে।'

চিত্রা হেসে বলে, 'হাত বুলিয়ে দেবার লোভে বুঝি তোমার মাথা আজকাল রোজই ধরছে! দুষ্টু ছেলে! কিন্তু হাত বুলিয়ে দেয় সে ঠিকই।

ওদের 'তুমি' বলাটা যে কবে শুরু হয়ে গেছে তা কেউই টের পায় নি। যেদিন প্রথম তথ্যটা ওরা অনুভব করলে সেদিন আর নতুন ক'রে 'আপনি' বলা সম্ভব নয়।...

সুতরাং সপ্তাহের সাত সাতটা দিন তাদের চব্বিশ ঘণ্টার পরমায়ু নিয়ে এত দ্রুত

কেটে যাবে তা কমল কল্পনাও করে নি।

নির্দিষ্ট সোমবারেও কমল না পৌঁছতে ওর বাবা চিন্তিত হয়ে পড়লেন। তার পরের দিনও যখন কেটে গেল তখন আর স্থির থাকতে না পেরে ওর অফিসে গেলেন এবং খুঁজে খুঁজে যে সব সহকর্মীর সঙ্গে কমল বেড়াতে গিয়েছিল তাদের একজনকে বার করলেন। ওর বাবা জানতেন না যে কমল সেখানে একা আছে। অতটা ভেবে দেখেন নি যে, তাঁর ছেলের স্নায়বিক দুর্বলতার জন্য বাকী তিনজনেরও ছুটি নেওয়া সম্ভব কি না। এদের নামগুলো জানতেন তিনি, (কমলকে যাবার আগে বলে যেতে হয়েছিল কাদের সঙ্গে যাচ্ছে সে)···সুতরাং সেক্শন্ না জানা থাকলেও একজনকে শেষ পর্যন্ত খুঁজে বার করা অসম্ভব হ'ল না। এরা ফিরেছে অথচ ছেলে ফেরে নি দেখেই তাঁর উদ্বেগের সীমা রইল না। সে বন্ধুটিও, মানবচরিত্রের স্বাভাবিক রীতি অনুসারে, যে কথাটা বাড়ি বয়ে গিয়ে বলতে চক্ষুলজ্জায় বেধেছিল, সেই কথাটাই আকারে ইঙ্গিতে জানিয়ে দিতে পেরে এত দিনে পরিতৃপ্ত বোধ করল।

কমলের বাব মুখ কালো ক'রে বাড়ি ফিরে তখনই সাতাশটি শব্দ সমন্বিত একটি জরুরী টেলিগ্রাম ক'রে দিলেন। তার বাংলা হচ্ছে এই যে, কমল যদি টেলিগ্রাম পাওয়া মাত্র না ফেরে তো তিনি সস্ত্রীক গিয়ে ছেলেকে উদ্ধার ক'রে আনবেন এবং তাহলে সে ডাকিনীর আর রক্ষা থাকবে না!

টেলিগ্রামখানা যেন নিরবচ্ছিন্ন একটা স্বপ্নকে রূঢ় আঘাত করল।

চমকে উঠে কমল আবিষ্কার করল যে সাতদিন পেরিয়ে আরও দুদিন কেটে গেছে এবং সেটা বুধবার। আরও মনে পড়ল যে অফিসে পর্যন্ত একটা চিঠি দেওয়া হয় নি।

টেলিগ্রামখানা চিত্রা পড়ে নি কিন্তু কমলের মুখে তার প্রতিক্রিয়াটা লক্ষ্য ক'রে সবই বুঝতে পেরেছিল। ঘা খেয়ে খেয়ে অনেক কিছুই শিখতে পেরেছে সে, যা ঐ বয়সে সকলে শেখবার সুযোগ পায় না।

কমলও তার মুখের দিকে চেয়ে—ও যে আসল সত্যের সবটা না হোক অনেকটাই অনুমান করতে পেরেছে সেটা অনুমান ক'রে—মাথা হেঁট ক'রে বলল, 'বাবা লিখেছেন আজ আমি না গেলে তিনি নিজে আসবেন নিয়ে যেতে।' তারপরই কেমন এক রকম অসংলগ্নভাবে বলল, 'অফিসেও একটা চিঠি দেওয়া হয় নি, মাটি করেছে দেখছি!'

চিত্রা কাছে এসে ওর কাঁধে একটা হাত রেখে আস্তে আস্তে বলল, তুমি আজই চলে যাও ভাই। আমার জন্যে আর তোমার ক্ষতি হ'তে দেব না।'

'কিন্তু!' কমল যেন চমকে উঠে বলে, 'কিন্তু এ পাড়ায় যে এখনও কেউ একই

না ! কার ভরসায় রেখে যাবো তোমাকে ?'

'ওঁর ভরসায় ।' ওপর দিকে হাত দেখিয়ে দেয় সে, 'আমার অদৃষ্টে যা আছে তাই হবে ।··· আমি তোমাকে এভাবে ধরে রেখেই অন্যায় করেছি। ভয়ে দিশেহারা হয়ে কী করেছি তা ভাল ক'রে ভেবেও দেখি নি ।'

তারপর একটু থেমে, ঈষৎ গাঢ়স্বরে বললে, 'অবশ্য আমি লাভবানই হয়েছি ; এই কদিনে তোমার যে স্নেহ পেয়েছি তা যদি আরও কিছুদিন বাঁচি আমার জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সম্বল হয়ে থাকবে ।'

কমল তখন আর কিছু বলল না, অফিসে একটা টেলিগ্রাম করা দরকার সবাগ্রে। চট্ ক'রে জামাটা গায়ে দিয়ে বেরিয়ে পড়ল। কিন্তু ফিরে এসে প্রথমেই বলল, 'দিদি, তুমিও তৈরী হয়ে নাও—আমার সঙ্গে যাবে ।'

'সে কি ! আমি কোথায় যাবো ? না, না - সে তোমার বাবা মা ভাববেন হয় তো—'

'হয় তো কেন, নিশ্চয়ই খারাপ কিছু ভাববেন। প্রথমেই যদি তোমাকে নিয়ে গিয়ে তুলতুম, কুড়িয়ে পাওয়া বোন্ বলে হয়ত কিছু ভাবতেন না। কিন্তু কী শুনেছেন আর কতটা শুনেছেন তার ঠিক কি। না, অত বোকা আমি নই। বাড়িতে তুলব না ।'

'তবে ?' আরও বিস্মিত হয় চিত্রা।

'আপাতত কাল এক বন্ধুর বাড়ি তুলব, তারপর একটা বাসা-টাসা দেখে নিতে হবে ।'

'তারপর ?'

'তারপর তুমি একটা চাকরির চেষ্টা দেখবে, যতদিন না পাও তোমার ভাই তো রইলই ।'

'না না—সে বিষম বোঝা হবে তোমার পক্ষে। দুটো প্রাণী এই বাজারে—'

'কতই বা খরচা। আর চিরকাল তো তুমি বসে খাবে না। সে যেমন ক'রে হোক চালানো যাবে, কিন্তু তাই বলে তোমাকে এই অনিশ্চিত অবস্থায় গুণ্ডার দয়ার ওপর কী ক'রে রেখে যাই বলো ।'

'কিন্তু কীই বা রোজগার করব এই ছেলে নিয়ে—'

কমল যেন একটু অসহিষ্ণু হয়ে ওঠে, 'মিছিমিছি কথা কাটাচ্ছ। এখানে যে ভাবে যতটুকু করছিলে সেটুকু কি আর কলকাতায় হবে না ? তেমন একটা ফ্ল্যাট্-বাড়ি দেখে ভাড়া নিতে পারলে সেই বাড়ি থেকেই একপাল ছাত্রছাত্রী জুটে যাবে। ছেলে-

মেয়ের অভাব কি? বিশেষ ঐ রেটে—'

কিন্তু তবুও চিত্রা ইতস্তত করে, 'যদি না জোটে? তুমি এমনি সাহায্য করবে—তোমার বাবা-মাকে কী জবাবদিহি করবে?

'সে তখন ভাবা যাবে। অফিসের পর একটা টিউশনীও তো করতে পারি। কিন্তু এখানে পড়ে থাকলেই বা কি করবে তা ভেবে দেখেছ কি? এই গর্তের মধ্যে—? কোনদিন চাকরি-বাকরি হবার তো সম্ভাবনাও নেই। এ তো নিশ্চিত মৃত্যু!'

তা বটে।

সেটা অনেক দিন ধরেই ভাবছে।

কিন্তু একেবারে এত স্বল্প-পরিচিত তরুণের সঙ্গে চলে যাবে—বলতে গেলে নিরুদ্দেশ যাত্রায়? তার বোঝা হয়ে?

পাথরের মতো নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে চিত্রা।···

কমল ওকে একটা ঠেলা দেয়, 'না—দেখছি আমাকেও ঐ গুণ্ডাদের মতো কিডন্যাপ করতে হবে শেষ পর্যন্ত! নাও, নাও, ঝটপট নাও—'

'কিন্তু এ বাড়ির চাবি?' চিত্রা শেষ একটা অজুহাত খুঁজে বার করে।

'ঠিকানা তো দিয়ে গেছে? সেখানে গিয়ে তাকে পাঠিয়ে দিও। যেমনকার তেমনি। ও বুড়িও নিশ্চয় ঘুষ খেয়েছিল।'···

অগত্যা চিত্রা গোছগাছ শুরু করে দেয়।

পরের গলগ্রহ হওয়াই যখন তার ভাগ্য, তখন আর দ্বিধা রেখে লাভ কি? এমন সুযোগ ছাড়লে আর হয়ত জীবনে আসবে না। ছেলেকে বাঁচাতে হলে এ ছাড়া পথ নেই।

মনকে বার বার এই যুক্তি দেয় চিত্রা।

॥ ২২ ॥

পথে আসতে আসতে কমল ওকে মতলবটা খুলে বললে, 'আপাতত তোমাকে নিয়ে গিয়ে ভবানীপুরে এক বন্ধুর বাড়ি তুলব। রণজিৎ আমার আবাল্য সহপাঠী—ঠিক বন্ধু বলতে ওই একটিই আছে আমার। ওর ওপর আমার যথেষ্ট জোর চলে। তা ছাড়া ওদের পরিবারে লোক কম—ওরা দু ভাই, মা আর বাবা। পরিবারটি খুব শিক্ষিত এবং উদার, ওখানে তোমার কোন অসুবিধা হবে না বলেই আমার বিশ্বাস।···তাছাড়া কদিনই বা—তোমার শান্তিদি কোথায় আছেন যদি খুঁজে না বার করতে পারি, একটা ঘর ঠিক পাবো!'

সে তার অল্প বয়সের সহজাত আশ্বাসে জীবনের উজ্জ্বল দিকটাকেই বিশ্বাস করে। কিন্তু চিত্রা যেন কিছুতেই স্থির হ'তে পারে না। এ কোন্ অনিশ্চিতে পা বাড়াচ্ছে সে কে জানে। কোথায় কোন্ কূলে তার নৌকা ভিড়বে! ট্রেন একটির পর একটি মাইল পিছনে ফেলে কলকাতার দিকে এগোয় আর তার মুখ শুকিয়ে ওঠে।

শান্তিদির চিঠি পায় নি বহুদিন। ওঁর হোস্টেল উঠে গেছে, জিনিসপত্রগুলো একটা কার বড় আস্তাবল ভাড়া ক'রে সেখানে উঠিয়ে দিয়েছেন এবং নিজে গিয়ে সাময়িক ভাবে কোন্ এক ছাত্রীর বাড়ি আশ্রয় নিয়েছেন, এই পর্যন্ত সে জানত। তার পরে আর একখানি কার্ড পেয়েছিল, তাতে লেখা ছিল, 'শেষে চাকরিই নিতে হ'ল চিতু। সামান্য মাইনে। তবে হাল ছাড়ি নি, বাড়ি খুঁজছি, আবারও হয়ত ছাত্রীনিবাস খুলতে পারি।'

ব্যস্। এই পর্যন্তই। আর ও কোন খবর পায় নি তারপর।…

বেচারী শান্তিদি। ওরই বরাতে বোধ হয় তিনি এমন ভাবে বিপন্ন। গুরুদেবের আর সুস্থ হয়ে ওঠবার আশা নেই। যে ওকে দয়া করে তারই মাথায় বিপদ ভেঙে পড়ে। এই ছেলেটি নিয়ে যাচ্ছে, এরই বা কি হবে কে জানে!…

ভবানীপুরে সে-বন্ধুর বাড়ি পৌঁছতেই বোঝা গেল যে তার আশঙ্কাই ঠিক। কমলের বন্ধু রণজিৎ নীরবে একবার চিত্রার ও তার মুখের দিকে চাইল। এবং তারপর ওষ্ঠপ্রান্তে ঈষৎ যে একটি অর্থপূর্ণ হাসি ফুটে উঠল, তা গোপন করবার কোন চেষ্টাও করল না। শুধু বলল, 'তা আমার কাছে কেন—ওপরে যাবি না? মাকে বলবি না?'

'তুই-ই বলিস। আমার মোটে দাঁড়াবার সময় নেই। আমাকে আবার বরা-নগর যেতে হবে—বুঝিস তো?'

সে প্রায় ছুটেই চলে গেল। তাছাড়া সে অতশত লক্ষ্যও করে নি—আশঙ্কাও করে নি। তার মনের মধ্যে উদ্বেগ ছিল তার বাবা সম্বন্ধেই, ট্রেনের সময় তিনি জানেন—বেশীক্ষণ লেট্‌এর অজুহাত দেওয়া চলবে না।

রণজিৎ অবশ্য আর কিন্তু বলল না ওপরে নিয়ে গিয়ে মা'র জিম্মা ক'রে দিতে তিনি অত সহজে অব্যাহতি দিলেন না। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে একবার চিত্রার আপাদমস্তক তাকিয়ে নিয়ে বললেন, 'তুমি কি কমলের কোন আত্মীয়?'

মাথা হেঁট করে চিত্রা বললে, 'না।'

'কতদিনের পরিচয় ওর সঙ্গে?'

'বেশীদিনের না।' মিথ্যা কথা আজও ওর মুখে আটকায়।

'মানে যে কদিন ও পুরী গিয়েছিল সেই কদিনের, না ?'

'হ্যা।'

'এত অল্পদিনের পরিচয়ে কমল এত বড় দায়িত্ব নিলে কি ক'রে ?'

বাতাস কি কোথাও নেই ? এই কটি মিনিটেই চিত্রা যেন ঘেমে নেয়ে উঠেছে। মাথা আরও হেঁট ক'রে জবাব দিলে, 'আমাকে খুব বিপন্ন দেখে হঠাৎ নিয়ে চলে এসেছে, অত কিছু ভাববারও বোধহয় সময় পায় নি। আমারও তখন ভালমন্দ বিচারের সময় ছিল না—'

'বিপন্ন! কী রকম বিপন্ন ?'

এইবার বোধহয় রণজিতেরও চক্ষুলজ্জায় বাধল, সে বললে, 'আঃ, ওসব কথা এখন থাক্ না মা।'

সে-কথা থাকলেও গৃহিণী থামলেন না, 'তোমার তো সিঁথিতে সিঁদুর দেখছি, হাতেও লোহা—তা স্বামী ?'

'তিনি—নিরুদ্দেশ।'

'অ।' অর্থাৎ সবই তিনি বুঝেছেন। তাঁর চোখে ধুলো দেওয়া অত সহজ নয়।

এরপর আর জেরায় পড়ল না বটে, থাকা খাওয়া এবং ছেলেকে খাওয়ানোরও কোন অসুবিধা হ'ল না—আতিথেয়তায় ত্রুটি রাখা তাঁদের পক্ষে ভারী লজ্জার কথা—কিন্তু শুধু কঠিন নীরবতার মধ্য দিয়েই এই মার্জিত ও শিক্ষিত পরিবারটি প্রতিমুহূর্তে তাকে জানাতে লাগলেন যে সে অবাঞ্ছিত অতিথি। সকলেই শুধু নিঃশব্দে তাকায়, কর্তা থেকে শুরু ক'রে চাকর পর্যন্ত। সে তাকানোর একটিই অর্থ, আর তা এই যে—'আমরা সবই জানি। তোমার কেলেঙ্কারি আমাদের জানতে বাকী নেই, এখন তুমি গেলে বাঁচি।'

ওর সঙ্গে কেউ কোন কথা কয় না—নিজেদের মধ্যে হয়ত কথা হচ্ছে, চিত্রা কাছে এলেই সকলে একেবারে নিস্তব্ধ হয়ে যায়।

যেদিন ওরা পৌছল সেই দিনই বিকেল, গৃহিণী কুটনো কুটছিলেন, কাছে এসে চিত্রা কোনমতে মৃদুকণ্ঠে বলেছিল, 'আমাকে দিন না মা—আমি কুটে দিই—'

গৃহিণী যেন সামনে সাপ দেখার মতো শিউরে উঠলেন, 'না না···বাছা তোমাকে আর এসবে হাত দিতে হবে না। কর্তা তাহ'লে আমাকে আর আস্ত রাখবেন না।'

কেন আস্ত রাখবেন না সে প্রশ্ন অনর্থক। আতিথেয়তার ভদ্রতাও হ'তে পারে। কিন্তু অপমানে চিত্রার কানের কাছটা ঝাঁ ঝাঁ করতে লাগল। আস্তে আস্তে ছাদে চলে গেল সে।

আজও অপমান বোধ হয়—আশ্চর্য !

কমল এল দিন-তিনেক পরে একটা সন্ধ্যাবেলায়। চিত্রা ছাদে ছিল তখন —ছাদেই বেশির ভাগ থাকে, গৃহস্বামীদের নিঃশব্দ চাহনির ধিক্কার থেকে আত্মরক্ষা করতে।

কমল একটু অপ্রতিভ ভাবে হেসে বলল, 'এ তিন দিন আর কিছুতেই আসতে পারি নি, বাবা বিষম সন্দিগ্ধ হয়ে উঠেছেন।···চিরদিন তাঁকে ভয় ক'রে এসেছি, সে অভ্যাস আজও কাটাতে পারি নি। আজ কোনমতে খেলা দেখতে যাবো ব'লে ছুটি ক'রেছি।·· তারপর ? ছিলে কেমন ?'

এ কদিনের সহ্যের বাঁধ এক প্রশ্নেই ভাঙ্গল, উত্তর দিতে গিয়ে গলা দিয়ে স্বর বেরোল না ভাল ক'রে -কেমন একরকম বিকৃত স্বরে কোনমতে বলল, 'ভালই।' কিন্তু চোখ দিয়ে ঝর্ ঝর্ ক'রে জল ঝরে পড়ল। সন্ধ্যার সেই অস্পষ্ট আলোতেও কমলের চোখে তা এড়াল না।

সে বিষম ব্যস্ত হয়ে উঠল।

'আ রে, আ রে, ব্যাপার কি ? এঁরা কেউ কিছু বলেছেন ? কোন অপমান করেছেন ?'

মাথা নেড়ে জানাল চিত্রা, 'না।'

'তবে ?'

'এর চেয়ে সে রকম অপমান করলেও বোধ হয় ভাল হ'ত।' সে চোখ মুছে খুব সংক্ষেপে অবস্থাটা খুলে বলল। কিন্তু বেশী কিছু বলাও গেল না। 'এই যে বাবা কমল, কখন এলে ?' বলে রণজিতের মা এসে উঠলেন ছাদে।

'এই তো মিনিট দু-তিন।'

'তারপর ভাল তো সব ? সেদিন তো বাবা এসে দোরগোড়া থেকেই চলে গেলে, তিন দিন পাত্তা নেই।'

সংক্ষিপ্ত কুশল-বিনিময়ের পরই তিনি খুব নৈর্ব্যক্তিকভাবে প্রশ্ন করলেন, 'তোমার এ বোনকে আজ নিয়ে যাবে নাকি ? ওর হয়ত একটু অসুবিধেই হচ্ছে। আমাদের বাড়িতে তো তেমন কেউ নেই সমবয়সী বা গল্প করার লোক। তুমিও আসছ না—'

'বোন' এবং 'তুমিও' শব্দদুটির উপর সামান্যই জোর পড়েছিল কিন্তু আজ আর কমলের কানে তা এড়াল না। সে শুধু বলল, 'না। আজকের দিনটাও থাক্—কাল নিয়ে যাবো।'

'বেশ তো, থাক্ না।' এই বলে তিনি চুপ করলেন কিন্তু নড়লেন না। খানিকটা বৃথা অপেক্ষা ক'রে কমল বলল, 'তাহ'লে ঐ কথাই রইল। তৈরী থেকো—কাল বিকেল নাগাদ এসে নিয়ে যাবো।'

কথাটা ঝোঁকের মাথায় বলে ফেলেছিল কমল। ভেবেছিল আর কিছু ব্যবস্থা না হয়, একটা দিন কোন হোটেল কি ধরমশালায় নিয়ে গিয়ে তুলবে। কিন্তু অতটা কিছু করতে হ'ল না। দৈবাৎ একটা ঘরের সন্ধান পাওয়া গেল। দুপুরবেলা অফিসে ফাইলগুলো খুলে রেখে তার ওপর পেপারওয়েট চাপা দিয়ে পাশের ভদ্রলোকটিকে একটু টিপে দিয়ে বেরিয়ে পড়ল। অফিসে এমন হামেসাই চলে—সবাইকেই কোন না কোনদিন এই পথ ধরতে হয় বলে কেউই কারুর নামে চুকলি খায় না।·· তাই নিশ্চিন্ত হয়ে চলল কমল ঘরের খোঁজে। একটা বড় বাড়ির দোতলায় একটা ছোট্ট ঘর--পাশেই একটু বারান্দা-ঘেরা রান্নার জায়গা। দোতলাতেও বাথরুম আছে একটা। বাকী দুটো ঘরে যাঁরা থাকেন—তাঁরাই পুরো দোতলা ভাড়া নিয়েছেন- এখন এই ঘরটা 'সাবলেট' করতে চান।

ঘরটা মোটের ওপর ভালই। দুটো বড় জানলা আছে, কলকাতার বাড়িতে এর চেয়ে আলো-বাতাস পাওয়া যায় না। তাছাড়া সিঁড়ি দিয়ে উঠে বাঁদিকে এই ঘরটা শুধু—ডানদিকে ওদের ঘর দুখানা। একরকম আলাদা বলা চলে। ভাড়া স্থির হ'ল পনেরো টাকা। কমল তখনই পনেরোটা টাকা বার ক'রে দিলে ভদ্রলোকের হাতে।

'কবে আসবেন?'

'এখনি।'

'এখুনি?' একটু সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে চান ভদ্রলোক, 'কে থাকবেন?'

'থাকবেন--আমার এক দূর সম্পর্কের বোন, আর তাঁর একটি বাচ্ছা ছেলে।'

'ব্যস্? পুরুষ অভিভাবক?'

'কেউ নেই আপাতত। অভিভাবক আমিই।'

'তিনি কি বিধবা?'

'না, তাঁর স্বামী নিরুদ্দেশ।'

'কী করেন?'

'মাস্টারী করতেন, আপাতত চাকরি নেই। খুঁজছেন।'

'তবে মশাই আমি ভাড়া দিতে পারব না। মেয়েছেলের ব্যাপার—ভাড়া ফেললে কে আবার নালিশ-মকদ্দমা করতে যাবে! সে বড় হাঙ্গামা। আর ওদের কি মশাই

ছুকোঁটা চোখের জল ফেললেই পাড়াসুদ্ধ সব একদিকে হবে। তখন আমি হয়ে যাবো দোষী। মাপ করবেন।'

কমল একটু অসহিষ্ণু হয়ে বলল, 'আপনি আমার নামে ভাড়ার রসিদ কাটুন। আমি না হয় এক কলম লিখে দিচ্ছি ভাড়া নিলুম ব'লে। আমি সরকারী অফিসে চাকরি করি—বিশ্বাস না হয় সঙ্গে চলুন, কোন্ ঘরে বসি সব দেখিয়ে দিচ্ছি।'

লোকটি এইবার একটু অপ্রস্তুত হয়ে ব'ললেন, 'না না তা নয়—যা দিনকাল প'ড়েছে, বোঝেন তো। আচ্ছা, দিন আপনার নামেই রসিদ দিচ্ছি। কিন্তু এখনই আসবেন—?

'হ্যাঁ, বিদেশ থেকে এসে এক জায়গায় উঠেছেন, সেখানে বড্ড অসুবিধা হচ্ছে থাকবার।'

কোনমতে সেখানকার পালা শেষ ক'রে কমল ছুটল একটা ট্যাক্সি নিয়ে ভবানীপুর। চিত্রা একরকম প্রস্তুত হয়েই ছিল। দশ-পনেরো মিনিটের মধ্যেই সব ঠিক ক'রে রণজিতের বাবা-মাকে প্রণাম করতে গেল। তাঁরা নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইলেন। যাবার সময়ও একটা সম্ভাষণ জানালেন না। তাঁদের মুখভাব দেখে চিত্রাও সাহস ক'রে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের বা সৌজন্য-প্রকাশের চেষ্টা করল না।

ওদের পৌঁছে দিয়েই কমল ছুটল বাজারে। গৃহস্থালীর খুব প্রয়োজনীয় দু-টারটে জিনিসপত্র—যা ওর মনে পড়ল—কিনে, একটা তোলা উনুন, কিছু কাঠ ঘুঁটে কয়লা পর্যন্ত সংগ্রহ ক'রে, খোকার জন্য একটা টিনের দুধ কিনে রিক্সা ক'রে যখন ফিরল তখন ওর অবস্থা দেখে চিত্রা লজ্জিতও হ'ল, কিন্তু হাসিও সামলাতে পারল না, 'আহা বেচারা! বিয়ে না ক'রেই সংসারের ঝামেলা!'

কমলও হাসল, 'তাই না তাই। এই সব ভয়েই না বিয়ে করতে চাই নি।··· দ্যাখো—যা মনে পড়ল সবই এনেছি, বাকী যা লাগে এ ভদ্রলোকদের তো ঝি আছে, তাকে দুটো চারটে পয়সা দিয়ে আনিয়ে নিও। আর এই নাও, গোটা আষ্টেক টাকা হাতে আছে—রেখে দাও আপাতত।'

টাকা কটা হাত পেতে নিতে চিত্রা মরমে মরে গেল। কিন্তু উপায় কি?

সে শুধু বলল, 'কত টাকা খরচ করছ ভাই? তোমার বাবা জানতে পারবেন না?'

'এখনও সে অবস্থা হয় নি। বরাবরই বাবা কিছু কিছু হাতখরচা দিতেন, এখন তো ভালই দেন, তাই থেকে দু-একটা ক'রে টাকা জমিয়ে পোস্ট-অফিসে রেখেছিলুম। পুরীতে গেছি সেই টাকা ভেঙেই। কাজেই বিশেষ আর কিছু নেই।

আর যা রইল হয়ত মাসখানেক তোমার খরচ চলবে। তারপর অন্য ব্যবস্থা করতে হবে। দেখি, টিউশনী দু-একটা পাই কিনা—। চলি—।'

চিত্রা ব্যাকুলভাবে কী একটা বলতে গেল, বোধ হয় চা খাবার কথাই—কিংবা বিশ্রামের কথা—ক্লান্তিতে উদ্বেগে গরমে ওর চোখমুখ বসে গেছে, সে অবস্থায় ছেড়ে দিতে কষ্টই হয়—কিন্তু কিছু বলবার আগেই কমল বলল, 'বোঝ না—এখন অকারণে বাড়িতে একটা ঝড়ের সৃষ্টি ক'রে দরকার নেই। কাল পরশু কবে বা কখন আসব, তাও বলতে পারছি না, তবে ভেবো না—ঠিক আসব।'

সে প্রায় ঝড়ের মতোই বেরিয়ে চলে গেল।

চিত্রাও বাধা দেবার বিশেষ চেষ্টা করল না। তার তো গৃহস্থালী গোছানোই হয় নি—চা জলখাবার খুব তাড়াতাড়ি হয়েও উঠত না।

কিন্তু তার পরও বহুক্ষণ পর্যন্ত সে স্থির হয়ে বসেই রইল। সংসার গুছিয়ে নিয়ে রান্নাবান্না চাপানোর মতো কোন উৎসাহ তার মনের মধ্যে কোথাও নেই। এ কি করল সে, এর কী পরিণাম—তা কে জানে! মিছিমিছি এই সরল ছেলেটিকেও তার দুর্ভাগ্যের সঙ্গে জড়িয়ে ফেলল হয়ত। হয়ত তার মরাই উচিত ছিল, নয়তো উচিত ছিল সেই লোকটির কাছে আত্মসমর্পণ করা। এমন ক'রে দুরবস্থা ও দুর-দৃষ্টের সঙ্গে অহর্নিশি সংগ্রাম ক'রে কতকাল ভেসে ভেসে বেড়াবে?

ছেলেটা নতুন খেলনা পেয়ে আপন মনে খেলা করছিল কিন্তু অন্ধকার হয়ে আসতেই মা'র কাছে এসে বসল, 'মা রে, খিদে পেয়েছে।'

সচকিত হয়ে উঠে চিত্রা বলল, 'হ্যাঁ বাবা, এই যে উঠি।'

বাড়িওয়ালার স্ত্রী—বাড়িওয়ালাই বলতে হবে,—আসল বাড়িওয়ালাকে তো চিত্রা চেনেই না—বারান্দার পর্দা সরিয়ে এদিকে এসে উঁকি মারলেন, 'এ কি, আপনার তো গোছগাছ কিছুই হয় নি দেখছি। খাওয়া-দাওয়ার যোগাড় কি? ছেলেটা—আজ না হয় আমার ওখানেই হোক না, অবশ্য যদি আপত্তি না থাকে। আমরা বৈদ্য।'

'না না—তার জন্যে নয়। ওসব আমরা মানি না।...তবে কিই বা গোছ-গা করার আছে। নিচ্ছি আমি এখনই সব ঠিক ক'রে।'

ওর ভয়—এই অন্তরঙ্গতার সঙ্গে সঙ্গেই যে অসংখ্য প্রশ্ন বর্ষিত হবে ওর উদ্দেশে—সেই অবাঞ্ছিত প্রশ্নগুলিকে।

সে উঠে পড়ে তাড়াতাড়ি জিনিসপত্রগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করতে থাকে।

কিন্তু বাড়িওয়ালী মানুষটি ভালই। তিনি বলে ওঠেন, 'না না ভাই—আজ আ

আঁচ দেবেন না। ফুড কিছু আছে তো? আমি গরম জল দিয়ে যাচ্ছি, ছেলেটাকে একটু কিছু খাইয়ে দিন। আর আপনার মতো খানকতক রুটিও গড়ে দিয়ে যাচ্ছি। বেশী দেরি হবে না- আটটার মধ্যে আমি সেরে ফেলি।'

তিনি আর দাঁড়ালেন না। চিত্রাও যেন বাঁচল। ওর হাত-পা এমনিতেই শিথিল হয়ে আসছিল।

॥ ২৩ ॥

কমল এল দিন-দুই পরে একদিন দুপুরবেলা। ক্লান্ত, ঘর্মাক্ত দেহে এসেই এলিয়ে পড়ল চিত্রার বিছানায়।

চিত্রা দুদিনেই কিছু উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিল বৈকি! তবে বহু উদ্বেগের সুফল এই যে কিছুদিন পরে আর তা মানুষকে অনড় করতে পারে না। বিচলিত তো করেই না।

কিন্তু ওকে আসতে দেখে চিত্রার যে আনন্দ হ'ল আজ, তা যে ঠিক শুধুই তার স্বার্থ-জড়িত উদ্বেগ থেকে অব্যাহতির জন্য তা নয়—আজ প্রথম সে অনুভব করল, এই ছেলেটি তার অন্তরের অনাবিল প্রীতিও খানিকটা দখল ক'রে বসেছে।

সে যাই হোক—আনন্দ-উদ্বেগ-উচ্ছলতা কিছুই সে প্রকাশ করল না। একটা কথাও কইল না। ওর অবস্থা দেখে নিঃশব্দে উঠে গিয়ে একটা পাখা এনে জোরে জোরে বাতাস করতে লাগল। কমলও সৌজন্য প্রকাশের চেষ্টা করল না, বরং মনে হ'ল এই সস্নেহ সেবা সে তার সমস্ত মন-প্রাণ দিয়ে উপভোগ করছে।

একটু পরে সুস্থ হয়ে কমল চোখ খুলে উঠে বসল। পাখা নামিয়ে রেখে চিত্রা নিজেই ওর জামা গেঞ্জি খুলে নিয়ে বাইরে মেলে দিয়ে এল, ভিজে গামছা দিয়ে ওর মাথা মুখ মুছে দিয়ে আবারও পাখা নিয়ে বসল হাওয়া করতে।

কমল এইবার প্রথম কথা কইল। একটু যেন অপ্রতিভ ভাবে হেসে বলল, 'জানো, এমন সেবা বা স্বাচ্ছন্দ্য আমি জীবনে কারুর কাছে থেকে পাই নি। আমার যেন কেমন অবাক লাগছিল। তুমি এসব শিখলে কোথায়?'

তরুণ পুরুষের সান্নিধ্য, পরিশ্রমতপ্ত পুরুষদেহের একটা বিশেষ গন্ধ চিত্রাকে যেন ক্ষণকালের জন্য উন্মনা, মোহগ্রস্ত ক'রে তুলেছিল। কমলের প্রশ্নে তার সম্বিৎ ফিরে এল। নিজের কাছেই লজ্জিত হয়ে পড়ল যেন। তাড়াতাড়ি উত্তর দিল, 'কোথাও শিখি নি। কেউ তো ছিল না, শিখব কার কাছ থেকে? আর আমার মনে হয় এটা মানুষ শেখে নিজের অন্তরের তাগিদে।'

'নাঃ! তুমি অপূর্ব!

'আচ্ছা আচ্ছা, হয়েছে। আর বাজে কথায় কাজ নেই। অত খোসামোদ কেউ চায় নি তোমার কাছে।'

'নাঃ, সত্যি।'

একটুখানি চুপ করে থেকে কমল বলল, 'দুদিন খুব ভাবছিলে তো?'

'ভাবি নি বললে মিছে কথা বলা হবে। তবে খুব যে ভেবেছি তাও নয়। চিন্তাটা বেশী তোমার জন্যেই—'

'হুঁ। সেটা খুব অকারণও নয। বাবা সেদিনের বিবরণ সবই শুনেছেন, অফিসেরই বোধ হয় কেউ গোয়েন্দাগিরি করছে। তিনি কিছু বলেন না কিন্তু মা রাত্রে কান্নাকাটি করছিলেন। এমন বিশ্রী ব্যাপার!'

বিমর্ষ ও চিন্তিত মুখে সে চেয়ে রইল বাইরের দিকে।

মাথা হেঁট করে বসে ছিল চিত্রা। একটু পরে সে আস্তে আস্তে বলল, 'তুমি আমাকে ছাড়, আমাকে উপলক্ষ ক'রে এত বড় অভিশাপ জীবনে ডেকে এনো না।'

'অভিশাপ জীবনে আসবেই—সেইটে বুঝতে পেরেছি। বাপ-মার এক সন্তান হওয়াই যে সবচেয়ে বড় অভিশাপ। ছেলেবেলায় মহাভারতে এই একছেলের ব্যাপার নিয়ে একটা গল্প পড়েছিলুম—অত বুঝি নি তখন, এখন বুঝছি। আমি যদি বিয়ে ক'রে বউ ঘরে আনি, তাহলেও আমার বাড়িতে অশান্তির আগুন জ্বলবে। এ ঈর্ষা। স্নেহ যেখানে যত বেশী সেখানে তত কৃপণতা তার ভাগ নিয়ে।'

'কিন্তু দুটো তো এক ব্যাপার নয়। স্ত্রীর কথা আলাদা, আমি কে, জীবনে হঠাৎ এসে পড়েছি, হঠাৎ চলে যাব—তার জন্যে মিছিমিছি কেন—'

কমল যেন বাধা দেবার ভঙ্গীতে একটা হাত তুলে ক্লান্ত সুরে বলল, 'কে জানে, এখন ওসব হিসেব থাক। মন বড় বিচিত্র জিনিস, কতকটা বোধ হয় চক্রব্যূহের মতো। সেখানে ঢোকা যায় যত সহজে, তত সহজে বেরনো যায় না·· এখন একটু চা খাওয়াবে কি? ছুটির পর আসতে পারব না বলে অফিসেরই একটা কাজ ঘাড় পেতে নিয়ে বেরিয়ে পড়েছি। ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটেছি বলতে গেলে—সে কাজ সেরে এখানে পৌঁছেছি আধঘণ্টার মধ্যে। আবার ছুটির আগে অফিসে ফিরে যেতে হবে।'

শুধু চা নয়, কাঠ জেলে তাড়াতাড়ি চিত্রা কিছু খাবারও ক'রে দিল। রান্নার জায়গাটা যদিও বাইরে তবু ঘর থেকেই অনেকটা দেখা যায়। কমল মুগ্ধ দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল কেমন অনায়াস-নিপুণতার সঙ্গে হাত চলছে

চিত্রার।··

হঠাৎ এক সময় কাজের ফাঁকে চোখ তুলে কমলের সেই প্রায়-অপলক দৃষ্টিটা চোখে পড়ল চিত্রার। আরও একজন এমনি ভাবে তাকিয়ে থাকত ওর রান্নার সময় —নরেশ। সঙ্গে সঙ্গে এতদিন পরে অনেকদিনের নিরুদ্ধ বেদনা ও অভিমানে ওর দুটো চোখ জলে ভরে এল।

এখানে এসে আর চিঠি দেয় নি চিত্রা। দশ টাকাতে যখন ওর চলবেই না, তখন আর হাত পেতে সে অপমানের ভিক্ষা নিয়ে কাজ নেই। যা আছে অদৃষ্টে থাক্। মনিঅর্ডার ফিরে গেলেই নরেশ বুঝবে—নিশ্চিন্তও হবে।

খেতে খেতে কমল বলল, 'কদিন পরে তোমার কাছে খেতে বসে পুরীর কথা মনে হচ্ছে, না?'

চিত্রাও মুচকি হেসে বললে, 'একটু আগেই মনে হচ্ছিল। আমার আবার কী স্পর্ধা—আজই দুপুর বেলা নিজে খেতে বসে মনে হ'ল একবার যে, হয়ত বাড়িতে তোমার ভাল ক'রে খাওয়া হচ্ছে না। সঙ্গে সঙ্গে নিজের ধৃষ্টতায় নিজেই লজ্জায় মরে গেলুম।'

কমল অন্তমনস্কভাবে চেয়ে রইল ওর মুখের দিকে, কোন উত্তর দিল না।

সেদিন যাবার সময় কমল বলেই গিয়েছিল, 'ক'দিন যদি আসতে না পারি তো ভেবো না।' কিছু টাকাও সেই জন্যে সে প্রায় জোর ক'রেই ওর হাতে গুঁজে দিয়ে গিয়েছিল। বাড়িওলাদের ঝিয়ের সঙ্গে একটা চুক্তি হয়ে গিয়েছে—বাজার-হাটের দুর্ভাবনা ছিল না।

তবু পাঁচ-ছদিন চলে যাবার পর চিত্রার মুখটা একটু শুকিয়ে উঠল। অথচ কী করবে তাও ভেবে পায় না। অকস্মাৎ ও আবিষ্কার করল যে কমলের বাড়ির ঠিকানা সে জানে না—অফিসের নামটা জানলেও সেকশ্যন প্রভৃতি কিছুই জানা নেই তার।

অবশ্য বাড়ির ঠিকানা জানলেই বা কি সুবিধা হ'ত। বাড়িতে চিঠি লেখা সম্ভব নয়। রণজিতের ঠিকানায় চিঠি দেবে? তার বাবা-মায়ের পাথরের মতো কঠিন মুখ মনে পড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে ইচ্ছা দমন করল।·· বিশ্বাস কারও ওপরই আর নেই, মানুষকে চেনে এমন অহঙ্কার জীবনে প্রকাশ করবে না সে—তবু এক-একসময় কমলের উজ্জ্বল তরুণ মুখখানা মনে প'ড়ে নিজের সংশয় ও উদ্বেগের জন্য নিজেই যেন

লজ্জিত হয়ে পড়ে। সব মানুষ কিন্তু এক ধাতুতে গঠিত নয়।

অবশেষে সপ্তম দিনে যখন রীতিমতো বিচলিত হয়ে উঠেছে চিত্রা, তখন রাত আট:ার পর কমল কোথা থেকে এসে উপস্থিত হ'ল। কুঁচোনো দেশী ধুতি পরনে—গায়ে সিল্কের পাঞ্জাবি, মুখেও প্রসাধনের চিহ্ন সুস্পষ্ট। একেবারে উৎসবের বেশ।

সে বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করল, 'এ কী, এত রাত্রে, এ বেশে? বিয়ে করতে যাচ্ছ নাকি?'

কমল সকৌতুকে হাসতে লাগল।

'কতকটা তাই বটে, ক'দিন আর বেরোতে পারি না কিছুতেই। বুড়ো আজকাল অফিসের কাছে এসে দাঁড়িয়ে থাকে আড়ালে। হঠাৎ মনে পড়ে গেল আজ বিয়ের দিন। এক কলেজের বন্ধুর বিয়ে বানিয়ে ফেললুম সঙ্গে সঙ্গে—সে নামে কোন বন্ধুই নেই। তারই নেমন্তন্ন খেতে এসেছি। আবার পরশু বৌভাতের সুযোগটা পাওয়া যাবে—উপহারের নাম ক'রে কটা টাকাও বেরিয়ে আসবে।'

কৃত্রিম কোপে চিত্রা তর্জন ক'রে উঠল, 'ও কি, বাপ-মায়ের সঙ্গে জুচ্চুরি? দুষ্টু ছেলে!'

কমলও কৃত্রিম বিনয়ে হাত জোড় ক'রে বলল, 'তোমা লাগি করিয়াছি পাপ, দেবি, তুমি দণ্ড দাও।...এখন যাও দেখি কিছু খাবার যোগাড় করো গে। নেমন্তন্ন বলে বেরিয়েছি, বাড়ি গিয়ে কিছু খাওয়া চলবে না।'

চিত্রা বলল, 'কিন্তু সে ক্ষতিপূরণ কি আর করতে পারব? মাছের কালিয়া দই মিষ্টি কোথায় পাবো?'

'সে ক্ষতি পূরণ হবে—দেবি তব নত-নেত্র-কিরণসম্পাতে।' বলেই সে যেন অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল, তাড়াতাড়ি সেটা ঢাকবার জন্যে বলল, 'আমায় একখানা কাপড় দাও, এ কাপড়-জামা সাবধানে খুলে রাখি, নইলে নাট্ হয়ে যাবে।'

খোকা বহুক্ষণ ঘুমিয়ে পড়েছে। কমলকে খাইয়ে চিত্রা কমলের কাছে এসে বসতে কমল ওর কোলে মাথা দিয়ে শুয়ে পড়ল।

'তুমি খেলে না?'

'পরে খাবো, তুমি তো এখনই চলে যাবে। একটু কাছে বসি।'

'তা বটে। একটু মাথায় হাত বুলিয়ে দেবে? সেই পুরীর মতো?'

'সে লোভ এখনও আছে?' চিত্রা হেসে ওর চুলের মধ্যে আঙুল চালিয়ে দেয়। নিস্তব্ধ হয়ে এসেছে গলির মধ্যে, বাড়িওয়ালাদের ঘড়িতে দশটা বাজল। তারাও

শুয়ে পড়েছে এতক্ষণে। সকাল ক'রেই ওরা শোয়।

কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছে দুজনেই, কথাও বন্ধ হয়ে গেছে, চুপচাপ।

হঠাৎ এক সময় কমল প্রায় চুপি চুপি বলে, 'তুমি খুব ভয় পেয়েছিলে, না? এই দুদিন আসি নি বলে?

চিত্রাও তেমনি চুপিচুপি, কেমন যেন ধরা গলায় বলল, 'পেয়েছিলুম একটু—সত্যিই।'

কমল ওর হাতখানা টেনে নিয়ে নিজের চোখ দুটোর ওপর চেপে ধরে বলল, 'আমার মনে হয় তোমার আর ভয় পাবার কারণ নেই—কোনদিনই। আসি বা না আসি—আমার পক্ষে তোমাকে ভুলে থাকা সম্ভব নয়।'

নিশীথ নির্জন রাত্রে মনের ওপর এক-একটা কথার, এক-একটা বিশেষ কণ্ঠস্বরের অদ্ভুত প্রতিক্রিয়া হয়। চিত্রার মনে হ'তে লাগল, ওর বুকের স্পন্দন যেন অকারণে বেড়ে যাচ্ছে, দেহের মধ্যকার রক্তস্রোত হয়ে উঠছে চঞ্চল। আকারহীন উত্তেজনায় ও অজ্ঞাত আশঙ্কায় ওর কপালে ঘাম দেখা দিল। দেখতে দেখতে জামাটা ভিজে উঠল ঘামে। লক্ষ্য করল কমলের ললাটও আর্দ্র হয়ে উঠেছে। ওর রক্তের চঞ্চলতা কপালে হাত দিয়েই বোঝা যায়।

কমলের মাথাটা কোল থেকে একরকম তুলে ধরেই বলল, 'এইবার বাড়ি যাও, রাত হয়ে যাচ্ছে। বরানগর যেতে হবে তো।'

কমলও বোধ হয় নিজের ভাবপ্রবণতায় লজ্জিত হয়ে পড়েছিল, 'হ্যাঁ, যাই' বলে উঠে কাপড়-জামা পরে প্রায় নিঃশব্দেই বেরিয়ে গেল।

॥ ২৪ ॥

চিত্রার উপার্জনের কোন চেষ্টাই হয় না। দরখাস্ত খান-কতক করেছে সে নিজে-নিজেই—বাড়িওয়ালার কাছ থেকে খবরের কাগজ চেয়ে এনে,—কিন্তু তাতে বিশেষ ফল হয় নি। দু'একটা উত্তর আসে নি যে তা নয়—তবে সে সব সামান্য বেতনের কাজ, তাতে ছেলের জন্যে ঝি রেখে চাকরি করা চলে না। কমলেরও এদিকে তেমন গা নেই যেন, তাগাদা দিলে বলে, 'কেন, ছেলেটাকে ভাসিয়ে না দিলে চলছে না বুঝি?'

ছেলের কথাও চিত্রা ভেবেছে। ঝিয়ের কাছে রেখে গেলে অযত্ন হবে এটাও ঠিক কিন্তু তাই বলে চিরকাল এমনি ক'রে কমলের গলগ্রহ হয়ে থাকবে? কমল কোথা থেকে যে টাকা যোগাচ্ছে, তা সে-ই জানে, তবে তার যে কষ্ট হচ্ছে সে

তথ্যটা ওর মুখের দিকে চেয়েই বুঝতে পারে। কিন্তু কী করবে তাও তো ভেবে পায় না।

তার ওপর দেখতে দেখতে সারা শহরে একটা আতঙ্কের কালো পর্দা নেমে এল। জাপানীরা বোমা ফেলবে। পালানো উচিত।

একদিন চিত্রার বাড়িওয়ালারা এসে জানালেন যে তাঁরা পালাচ্ছেন—কোথায় খুসরুরা না কোন্ জায়গায় বাড়ি পেয়েছেন। চিত্রা যদি থাকতে চায় তো ভালই, গোটা বাড়িটাই ভোগ করতে পারে সে, ভাড়া না দিলেও তাঁরা দুঃখিত হবেন না। আর না হ'লে অন্য ব্যবস্থা করতে হবে তাঁদের।

চিত্রা আর কোথায় পালাবে? তার স্থান কোথায়?

শান্তিদির খবর পেয়েছে সে, তিনি মফঃস্বলের এক মেয়ে-হোস্টেলে চাকরি পেয়েছেন: কিন্তু আবার তাঁর জীবনকে বিড়ম্বিত করা। না। তার চেয়ে অদৃষ্টে যা আছে তা-ই হোক। বোমা পড়ে তো সে বরং বাঁচবে। বাড়িওয়ালারা এমনি খুব ভদ্র, তবু গিন্নী মধ্যে মধ্যে এসে আলাপ করার ছলে বহু প্রশ্নই করেন এবং আনাড়ী চিত্রা মিছে কথা বলার ব্যর্থ চেষ্টা করলে মুচকি হাসেন। অর্থাৎ বুঝিয়ে দেন যে সবই তিনি বুঝছেন, শুধু কিছু বলতে চান না, তাই চুপ ক'রে থাকেন।

কমল সংবাদ পেয়ে খুশীই হ'ল, 'বাঁচা গেল, নির্ভয়ে আসা-যাওয়া করা যাবে। কেবলই মনে হবে না যে চার-পাচ জোড়া চোখ নিঃশব্দে আমাকে অনুসরণ করছে!'

'তুমি কোথাও যাবে না?' প্রশ্ন করে চিত্রা, 'যাওয়াই তো উচিত!'

'বেশ বলেছেন মশাই, আমার অফিস?'

'ছুটি নাও।'

'হ্যাঁ, অফিসটা মামার বাড়ি কি না!'

একটু থেমে কী যেন ভেবে নিয়ে বলে, 'বরং বুড়োবুড়ীকে ভয় দেখিয়ে বাইরে কোথাও পাঠাতে পারলে মন্দ হয় না। এই মওকা—দিন-কতক নিশ্চিন্ত হয়ে তোমার এখানে আশ্রয় নিই।'

সে সম্ভাবনাটা চিত্রাও ভেবে দেখেছে। ওর বুক কেঁপে ওঠে।

ইদানীং কমলের মনোভাবটা আর চিত্রার কাছে অস্পষ্ট নেই। 'দিদি' বলে ডাকা সে অনেকদিনই ছেড়ে দিয়েছে। দু-একদিন 'চিত্রা' বলে ডাকবার চেষ্টা করেছিল, চিত্রার তিরস্কারে সেটা আর করে না কিন্তু সম্বোধনও করে না কিছু। নানা কৌশলে সেটা এড়িয়ে যায়। অথচ ওর ব্যবহারে এমন কোনও অশিষ্টতাও প্রকাশ পায় নি; কোনদিন চিত্রার জন্য নিঃশব্দে কতটা স্বার্থত্যাগ ক'রে যাচ্ছে সে, কত

রকম ক'রে ওদের এই নিরাপদ আশ্রয় আর অন্ন যোগাতে হচ্ছে ওকে—আকারে-ইঙ্গিতেও সে কথার উল্লেখ করে নি। চিত্রা ঠিক না জানলেও সে স্বার্থত্যাগের পরিমাণ অনুমান করতে পারে। সুতরাং বেশী কঠিন হওয়া সম্ভব নয় ওর পক্ষে, বেশী এড়িয়ে যাওয়াও সাধ্যাতীত। তবু তো আজকাল আর কাছে বসা বা মাথা টিপে দেওয়া—এগুলো ছেড়েই দিয়েছে।

কিন্তু ভয় যে ওর নিজেকেই।

তরুণ সুশ্রী বলিষ্ঠ—একান্ত ভাবে তদ্গত-প্রাণ। চিত্রার জন্যে বাবা-মা স্বজন বান্ধব সব ছাড়তে বসেছে। কে সে? পরস্যাপি পর বই তো নয়। ওদের স্বাচ্ছন্দ্য যোগানোর জন্যেই প্রাণপাত পরিশ্রম করছে, দিনরাত ভাবছে। দিয়ে যায় কিন্তু প্রতিদান দাবী করে না, ভালবাসে কিন্তু ভালবাসার আশা রাখে না। ওর এই আত্মলেশহীন ভালবাসার গভীরতাকেই ভয় করে চিত্রা। ভয় পায় ওর সঙ্গে নির্জন বাড়িতে দীর্ঘকাল থাকার সম্ভাবনায়।

কেমন একটা অসহায় ক্ষীণকণ্ঠে বলে, 'তোমাকে ছেড়ে তোমার বাবা-মা কোথাও যেতে রাজী হ'লে তো?'

কমলেরও সে ভয় ছিল মনে, সে বলল, 'চেষ্টা করতে হবে রাজী করাতে। দিন-রাত এমন ক'রে মিছে কথা বলা আর পেরে উঠছি না।' কথাগুলো বলতে বলতে শেষের দিকে গম্ভীর হয়ে যায় সে।

চিত্রাও একটু চুপ করে থেকে বলে, 'তবে আমাকেই ছাড়। এতকাল তুমি যখন ছিলে না তখনও তো আমার দিন কেটেছে—পরেও কাটবে।'

মনস্থির ক'রে ফেলার ভঙ্গীতে কমল বলে, 'সে আর হয় না।'

বাড়িওয়ালা সত্যিই চলে গেলেন একদিন। বাড়ি নির্জন হ'ল। এখন কমল এলে চিত্রা চারিদিকের জানলাগুলো ভাল ক'রে খুলে দেয়। পর্দা দেয় সরিয়ে, গোপনতা কোথাও কিছু না থাকে।

প্রথমটা কমল বুঝতে পারত না। একদিন বুঝতে পারল। ঈষৎ আহত কণ্ঠে বললে, 'অত ক'রে জানলা খুলে দিচ্ছ কেন? তুমি—তুমি কি আমাকে অবিশ্বাস করো?'

উত্তর দিতে গলা কাঁপে, মাটির দিকে চেয়ে বললে, 'না—অবিশ্বাস করি আমাকেই।'

'সত্যি বলছ?' কী ঐকান্তিক আগ্রহ ওর কণ্ঠে!

'সত্যিই বলছি।'

এ কথা থেকে কমল কি আশ্বাস পায় তা সে-ই জানে কিন্তু তার মুখ খুশিতে ঝলমলিয়ে ওঠে।

উত্তেজিতভাবে উঠে খানিকটা পায়চারি করে কমল, তারপর হঠাৎ কাছে এসে ওর দুটো কাঁধে হাত রেখে মুখোমুখি হয়ে দাঁড়ায়। ওর সুডৌল ললাটে ঘাম দেখা দিয়েছে, ঠোঁট দুটো কাঁপছে একটু একটু। চিত্রার কাঁধটা ওর বলিষ্ঠ হাতের মুঠির মধ্যে টনটনিয়ে ওঠে, এত জোরে চেপে ধরেছে সে।

ওর মুখের দিকে চেয়ে কমল বলে, 'কিন্তু সত্যিই কি এর প্রয়োজন আছে? তুমি বাগচির সঙ্গে তোমার বিয়ে নাকচ করিয়ে নাও—আমি, আমি রাজী আছি—'

ব্যাকুল হয়ে উঠে চিত্রা ওর মুখটা হাত দিয়ে চেপে ধরে, 'ছি!'

কেমন একরকম অপ্রতিভভাবে কমল সরে আসে ওর কাছ থেকে। একটু পরে বাড়ি থেকেও বেরিয়ে যায়।...

এরপর দু-তিনদিন কমল এলো না। এত বড় বাড়িতে একা থাকা—ঐটুকু বাচ্ছাকে নিয়ে, ভয়-ভয় করে ওর। ঝি আসে না। বাড়িওয়ালাদের ঝি—তাঁদের সঙ্গে চলে গেছে। বাজারহাট করার খুব বেশী দরকার হয় না, এই যা ভরসা। সামনের মুদির দোকানে জানলা থেকে বললে, মাল বাড়িতে দিয়ে যায়—কিন্তু তবু—

ভবিষ্যতের জন্যেও ভয় করে না কি? কমল দু-চারদিন না এলে এ ভয়ও কি ওর মনে উঁকি মারে না যে আর হয়ত সে কোনদিনই আসবে না, বাপ-মা তাকে আটকাতেই পেরেছে? হ্যাঁ, সে ভয় করে ঠিকই, তা আর অস্বীকার করার উপায় নেই—কিন্তু তার চেয়েও বেশী ভয় ওর কমলের জন্যে। নিজের ভবিষ্যতের কথা আজকাল যেন তত ভাবে না, কতকটা বেপরোয়া হয়ে গেছে। কিন্তু কমলকে আর দেখতে পাবে না, এটা যেন ভাবতেও পারে না আজকাল। কবে কখন এবং কেমন ক'রে যে কমল ওর সত্তার সঙ্গে জড়িয়ে গেছে তা চিত্রা বুঝতে পারে নি, এখন সত্যটা অনুভব করে। অনুভব করে যে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ওর কান কার বলিষ্ঠ পায়ের শব্দের দিকে পাতা থাকে—কার আগমন-প্রতীক্ষায় আশা ও আশঙ্কাতে তার বুক কাঁপে অহরহ। এ যে কী বেদনা তা কাউকে বোঝাবার নয়। সে কমলকে যেমন দিনরাত কাছে পেতে চায় তেমনি চায় দূরে—বহুদূরে সরিয়ে রাখতে। ক্রমেই যেন বড় দুর্বল হয়ে পড়ছে—

অবশেষে কমল যেদিন এল সেদিন আর মনের আবেগকে চাপা গেল না কিছুতেই। উদ্বেগ-শঙ্কা-স্নেহ একসঙ্গে যেন চোখের জলে উপ্‌চে উঠল, ছুটে এসে ওর দুটো হাত ধরে চিত্রা বলল, 'এমন ক'রে ভাবাতে হয়? নির্জন পুরীতে আমার দিন কাটে কী ক'রে বলো তো?'

কমল প্রথমটা যেন থতমত খেয়ে গিয়েছিল। তারপর বলল, 'আমি তো তোমার কাছেই থাকতে চাই— কিন্তু তুমি কী রাজী হবে?'

চিত্রা সামলে নিল নিজেকে। কমলের কণ্ঠে সমস্ত অভিমান ছাপিয়ে প্রকা পেয়েছে এক বিপুল সীমাহীন অথচ নিস্তরঙ্গ প্রেম। নিস্তরঙ্গ বলেই চিত্রার ভয়। সে প্রাণপণে গলা সহজ ক'রে নিয়ে বলল, 'এখন বসো তো। আচ্ছা মা বটে। চা খাবে?'

চা ও খাবার ওর সামনে সাজিয়ে দিয়ে কাছে এসে বসতেই কমল তার পূর্ব প্রশ্নের জের টেনে বলল, 'কই, উত্তর দিলে না?'

গলা জড়িয়ে আসে চিত্রার, তবু সে না বোঝবার ভান ক'রে বলল, 'কিসের?'

'এই—এখানে এসে থাকব কিনা?'

অন্য দিকে চেয়ে চিত্রা বললে, 'না।'

'কিন্তু এমন ক'রে সত্যিই আমি আর পারছি না। তুমি জানো না বাড়িতে কি অশান্তি শুরু হয়েছে, প্রতিটি স্টেপ আমার ওপর নজর রাখা হয়—রোজ রোজ খেপাখেচি।'

'আমাকে ছাড়—আমি তো বলেছি।'

'তাই ভেবে আকুল হচ্ছিলে চার-পাঁচ দিনেই?' কমলের কণ্ঠে কি সামান্য একটু বিদ্রূপ ফোটে।

চিত্রার মুখ-চোখ যে লাল হয়ে উঠেছে তা সে নিজেও অনুভব করে। সামলাতেও একটু সময় লাগে। খানিকটা পরে যতটা সম্ভব নিরাসক্ত কণ্ঠে বলে, 'আসবার কথা থাকে বলেই ভাবি—না থাকলে ভাবতুম না।'

কমল ছেলেমানুষ। তার আর অভিমান চাপা থাকে না, 'তুমি জানো আমি তোমাকে ছেড়ে থাকতে পারব না—আমার আর উপায় নেই, তাই তুমি অনায়াসে অবহেলা করো।'

চিত্রা এবার দৃঢ়ভাবে ঘাড় নাড়ে, 'আমি ঠিক তার উলটোটাই জানি। এমন কোন হৃদয়াবেগ নেই যা মানুষ দমন করতে না পারে। এ তোমার দুদিনের মোহ—দুদিনেই ভুলতে পারবে। সময়ের তুল্য ওষুধ আর নেই—তা তো জানো। আমার

তি, তুচ্ছ একটা মেয়েছেলের জন্যে জীবনকে এমন ভাবে বিড়ম্বিত করো না।'

কমল কিছুক্ষণ মুখ গোঁজ ক'রে বসে থেকে বলে, 'কিন্তু তোমার আপত্তিই বা কি? আমি তো তোমায় বিয়ে করতে চাইছি!'

বুকের কাছটা ধ্বক্ ক'রে ওঠে চিত্রার। কিন্তু সাগরের তরঙ্গ বেলা-ভূমি অতিক্রম করে না। বুকের সে উত্তাল ঢেউ মুখে প্রকাশ পায় না। সে তেমনি নিস্পৃহ কণ্ঠেই বলে, 'বিয়েতে আর আমার রুচি নেই।'

'সবাই তোমার নরেশ বাগ্‌চি নয়।'

'তা হয়ত না হ'তে পারে কিন্তু আমি আর রিস্ক নিতে চাই না। বার বার আশাভঙ্গের বেদনা সহ্য করার চেয়ে নিরাশায় ডুবে থাকাই ভাল।'

'বেশ, বলো কী প্রমাণ চাও! কোন্ প্রমাণে বিশ্বাস হবে তোমার বলো। রও কি চাও তুমি, তোমার জন্যে বাপ-মা আত্মীয় স্বজন বন্ধু-বান্ধব সব ছেড়েছি। তোমার নরেশের মতো সব কুল বজায় রাখতে তো চাই নি!'

'আমি কিছুই চাই না—কোন প্রমাণে আমার শখ নেই।' কথা কইতে কইতে কেমন যেন ব্যাকুল হয়ে ওঠে চিত্রা, 'লক্ষ্মী ভাইটি, তুমি আমাকে ছাড়ো। তুমি সুখী হও, নিশ্চিন্ত হও—এর চেয়ে বড় প্রার্থনা আমার আর নেই। দিন রাত ঈশ্বরকে শুধু এই কথাই জানাচ্ছি যে আমার দ্বারা তোমার আর কোন অনিষ্ট না হয়।'

বলতে বলতেই দুই চোখের কূল বেয়ে অনিচ্ছার সব বাধা অতিক্রম ক'রে জল ঝরে পড়ে ঝর্ ঝর্ ক'রে।

ওর সেই চোখের জল আর মুখের ভাব দেখে কমল সাহস করে না বেশী কিছু বলতে, নীরবে নতমুখে চা খাওয়া শেষ ক'রে উঠে যায়।

এর দিন-দুই পরেই এক রাত্রে চিত্রার কড়া নড়ে ওঠে কট্ কট্ ক'রে। ভয় পাবারই কথা—কিন্তু কে জানে কেন ওর ভয় হয় না। ওর মন বলল—আগন্তুককে সে চেনে, তাড়াতাড়ি গিয়ে দোর খুলে দেখে কমল। ওর হাতে একটা স্যুটকেস, আর এক হাতে খবরের কাগজে মোড়া একটা প্যাকেট।

'এ কী ব্যাপার? কোথায় চললে?'

সহজ-ভাবে বললেও পা-দুটো যেন কেমন দুর্বল হয়ে আসে চিত্রার, বুকটা কাঁপে একটু একটু।

'আর কোথাও যাবো না বলেই এসেছি। সব পাট চুকিয়ে দিয়ে এলাম চিত্রা!'

চিত্রা শব্দটা যেন একটু জোর ক'রেই উচ্চারণ করল।

'তা– তার মানে ?'

'চলো—বলছি।'

একরকম ওকে ঠেলেই ভেতরে এসে স্যুটকেসটা নামিয়ে রাখল কমল। তারপর হাত-পা মেলে বিছানায় শুয়ে পড়ে বলল, 'ওদিকের আশ্রয় ঘুচিয়ে দিয়ে এসেছি চিরকালের মতো। বাবা মাকে একেবারে জবাব দিয়ে এসেছি। তুমি ছাড়া আমার অন্য পথ অন্য মত নেই—এটা স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছি। আর আমার কোন আশ্রয় কোন অবলম্বন নেই। ভেবে দেখলুম কোন দ্বিধা থাকতে আশ্রয় গ্রহণ করা তোমার পক্ষে সম্ভব হবে না—তাই সব পথ বন্ধ ক'রে চলে এসেছি। এখন আর তুমি আমাকে তাড়াতে পারবে না।' ছেলেমানুষের মতোই কথাগুলো বলে কমল।

আনন্দে সমস্ত রক্ত ধমনীতে নেচে ওঠে, দেহের সমস্ত স্নায়ু ওঠে ঝন ঝন ক'রে—অথচ বুকের মধ্যে সেই একই সঙ্গে অনুভব করে একটা প্রচণ্ড হতাশা, পা-দুটো হয়ে যায় পাথর। গলার স্বর খুঁজে পায় না চিত্রা। এমন একই সঙ্গে দুই প্রচণ্ড রকমের বপরীত অনুভূতি মানুষ যে বোধ করতে পারে, তা সে এর আগে কোনদিন কল্পনাও করে নি।

অনেক—অনেকক্ষণ পরে কথা খুঁজে পেলে চিত্রা। কোনমতে বললে, 'সে—সে কেমন ক'রে হবে ?'

'তা জানি না—জানতে চাই না। সব ভাবনার শেষ ক'রে দিয়েছি আজ, বললুম তো।' অকস্মাৎ কেমন যেন উত্তেজিত ভাবে উঠে বসে কমল, 'সব যুক্তিতর্ক—ভবিষ্যৎ বর্তমান—ভাসিয়ে দিয়েছি চিতু—কোনদিকে চাইব না। কিন্তু ভাবব না। ভাবনার কিছু নেইও। এইটুকু শুধু ভেবে দেখেছি তোমাকে ছাড়া আমার চলবে না। আর কি ভাবব ? থাক্ দূর ভবিষ্যৎ দূরে—আপাতত আমাকে সবকিছু ভুলে একটু সুখী হ'তে দাও !'

'কিন্তু সুখের চেয়ে শান্তির দাম যে অনেক বেশি কমল।'

আচ্ছন্ন অভিভূতের মতো বলে চিত্রা। কমলের কথাগুলো যেন সঙ্গীতের মতো বাজছে তার কানে, নেশার মতো, সে সঙ্গীত তাকে মোহগ্রস্ত করছে।

'কে বলেছে সে কথা। সুখ বাদ দিয়ে কি শান্তি পাওয়া যায় ? আমি তা বিশ্বাস করি না।'

বলতে বলতেই সে প্রবল বেগে চিত্রার একটা হাত ধরে টেনে একেবারে বুকের মধ্যে এনে ফেলল। তারপর তেমনিই প্রচণ্ড ভাবে ওকে বুকের ওপর চেপে ধরে

বলল, 'অনেকদিন অনেক যুদ্ধ করেছি যুক্তিতর্কের সঙ্গে—এবার তুমি আমাকে দয়া করো, আমায় একটু আশ্রয় দাও চিত্রা।'

উত্তেজনা ক্রমশ বুঝি বেড়েই যায়। কমলও কেমন অস্থির হয়ে উঠল। হয়ত শেষবার যুদ্ধ করলে নিজের বিবেকের সঙ্গে—তারপরই অসংখ্য উষ্ণ চুম্বনে চিত্রার পিপাসিত উষ্ণ ওষ্ঠ দুটি কিছুকালের জন্য অবশ ক'রে দিলে।...

জীবনের সবচেয়ে কাম্য ও প্রেয় সুধাপাত্র তৃষিত ওষ্ঠের সামনে এসে পড়েছে। চিত্রা বুঝি আর পারে না নিজেকে সামলাতে।

কী হবে ভবিষ্যৎ ভেবে? ভবিষ্যৎ তো অনেক ভেবেছে। যাক আজ সব কিছু আবেগের এই বন্যায় ভেসে। দূর হয়ে যাক পাই-পয়সার হিসেব আর ভালমন্দর চিন্তা। পিছনে থাক বিবেক।

সুশ্রী, সুন্দরকান্তি তরুণ, তার জীবনের প্রথম প্রণয়-নৈবেদ্য এনেছে ওর কাছে—হৃদয়ের ডালি সাজিয়ে! এ কি প্রত্যাখ্যান করা যায়?

আর কেনই বা করবে সে? চিরজীবন বঞ্চিত হবে?

বিদ্যুতের মতো চিন্তাগুলো দ্রুত সরে সরে যায়। মুহূর্তের মধ্যেই আকাশপাতাল ভাবে—লড়াই করে বিবেক আর শুভবুদ্ধির সঙ্গে।

অবশেষে এক সময় প্রাণপণে নিজেকে ছাড়িয়ে নেয় কমলের বাহুবন্ধন থেকে। মনে হ'ল কোথায় যেন হৃদয় ওর মূল প্রসারিত করেছিল চিরকালের মতো—আজ সেই মূলসুদ্ধ ছিঁড়ে সরিয়ে নিতে হচ্ছে তাকে, এমনিই যন্ত্রণা।

কমলও ভাবাবেগের অতিরিক্ত উচ্ছ্বাসে শ্রান্ত হয়ে পড়েছিল—হয়ত ইতিমধ্যে লজ্জিতও হয়েছিল। সে আবার ক্লান্ত ভাবে বিছানায় এলিয়ে পড়ে চোখ বুজল।

চিত্রা বাইরে গিয়ে বারান্দায় দাঁড়িয়ে রইল অনেকক্ষণ—অন্ধকার নিস্তব্ধ গলিটার দিকে চেয়ে। মাথায় ওর আগুন জ্বলছে। হাত-পা কাঁপছে থর থর ক'রে। দাঁড়িয়ে থাকা যায় না—পা যেন অবশ, তবু ঠেস্ দিয়ে কোনমতে দাঁড়িয়ে থাকে। বুকের শব্দ যেন বাইরে থেকে শোনা যাচ্ছে। অবশেষে বহুক্ষণ পরে একসময় ভেতরে এসে বললে, 'তোমার তো খাওয়া হয় নি। খাবার করি?'

'না না। দোহাই তোমার, এত রাত্রে আর ওসব হাঙ্গামা ক'রো না। তাছাড়া এখন কি কিছু খাওয়া সম্ভব! তুমি—তুমি শুয়ে পড়ো।'

'এখন কি আর কোনমতে তোমার বাড়ি ফিরে যাওয়া সম্ভব নয়?'

'না। সে পথ আর নেই।'

'অন্য কোথাও?'

'বহুদিন তো কারুর সঙ্গে সম্পর্ক রাখি নি। তাছাড়া ট্রামবাস বন্ধ হয়ে গেছে। যুদ্ধের দিন পার্কে বা স্টেশনেও পড়ে থাকতে দেয় না।'

'না না। তা বলি নি। তুমি শোও ভাল ক'রে। জামাটামা ছাড়ো। একটু চা খাবে না কি? স্পিরিট জ্বেলে ক'রে দেব?'

অপ্রতিভ হয়ে পড়ে চিত্রা। নিজের কঠিন ব্যবহারের জন্য একটু লজ্জিতও হয়।

'না না। কিছু দরকার নেই। তুমি শুয়ে পড়ো।'

একটুখানি চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকে চিত্রা—কমলের মনে হয় এক যুগ। তারপর বলে, 'তুমি দোরে খিল দিয়ে শোও।'

'আর তুমি? তুমি এত রাত্রে কোথায় যাবে?' ব্যস্ত হয়ে উঠে বসে কমল।

'ভয় নেই। বাড়িওয়ালাদের চাবি তো আমার কাছেই। পাশের ঘরেই রইলুম

'কেন, কেন চিতু? এখানে কি শোওয়া যায় না? আমাকে বিশ্বাস করো—'

'ছি! সে কথা নয়। বিশ্বাস নিজেকেই করি না। তুমি শোও। আজ উত্তেজিত হয়ে আছ, পরিষ্কার ক'রে কোন কথাই বুঝতে পারবে না। কাল তো রইলই—ভয় কি?'

মন বড় দুর্বল। একজনের চোখেই বিশ্বের সমস্ত তরুণ তার দুনিবার ক্ষুধা ও সুধা নিয়ে অপেক্ষা করছে যেন। চিত্রা দ্রুত বেরিয়ে যায় ঘর থেকে।

॥ ২৫ ॥

সারারাত যে ঘুম হ'ল না তা বলাই বাহুল্য। শোবারও কোন চেষ্টা করল না চিত্রা। কোনমতে দরজাটা দিয়ে সে মেঝেতেই বসে পড়ল। বন্ধ ঘরের ভ্যাপ্‌সা গন্ধ—কিন্তু ওর কোনদিকে লক্ষ্য নেই। আচ্ছন্নের মতো,তন্দ্রাহতের মতো স্তম্ভিত হয়ে বসে রইল।

সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য নিশ্চিন্ত জীবন, সুন্দর গৃহস্থালী। ছেলের নিরাপদ ভবিষ্যৎ। এর চেয়ে মানুষ আর কি চায়? মানুষ যার জন্য লালায়িত, সেও এত কাল যার জন্য লালায়িত ছিল—সেই সহজ জীবন তার সমস্ত প্রলোভন নিয়ে ওর জন্য অপেক্ষা করছে, ওকে অনুনয় করছে। শুধু একবার 'হাঁ' বলার ওয়াস্তা। কিন্তু তার পর?

সব ছেড়ে—বাপ-মা আত্মীয়স্বজন ঘরবাড়ি সমস্ত কিছু ছেড়ে শুধু স্ত্রী নিয়ে পুরুষ সুখী হয় না। নরেশও হয় নি। আজকের মোহ যখন কাটবে তখন কমলের জীবনও বিষাক্ত হয়ে উঠবে। নরেশের মতো ত্যাগ করে না গেলেও এক মুহূর্ত শান্তি পাবে না বেচারী—চিত্রাও হয়ত সেই অশান্তিতে জলবে বাকী জীবন।

তাছাড়া, তাছাড়া—সমস্ত পৃথিবীকে যে স্ত্রীর জন্য ত্যাগ করা যায়—চিত্রা কি সেই স্ত্রী?

এটা সে নিঃসংশয়ে জানে, খুব বেশী না হ'লেও সে কমলের চেয়ে বয়সে বড়। আজ সেটা এমন কোন বাধা না হ'তে পারে কিন্তু আজ থেকে দশ বছর পরে। চিত্রা যখন যৌবনের শেষ সীমায় পৌছবে তখনও কমলের যৌবন-দীপ্তি ক্ষুণ্ণ হবে না। তখন কি বোঝার মতো মনে হবে না তার চিত্রাকে? ফেলতে পারবে না, ত্যাগ করতে পারবে না—অথচ সহ্য করতেও পারবে না।…না, না-কমলকে সে জেনেশুনে এত বড় দুর্ভাগ্যের মধ্যে ফেলবে কী ক'রে? যে চরম বিপদের দিনে অভয় ও আশ্রয় দিয়েছে, বলতে গেলে রাস্তা থেকে কুড়িয়ে এনেছে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ও অপরিচিতকে- দ্বিধা করে নি, সংশয় করে নি - লাভ-লোকসান তলিয়ে বোঝে নি, তাকে এমন ক'রে বদ্ধ জলার পাঁকে ডোবাবে? না—তা সে পারবে না।

আবার মনের মধ্যে কোথায় একটা আশা ওঠে গুনগুনিয়ে, এমন কথাও এক একবার মনে হয় যে সত্যিই কমল যদি তাকে নিয়ে সুখী হয়? চিরকালের মতোই? আজ থেকে কুড়ি বছর পরেও যদি কমলের প্রিয়তমা হয়ে থাকতে পারে সে? জগতে এমন দৃষ্টান্ত তো একেবারে দুর্লভ নয়! মিথ্যা দূর ভবিষ্যতের কোন্ এক অনিশ্চিত দুঃসম্ভাবনার জন্য বর্তমানের নিশ্চিত অস্তিত্বকে অস্বীকার করবে?

কেন?…

কিন্তু আশা রাখতে আর ভরসা হয় না। জীবনের সমুদ্রমন্থনে বার বার তার ভাগ্যে হতাশার গরলই উঠেছে। হয়ত তার দুর্ভাগ্যের সঙ্গে জড়িয়েই কমলের এত অশান্তি। তার চেয়ে বরং ও শান্ত হোক—নিরুদ্বিগ্ন হোক—চিত্রা পাথরের মতো ওর গলা জড়িয়ে ডোবাবে না—ডুবতে হয় নিজেই ডুববে।

পরের দিন সকালে চিত্রা সামনে এসে দাঁড়াতে কমল ওর মুখের চেহারা দেখে চমকে উঠল, 'এ কী ব্যাপার—এক রাত্তিরে কি চেহারা হয়েছে তোমার?'

কমলেরও যে সারারাত ঘুম হয় নি তা তার মুখ দেখেই বোঝা যায়, কিন্তু তবু নরম হ'লে চলবে না, স্নেহাতুর উদ্বেগকে দমন করতেই হবে। চিত্রা মনস্থির ক'রে ফেলেছে।

সে কোনও রকম ভূমিকা না ক'রেই বলল, 'তুমি এখন স্নানাহার করো, তারপর একটা মেস্-টেস্ দেখে আপাতত বাসা নাও—যতদিন না আবার বাড়ি ফিরে যেতে পারো।'

কঠিন আঘাত সামলাতে সময় লাগল। অনেকক্ষণ পরে কমল বলল শুধু, 'তার মানে ?'

'মানে কি এতই শক্ত ! আমার এখানে তুমি এভাবে থাকলে লোকে কি বলবে ?'

'কিন্তু আমরা তো বিয়ে করব বলেই স্থির করেছি—তাতে—'

'কে স্থির করেছে ? তুমি স্থির করলেই কি আমারও স্থির করা হয়ে যায় ? দুঃসময়ে কিছু সাহায্য নিতে বাধ্য হয়েছিলুম—তাই বলে কি নিজের জীবনের সবচেয়ে বড় প্রশ্নেও নিজের কোন হাত থাকবে না ? আমি কি তোমার ক্রীতদাসী ?'

নিজের আঘাতের নিষ্ঠুরতা নিজের বুকেই বুঝি দ্বিগুণ বাজে। তারই ফলে কণ্ঠস্বর অকারণ তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে চিত্রার।

স্খলিত ভগ্নকণ্ঠে কমল বলে, বলতে বলতে ঠোঁটদুটো কেমন যেন আলগা ভাবে বেঁকে যায়, নিজের স্নায়ুর ওপর নিজেরই যেন জোর থাকে না।—তবু বলে, 'কিন্তু এত কথা কেন বলছ চিত্রু। আমি তো সে জোর দেখাতে চাই নি, ভালবাসার জোরই দেখিয়েছি। তুমি কি আমাকে একটুও ভালবাসো না ? ঠিক ক'রে বলো—আত্মপ্রবঞ্চনা ক'রো না।'

জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে চিত্রা বললে, 'ভালবাসব না কেন। স্নেহ তোমাকে আমি খুবই করি। কিন্তু তাতে বিবাহের কথা ওঠে না। স্বামী-স্ত্রীর ভালবাসা অন্য জিনিস। সে ভালবাসার লোক আমার আলাদা। আমার স্বামী এখনও আছেন—সেট ভুলে যেও না।'

'কিন্তু, কিন্তু তাকে—মানে বাগচীকে—তুমি তো—'

'হ্যাঁ। তাঁকে আমি আজও ভালবাসি, কে বললে ভালবাসি না, কে বলেছে এমন কথা তোমাকে ? এ তোমার ধৃষ্টতা !'

উত্তেজনায় আবেগে হাঁপাতে থাকে সে।...

বিবর্ণ হয়ে গেল কমলের মুখ। সে অনেকক্ষণ মাথা হেঁট করে বসে থেকে একসময় উঠে দাঁড়াল। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলবার শক্তিও যেন আর তার নেই। আলনা থেকে নিঃশব্দে জামাটা টেনে নিয়ে গায়ে দিয়ে সুটকেসটা হাতে ক'রে বেরিয়ে গেল। একেবারে দোরের বাইরে পা দিয়ে একবার থমকে দাঁড়িয়েছিল। হয়ত কিছু বলবারও চেষ্টা করেছিল। হয়ত বলতে চেয়েছিল, 'আমাকে মাপ ক'রো—আমি বুঝতে পারি নি' কিন্তু কিছুই বলা হ'ল না। কোনমতেই যখন গলা দিয়ে শব্দ বেরোল না তখন আর অপেক্ষা না ক'রে কমল নেমে গেল সিঁড়ি বেয়ে। পায়ে জোর

নেই—নিজের ওপর এতটুকু রাশ নেই—হাত-পা সব যেন শিথিল। যেতে যেতে বার দু-তিন যে ঠোক্কর খেল সে—তা ওপরের ঘরে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থেকেও চিত্র অনুভব করল। কিন্তু মনকে দুর্বল হ'তে দিলে চলবে না—তাহ'লেই ভেঙে পড়বে!

চলে গেল। জীবনের সুখশান্তি আশা ভরসা অবলম্বন ভবিষ্যৎ যা কিছু ওর—স এই মাত্র ঐ পথ ধরে নেমে চলে গেল, হয়ত চিরকালের মতোই। ও স্বেচ্ছায় নিজে এই মহাসর্বনাশ করল। শেষ অবলম্বন ত্যাগ ক'রে ঝাঁপিয়ে পড়ল অনিশ্চয়তা অতল অন্ধ গহ্বরে।

কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল চিত্রা বহুক্ষণ। অবশ অনড় হয়ে গেছে, শুধু ওর দে নয়—মনও। কিছু ভাববার ক্ষমতা নেই আর।

কাল থেকে খায় নি কিছু। বেচারী কোনদিনই ক্ষিদে সহ্য করতে পারে না সারারাত যে ঘুম হয় নি সে চিহ্নও তো স্পষ্ট। সকালে এক কাপ চাও খেয়ে গে না। কোথাও খেতে পাবে কি না তার ঠিক কি! কোথায় আশ্রয় নেবে তাই কে জানে! আশ্রয় পাবে কি না!

কমলের সেই অপরিসীম মলিন শুষ্ক মুখ মনে ক'রে ওর বুকটা যেন মুচ্‌ড়ে কেঁ উঠল। কিন্তু তার বহু পূর্ব থেকেই কখন নিঃশব্দে চোখের জল ঝরে পড়ে বুকে আঁচল ভিজিয়ে দিয়েছে তাও লক্ষ্য করে নি!

আচ্ছা—মনের এই অবস্থায়—আত্মহত্যা ক'রে বসবে না তো!

হে ঠাকুর—এ কী করলুম! কী করলুম!

তাকে বাঁচিয়ে রাখো, নিরাপদে রাখো। আমায় যত খুশি শাস্তি দাও—দু দাও—তাকে শুধু বাঁচিয়ে রাখো।

ছেলে উঠে পড়েছে। সে অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে, 'মা, তুই কাঁদছিস কে মামা কোথায়?'

'কাঁদছি? কে বললে? চোখে কি পড়েছে!'

কাঁদবারও অবসর নেই ওর। বিছানা তুলতে হবে এখন। প্রতিদিনকার জী যাত্রার তুচ্ছাতিতুচ্ছ খুঁটিনাটি কাজ। দাঁড়াবার বা ভাববার অবকাশ কোথা ছেলেকে খাওয়াবার জন্য উনুনেও আঁচ পড়ল। শুধু চিত্রা নিজে কিছুতেই f মুখে দিতে পারল না।

শুষ্কমুখে কমল হয়ত কোথায় ঘুরছে কিংবা কোথাও কোন পার্কেই বসে আ তাকে নির্মম ভাবে বিদায় ক'রে দিয়েছে সে। কোন্ মুখে এখন নিজের C

খাবার দেবে!

হতভাগী সে—একটু কিছু খাওয়াবার আগেই কেন কথাগুলো বলতে গেল? এত কি সময় বয়ে যাচ্ছিল ওর?

একসময় নিজের ওপর বিতৃষ্ণায় ও আত্মধিক্কারে সত্যি-সত্যিই মেঝেতে মাথা খোঁড়ে চিত্রা। এই মুহূর্তে সে অনায়াসে আত্মহত্যা করতে পারত যদি না ছেলেটা থাকত মৃত্যুর পথ আট্‌কে।

সন্ধ্যার দিকে দরজায় কড়া-নাড়ার শব্দে বুকের কাছটা ধ্বক ক'রে উঠল।

কমলই ফিরে এসেছে নিশ্চয়। অস্নাত, অভুক্ত, পরিশ্রান্ত কমল।

আর সে ফেরাবে না—আর সে কিছু ভাববে না। ওর সেবা ক'রে জীবনকে ধন্য করবে।

আগের দিনের রাত্রি-জাগরণ ও উপবাসে উদ্বেগে উত্তেজনায় দেহ পাতার মতো কাঁপছে। তবু তর তর ক'রে নেমে গেল সে। কিন্তু দরজা খুলে দেখল একটি প্রবীণ ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে আছেন। অস্পষ্ট আলো—তৎসত্ত্বেও চেহারার সাদৃশ্যে পরিচয়টা আপনিই পেয়ে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গেই কেমন যেন একটা অজ্ঞাত আশঙ্কায় বুকের কাছটা হিম হয়ে এল।

ভদ্রলোক স্বল্পভাষী। বললেন, 'তুমিই কি চিত্রা বাগ্‌চী?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। কেন?'

'বলছি। তোমার সঙ্গে কথা আছে কয়েকটা। আমি কমলের বাবা। আমার নাম চিন্তাহরণ চৌধুরী।'

'আসুন।'

আগে আগে পথ দেখিয়ে ওপরে ঘরে এনে বসাল। ছেলেটাকে নিচের তলাওলার ভাই আজ বেড়াতে নিয়ে গেছে। ভালই হয়েছে—সে কিছু না বুঝলেও চিত্রা লজ্জিত হ'ত।

চিত্রা ওঁকে বসতে দিয়ে সামনে মেঝের ওপর নিজেও বসল, 'বলুন, কী বলবেন?'

ওর কণ্ঠস্বর শান্ত অথচ কঠিন। প্রথম বিস্ময়ের বিহ্বলতা কেটে গেছে—ওঁর আগমনের কারণটা অনুমান ক'রে চিত্রার মনও বিরূপ এবং কঠিন হয়ে উঠেছে।

চিন্তাহরণবাবু এবারেও কিছুমাত্র ভনিতা করলেন না। বললেন, 'কত টাকা পেলে তুমি আমার ছেলেকে ছাড়বে?'

চিত্রার ইচ্ছা হ'ল ঠাস ক'রে একটা চড় বসিয়ে দেয় এই বৃদ্ধ লোকটার গালে অতিকষ্টে সামলে নিলে নিজেকে। এ কথার উত্তর দিতেও ঘৃণা বোধ হয়।

'চুপ ক'রে থেকো না—বলো।'

'আপনার টাকা আপনারই থাক্। আমি তাকে এমনিই ছেড়ে দিয়েছি।'

'তা আমি জানি। ছেলেকে নজর-ছাড়া করেছি ভেবো না। আজ সে এখ বন্ধুর বাড়ি আছে, কাল হয়ত বাড়িই ফিরে যাবে। কিন্তু এও জানি যে সে আবার ঘুরে আসবে তোমার কাছে।'

'তার আর আমি কি করব বলুন।'

'সে তোমার উপকার করেছে কিছু। আজও সে তোমাকে পালছে। তু তার কথাটা ভাবো—তার ভবিষ্যৎ—'

'আপনি কি মনে করেন শুধু টাকার জন্যেই আমি তার মন ভুলিয়েছি?'

'কথাটা রূঢ় ভাবে বললে—কিন্তু তাই ঠিক নয়? তাকে না পেলে তোম চলত কি ক'রে?'

'তাই যদি জানেন তো আমার কাছে এ প্রস্তাব করতে এসেছেন কেন? আ ছাড়ব কেন? কি স্বার্থে? সকালে তাকে ছেড়ে দিয়েই ভুল করেছি। অ করব না। আমার ভবিষ্যৎ আছে, ছেলের ভবিষ্যৎ আছে।'

অকস্মাৎ চিন্তাহরণবাবু ওর হাত দুটো ধরে ফেললেন, 'আমরা বুড়োবুড়ী তোম কাছে ভিক্ষা চাইছি। কাল থেকে তাঁর মুখে জল যায় নি।···তোমার আর তোম ছেলের ব্যবস্থা আমি ক'রে দিচ্ছি। নার্সারী ইস্কুল আছে মিশনারীদের, সেখা ছেলেকে রেখে দেবে—তুমি এই অবসরে নার্সিং শিখে নাও। যুদ্ধের বাজারে বছ খানেক ট্রেনিং নিলেই ভাল চাকরি পাবে। ওযাকাই-এর চাকরি করতে বলি হাজার হোক্ আমার ছেলে তোমাকে ভালবেসেছিল—কিন্তু নার্সের চাকরিতে বাধা নেই। সব খরচ আমি দেব—অগ্রিম। তোমাদের দুজনের এক বৎসরের খরচ অগ্রিম দিচ্ছি। তুমি রাজী হও মা।'

এ বোধ হয় ঈশ্বরেরই নির্দেশ। তাঁর করুণা। এতকাল পরে তিনি ওর ক ভাবতে পারলেন বোধ হয়।

অনেকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে চিত্রা বলল, 'তার বদলে আমাকে কি করতে হবে

'তোমাকে এখান থেকে চলে যেতে হবে। কমল না জানতে পারে তোম ঠিকানা। অন্তত এক মাস দেড় মাস—একটু সামলে নিক। তারপর জান পারলেও ক্ষতি নেই।'

'চলে যেতে হবে ? কখন ?' বিহ্বল, স্বপ্নাবিষ্টের মতো প্রশ্ন করে চিত্রা।

'আজই। এখনই। যত শীঘ্র হয়। সে না এসে পড়ে।'

'কিন্তু আপনি যে আমাকে ঠকাবেন না তার প্রমাণ কি ?'

এই দরদস্তুর, এই বেচাকেনার সহস্র সতর্কতা—এ কি ওরই গলার আওয়াজে কাশ পাচ্ছে ?…নিজেরই বিশ্বাস হয় না—এত নির্লজ্জতা আর হৃদয়হীনতা।

'আমি হাজার টাকা নগদ পকেটে ক'রে এনেছি। তোমার ছেলের খরচ পড়বে াসে পঞ্চাশ টাকা। এক বছরে ছ'শ'। তোমার কাছেই বাকী টাকা থাকবে। সপাতালের নার্সিং শেখার—এখন সব খরচা ওরাই দেবে। তাছাড়াও কিছু টাকা ামি তোমার নামে জমা দিয়ে দেবো কোন ব্যাঙ্কে। এর বেশি চেও না—এই ামার যথাসর্বস্ব।'

অনেক—অনেকক্ষণ বসে রইল চিত্রা পাথরের মতো। তারপর একসময় প্রায় স্পষ্ট কণ্ঠে বলল, 'আমি রাজী আছি। আপনি ব্যবস্থা করুন।'

নীরন্ধ্র হতাশার মরুভূমির মধ্যে যে সামান্য একটু আশার অঙ্কুর ছিল- তাও কিয়ে ঝলসে গেল। বজ্রে কত তাপ কে জানে ? এর চেয়েও কি বেশি ?

অন্ধকারে ঘরের মধ্যেটা থম্‌থম্‌ করতে থাকে। ভয়াবহ নিঃশব্দতা।

চিন্তাহরণবাবুও যেন এ উত্তর এত সহজে আশা করেন নি। তিনি একটু অবাক্‌ য়েই তাকিয়ে বসে থাকেন ওর দিকে।

॥ ২৬ ॥

র পর বহুদিন চলে গেছে। বাচ্চু ইস্কুলে পড়ছে, হোস্টেলেই থাকে। চিত্রা থাকে লিটারী হাসপাতালের নার্সের ব্যারাকে। বৈচিত্র্যহীন একঘেয়ে জীবন। রাদিন কাটে কর্মকোলাহলে রোগীদের সেবার মধ্যে। সন্ধ্যা ও রাত্রি যেন ভয়াবহ য় উঠেছে ওর জীবনে। যেদিন রাত্রিতে ডিউটি থাকে, ও যেন বেঁচে যায়। ঘুম আজকাল এমনিই হয় না—তবু রাত জাগলে দিনের বেলাটা একটু আচ্ছন্ন হয়ে কে। তাছাড়া তাড়্ডা দিয়েও দিন কাটে।

পরিচিত কেউ নেই। শান্তিদির চিঠি আসে, কালেভদ্রে, কদাচিৎ। গুরুদেব ই, দেহ রেখেছেন। কোথাও এমন কেউ নেই যার সংবাদ সে নিতে পারে বা ক নিজের সংবাদ দিতে পারে।

কমল ?

সে প্রতিশ্রুত আছে চিন্তাহরণবাবুর কাছে, কখনও খবর দেবার কি নেবার চেষ্টা করবে না।

অবশেষে একদিন—দিনটাও মনে আছে চিত্রার—ইউরোপে যুদ্ধ যেদিন শেষ হ'ল—ওদের ব্যারাকের ঝি এসে খবর দিলে, 'একটি বাবু আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন !'

'বাবু? আমার সঙ্গে?'

'হ্যাঁ। আপনার নামই করলেন।'

আজও ধ্বক্ ক'রে ওঠে বুকটা—আশা ও আশঙ্কায়।

কমল?

নিশ্চয়ই কমল, কিন্তু দেখা করা কি ঠিক হবে?

পরক্ষণেই নিজেকে বোঝায়—কেন ঠিক হবে না। সে নিজে থেকে খবর নেবে না বা দেবে না এই প্রতিশ্রুতিই দিয়েছে, খোঁজ নিয়ে সে এলে দেখা করবে না—এমন প্রতিজ্ঞা তো করে নি!

'বসতে বল্ বাবুকে, আমি যাচ্ছি।' একবার চুলটা ঠিক ক'রে নেয় নিজের অজ্ঞাতসারেই। শাড়িটা একটু টেনে সমান করে নেয়। তারপর কম্পিত দুরু-দুরু বুকে নেমে আসে ভিজিটার্স রুমে।

যে লোকটি বসে আছে সে কমল নয়—নরেশ।

ভূত দেখার মতোই চমকে উঠে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে যায় চিত্রা।

আর অপ্রতিভের শুষ্ক হাসি হাসে নরেশ।

'এই যে, ভাল আছ?'

চিত্রা উত্তর দিলে না কিন্তু নরেশের গলার আওয়াজেই বোধ করি প্রথম বিস্ময়ের স্তম্ভিত ভাবটা কাটল—সে ভেতরে এসে সহজভাবেই একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়ল।

নরেশ যেন এই ক'বছরেই বড্ড বুড়ো হয়ে গেছে। গাল চড়িয়ে কোথায় ঢুকে গেছে, মাথার চুল পাতলা, কপালেও অজস্র কুঞ্চনরেখা।

আবারও একটু অর্থহীন হাসি হাসল সে। অসংলগ্ন ভাবে বলল, 'কম খুঁজেছি তোমাকে! পর পর মনিঅর্ডার ফেরত আসতেই বুঝলুম তুমি ওখানে নেই। তবু সেখানে গিয়েই খোঁজ করতে হ'ল। একজন বললে, কে একটি কলেজের ছেলের সঙ্গে তুমি নাকি পালিয়ে এসেছ—'

চিত্রা কি বলতে যাচ্ছিল নরেশ বাধা দিয়ে বললে, 'আমি কিন্তু সে কথা বিশ্বাস

করি নি—'

'কেন করো নি। সেইটেই কি স্বাভাবিক নয়। বিশ্বাসঘাতকতা ও অপমান ছাড়া কী পেয়েছিলুম তোমার কাছে যে চিরকাল তোমার ধ্যান ক'রে কাটাবো?'

তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে চিত্রার কণ্ঠ।

নরেশ অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে বলে, 'না না, তা নয়।—তার পর—'

'ওসব ইতিহাস থাক্। কী ক'রে খুঁজে পেয়েছ তা শোনবার ধৈর্য আমার নেই। কেন খুঁজে বার করেছ তাই বলো।'

আরও অপ্রস্তুত হয়ে নরেশ চুপ ক'রে যায়। খানিকটা পরে বলে, 'আমি তোমাকে নিয়ে যেতে চাইছিলুম!'

'বটে? সে আমার সৌভাগ্য। কিন্তু কোথায়—?'

'মানে—বাবা মারা গিয়েছেন বছর দুই। গত বছর আমার স্ত্রীও মারা গেছে।'

'অ। তাই কি রক্ষিতাকে নিয়ে যেতে এসেছ?'

দুজনেই চুপ ক'রে বসে থাকে। নরেশ কেমন যেন হয়ে গিয়েছে। এমন বোকার মতো কথাবার্তা তো কখনও সে বলত না।

একটু পরে নরেশ একেবারে হাত জোড় করে।

'আমাকে ক্ষমা করো চিত্রা। আমি যা অন্যায় করেছি তার ক্ষমা নেই। তবুও—'

'আমার ক্ষমাতে কি কোন প্রয়োজন আছে তোমার?'

নরেশ আবারও বোকার মতো বলে বসল, 'ছেলেটাকে দেখবার জন্যেই এত খুঁজে বেড়িয়েছি তোমাকে—'

'আমার জন্যে যে নয়—তা তুমি দয়া ক'রে না বললেও বুঝতে পারতুম। তোমার স্ত্রীর ছেলেমেয়ে কটি?'

নরেশের চোখে কি জল এসেছে?

সে প্রায় ভগ্নকণ্ঠে বললে, 'আমার দ্বিতীয়া স্ত্রীর ছেলেপুলে হয় নি।'

'তাই এত খোঁজা! কিন্তু বৃথাই এত কষ্ট করেছ। ছেলে পাবে না। কোনও দিন না।'

'শুধুই ছেলে নয় চিত্রা। তোমাকেও আমি স্বাধিকারে, সগৌরবে, তোমার ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছি—'

'A bit late! তাই নয় কি? যাক্ গে—ওসব নাটুকেপনায় দরকার নেই। চা খাবে? আমার কাজ আছে।'

'চিতু, দয়া করো আমাকে।'

ও নামটা থাক। ও নামে তোমার চেয়ে অনেক—অনেকগুণে যোগ্যতর লোক আমাকে ডেকেছে। ওটা তোমার মুখে আর কলঙ্কিত করো না।'

'তা সে অনেক বেশী যোগ্যতর লোকটিও ত্যাগ ক'রে গেল কেন?' ঈর্ষা ও ব্যঙ্গ ফুটে ওঠে এতক্ষণ পরে।

'কে বললে ত্যাগ ক'রে গেছে? সে আমার জন্যে সমস্ত ত্যাগ করেছিল ব'লে আমিই তাকে ত্যাগ করেছি। তার সুখের জন্যে, তার মুখ চেয়ে। শোন, হ্যাঁ, তাকেই আমি ভালবেসেছি, আর ভালবাসি। সে সাধারণ মানুষ নয়, তাই তাকে আমার এই দেহের বাঁধনে বেঁধে রাখতে চাই নি। তাকে আমি মনে মনে পুজো করি প্রতিদিন। তাইতেই আমার সুখ, আমার গর্ব।'

বহুদিন—বহুদিনের সঞ্চিত বেদনা আজ যেন অতি স্বল্প কারণেই গলগল্ ক'রে বেরিয়ে আসে—হয়ত বা অকারণেই নাটকীয় হয়ে ওঠে তার কথাবার্তা। তবু না বলে পারে না চিত্রা। এতদিনে শোনাবার মত একটা লোক এবং একটা কারণ পাওয়া গেছে।

কিন্তু এইবার ক্লান্ত হয়েই চুপ করে চিত্রা। চোখের দুই কোণে জল টল্‌টল্ করে।

খানিকটা চুপ ক'রে থেকে নরেশ বলে, 'এসব জেনেও তোমাকে আমি নিয়ে যেতে চাই চিত্রা। আমি তোমাকে মাথায় করে রাখব।'

'কিন্তু আমি তোমার মাথায় থাকতে চাই এমন কথা কে বললে? একদিন পায়ে স্থান দিলেও কৃতার্থ হতুম কিন্তু আজ আর প্রয়োজন নেই। আচ্ছা, এখন এসো—'

'ভাল ক'রে ভেবে ছাখো চিতু। ছেলেকে তুমি পিতৃ-পরিচয়ে বঞ্চিত করছ যে অভাব তুমি অহরহ ভোগ করেছ সেই অভাবেই তাকে—'

শেষ চরম আঘাত দেয় নরেশ—অন্তত দেবার চেষ্টা করে।

চিত্রা অনেকক্ষণ চুপ করে রইল। এই প্রথম। বোধ হয় তার মনে একটা দ্বিধা, একটা সংশয় দেখা দিল।

তারপর আস্তে আস্তে সে বলল, 'পরিচয় তুমি ঠিক দেবার মালিক নও বোধ করি—পরিচয় তার আছেই। আমাদের বিয়ে তুমি অস্বীকার করতে পারো না। ...না—এখন তোমার সঙ্গে তার আলাপ না হওয়াই ভাল। তাকে মানুষ করবারই সাধনা আমার, যদি সে মানুষ হয় তো তাকে সব কথা আমিই খুলে বলব। তা:পর সে তোমার পরিচয় স্বীকার করতে চায় করবে। তার আগে না।'

নরেশ হতাশ ভাবে বললে, 'তুমি—তুমি অন্তত তার জন্যে কিছু খরচ নাও—

'না। যতদিন পারব নেব না। যদি না পারি বা সে মানুষ হয়ে ওঠার, আগেই

আমার মৃত্যু ঘটে—তখন যাতে তুমি খবর পাও সে ব্যবস্থা ক'রে রেখেছি।'

চিত্রা উঠে দাঁড়াল। একটু কী ইতস্তত করল, তারপর দু হাত তুলে একটা নমস্কার ক'রে ঘর থেকে বেরিয়ে চলে গেল। যাবার আগে একটা বিদায়-সম্ভাষণও জানিয়ে গেল না।

নরেশ আরও খানিকটা বসে থেকে এক সময় উঠে স্খলিত মন্থর-পদে বেরিয়ে গেল ; বাগান পেরিয়ে হাসপাতালের মাঠ পার হয়ে কোন্ কোলাহল-মুখরিত রাস্তার ভিড়ের মধ্যে মিশে গেল। হয়তো সে আশা করেছিল চিত্রা ফিরবে—অথবা কোন খবর পাঠাবে। কিংবা কোন আশাই করে নি—এমনিই বসে ছিল। ওঠবার ক্ষমতা ছিল না বলেই। হয়ত প্রত্যাখানের অপমান নয়, শুধু লজ্জাও নয়—কিছু ব্যথাও তার সমস্ত দেহ-মনকে অভিভূত, ক্লান্ত ক'রে তুলেছিল, কে জানে!

চিত্রা তার ঘরের জানলা থেকে স্তব্ধ অপলক নেত্রে চেয়ে ছিল নরেশের গতিপথের দিকেই। ফটক পেরিয়ে রাস্তার বহুদূর অবধি তার চোখ দুটো অনুসরণ করেছিল ওকে, একেবারে ভিড়ে হারিয়ে যাবার আগে পর্যন্ত। তারপর যখন আর দেখা গেল না তখন তার চোখ দুটো আবারও জ্বালা ক'রে ঝাপ্‌সা হয়ে এল।

চলে গেল। আবারও চলে গেল! তার বজ্রাহত দগ্ধ জীবন হয়ত আজও কিছু সঞ্জীবনী রস খুঁজে পেত ভবিষ্যতের দিনরাত্রি থেকে কিন্তু সে সম্ভাবনা অঙ্কুরেই নষ্ট ক'রে দিল সে—নিজের হাতে।

নরেশকে সে সত্যিই ভালবেসেছিল। হয়ত সে ভালবাসা আজও যায় নি। আজও তৃষ্ণাতুর কাঙ্গাল মন কল্পনায় তার সঙ্গ-সুখের ছবি আঁকে। কিন্তু তবু সে নিজেই বিদায় ক'রে দিল সেই স্বামীকে।

আজ তার সামনে রইল—যতদূর দৃষ্টি যায় একই মহাশূন্য-প্রসারিত—দীর্ঘ দিন এবং দীর্ঘ রাত্রি। একটানা, একঘেয়ে ; বৈচিত্র্যহীন, আনন্দহীন, দুঃসহ দিনরাত্রি। অথবা শুধুই রাত্রি, মেরুপ্রদেশের অখণ্ড রাত্রিতে তাপহীন যে অরোরার আলো থাকে—ওর জীবনে তাও রইল না।

ছেলে? না, ছেলের আশাও সে রাখে না। ওর জীবনে কোন স্বপ্ন, কোন আশাই সফল হবে না, তা সে জানে। যতটুকু কর্তব্য ততটুকু সে ক'রে যাবে। প্রতিদানের ভরসা সে রাখবে না।···

কমল বাড়ি ফিরে গেছে। তাছাড়া আর কীই বা করতে পারত বেচারা!

সে নাকি আজও বিয়ে করে নি—হয়ত দুদিন বাদে করবে। তা করুক।

তাতে চিত্রার দুঃখ নেই। চিরকালই ওর স্মৃতি মনে ক'রে রেখে নিজের জীবন মরুভূমি ক'রে তুলবে—এমন স্বার্থপর কামনা চিত্রার নেই। কমল সুখী হোক—কমল শান্ত হোক। তাকে সে—না, না, তাকে আশীর্বাদ করার ধৃষ্টতা ওর নেই, সে দেবতা। সে নিত্য প্রার্থনা করবে, করেও সে ঈশ্বরের কাছে—কল্যাণ হোক তার।

আজ আর চিত্রার. কোন নালিশ নেই। আশা নেই—আকাঙ্খা নেই—তাই আশা-ভঙ্গের বেদনা বা নালিশও নেই। আজ সে শান্ত, নিশ্চিন্ত।

যে ঊষর দীর্ঘ-বিসর্পিত পথ তার সামনে পড়ে আছে—সেই পথই তার কাছে আজ একমাত্র সত্য, একমাত্র বাস্তব। জয় হোক সে পথের। অবসর যেদিন মিলবে সেদিন ঐ পথের এক প্রান্তে তার শেষ প্রণাম রেখে যাবে তার অদৃষ্ট-দেবতার উদ্দেশে।

আলেয়ার আগুন

দ্বিতীয় পর্ব

ইখতিয়ারউদ্দীন মহম্মদ বখ্‌তিয়ার—সাধারণ বাংলা ইতিহাসে যিনি বখ্‌তিয়ার খলজী নামে অভিহিত, মানুষটি দেখতে যেমনিই, যত খারাপই হোন—নাদান বা নির্বোধ ছিলেন এমন অপবাদ তাঁর শত্রুতেও দিতে পারত না। আর শত্রু তো তাঁর অজস্র, অগণ্য, 'বেসুমর'। একটু ক্যাপাটে গোছের ছিলেন বরং প্রথম দিকটায়, তাঁর কয়েকটা আচরণের কোন অর্থই খুঁজে পেত না তাঁর অনুরাগী অনুচররাও, কিন্তু বুদ্ধ্‌ু কদাচ না। বেওয়াকিফ্‌ও কেউ বলতে পারবে না।

আর তাহলে—একটা সহায়-সম্বল-পৃষ্ঠপোষকহীন নিঃস্ব কদাকার খর্বাকৃতি মানুষ, যাকে দেখলে মর্কট বলে মনে হয়—একা নিজের তকদিরের সঙ্গে লড়ে সমগ্র বঙ্গ-বিহারের সুবেদার হতে পারতেন না—সুলতান বলে প্রচার করলেও বাধা দিতে পারত না বোধহয় কেউ—দিল্লীর সুলতানের দরবারে দস্তুরমতো সুবেদার বলে স্বীকৃত হতেন না।

বুদ্ধ্‌ুও না, বাওরা-দিওয়ানাও না, তবে সেই মানুষ, রুক্ষ জলহীন শস্য-শষ্পহীন পাথুরে দেশের অধিবাসী—ভিজে স্যাঁতসেঁতে উত্তরবঙ্গের তরাই অঞ্চল পেরিয়ে, দুর্গম অরণ্যঘন মেঘাবৃত শ্যাওলাধরা পূর্ব হিমালয় ডিঙিয়ে তিব্বত অভিযান করতে যাবেন কেন? কোন্ উদ্দেশ্যে, কিসের আশায়? কোন মুনাফার খোয়াব দেখেছিলেন তিনি?

দেশ জয়? নতুন মুলুকের ওপর নিজের 'শাহী' কায়েম করা?

ও দেশ জয় করতে পারলেও শাসন করতে পারবেন না, স্থায়ী কোন হুকুমৎ বসাতে পারবেন না, সেটুকু নিশ্চয় তাঁর জানার কথা।

ঐশ্বর্য? এতদিন গৌড়-বঙ্গ লুঠ ক'রে, নবদ্বীপ শ্মশান ক'রে তিনি কম দৌলত পান নি। বস্তুতঃ সেই দৌলতেরই মাত্র একভাগ, এক-শতাংশও হয়ত নয়—নজরানা দিয়েই তো চমৎকৃত—খুশী করে দিয়েছিলেন দিল্লীর সুলতান কুত্‌বউদ্দীনকে।

তবে?

মূল প্রশ্নটা থেকেই যাচ্ছে। ইতিহাস এ প্রশ্নের জবাব দিতে পারে নি। সমসাময়িক কোন লোকই জানত না, ঐ লোকটির মনের মধ্যে কী আছে, কোন অভিপ্রায়ে কি করছে! জানলে হয়ত কোথাও কেউ লিপিবদ্ধ ক'রে যেত। সেদিন কী তাঁর মুরাদ ছিল, কী তাঁর মোনাজাত—কামনা বা প্রার্থনা—কেউই জানতে পারে নি আজ পর্যন্ত।

প্রাণ হাতে ক'রেই গিছলেন ইখ্‌তিয়ার। তাঁর মতো অভিজ্ঞ লোক এ অভিযানের বিপদ সম্যক্ জানতেন না—তা সম্ভব নয়। প্রাণপণ শব্দটা লোকে বলে কথার কথা হিসেবে। ইখ্‌তিয়ার সেদিন যথার্থই প্রাণপণ ক'রে জীবনের এই সর্ববৃহৎ জুয়া খেলায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। প্রাণ নিয়ে ফিরে এসেছিলেন বটে শেষ পর্যন্ত, কিন্তু সে বহু পরবর্তী যুগের সম্রাট নাপোলেঁয়র মতোই ফিরে আসা— রাস্তা থেকে যে ভাবে ফিরেছিলেন তিনি। ছ লক্ষর বাহিনী অবশ্য নয় ইখতিয়ারের, তবে সে যুগের পক্ষে একেবারে তাচ্ছিল্য করার মতোও নয়। দেবকোট থেকে যাত্রা করেছিল দশ হাজার অশ্বারোহী। মাত্র কয়েক মাস পরে ফিরেছিল একশোরও কম।

কেন গিয়েছিলেন এই নিশ্চিত-পূর্ব-অনুমতি সমূহ বিপদের ঝুঁকি নিয়ে?

সোনা? সোনার লোভে?

হ্যাঁ, সেনা আর সেনানায়কদের তাই বলেছিলেন বটে। নইলে তাদের ঐ ভয়াবহ পথে টেনে নিয়ে যাওয়া যেত না। লোভ দেখিয়েছিলেন 'সোনেরী কিস্‌সা' বলে। বলেছিলেন—প্রচুর সোনা জমে আছে সেখানে! সোনার পাহাড়! বর্বর পাহাড়ীরা তার কীমৎ জানে না। সোনার বিনিময়ে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের, বিসাসের উপকরণ পাওয়া যায় তা জানে না। তারা হয়তো বাধাও দেবে না, যত ইচ্ছা নিয়ে আসতে পারবে।

তারাও, উনি যা আশা করেছিলেন, লোভে পাগল হয়ে উঠেছিল প্রায়। আবার যাদের এদেশে রেখে গিয়েছিলেন ঘাটিতে ঘাটিতে যাতে ওঁর অনুপস্থিতিতে না বিদ্রোহ জেগে ওঠে, গদর দেখা দেয়—দিনাজপুরে দেবকোটে, তেলিয়াঘড়িতে, সরকার ঘোড়াঘাটে—তাদের কাছে বলেছিলেন অন্য কথা। বলেছিলেন, সোনার কথা সির্ফ ঝুটা। ওটা বলতে হয়েছে নইলে এই বিপদ আর পথের কষ্ট মাথায় ক'রে কেউ যেতে চাইবে না। আসলে ওঁর উদ্দেশ্য অন্য, ঐ পথে গিয়ে তুর্কীস্থানের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। তামাম হিন্দুস্তানের তখ্‌ৎ সামিল করাই তাঁর উমীদ। তখন এই সব মনসবদারদের সুবেদার ক'রে দেবেন তিনি, বিশ্বস্ততার পুরস্কারস্বরূপ।

এটাও সত্য নয়। সম্ভবতঃ বলেছিলেন এই জন্যে যে, সোনার কাহিনী শুনলে সবাই সেখানেই যেতে চাইবে। এখানের গদি পাহারা দেবার জন্যে কাউকে রেখে যাওয়া যাবে না।

সত্য কী তা কেউ জানে না।

এক, জানতে পারত বেঁচে থাকলে, আঁচ করতে পারত, সেই কাফের ছোকরীটা —ললতা।

হ্যাঁ, লল্‌তাই তাঁর উপযুক্ত জীবনসঙ্গিনী। তাঁর শুধু নর্ম নয়, মর্মসহচরীও। সে-ই ঠিক বুঝেছিল তাঁকে।

কী যে হ'ল মেয়েটার! অত সাহসী মেয়ে, খুবই সাহস তাতে কোন সন্দেহ নেই—তাঁর মতো সাক্ষাৎ দানোকে নাকে দড়ি নিয়ে নাচিয়েছে—তবু একসঙ্গে এতগুলো লোকের হত্যা-মহোৎসব 'আম্ কুরবানী' দেখতে দেওয়া উচিত হয় নি তাঁর। হাজার হোক আওরৎ। ও দৃশ্য দেখে মাথার গোলমাল হয়ে যাওয়াই স্বাভাবিক। দিমাগ ঠিক রাখা কঠিন।

॥ ২ ॥

সেই লল্‌তা'ই প্রথম বলেছিল ওকে আলেয়ার কথা।

আলেয়া মামদো। কাফেররা, এ দেশের কাফেররা বলে ভূত। বিহারীরা বলে পিরেত।

না, ভূত বা মামদোও তো নয়, কী যেন বলেছিল?—পেত্নী?

ঠিক, পেত্নীই বলেছিল। হ্যাঁ, এখন ইয়াদ হচ্ছে।

অন্ধকার ছায়াচ্ছন্ন স্রুণ জমিতে ঘুরে বেড়ায় রোশনীর নেশা জাগিয়ে, রোশনীর ফাঁদ পেতে ভুলিয়ে নিয়ে যায়, আলোর হাতছানি দিয়ে ইশারা করে। ইনশান, বিশেষ মরদ, সে নেশায় বেহুঁশ দিওয়ানা হয়ে যায়, ছুটে যায় সেদিকে—তারপর পাঁক আর চোরাবালিতে ডুবে যায়, দম বন্ধ হয়ে মরে।

হোসেনাও সেই আলেয়া ইখ্ তিয়ারউদ্দীনের জীবনে।

প্রথম যৌবনে—হ্যাঁ, কুৎসিত কুব্জ বিকলাঙ্গরও যৌবন আসে কোন না কোন সময়ে, সেও ভবিষ্যতের খোয়াব দেখে—অনেক আশা, অনেক স্বপ্ন বুকে নিয়ে তকদিরের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে ইখ্ তিয়ার হিন্দুস্তানে এসেছিলেন। তারপর বহুবার আশাভঙ্গ হয়েছে, বহু লাঞ্ছনা বহু অপমান সইতে হয়েছে তাঁকে এই বদচেহারার জন্যে, বদসুরতের খেসারৎ দিতে হয়েছে সেই বাল্যকাল থেকেই, কিন্তু সেদিন মূলতানের নখাস বা বান্দাবাজারে যে অপমান করেছিল মেয়েটা, নাতোয়ান বলেই বা মুখ বুজে সহ্য করতে হয়েছিল, তার মতো আঘাত আর কোন কিছুতেই পান নি তিনি জীবনে।

একটা সামান্য বাঁদী, যাকে প্রায় উলঙ্গ ক'রে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছিল অসংখ্য অলস দর্শকের চোখের সামনে, সেই লৌণ্ডী, হোসেনা তার নাম, তার এত গোস্তাকি,

এত স্পর্ধা। সেইটে মনে হলেই আজও এমনি বিছার জ্বাল বোধ করেন ইখ তিয়ার।

ইখ্‌তিয়ার বেহুঁশের মতো একদৃষ্টে চেয়ে ছিলেন। দেখার মতোই সুরৎ তা তিনি স্বীকার করতে বাধ্য। সেই সময় কে একজন তামাশা ক'রে জিজ্ঞাসা করেছিল, ইখ্‌তিয়ারের শখ আছে কিনা এই বাঁদী কেনার। সেও যে অপমানই করতে চেয়েছিল তা কারুরই বুঝতে বাকি রইল না। ইখ্‌তিয়ারও তা বুঝেই জবাব দেন নি। কিন্তু সেই বাঁদী ওঁর দিকে একবার চেয়েই থুথু ফলে ঘাড় ঘুরিয়ে নিয়েছিল। যেন ওঁর শুধু চেয়ে তাকাতেই অপমানিত বোধ করছে সে, ওঁর দৃষ্টি তার গায়ে লাগাও দুঃসহ তার কাছে। উনি কিনতে পারবেন না সে তো স্পষ্ট, তবু সেই প্রসঙ্গ নিয়ে তামাশা করাতেও তার অপমান হয়।

বাঁদী—চিরদিন যাকে পরের হুকুমে চলতে ফিরতে হবে, পরের মর্জিতে ইজ্জত শরীর সঁপে দিতে হবে, মালিক ইচ্ছে করলে নিজেও ভোগ করতে পারে, খুশি হলে কোন নৌকরকেও বিলিয়ে দিতে পারে, হুকুক করলে কুষ্ঠরোগীর সঙ্গেও শুতে হবে, তারও ঘৃণার পাত্র উনি। এতখানি ঘৃণা। যদি ওঁর টাকা থাকত, উনি কিনে নিতেন? তাহলে তো এই বে-আদবির জন্য কোড়া মেরে মেরে ঐ সুন্দর চামড়া ক্ষতবিক্ষত ব্রণাঙ্কিত ক'রে দিতেন আগেই। যেমন পরে আরও অনেক মেয়ের দিয়েছেন। তাদের ওপর দিয়ে কতকটা এই ঝাল মিটিয়েছেন।

হ্যাঁ, এই জ্বালার শোধ তুলতেই অসংখ্য মেয়ের, কেনা নয়—কেনাও হয়ত কেউ কেউ ছিল, কিন্তু সে সামান্যই, দু-একশোর বেশী হবে না—গায়ের জোরে হিম্মতের জোরে দখল ক'রে বাঁদী-করা-মেয়ের পিঠের চামড়া, পিঠ-বুকের চামড়া কুৎসিত কদর্য ক'রে দিয়েছেন। কারও কারও সে ঘা শুকোতে দীর্ঘ দিন সময় লেগেছে, কেউ কেউ বিকলাঙ্গও হয়ে গেছে চিরদিনের মতো। যতদিন খুশি হয়েছে নিজে ভোগ করেছেন—সে দু-তিন দিনের বেশী নয়, কাউকে আবার একদিনের বেশী সহ্য হয় নি। ছিঁচকাঁদুনে কিংবা ভয়ে বোবা পাথর হয়ে যাওয়া মেয়েদের সহ্য হয় না ওঁর। তাহলে তো মুর্দার সঙ্গে শুলেই হয়। তারপরই অসহ্য লাঞ্ছনা ও নির্যাতন করেছেন। দৈহিক পীড়ন প্রহারে মুমূর্ষু হয়ে গেলে বিলিয়ে দিয়েছেন নফর বা সিপাহীদের, কোন কোন ক্ষেত্রে কেনা বান্দাকেও। তার আগে—নির্যাতনের আগে অনেক সময় বেছে বেছে সবচেয়ে সুন্দরী মেয়েগুলোকে বেইজ্জৎ করিয়েছেন, নিজের সামনে সম্ভোগ করিয়েছেন সবচেয়ে কুৎসিত নৌকরদের দিয়ে অনেক সময় হাবশী বান্দাদের দিয়ে। এমনিও ওঁর কাজ মিটে গেলে যার যাকে খুশি নিয়েছে, তিনি আর সে হিসাব রাখেন নি, ফিরেও তাকান নি। অনেকে মার খেতে খেতে মরেও গেছে,

তার জন্যেও কোন আপসোস হয় নি তাঁর।

তবু তো এত ক'রেও এত বর্বরতা—কাফেরেরা বলে পিশাচ, লল্‌তা শিখিয়ে গেছে শব্দগুলো—এত পৈশাচিকতাতেও সে অপমানের জ্বালা ভুলতে পারেন নি।

অবশ্য বিচ্ছিন পরে উন্মত্ততাটা কমেছে কিছু। কিছু কমেছে সময়ে—পিশাচের বা দানোদেরও দৈহিক ক্লান্তি বোধ হয় একসময়—তাই হয় তো হয়েছে, কিছু সেই লল্‌তা মেয়েটা কমিয়ে গেছে নিজের জান কবুল ক'রে, জান দিয়ে। অদ্ভুত মেয়েটা! আজও তার জন্যে ওঁর দুঃখ হয়। তকদির কি—ভবিষ্যৎ আর ভাগ্য জেনেও সে ওঁর দিকে আকৃষ্ট হয়েছিল, হয়ত ভালও বেসেছিল। ওঁর বিশ্বাস ভালই বেসেছিল। ওঁর জন্যেই ভালবেসেছিল। কান্নাকাটি ক'রে প্রাণভিক্ষা করে নি, মেহেরবানি চায় নি—বরং মুখের ওপর কড়া কড়া কথা শুনিয়ে দিয়েছে, সাফ সাফ জবাব দিয়েছে ওঁর কথার। অভিনয়? ভান? এ যদি অভিনয় হয় তো বড় তাজ্জব। অদ্ভুত শক্তি মানতেই হবে, তারিফ করার মতো। অনেকতো দেখলেন বখ্‌তিয়ার তাঁর জীবনে। অনেক ছল, অনেক চাতুরী—সেই অভিজ্ঞতা মতোই বাজিয়েও দেখেছেন বার-বার, বহুবার বহুভাবে, কিন্তু ছল বলে ধরতে পারেন নি। সোবে হয় অবশ্য, হয় না বললেও ঝুট বলা হয়, তবু তার মহব্বৎ আশক সাচ্চা বলেই ভাবতে ভাল লাগে তাঁর।

উনিও ভালবেসেছিলেন। ঠিক প্রেয়সী হিসেবে হয়ত নয়। তেমন ভাবে কাউকেই ভালবাসেন নি। প্রেমটা আসার সুযোগই হয় নি জীবনে। শুধু কেমন যেন মায়া পড়ে গিয়েছিল ওঁর। তাকে ভালবাসা না বলে স্নেহ বলাই উচিত। কাছে থাকলে ভাল লাগত, কথা বলে কথা-কাটাকাটি ক'রে খুশ হ'ত—বন্ধুর মতো মনে হ'ত।

কড়া কড়া কথা বলেছেন অনেক সময়, হুমকি দিয়েছেন, কিন্তু সে ভয় পায় নি, আরও কড়া জবাব দিয়েছে। সে-ই চিনেছিল ওঁকে। বোকা মিনমিনে লোক উনি দু'চক্ষে দেখতে পারেন না, তা কী মরদ কী আওরৎ। ঐ মেয়েটার ছিল ধারালো তলোয়ারের মতো দুদিকেই শান, যেমন সুরৎ তেমনি বুদ্ধি, আর তেমনি সাহস ও তেজ। *সে যদি থাকত আজ! ওঁর সুলতানতের প্রধান স্তম্ভ হ'ত, যথার্থ ওআজীর* হতে পারত। তাকেই তিনি প্রধানা বেগম করতেন।

সে-ই সন্ধান দিয়েছিল ওদন্তপুর বিহারের। সে এদিককার সব খবর রাখত। সেই জন্যেই কতকটা আরও তাকে সঙ্গে নিয়েছিলেন। ইন্‌সাল্লাহ্‌। অমন শানদার মেয়েটাও যে ঐ আগুন আর মৌত দেখে অমন বাওরা হয়ে যাবে তা কে জানত।

তাহলে কি আর তাকে নিয়ে যেতেন!

আলিমর্দান অবশ্য বলে অন্য কথা। সে বলে নিশ্চয় ঐ মৌণ্ডীর কোন আশকের লোক ছিল ঐ বিহারের। সে যে ছিল ওখানে তা জানত না, তাকেই মরতে দেখে আর ঠিক থাকতে পারে নি, আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। নয় তো, তার সঙ্গে রাগারাগি ছিল, সেই শোধ নেবার জন্যেই সে ওদন্তপুর বিহারের খোঁজ দিয়েছিল—তখন ঝোঁকের মাথায় আক্রোশের জ্বালায় দিয়েছে—সে শোধটা যে এমনভাবে উঠবে তা ভাবে নি। ঐ ভয়ানক ব্যাপার চোখের সামনে দেখেই অনুতাপ হয়েছে তাই আগুনে ঝাঁপ দিয়েছে।

ঝুট! বিলকুল ঝুট! এসব কথা বখ্‌তিয়ার বিশ্বাস করেন না। আলিমর্দানের হিংসের কথা এসব। ওঁকে কেউ সত্যি সত্যি ভালবাসবে, কোন মেয়ে ওঁর কল্যাণ চিন্তা করবে—তা ভাবতেও ওদের কষ্ট হয়।

তা সেই ললিতা মেয়েটাই অনেক কিছু বলে গেছে, অনেক কথা শিখিয়েছে, এদেশ—এদেশের লোক সম্বন্ধে অনেক কথা জানতে পেরেছেন তার কাছ থেকে। সে বলেছিল হোসেনার খোঁজ ছেড়ে দিতে। বলেছিল, ও আলেয়া, ওর পেছনে ছুটে শুধু শুধু নিজের শক্তি আর স্বাস্থ্য ক্ষয় করা। বলেছিল আলেয়া আলোর মায়া সৃষ্টি ক'রে ভুলিয়ে নিয়ে যায়—কুপথে কুস্থানে নিয়ে গিয়ে পাঁকে* ডুবিয়ে মারে।

আরও বলেছিল, 'শুধু একটার পর একটা রাজ্য জয় ক'রে বেড়িয়ে লাভ কি আলিগা? জীবনটা তাহলে ভোগ করলেন কি? সারা জীবনটা শুধু লড়াই আর মানুষ মারতেই যদি কাটল, ঘরের দিকে নিজের দিকে তাকাবারই যদি সময় না হ'ল—তাহলে এত কাণ্ড ক'রে লাভ কি? রাজগী সুলতানত্‌ তো চায় মানুষ আরামে থাকবে বলে—অন্য পাঁচটা লোকের থেকে, তার প্রজাদের চেয়ে সুখে থাকবে এই আশায়। আপনি তো দেখছি আপনার দীনতম রায়তের চেয়েও দুঃখী। তারা জীবন থেকে যেটুকু শান্তি সুখ পায়, তাও তো কোনদিন পেলেন না।'

উনি হেসেছিলেন সে কথা শুনে। হা-হা ক'রে হেসেছিলেন। বলেছিলেন, 'ঐ যে খড়ের ঘরে শুয়ে যারা বর্ষাতে ভেজে, জাড়ার দিনে হি-হি ক'রে কাঁপে, কোন হাঙ্গামা কি লড়াই বাধলে বকরার মতো মরে—তাদের সুখ আর আমার সুখ এক নয়। আমার এই লড়াই করাতেই সুখ। এই উদ্বেগ, এই দুশ্চিন্তা—এই নাওয়া-নিদ ছেড়ে, আরাম-আয়েস না ক'রে বেশিরভাগ দিনই ঘোড়ার সওয়ার হয়ে কাটানো—এতেই আমার আনন্দ, আমার বিশ্রাম। এই আমার নেশা। আর কি জানিস্‌, সুলতান

*Bog বা Quagmire.

বাদশা যে হবে, তার আরাম করতে নেই। আরামেই তার সর্বনাশ জানবি। তলোয়ার বেশীদিন খাপে পুরে রাখলে তাতে জঙ্ ধরে যায়।···নেশা ছাড়া মানুষ থাকতে পারে না। লড়াইয়ের নেশা ছাড়লেই আরামের নেশা তাকে পেয়ে বসে। না-মরদ হয়ে যায় ক্রমশঃ। আর, আমি লড়াই না করলেও অপরে চুপ ক'রে থাকবে কেন? তখন তারা এসে আমার সর্বনাশ করবে। রাজগী তো যাবেই, জানও যাবে।·· না লল্‌তা, এ পথে থামবার কোন উপায় নেই। থামা মানেই একেবারে থেমে যাওয়া জিন্দীগীর মতো। সবকিছুর শেষ—খতম! যে দিন থেকে তলোয়ার চালানের পেশা নিয়েছি, সেদিন থেকেই আরামকে হারাম বলে জেনেছি, আয়েসকে তালাক দিয়েছি।·আর, এতটুকু জমিনের মালিকানাকেই ঢের বলছিস! অনেক অনেক বড় মুলুকের যারা মালিক তারাই বা থামতে পারে কৈ? শুনেছি সিকান্দার শা তামাম দুনিয়ার আদ্ধেকেরও বেশী দখল করেছিলেন। তাতেও তাঁর আশ মেটে নি। ফৌজের চাপে পড়ে হিন্দুস্তান থেকেই ফিরতে হয়েছিল বলে আপসোসের শেষ ছিল না, সেই আপসোসেই মারা গেলেন তিনি। বেনিয়াজ রুমের বাদশারা আরও অনেক দেশ জয় করেছিলেন, তবু খুশী হন নি। যেদিন হলেন—আরাম করতে গেলেন, সেদিন সমস্ত শাহী টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙ্গে পড়ল।'

তারপর এক বয়েৎও শুনিয়েছিলেন ওকে—

"দরমিয়ান বহর আগর, বিনিশস্তা অম।
তমাদর আব এ-সবু, চাম বস্তা অম॥"

তার পর মানেও বুঝিয়ে দিয়েছিলেন হিন্দীতে—'যদি সমুদ্রের মধ্যেও বসে থাকি, তবু কারও সুরাইয়ের জল দেখলে তাও পেতে ইচ্ছে করে।' বলেছিলেন, 'জীবনের নিয়মই এই। আশ মেটে না কিছুতেই। যতদিন বেঁচে থাকবে মানুষ ততদিনই আরও, আরও, পাবার ইচ্ছা থাকবে। এ ইচ্ছা মিটে গেলেই তো জীবনও শেষ! বেঁচে লাভ কি? ঐ যে তোদের দেশের নাঙ্গা ফকীরগুলো, ওরাই কি সব ইচ্ছে ছাড়তে পেরেছে? মনে তো হয় না। তা নইলে নিজেদের মধ্যে কেজিয়া করে কেন?'

॥ ৩ ॥

না, হোসেনার আশা ছাড়তে পারেন নি ইখ্‌তিয়ারউদ্দীন মহম্মদ বখ্‌তিয়ার। শুধু যদি ঐ দেহটা পাবার আশা হ'ত তো কবেই ছেড়ে দিতেন। কারণ জানেন যে, সে এতদিনে বহু হাত-ফেরতা হয়েছে, তার সে লাবণ্যের চিহ্নও আছে কিনা সন্দেহ

হয়ত নানা রোগে ভুগে অতিরিক্ত অত্যাচারে বুড়ী হয়ে গেছে।

আসলে এ যে তাঁর প্রতিশোধের প্রশ্ন। ওঁর জীবনের বলতে গেলে একমাত্র লক্ষ্য। সমস্ত আশা আকাঙ্ক্ষা কামনা ঐ একটি মাত্র লক্ষ্যে স্থির হয়েছে।

সেই থুথু-ফেলা মুখ দিয়ে ওঁর থুথু চাটাবেন, তবে ওঁর সেই লক্ষ্যে পৌঁছনো হবে, সর্বশ্রেষ্ঠ বাসনা পূর্ণ হবে। জীবনের সবচেয়ে বড় আশা।

সেই আশা পূর্ণ হলে, সেই লক্ষ্যে পৌঁছতে পারলে তবেই স্থির হয়ে নিজের দিকে, জীবনের দিকে, ভবিষ্যতের দিকে তাকাবার ফুরসুৎ মিলবে ওঁর—তার আগে নয়।

মন এই একটা জায়গায় স্থির আছে বলেই অনেক সময় তাঁর কার্য-কারণের সম্বন্ধ, তাঁর আচরণের অর্থ খুঁজে পায় না কেউ। বিহারটা সম্পূর্ণ আয়ত্ত না ক'রেই ঈসাই ১২০১ সালে কেন উনি নবদ্বীপ জয় করতে গেলেন, তা কেউ জানে না।

নবদ্বীপ কোন রাজধানী বা ভারী শহর নয়। লুটপাট তো রাজধানী বা সেই রকম শহরেই সুবিধে। অনুচরদের কেউ কেউ ভয়ে ভয়ে সেটা মনে করিয়েও দিতে গেল। বখ্‌তিয়ার ওদের নির্বুদ্ধিতায় হাসলেন শুধু।

ওদের মাথায় যে কথাটা গেছে সেটা ওঁর মাথায় যাবে না—এমন ভাবার থেকে নির্বুদ্ধিতা, বেঅকুফি কী হতে পারে।

তবে, এরা যে ওঁর মনের, চিন্তার তল পায় না—সেটা মনে মনে বেশ উপভোগ করেন উনি। ওঁর বুদ্ধির সীমা পায় না বলেই ভয়ে ভয়ে থাকে—সেটাও মস্ত সুবিধে একটা।

বদবখ্‌তরা জানে না যে রাজধানীতে যেমন সোনা-দানাও বেশী, তেমনি সেখানে পাহারার ব্যবস্থাও কড়া। নবদ্বীপ হল ইষ্ট-চিন্তা-সর্বস্ব বৃদ্ধ রাজার তীর্থবাসের আড্ডা। বড় ধরনের সরাইখানা ছাড়া কিছু নয়। সেখানে কড়া পাহারা বসাবার কথা কারও মাথাতেও যাবে না। সে সব খবর না নিয়ে উনি এ কাজে এগোন নি। লক্ষ্মণসেনের কত প্রতাপ তা লল্‌তার মুখে শুনেছেন। হোক না আজ বৃদ্ধ। শের বুড্‌ঢা হলেও সে শের। অবশ্য হ্যাঁ, আরামে শান্তিতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছেন ; শোনা যায়, মাইনে ক'রে বড় বড় শায়ের আর ওস্তাদ গাইয়ে পোষেন, মুসায়রা আর মহফিল লেগেই থাকে। লড়াই-টড়াই হয়ত ভুলেই গেছেন। আরামের নেশা পুস্তার নেশা—বুঁদ হয়ে থাকে লোকে। তবু সাবধানের মার নেই।

গঙ্গাস্নানের জায়গা, গ্রাম ছাড়া কিছু নয়—নিহাৎ রাজা এসে মাঝে মাঝে থাকেন বলেই গণ্ডগ্রামে দাঁড়িয়েছে, আধা শহরের চেহারা নিয়েছে। একটা দরবারও নাকি বসে—যখন রাজা এসে থাকেন। কিন্তু প্রাসাদ বা দুর্গ বলে কিছু নেই। রাজা যে

বাড়িতে থাকেন, সেটাও খড়ের চালা, একটা মস্ত আটচালার মতো—বাঁশ আর মাটির দেওয়াল। দেওয়ালে চিত্র-বিচিত্র আছে, কাঠের দরজায় কারুকার্যেরও অভাব নেই। কাঠে গালার রঙ—লেপামোছা ঝকঝকে। তবু এমন বাড়িতে কোন ভরসায় রাজা থাকেন ভেবেই পান না বখ্‌তিয়ার। দুশমন লড়াই বলে যে জিনিস আছে পৃথিবীতে—এসব ভুলেই গেছেন নাকি? ওদন্তপুর বিহারের কিস্‌সাও কি পৌঁছয় নি কানে?

সব ফেলে নবদ্বীপ জয় কেন? এত তাড়া কিসের?—এ প্রশ্নও করেছে বৈকি কেউ কেউ।

জবাব পায় নি। বখ্‌তিয়ার শুধু ছাটা দাড়িতে হাত বুলিয়েছেন আর হেসেছেন মুচকি মুচকি। এর উত্তর দেবার নয়। এদের অন্ততঃ দিতে পারবেন না। এক সেই লল্‌তাকে দেওয়া চলত।

এত দিন পরে হোসেনার সন্ধান পেয়েছেন। ঠিক খবর পেয়েছেন কিনা জানেন না, তবে দুটো ব্যাপার মিলে গেছে বলেই তাঁর এই বিশ্বাস দৃঢ় হ'য়েছে।

স্বপ্ন দেখেছেন লল্‌তাকেই। সে যেন ক্রমাগত উত্তর দিকে হাত দেখাচ্ছে, ইশারা করছে এগিয়ে যেতে। বলছে, 'তুমি যা চাও আলা হজরত, তা ঐখানে আছে। পাহাড় পর্বত ডিঙিয়ে যেতে হবে। পারবে তো? দেখো, তোমার আলেয়া ঐখানে জ্বলছে।'

কণ্ঠে তার বিদ্রূপের সুর। ব্যঙ্গ করছে মনে হ'ল। দারুণ ক্রোধে কী জবাব দিতে গিয়ে ঘুম ভেঙে গেল বখ্‌তিয়ারের।

পরের দিন—ফজরেই খবর এল। কে নাকি এক পাহাড়ের রাজা তাকে জোর ক'রে কেড়ে নিয়ে গেছে। তারা নাকি জাত মানে না, চামড়ার জামা গায়ে দিয়ে থাকে, পচা মাখন খায়, কখনও গো-স্‌ল করে না। তিব্বত বলে একটা জায়গা আছে—সেখানকারই কোন এক রাজা বা তেমনি কোন জমিদার। হিন্দুস্তানের এক কাফের রাজা ফকির হয়েছিল, তাকেই মানে ওরা, পূজো করে। না হিন্দু না মুসলমান—অন্য এক জাত তারা।

যে লোকটা খবর এনেছিল তাকে অনেক ক'রে বাজিয়ে দেখেছেন। এর আগে এমন বাজে খবর অনেকে দিয়েছে বকশিশের লোভে। তার শাস্তিও পেয়েছে। চরম শাস্তি দিয়েছেন তাদের। জ্যান্ত ডালকুত্তা দিয়ে খাইয়েছেন—মাটিতে অর্ধেকটা

পুতে হাত বেঁধে রেখে ক্ষুধার্ত কুকুর ছেড়ে।

একেও সে ভয় দেখিয়েছেন। দু'দিন ঠাণ্ডি গারদে রেখেছেন। কিন্তু লোকটা ভয় পায় নি। বলছে, 'আমাকে সঙ্গে নিয়ে চলুন, যদি ঝুট বলে থাকি কুত্তা দিয়েই খাওয়াবেন।'

এক রকম কথাই বলে গেছেন বরাবর। অনেক রকম ক'রে জেরা করেছেন, করিয়েছেন—তাতেও কথায় গোলমাল হয় নি। চেহারার বর্ণনাতেও মিলেছে। সে রাজা ওকে মুসলমান জেনেও রেখেছে—তাদের যে ধর্ম তাতে মুসলমান বা ঈসাইদের সঙ্গে খানাপিনা করতে আটকায় না। সে ধর্মের খোঁজও নিয়েছেন। ওদন্তপুরের মতো আরও ছোট বড় বিহার, এখানে আছে তাদের। পূর্বে বিক্রমশীলা খুব বড় বিহার, সেখানেও যাবেন একদিন। এইসব বিহারে যে সাধুরা থাকে তারা নাকি ঐ ধর্মেরই লোক।

অতএব তিব্বত চল।

কিন্তু যাব বললেই যাওয়া যায় না। বিহার এখনও সম্পূর্ণ আয়ত্তে আসে নি। উড়িষ্যার বিপুল শক্তি ওৎ পেতে আছে তাঁদের খতম করবার জন্যে। সে অবস্থায় গৌড়ের রাজাকে পিছনে রেখে পাহাড় ডিঙোতে যাওয়া পাগলামি। সেন রাজাদের বিস্তর নাম-ডাক। এককালে প্রবল শক্তি বলে গণ্য হতেন। সে শক্তির কতটা এখনও আছে তার সঠিক হিসেব পাওয়া শক্ত। ওঁকে যে এদেশের কেউ দেখতে পারে না সে তো জানা কথাই। সুযোগ পেলেই জব্দ করতে, উৎখাত করতে চেষ্টা করবে।

সুতরাং—শেষ না হোক, গৌড়েশ্বরকে নখদন্তহীন ক'রে দিতে হবে। আর সেটা নবদ্বীপে যতটা সহজ হবে, লক্ষ্মণাবতীতে ততটা নয়।

মন স্থির করার সঙ্গে সঙ্গেই আয়োজন শুরু হয়ে গেল।

সাবধানে বেশ ভেবেচিন্তেই আয়োজন করলেন বখ্‌তিয়ার—যাকে বলে আট-ঘাট বেঁধে। দ্বারভাঙ্গা ও তেলিয়াগড়িতে ঘাঁটি করলেন। কিছু ফৌজ ও এক একজন বিচক্ষণ ফৌজদারকে বসালেন। অর্থাৎ ওদিক দিয়ে না কোন সাহায্য আসে। তার-পরও সোজা-পথে গেলেন না, রাজমহলের দক্ষিণ দিকে ঘুরে ঝাড়খণ্ডের পথে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে গেলেন।

নিবিড় অরণ্য, তবে বড় বড় গাছ, শাল গাছই বেশী। আগাছার ঘন ঝোপঝাড় নেই তত। দুশমন—তা মানুষই হোক আর জানোয়ারই হোক—কেউ আসছে কিনা দূর থেকেই দেখা যায়।

তবু, বখ্‌তিয়ার ছাড়া সকলেই ভয় পেয়ে গেল। বাঘ আছে, ভয়ানক ভয়ানক সাপ আছে। সে সব সাপ ছুঁলেই মৃত্যু। তার চেয়েও ভয়ঙ্কর এত বড় বড় কালো কাঁকড়া বিছে! মৃত্যু তো অবধারিত, তার আগে যে অসহ্য যন্ত্রণা সেটা আরও ভয়াবহ।

বখ্‌তিয়ার এদের ভয় দেখে হেসেই খুন। বললেন, 'সাপে বাঘে কটা মানুষ খেতে পারে? সোজা পথে লড়াই দিতে গেলে কত হাজার মানুষ মরবে তার হিসেবটা কষে দেখেছিস?'

হিসেবটা মিলিয়ে পেলও তারা। সাপে বাঘে বিচ্ছুতে আর পেটের অসুখে মারা গেল একশোর সামান্য একটু বেশী। লড়াইতে হয়ত আরও বেশী মরত।

কিন্তু লড়াই তো একটা সামনে রইলই, সেটা তো এড়ানো যাবে না! –শুধালো তারা।

'লড়াই যাতে একেবারেই না করতে হয় সেই ব্যবস্থাই করছি।'—সংক্ষেপে উত্তর দিলেন বখ্‌তিয়ার।

করলেনও সেই ব্যবস্থা।

জঙ্গল থেকে বেরিয়ে লোকালয় পেলেন একেবারে বীরভূমে পা দিয়ে। লোকালয় দ্রুত অতিক্রম করলেন তিনি—এত দ্রুত, যে ব্যাপারটা কি বোঝবারই অবকাশ পেল না কেউ, খবর দেওয়ার তো কথাই ওঠে না।

শেষদিনে ভোর থেকে দশ ক্রোশ রাস্তা পেরিয়ে দুপুরে ওঁরা নবদ্বীপ পৌঁছলেন। তখন দরবার ভেঙ্গে গেছে। দরবার তো কত, আড্ডাই বলা চলে! কাব্যপাঠ ও সাহিত্য এবং শাস্ত্র-আলোচনাই বেশির ভাগ। সকলেই স্নানাহার বিশ্রামের আয়োজনে ব্যাপৃত। কারও বা ও-পাট চুকে গেছে, ঘুমোচ্ছে। কেউ বা নদী থেকে স্নান ক'রে ফিরছে, এইবার খেতে বসবে—এই সময়টা। এক কথায় সারা শহরটাই ঝিমোচ্ছে—শান্ত, নিশ্চিন্ত, তন্দ্রাতুর।

এর মধ্যে উনিশজন অশ্বারোহী দুলকি চালে শহরে ঢুকল কি না কে তার খবর রাখে! বাজার উঠে গেছে, দোকানের সব ঝাঁপ ফেলা। পথেঘাটে লোক নেই, দু'চার জন যা আছে, গঙ্গার ঘাটে বা স্নান করে ফিরছে। তবু এক-আধজন জিজ্ঞাসা করল বৈকি, 'তোমরা কারা গা? কোথা থেকে আসছ?'

ওরা ভাঙ্গা হিন্দীতে বুঝিয়ে দিলে—ঘোড়া বেচতে এসেছে, কেউ কিনবে? তারাও সোজা আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলে রাজার বাড়ির দিকে। এখানে আর ঘোড়া কে কিনবে, কারই বা দরকার? রাখলে এক রাজাই রাখতে পারেন। কাজে না লাগলেও রাজাদের হাতী ঘোড়া দু-চারটে রাখতে হয়। কেউ কিছু বেচতে

এলে দরকার না থাকলেও কিনতে হয়—মর্যাদা রাখতে।

তার মানে—রাজবাড়ি বা ঐ বাঁশ-মাটির কেল্লা খুঁজে পেতেও অসুবিধা হ'ল না। দেউড়িতে দারোয়ান বা সান্ত্রী পাহারা ছিল হয়ত, অথবা ছিল না। থাকলেও তারা তখন ভাত খেয়ে ঝিমোচ্ছে।

হঠাৎ উনিশখানা তলোয়ার যদি তাদের ঘাড়ে এসে পড়ে তো মাথাগুলো গড়িয়ে পড়তে কতক্ষণ!

সময় হিসেব করা ছিল বখ্‌তিয়ারের। নির্ভুল। দক্ষ সেনাপতির যেটা সর্বপ্রধান গুণ সেটা ছিল ওঁর সহজাত। উনিও রাজপ্রাসাদে হানা দিয়েছেন, সঙ্গে সঙ্গেই ঠিক সেই সময়টায়—যে সব সিপাহী বা সিপাহশালার শহরের উপকণ্ঠে আম-কাঁঠালের বাগানে ঘাপটি মেরে বসে ছিল—তারা চারিদিক থেকে বিকট আওয়াজ ক'রে ঝাঁপিয়ে পড়ল তলোয়ার, বর্শা, বল্লম নিয়ে। কারও হাতে বা জ্বলন্ত মশাল, অব্যর্থ লক্ষ্যে ছুঁড়তে লাগল খড়ের চালের ওপর।

ফলে বিস্মিত আর্তনাদ—নিরীহ নিরস্ত্র মানুষগুলোর মৃত্যুযন্ত্রণার কাতরানি, এ পক্ষের পৈশাচিক উল্লাসধ্বনি, মেয়েদের অসহায় করুণ কান্না। এর মধ্যে নবদ্বীপ শহর এক প্রহরেরও কম সময়ে হাত-বদল হয়ে গেল। সেখানে বখ্‌তিয়ারের চাঁদ-তারা আঁকা পতাকা উড়ল।

উড়ল অংশত অর্ধদগ্ধ প্রাসাদের সামনে। গোটা শহরটাই জ্বলছে তখন, লুঠ-পাট, নারী-হরণ শেষ ক'রে আগুন লাগালো—এ তো বিজয়ী সেনাদের অধিকার!

কিন্তু কে জানে কেন—মানে অনুচররা ঠিক বুঝল না কারণটা, খুব একটা বেপরোয়া লুটতরাজ চলতে দিলেন না বখ্‌তিয়ার। বোধ হয় বুঝেছিলেন যে, সবাইকে বিদ্বিষ্ট ক'রে, পিছনে হাহাকার আর অভিশাপ রেখে যাওয়া বুদ্ধিমানের কাজ নয়। তিনি বরং শাসনেই মন দিলেন। প্রজাদের কিসে সুবিধা হয়—কোথায় কোথায় কড়া হতে হবে, কোথায় দয়া-দাক্ষিণ্য করতে হবে, সেটা এতদিনে বুঝে গিয়েছিলেন—সেই মতো ব্যবস্থা করলেন।

শুধু একটা ব্যাপারে তিনি কোন আপস করতে রাজী হলেন না। কারও পরামর্শও শুনলেন না। কাফেরদের মন্দিরগুলো ভেঙ্গে সেখানে মসজিদ আর টোলবাড়িতে মাদ্রাসা বসিয়ে এদের যে মহৎ উপকার এবং নিজের পরকালের কাজ করছেন, তাতেও যে কেউ চটে থাকতে পারে—সেটা তাঁর মাথাতেই ঢুকল না। যে সমস্ত পারিষদ বোঝাতে গিয়েছিল, তাদের বললেন, 'একসময় এরা বুঝবে কত ভাল কাজ করেছি।

ইন্‌সান হয়ে সত্যধর্মের মর্যাদামূল্য বুঝবে না, তা কখনও হয়! একদিন না একদিন বুঝবেই। তা ছাড়া, এই যারা মুসলমান হচ্ছে তারাই আমাদের বন্ধু হয়ে থাকবে। তাদের তো আর কাফেরদের মধ্যে ঠাঁই হবে না। আমাদের সঙ্গে দোস্তি করতেই হবে।'

॥ ৪ ॥

বাংলার মাটিতে আলস্যের বীজ ছড়ানো আছে, বাতাসে আরামপ্রিয়তার বীজাণু। অক্লান্ত যোদ্ধা বখ্‌তিয়ারকে কি সেই রোগ পেয়ে বসেছে? নইলে কেন নবদ্বীপ আসা, তা ভুলে গিয়ে রাজ্যশাসনেই এত ব্যস্ত হয়ে পড়বেন কেন? নতুন কোন দেশ জয়েরও তো চেষ্টা দেখা গেল না। তামাম হিন্দুস্তানের তখ্‌ৎ-এর কথাও যেন ভুলে গেলেন বলে মনে হতে লাগল।

অথবা এতদিন নব নব ভূখণ্ড জয়ই করেছেন, রাজ্যশাসন—রাজত্ব করা যাকে বলে তা কখনও তেমনভাবে করেন নি। মনের মধ্যে ছিল প্রচণ্ড প্রতিশোধ-বহ্নি, সেই উত্তাপেই তাঁকে স্থির থাকতে দেয় নি, পায়ের নিচের মাটিটা কেমন তা দেখার সুযোগ পান নি। বাংলা দেশের শান্ত আবহাওয়া, বিনত, নিজেদের-ভাগ্য-সম্বন্ধে-উদাসীন প্রজাদের পেয়ে—রাজত্ব করার নেশাই পেয়ে বসেছিল বোধহয়। কোথা দিয়ে তাই চার-পাঁচটা বছর কেটে গেছে তা টেরও পান নি।

হঠাৎ একদিন এক প্রবল আঘাতে সচেতন হয়ে উঠলেন। কে জানে—ভাগ্যের আঘাত, নিয়তির আঘাত কিনা।

এবার আর খোয়াব নয়—লল্‌তা বুঝি নিজেই এল মনে করিয়ে দিতে।

আবারও লল্‌তা। অন্য পরিচয়ে অন্য ভাবে।

এমনিই এসেছিল মেয়েটা। সাধারণ নিয়মেই।

ওঁর যে সব সর্দার বা ফৌজদার ওঁর মন পেতে চায় তারা মাঝে মাঝে লুঠের বখরা, উপঢৌকন পাঠায়। বলে, 'যা আপনার যোগ্য তা কি আর আমরা ভোগ করতে পারি? যা আমাদের মতে এঁটো জিনিস, ঘাঁটা মাল কি নিতান্তই বাজে—তাই আমরা রাখি।'

বখ্‌তিয়ারের কড়া হুকুমে অকারণ লুঠতরাজ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু নদীর ঘাট, কি কোনো পরবের দিনে দেবমন্দির কি কোন মেলা থেকে দু-একটা 'ছোকরী' তুলে আনা এমন কিছু দূষ্য বলে কেউই মনে করত না। বোধহয় পৃথিবীর সর্বত্রই বহুদিন

পর্যন্ত এই রকমই মনের ভাব ছিল শক্তিমান বা 'ওপরতলা'র মানুষদের, বিজেতা কি শাসক শ্রেণীর।

এমনিই এক রাজভোগ্য রাজযোগ্য বস্তু পাঠিয়েছিল আফজল বেগ—বিহারের ফৌজদার। নাকি কোন্ এক রাজবংশের মেয়ে, রাজবাড়ির বৌ। এই রাজা বা ভুঁইয়া ওদের সঙ্গে খুব বজ্জাতি করতে গিয়েছিল, অন্য ভুঁইয়াদের সঙ্গে সলা ক'রে দল পাকিয়ে উৎখাত করার মতলব করেছিল এদের—সে ষড়যন্ত্র বখ্‌তিয়ারের খাদেম আফজল বেগ অঙ্কুরেই বিনষ্ট করেছে, সে রাজবাড়ি সমভূমি ক'রে সেখানে তিলের চাষ লাগিয়েছে, তাদের বংশে বাতি দিতে কাউকে রাখে নি। শুধু এই লৌণ্ডীকে আলা হজরতের মেহেরবানির উপযুক্ত ভেবে সবিনয়ে পাঠাচ্ছে সে, সঙ্গে সামান্য হাজার-খানেক মোহর।

আসলে হয়ত এই বিশেষ ভুঁইয়ার ঐশ্বর্যের খ্যাতি কানে পৌঁছেছিল। আফজল বেগ লোভ সামলাতে পারে নি—বহু পুরুষের সঞ্চিত বিপুল বিত্তের কিস্‌সা—আগেই মুসলমান সুবেদারের কাছে বশ্যতা জানিয়েছে বলে লুঠপাট করা যায় নি এতদিন—এখন একটা মিথ্যে বদনাম দিয়ে আসলে ডাকাতি করেছে। সে অপরাধ ঢাকতে এবং লুঠের মালের হিসাব দেবার দায় এড়াতেই এত গরজ ক'রে ভেট পাঠানো।

সবই বুঝলেন বখ্‌তিয়ার, তবে বুঝেও না বোঝার ভান করলেন। একই সঙ্গে সকলকার সঙ্গে লড়াই করা যায় না। যা পেলেন আপাততঃ এইতেই খুশী থাকতে হবে। জমুক না টাকা আফজল বেগেরই ঘরে, টাকা কিছু তার সঙ্গে মাটিতে যাবে না। যখন বুঝবেন এইবার প্রবল হয়ে উঠেছে, মনে উচ্চাশার সাপটা ফণা ধরেছে, তখন লাঠির এক এক ঘায়ে যেমন বহুত সত্যিকারের সাপ মেরেছেন জীবনে, সেইভাবেই খতম করবেন লাঠির জোরে। লোভের সাপকে কী ক'রে জব্দ করতে হয় সে মন্ত্র তাঁর জানা আছে।

আপাততঃ মেয়েটা।

লল্‌তার পর ওঁর পৈশাচিক বদভ্যাস অনেকখানিই কমেছে। এখন শুধু প্রয়োজন মতো, অবসর মতো এদের খোঁজ করেন। তবে নাকি রাজবংশের মেয়ে, রাজবংশের বৌ—সেদিন মনে হ'ল, দেখাই যাক না পরখ ক'রে। মন্দ কি।

রাত্রে কাজ সেরে নিজের শোবার ঘরে গিয়ে তলব ক'রে পাঠালেন। হুকুমের জন্যেই অপেক্ষা করছিল, হাত-পা-বাঁধা মেয়েটাকে এনে ঘরে ঢুকিয়ে বাঁধন খুলে দিয়ে চলে গেল প্রহরিণীরা। উনি কাছে গিয়ে অলস কৌতূহলেই দুটো আঙুলে ক'রে

মুখটা তুলে ধরলেন।

এক লহমা, তার পরই মনে হ'ল যেন সাপই দেখলেন—কিংবা জলন্ত আঙরায় হাত পড়ল—ঠিক তেমনিভাবে মুখটা ছেড়ে দিয়ে তিন পা পিছিয়ে গেলেন।

আরে, এ কাকে এনেছে বেঅকুফরা!

কোথা থেকে, কেমন ক'রে এল? কোন মতেই তো আসা সম্ভব নয় আর!

সম্ভব যে নয়, তা তো তিনিই সবচেয়ে ভাল জানেন। তাঁর চোখেই দেখা ঘটনাটা।

এ যে ললতা! সেই লল্‌তাই—সাত বছরের ব্যবধান ডিঙ্গিয়ে মৃত্যুর ওপার থেকে এসে দাঁড়িয়েছে তাঁর সামনে!

সত্যিই কি তাহলে মাম্‌দো বলে জিনিসটা আছে?

লল্‌তাই বলেছিল তাঁকে যে, অপঘাতে মলে, আত্মহত্যা করলে বেহেস্তে তার ঠাঁই হয় না। আত্মা মাম্‌দো হয়ে থাকে। ওদের মতে ভূত বা পেত্নী হয়—ওদের শাস্ত্রে নাকি এই কথাই আছে।

কিন্তু তাই কি সত্যি?…দ্যুৎ, তাই কখনও হয়?…

বিস্ময়ের প্রথম ধাক্কাটা কাটতে সন্দেহ দেখা দিল।

সন্দেহ নিজের ওপর। লল্‌তার কথা ভাবতে ভাবতে তিনিই বুঝি বাওরা হয়ে গেছেন। নইলে—

না, নেশা তো করেন নি। মদ কখনই খেতেন না বেশী, ইদানীং একেবারেই ছেড়ে দিয়েছেন। বুঝেছেন, যারা লড়াই-এ জিততে চায়, যারা দেশশাসন করতে চায়, তাদের পক্ষে দুটি নেশা হারাম, গুনাহ। মদ আর মেয়ে। মেয়ে ভোগ করতে পারো, অন্য দৈহিক প্রয়োজনের মতোই; তার মায়াতে জড়িয়েছ, নেশা ধরেছে কি সর্বনাশ! একবার শুধু খানিকটা ঐ মোহিনী মায়ায় জড়িয়ে পড়েছিলেন—তারই মাশুল ওয়াসিল দিচ্ছেন আজও।

তবে, এ কি দেখছেন সামনে?

নাকি অতিরিক্ত ঘুম পেয়ে খোয়াব দেখছেন তিনি? জেগে জেগেই খোয়াব দেখছেন আধো তন্দ্রায়?

দুই চোখ রগড়ে ভাল ক'রে চাইলেন। নিজের মাথায় প্রবল ঝাঁকানি দিলেন বার কতক। কিন্তু আগেও যা দেখেছিলেন এখনও তাই দেখলেন। দৃশ্যের কোন হেরফের হ'ল না।

ঘরে দুটো মোটা সলতের 'দীয়া' বা প্রদীপ জ্বলছে, আলো কিছু কম নেই! দেখার ভুল হবে কেন? সেই মুখ, সেই চোখ, সেই দেহের গঠন, সেই উদ্ধত ভঙ্গী

দাঁড়িয়ে থাকার।

আরও মিল আছে।

এসব ক্ষেত্রে মেয়েরা আসে কাঁদতে কাঁদতে আর ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে। এসেই পায়ে আছড়ে পড়ে, কাকুতি-মিনতি করে। এর চোখে জল নেই, ভঙ্গীতে অনুনয়ের আভাস পর্যন্ত নেই। বিদ্রোহিনী সোজা দাঁড়িয়ে আছে, দুই চোখে আগুন ওর।

সেই লল্‌তাই।

ছুটে গিয়ে ঘরের পর্দা সরিয়ে চিৎকার ক'রে— অনেক, অনেক আলো আনতে বললেন। মশাল চাই। চারটে পাঁচটা দশটা—যা আছে সব নিয়ে এস।

মশাল এসেও গেল প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই। ঘরের মধ্যকার থামে দেওয়ালে আটকে দিয়ে চলে গেল নৌকররা।

সেই উজ্জ্বল আলোতে আবারও মুখখানা তুলে ধরে দেখলেন। আবারও ছেড়ে দিলেন তেমনি হঠাৎ। নিজের মাথায় গাঁট্টা মারলেন গোটা দুই। এ কি সবই মায়া? জাদু? কোনও কুহকের খেলা! না কি সত্যিই প্রেতিনী এল লল্‌তার?

এক টানে ওর কাপড়খানা খুলে ফেললেন। সম্পূর্ণ বিবস্ত্র হয়ে গেল মেয়েটা, সর্বপ্রকার আবরণ-মুক্ত।

তবু ওর লজ্জা নেই, ভয় নেই। সঙ্কোচাবনত হবার ভঙ্গী-শূন্য দুই চোখে তেমনি আগুন জ্বেলে স্থিরভাবে চেয়ে আছে ওপাশের দেওয়ালের দিকে। ঠিক সেই রকম 'শিরতেড়া'।

তা হোক। তেমন মিল তো হতেই পারে। স্বভাবে স্বভাবে মিল হয়। কিন্তু দেহটাও যে এক। এ কি ক'রে সম্ভব হয়! এ কি তার যমজ বোন? কিন্তু সে তো ছিল মিথিলার মেয়ে, এ নাকি বাঙালী। তা ছাড়া সে বেঁচে থাকলে এতদিনে আর একটু বয়স হয়ে যেত। এ ঠিক সেই বয়সের মেয়ে, যে বয়সে লল্‌তাকে পেয়েছিলেন তিনি। এক শুনেছেন মরার পর বয়স বাড়ে না, এ পৃথিবীতে থাকলে—

আবারও মন সেইখানে চলে যাচ্ছে।

কিন্তু এ রহস্যরও তো কূল পাচ্ছেন না। এত মিল! এই রকম ঠোঁট, এই থুঁতনি। ঠোঁটের ওপর গলার খাঁজে এমনিই ঘাম জমে থাকত, বুকের খাঁজে এই রকমেই বিন্দু বিন্দু ঘাম জমত—কতদিন কাপড় সরিয়ে দেখেছেন তিনি। কোমরের মাপ, সুন্দর গোল নীচু তলপেট…। হাত দুটো দুপাশে সোজা ফেলে দাঁড়িয়ে থাকার ভঙ্গীটা—সমস্ত হুবহু তার মতো।

না, দিওয়ানা বাওরা যদি না হয়ে থাকেন তো এইবার নির্ঘাত হবেন।

উন্মত্তের মতোই চেঁচিয়ে উঠলেন এবার বখ্‌তিয়ার, 'তুই—তুই কে? ঠিক ক'রে বল্! আমার সঙ্গে চালাকি কি দিল্লাগি করতে চেষ্টা করিস নি। তোর নাম কি?'

এবার জবাব দিল মেয়েটা, 'ললিতা।'

'য়ঁ্যা।' বিকট চিৎকার ক'রে যেন লাফ দিয়ে উঠলেন বখ্‌তিয়ার।

'ঠিক বলছিস? তুই কি পাগল? না না, তোকে কেউ শিখিয়ে দিয়েছে। তাই না?...আমার সঙ্গে তামাশা করতে চায় কেউ।...তামাশা। তামাশা বার করছি। ঠিক ক'রে বল্ তোর নাম কি?'

মেয়েটা আর কোন উত্তর দিল না, তেমনি উদ্ধত ভঙ্গীতে অন্য দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

বখ্‌তিয়ারের চেহারা পালটে গেল যেন। এবার কাছে গিয়ে একরকমের ভাঙ্গা গলায় অনুনয়ের ভঙ্গীতে বললেন, 'তুই—তুই কি সত্যিই লল্‌তা? ঠিক ক'রে বল্। না না, তোকে ভয় দেখাচ্ছি না। পায়ে ধরছি তোর!'

বলেন কিন্তু উত্তরের অপেক্ষা করতে পারেন না। সহসা বুকে চেপে ধরে প্রায় পিষ্ট করে ফেলেন কঠোর আলিঙ্গনে, হাঁপাতে হাঁপাতে তেমনি স্খলিত ভগ্নকণ্ঠে বলেন, 'কোথায় ছিলি এতদিন তুই? একদিন খোয়াবে দেখা দিয়ে কোথায় লুকিয়ে ছিলি? বল্, আর একবার পথ বলে দে। কোথায় যাবো, কোথায় গেলে আমার আশ মিটবে, খুন ঠাণ্ডা হবে বলে দে! এবার আর দেরি করব না—'

সেই কঠোর বন্ধনের মধ্যেই কোনমতে নিঃশ্বাস নিয়ে জবাব দেয় মেয়েটা, 'যমের দক্ষিণ দোরই খোলা থাকে শুধু—শোন নি কারও কাছে। উত্তরে চলে যাও—সোজা উত্তর দিকে, তাহলেই সেখানে পৌঁছবে।'

কথাগুলো বাংলাতে বলে ললিতা। এত বাংলা জানেন না বখ্‌তিয়ার, পরাজিত জাতির ভাষা কে আর গরজ করে শেখে! কিছু বুঝলেন, কিছু বুঝলেন না। তবে উত্তর দিকটা বুঝলেন।

হ্যাঁ, ঠিক তো। লল্‌তাও তো সেদিন স্বপ্নে উত্তর দিকই দেখিয়ে দিয়েছিল।

উত্তর দিক। উত্তর দিকে গেলেই এতদিনের চেষ্টা সফল হবে? সেও দেখিয়েছিল, এও বলছে। তার মানে এও সে-ই।...জড়িয়ে ধরেছেন, রক্তমাংসের দেহের স্পর্শ—তবু কি এ প্রেতমূর্তি? কিন্তু তাদের তো শরীর থাকে না—তবে?

অন্যমনস্কভাবেই কখন কঠিন বাহুবন্ধন শিথিল হয়ে যায়, আবারও একটু দূরে সরিয়ে ভাল ক'রে চেয়ে দেখার চেষ্টা করেন।

সেই সামান্য অসতর্কতারই সুযোগ নেয় মেয়েটা।

ঘরে এসে—শয়নের আয়োজন হিসেবে—আঙরাখাটা খুলে একটা গজালে ঝুলিয়ে রেখেছিলেন বখ্‌তিয়ার, কোমরবন্ধটা পড়েছিল পাশের একটা খাটুলির ওপর। তাতে আটকানো একটা চামড়ার খাপে আরবী কিরীচ একখানা। বড় বাঁকা ছুরি। ক্ষুরধার, অথবা ক্ষুরের চেয়েও ধার।

অত বোঝেন নি বখ্‌তিয়ার, ভাবতেও পারেন নি। যে মেয়েটা এসে পর্যন্ত স্থির পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে আছে, সে এমন করবে ভাবাও কঠিন। মেয়েটা এই ক্ষণিক বিভ্রান্তির অবসরে হাত বাড়িয়ে যেন বিদ্যুৎগতিতে খাপ থেকে কিরীচখানা টেনে নিল।

অবশ্য, যতই উদ্‌ভ্রান্ত বা মোহগ্রস্ত হোন—প্রায়-আজন্ম যুদ্ধব্যবসায়ী বখ্‌তিয়ারের সে আচ্ছন্নতা কাটতেও সেই এক লহমার বেশী দেরি হয় না। তিনিও নিমেষে ওর সেই ছুরি-ধরা বাঁ হাতের বাহুমূল চেপে ধরেন বজ্রমুষ্টিতে।

তবে একটা ভুল করেছিলেন তিনি, ভেবেছিলেন মেয়েটা তাঁকেই হত্যা করতে চায়। কিন্তু দেখা গেল 'বাঙালীন'-এর উদ্দেশ্য অন্য। আর ক্ষিপ্রতায় বা হস্ত-কৌশলেও সে ওঁর থেকে কম যায় না। সে আশ্চর্য কায়দায় ডান হাতটা ঘুরিয়ে ছুরিখানা টেনে নেয় বাঁ-হাত থেকে—তারপর, বখ্‌তিয়ার অন্য কোন চেষ্টা করার আগেই, সেই ছুরি নিজের মুখের মধ্যে দিয়ে গলায় চালিয়ে দেয়। বাঁকা কিরীচের প্রান্ত কণ্ঠনালী ভেদ ক'রে বাইরে পর্যন্ত বেরিয়ে আসে। ফোয়ারার মতো উষ্ণ উত্তপ্ত লোহু নিমেষে বখ্‌তিয়ারের সর্বাঙ্গ লাল ক'রে দেয়—কাফেরদের হোলি খেলার মতো।

'শয়তানী, সর্বনাশী, কী করলি!' বিহ্বল বখ্‌তিয়ারের কণ্ঠ ভেদ ক'রে এই কটি শব্দই মাত্র বেরোয়।

॥ ৫ ॥

প্রথমে বিহ্বলতা, পরে প্রচণ্ড ক্রোধ—পৈশাচিক হিংস্রতা—বখ্‌তিয়ারের মনে পর পর এই দুই প্রতিক্রিয়া এনে দিল ঘটনাটা। যে যোদ্ধা রণক্ষেত্রে কখনও পরাজয়ের সম্মুখীন হয় নি, একটা সামান্য ষোল কি সতেরো বছরের মেয়ের কাছে এইভাবে পরাজিত হলে কিছুক্ষণের জন্য হিতাহিত-জ্ঞানশূন্য হবে, সে স্বাভাবিক। সে দিকদাহকারী উষ্মার প্রথম কুরবানি হ'ল অন্য দু'তিনটি মেয়ে। তাদের লাঞ্ছনা ও

নির্যাতনের চরম ক'রে যখন সে প্রচণ্ড উন্মার কিছুটা উপশম ঘটল তখন দুই চোখ জ্বালা ক'রে নামল অশ্রুর বন্যা।

এ এক অভূতপূর্ব অভিজ্ঞতা ওঁর পার্ষদদের। এই নরপিশাচ নিরেট পাষণ্ড লোকটার শরীরের মতো মনটাও পাথর দিয়ে তৈরী, এই কথাই জানত তারা—এর ভেতর চোখের জলের কোন উৎস আছে তা তারা কল্পনাও করতে পারে নি কখনও।

কেন—তাও তারা বুঝল না। এ কি ক্ষোভ? হতাশা? অপমানবোধ? মেয়েটা ফাঁকি দিয়ে হাতের মুঠোর মধ্যে থেকে চলে গেল—তাই?

তাদের পক্ষে এর চেয়ে বেশী কিছু ভাবা সম্ভব নয়। বখ্‌তিয়ারের এ 'আঁশু'—চোখের জল—তাঁর লল্‌তার জন্য। লল্‌তা মৃত্যুর পরও তাঁরই উদ্দেশ্যসিদ্ধি, আত্মার শান্তির জন্য চিন্তা করছে; স্বপ্নে দেখা দিয়েও তাঁকে সচেতন সক্রিয় করতে পারে নি, তাই বেচারাকে আবার দেহ ধরে আসতে হয়েছে। আর তিনি এমনই বেঅকুফ, নাদান, যে তাঁর নাজনী, তাঁর নূর-এ-চশম—হ্যাঁ, এতদিনে তিনি বুঝেছেন লল্‌তাই তাঁর প্রিয়তমা—তাকে হাতের মধ্যে পেয়েও ধরে রাখতে পারলেন না। দু'দুবার বেচারাকে আত্মহত্যা করতে হ'ল। এ কাজ একবার করলেই নাকি দোজখে যায়, তাকে রোজ-কিয়ামৎ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয় না—ওকে দু'দুবার এই গুণাগারির জন্যে না-জানি বেনিয়াজ খোদাতালাহ্‌ কি ভয়ঙ্কর শাস্তি দেবেন!

এ চোখের জল সেই নির্বুদ্ধিতার; এ চোখের জল লল্‌তার ভালবাসার প্রমাণ পেয়ে আনন্দে; এ চোখের জল তাকে ধরে রাখতে পারলেন না সেই আপসোসে। তার ঐ পাগলের মতো ব্যবহার দেখেই, ঐ বেতরিবৎ কাণ্ড-কারখানাতেই তো তাঁকে আবার শিক্ষা দিতে এমন ভাবে চলে গেল। তখন যদি তার হাতে পায়ে ধরতেন তো নিশ্চয় দয়া হ'ত। না, সম্ভোগ না-ই করুন—সে প্রয়োজন বিশেষ আর নেই তাঁর—কাছে থাকলে বুদ্ধি বাত্‌লালেই তিনি খুশী থাকতেন। এ তিনি কি করলেন!

আপসোস যতই হোক, আর বৃথা সময় নষ্ট করেন না একদিনও। এবার যেন দ্বিগুণবেগে সক্রিয় হয়ে ওঠেন।

আগে যা-ই মনে হোক, যে দ্বিধা বা সংশয়ই থাক—তাঁর লল্‌তাই যে তাঁকে পথ দেখাতে এসেছিল সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ রইল না। মৃত্যুর পরও তাঁর কথাই চিন্তা করছে সে—কথাটা ভেবে একটা অনির্বচনীয় তৃপ্তিও আস্বাদন করতে লাগলেন, সেই বোধটাই তাঁকে এই প্রেরণা ও উৎসাহ যোগাল।

লক্ষ্যবস্তু, জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্যর সিদ্ধি সামনে, পথ দেখিয়ে দিয়ে গেছে পয়ারী—আর দেরি করবেন না তিনি। রাজগীর নেশা তাঁর জন্যে নয়, সামনে তাঁর নূতন কর্মক্ষেত্র পড়ে, নূতন দেশ জয়, শক্তি ও সম্পদ বৃদ্ধি—এই নেশাই যেন জীবনে একমাত্র হয়—ভোগের নেশায় তাঁর দরকার নেই। সুখভোগ সুষুপ্তি আনে, আর সুষুপ্তি তো মৃত্যুরই নামান্তর।

তোড়জোড় শুরু হয়ে গেল অভিযানের।

ফৌজ—ঘোড়সওয়ার ছাড়া নেওয়া যাবে না। পাহাড়ের পথে পদাতিক অচল। দীর্ঘ সময় নেবে। ব্যয়-বহুল তো বটেই, সময় যাওয়া বিপজ্জনকও। ঘোড়াও—তজী আরবী ঘোড়া চলবে না। ছোট ছোট ঘোড়া—তাঁদের মুলুক তুর্কীস্তানে যেমন পাওয়া যায়—সমরখন্দ খিবা গজনীর বাজারে যা বিক্রি হয়—সেই রকম হলেই ভাল হয়—নিবেদন এখানের দেশী ঘোড়া, শোনপুরের মেলায় যেমন বেচতে আসে। এছাড়া মাল বওয়ার জন্যে চাই খচ্চর।

অশ্বারোহী ছাড়া যখন নেওয়া চলবে না—তখন বাহিনীর সৈন্যসংখ্যাও সীমিত হওয়া প্রয়োজন। তবু দশ হাজার সেনাই সঙ্গে নিলেন শেষ পর্যন্ত। অনেক টাকার খেলা। দশ হাজার সিপাহী, নৌকর নফর তল্পীবাহক বাবুর্চি সহিস—সেও কোন্ না দু হাজারের মতো। রসদ তাঁবু খচ্চর এতেও বিস্তর খরচ। পথে পথে পাবেন ঠিকই, কিন্তু তার দাম দেওয়া দরকার। নইলে জোর ক'রে কেড়েবিগড়ে নিলে—পিছনে শত্রু রেখে যেতে হবে। তাছাড়া জনবিরল পার্বত্যপথে কিছুই পাবেন না হয়ত—তার জন্যে ব্যবস্থা চাই।

অর্থাৎ লক্ষ লক্ষ মোহরের খেলা।

তবে তাতে আটকাল না বখ্‌তিয়ারের। সোনা বিস্তর জমিয়েছিলেন। বাকীটা যোগালেন অধীনস্থ সুবেদার ফৌজদাররা। আফজল বেগের মতো আরও অনেকে ছিল, তারা এতদিন ধরে একমনে শুধু সম্পদ বৃদ্ধিই ক'রে গেছে—ছলে বলে কৌশলে—এবার তাদের ঘাড়ের ওপর চেপে পড়লেন বলতে গেলে। নিজস্ব ফৌজ নিয়ে ঘিরে ধরলেন। টাকা চাই-ই, নইলে ছাড়ান নেই। তখন আর উপায় রইল না কোন কৈফিয়ৎ দিয়ে এড়িয়ে যাবার—প্রায় যথাসর্বস্বই আদায় দিতে হ'ল।

ফৌজদারদের বদলিও করলেন। এক জায়গায় বেশীদিন থাকলে বহুদূর পর্যন্ত মূল বিস্তার করে, জায়গাটাকে নিজস্ব বলে ভাবতে শেখে, এটা উচিত নয়। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটিতে ওরই মধ্যে যারা বিশ্বস্ত, তাদের রেখে যেতে হবে। পিছন থেকে ছুরি না মারে। আলিমর্দান খলজী সকলের থেকে বেশী

বিশ্বাসভাজন—তাকে বসালেন সরকার ঘোড়াঘাটে।

এদিকটা সামলানো শেষ হ'ল।

এবার নিশ্চিন্ত না হোন অনেকটা প্রকৃতিস্থ হয়ে যাত্রা শুরু করলেন।

যোদ্ধা বখ্‌তিয়ার যেন বহুদিনের ঘুম ভেঙ্গে জেগে উঠেছে। পুনর্জন্ম লাভ করেছে বলতে গেলে।

ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ শ্রেষ্ঠ সংগীত, দানা ঘাস আর পুরীষের গন্ধ শ্রেষ্ঠ আতর, অস্ত্রের ঝনৎকার সর্বশ্রেষ্ঠ সালসা।

এই তাঁর জীবন, জিন্দিগী। এতদিন ভুলে ছিলেন কি ক'রে, আশ্চর্য!

উত্তরে যাত্রা।

কিন্তু উত্তরবঙ্গ বিশেষ হিমালয়ের কাছাকাছি যে সব এলাকা, সেখানে দক্ষিণ বঙ্গের মতো ভদ্রবসতি নেই বললেই চলে। আদিবাসীতে আর পূর্ব-পথে-আগত অনার্যদের রক্ত মিশে অদ্ভুত সব জাত সৃষ্টি হযেছে। কোচ মেচ তিহারু। এরা যেমন ধূর্ত, তেমনি হিংস্র, তেমনি স্বাধীনতাপ্রিয়। এদের কাছে পরবর্তী যুগেও বহু মুসলমান সেনাপতি বিপর্যস্ত হয়েছেন। মুঘল আমলের নামকরা সেনানায়করা পর্যন্ত।

পা বাড়াতে হ'লে কোথায় পা ফেলব সেটা জানা দরকার। এ বোধ, যতই অসহিষ্ণু হোন, বখ্‌তিয়ারের একেবারে ছিল না তা নয়। তিনি দেবকোট, বর্তমান দিনাজপুরের ১৬ কিলোমিটার বা পাঁচ ক্রোশ দক্ষিণ থেকে সমস্ত শক্তি একত্র ক'রে যাত্রা শুরু করলেন বটে কিন্তু প্রথম থেকেই তাড়াহুড়ো করলেন না।

ধীরে ধীরে স্থানীয় অধিবাসীদের শক্তিসামর্থ্য ও মনোভাবের পরিচয় নিয়েই এগোলেন। কাউকে ঘুষ দিয়ে, কাউকে ভবিষ্যতের লোভ দেখিয়ে—দুর্বল বুঝলে তাকে পরাস্ত ক'রে এগিয়ে যেতে লাগলেন—যস্মিন দেশে যদাচার।

তাতেও অসুবিধা হ'তে লাগল। এরা যে পথ দেখাচ্ছে তাই যে ঠিক পথ কী ক'রে জানবেন।

তখন এক নূতন কৌশল করলেন।

এক সর্দারকে অতর্কিতে ধরে এনে প্রথমে মদ খাইয়ে কিছুটা অপ্রকৃতস্থ ক'রে মুসলমান ক'রে দিলেন। নাম দিলেন আলি মেচ। সে বেচারা অত বোঝে নি প্রথমটা। জোর করে কলমা পড়িয়েছে আর ভাল খানা খাইয়েছে, পোলাও মাংস—তাতে এমন দোষ কি, এই ভেবেছিল। কিন্তু বাড়ি ফিরে দেখল আত্মীয়স্বজন যে

যেখানে ছিল সব যেন ভোজবাজির মতো পর হয়ে গেছে। গ্রামের ধোপা নাপিত বন্ধ, এমন কি স্ত্রী বা বাপ-মাও তাকে ঘরে ঢুকতে দিতে নারাজ।

অগত্যা তাকে আবার এদের শিবিরেই ফিরতে হ'ল। বখ্‌তিয়ারও তা জানতেন। তিনি সমাদরে সাদরে অভ্যর্থনা করলেন। বিশেষ একটি স্থান নির্দিষ্ট হ'ল ওর জন্ত। সুন্দরী মেয়ে দেখে আবার বিয়ে দেবেন প্রতিশ্রুতি দিলেন। যুদ্ধ জয় ক'রে ফিরে এলে ওকে জায়গীর দিয়ে 'রাজা' ক'রে দেবেন এমনও আশ্বাস দিয়ে রাখলেন।

আলি মেচের মুখখানাই এমন—এখানের আদিবাসীরা সকলেই কতকটা এই ধরনের—এ ব্যবস্থায় খুশী হ'ল নিশ্চিন্ত হ'ল, অথবা রেগে রইল তা মুখ দেখে বোঝা গেল না। তবে বখ্‌তিয়ার নিজের মনের মতোই ব্যাখ্যা ক'রে নিলেন ওর মনোভাবের—খুশীই হয়েছে ধরে নিলেন।

আলি মেচের পরবর্তী ব্যবহারেও সেইটেই সমর্থিত হ'ল, সে সাবধানে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল। কোথায় কি অসুবিধা, কোন্ পথ পরিহার করা উচিত এবং কেন—তা বলে বুঝিযে দিতে লাগল। বখ্‌তিয়ার গোপনে গুপ্তচর পাঠিয়ে খবর নিয়ে দেখলেন ক'বার—আলি মেচ সত্য কথাই বলেছে, তিনি নিশ্চিন্ত হলেন, মনে মনে নিজেকে বাহবা দিতে লাগলেন।

এইবার তাঁর জীবনের রঙ্গমঞ্চে আর একজনের আবির্ভাব হ'ল।

বিখ্যাত মুসলমান ফকীর—শাহ গুরশাস্প ইরানী। দিল্লী সুলতানের আমন্ত্রণে এদেশে এসে—তপস্যার জন্যে এই দুর্গম অঞ্চলে বাস করছেন, ইতিমধ্যেই সিদ্ধপীর হিসাবে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে গেছে। মুসলমান এদেশে এখনও নামমাত্র—কিন্তু সে কিছু নয়, সকলেই ভক্তি করে ওঁকে। হিন্দুরা তো বটেই, আদিবাসীরাও তাঁকে দেবতার মতো দেখে। আরও তাদের ভক্তির কারণ, তিনি এখানে আসার দিনটি থেকেই এদের ভাষায় কথা বলছেন, অথচ তাঁর মাতৃভাষা ফারসী, এ ভাষার সঙ্গে সামান্যতম সাদৃশ্যও যার নেই।

খবরটা দিল আলি মেচই।

বখ্‌তিয়ারের বাহিনী বর্ধনকোট পর্যন্ত এগিয়ে গিয়ে প্রবল একটা বাধা পেল। প্রায় দুর্লঙ্ঘ্য বাধা। সামনেই রাঘমতী নদী, বর্ষায় পাহাড়ের জল নেমে যেমন স্ফীতোদরা, তেমনিই খরস্রোতা।

মানুষের বাধার মোকাবিলা করতে ইখ্‌তিয়ারউদ্দীন সবদাই প্রস্তুত। জান নিতে বা দিতে কোনটাতেই পিছপাও নন। শারীরিক কষ্টও যতদূর সম্ভব সহ্য করতে পারেন, বিনা জলে দুদিন ক্রমান্বয়ে মরুভূমি দিয়ে হেঁটেছেন--কিন্তু এ অন্য জিনিস। এর কোন অভিজ্ঞতা নেই তাঁর। যিনি অনায়াসে হাজার হাজার তলোয়ার বর্শার সামনে অবিচল থাকেন— নদীর এ রুদ্রমূর্তি দেখে তাঁরও প্রাণ কেঁপে উঠল। প্রচণ্ড গর্জনে বিপুল জলরাশি যেন ক্ষ্যাপা ষাঁড়ের মতো গুঁতোতে গুঁতোতে চলেছে। একশো দেড়শো মণের বড় বড় পাহাড়-ভাঙা পাথর অনাযাসে ঠেলে নিযে যাচ্ছে সে স্রোত। এখানে কোন নৌকা ক'রে পার হতে যাওয়া মূর্খতা শুধু নয়, বাতুলতা।

অসহিষ্ণু বখ্‌তিয়ার রাগে ক্ষোভে চুল ছিঁড়তে লাগলেন, আর সামনে যাকে পেলেন তার ওপর দিয়ে সে ক্ষোভ মেটাতে লাগলেন। গালাগালি প্রহার লাঞ্ছনার অবধি রইল না।

এই সময়ে এগিয়ে এল আলি মেচ। নির্ভয়েই এসে দাঁড়াল। এটুকু সে বুঝে নিয়েছে যে এই অকূল পাথারে সে-ই ভরসা, তাকে চটাতে সাহস করবেন না বখ্‌তিয়ার।

সে বলল, 'হুজুরালি, এ মানুষের অসাধ্য এ সময় এই পাহাড়ে নদীর সঙ্গে যোঝা। দৈবের শরণ নিতে হবে। এখানে কাছেই এক বহুৎ বড় পীরবাবা আছেন—লোকে বলে তিনশো বছরের ওপর বয়েস তাঁর। তাঁর পায়ে গিয়ে পড়ুন, কাজ হবে।'

চমকে উঠলেন বখ্‌তিয়ার, 'পীরবাবা। মুসলমান পীর?'

'হাঁ হাঁ—নইলে পীরবাবা বলব কেন?'

'এখানে মুসলমান পীর? সন্ন্যাসী? এখানে কি এত মুসলমান আছে?'

'না। এখানকার হিন্দুরা আদিবাসীরা সকলেই ওঁকে গুরুর মতো মানে—ভক্তি করে। শুনেছি ওঁর অসীম শক্তি। রাত্রে ফেরিশ্‌তারা এসে ওঁর সঙ্গে কথা বলে।'

'তাজ্জব! · ইনসাল্লাহ! বেশ চলো, তাঁর পায়ে গিযে পড়ি।'

'জনাবালি, দলবল নিয়ে তাঁর কাছে যাওয়া চলবে না। বিনা এত্তেলাতেও না। যে মানুষকে ওঁর পছন্দ হয় না তাকে উনি দেখা দেন না। জোর ক'রে কেউ দেখা করতে গেলে যেন বাতাসে মিলিয়ে যান তিনি। তিনদিকে মাটির দেওয়াল এক দিকে দরজা, দরজায় ধরুন আপনি গিযে দাঁড়িয়েছেন, তার আগে বাইরে থেকে দেখেছেন ঘরে আছেন উনি বাঘছালের ওপর বসে তসবী জপছেন—পরের লহমাতে দেখুন কেউ নেই কিংবা হয়ত একটা বড চন্দ্রবোড়া কি ময়াল সাপ বসে আছে কুণ্ডলী পাকিয়ে।'

বখ্‌তিয়ার আরও অধীর হয়ে ওঠেন, 'তুমি যাও আলি মেচ, জলদি যাও। আমার মন বলছে আমার জন্যেই ইনি এখানে এসে বসে আছেন। তাঁর হুকুম হ'লে আমি একাই যাবো—বেশী লোক নিয়ে গিয়ে দিক করব না।'

আলি মেচ পীর সাহেবের সামনে সটান পড়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে, যেমন সে আগেও করত।

পীর হাতে আশীর্বাদের ভঙ্গী করে স্নিগ্ধকণ্ঠে বললেন, 'এ কি! তুমি তো দেখছি ইসলাম নিয়েছ!'

চমকে ওঠে আলি মেচ। গায়ে কাঁটা দেয় তার। ওর বেশভূষার কথায় কোথাও তো মুসলমান বলে চেনবার মতো কোন চিহ্ন নেই!

এই সর্বজ্ঞ অন্তর্যামী সাধুর কাছে আর কোন কথা গোপন করার চেষ্টা করল না আলি মেচ, হাত জোড় ক'রে বলল, 'হ্যাঁ বাবা, কিন্তু আমি স্বেচ্ছায় নিই নি, আমাকে জোর ক'রে মুসলমান করা হয়েছে।'

সাধু তেমনি কোমল কণ্ঠেই বললেন, 'তাতে দোষ কি, যারা তোমাকে মুসলমান করেছে, তারা এই সত্য ধর্ম বিশ্বাস করে। এই ধর্ম নিলে তোমার কল্যাণ হবে ভেবেই করেছে। শিশুর ইচ্ছার বিরুদ্ধেই অভিভাবকরা লেখাপড়া শেখান, তার কল্যাণ হবে বলে, সেটাকে কেউ দোষের বলে মনে করে না।'

আলি মেচ বলল, 'বাবা, এ ধর্মের বিরুদ্ধে আমার কিছু বলবার নেই। আপনি তো কোনদিন কারও ওপর জোর করেন নি। কেউ যদি এ ধর্মের কথা বুঝিয়ে দিত আমি হয়ত স্বেচ্ছাতেই নিতাম। কিন্তু বাবা, আমার কল্যাণের জন্যে কি ধর্মের প্রচারের জন্যে এ কাজ করে নি। নিজেদের স্বার্থের জন্যে আমাকে আমার স্ত্রীপুত্র আত্মীয়স্বজন থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে। ধর্মের জন্যে এদের কোন মাথাব্যথা নেই। এক পিশাচ আর তার পাপ সহচর—দোজখ-থেকে-নেমে-আসা লোক কতকগুলো সোনার জন্যে আর জমির লোভে ক্ষেপে গেছে—মানুষের রক্তে চুমুক দিচ্ছে সেই লোভে।

আলি মেচ ইখ্‌তিয়ারউদ্দীনের পূর্ব ইতিহাস, তার উদ্দেশ্য, তার আচরণের কথা—মধ্যে মধ্যে সে যে কী রকম সাক্ষাৎ শয়তানে পরিণত হয়—সব সংক্ষেপে খুলে বলল। এমন কি সে যা দেখে নি, অপরের মুখে শুনেছে—আগেকার বৃত্তান্ত, ওদন্তপুর বিহারের কথা, নবদ্বীপের কথা—তার আগে স্ত্রীলোকদের ওপর অকথ্য

অত্যাচারের কথা—তাও সব জানাল।

পীর শাহ গুরশাস্প ইরানী সিদ্ধ সাধক। অন্য সমস্ত ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে মনকেও জয় করেছেন। তিনি শান্ত ভাবেই সব শুনলেন, মুখের রেখার কোন পরিবর্তনও ঘটল না। আলি মেচের কথা বিশ্বাস করলেন কি করলেন না, বখ্‌তিয়ারের উপর ক্রুদ্ধ হলেন কি তার আচরণ সমর্থন করলেন তা তাঁর মুখ দেখে বোঝা গেল না। শুধু, তিনি তসবী জপছিলেন, মধ্যে ক্ষণকালের জন্য হাত এবং ঠোঁট দুইই বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, এইটুকুতেই বোঝা গেল যে তিনি মনোযোগ দিয়ে সব শুনেছেন।

অবশ্য সে সামান্য সময়ের জন্যেই, তার পরই আবার জপ শুরু হয়ে গেছে। আলি মেচের বলা শেষ হতেও তখনই কোন কথা বললেন না, নীরবেই জপ ক'রে গেলেন প্রায় অর্ধদণ্ডকাল ধরে। তারপর আগের মতোই শান্ত মধুর কণ্ঠে বললেন, 'বাবা, আল্লার একজন সামান্য খাদেম, তাঁর দাস। তবে আমি বিশ্বাস করি তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান, সর্বব্যাপী। এমনিই মিথ্যা কথা বলা আমাদের ধর্মে গুণাহ, পাপাচার বলে গণ্য করা হয়। তার ওপর যেখানে তাঁর নাম করা হয়, উপাসনা করা হয়, সেখানে মিথ্যা কথা কথা বললে তাঁর রোষে পড়তেই হবে। আমি জানি না তুমি মিথ্যা বলছ কিনা। ব্যক্তিগত আক্রোশে একটা লোককে ছোট করছ কিনা। আমার জানার কোন আগ্রহও নেই। 'স তোমার আর পরমেশ্বরের ব্যাপার। সে আসতে চায় তাকে নিয়ে এসো; সে কেমন লোক, কি করেছে, কী চায়—সেটা তার সত্য অভিপ্রায় কিনা—এ বিচার তিনিই করবেন, তুমি নিশ্চিন্ত থাকো।'

কী বুঝল আলি মেচ কে জানে, ওঁর আপাত-বিপরীত আশ্বাসবাণীর মধ্যে থেকে নিজের মতো কোন অভয় খুঁজে পেল কিনা—সে যেন অনেকটা শান্ত ও নিশ্চিন্ত হয়েই, অভ্যাসমতো সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে চলে গেল।

॥ ৬ ॥

বখ্‌তিয়ারের শিবিরে আবার আনন্দকোলাহল উঠল, কর্মচাঞ্চল্য দেখা দিল। বরং একটু বেশীই, আগের চেয়ে।

বখ্‌তিয়ারের মুখেও অনেকদিন পরে হাসি ফুটেছে। তিনিও সোৎসাহে ঘুরে শিবির গুটোবার কাজকর্ম দেখছেন। দুর্দান্ত বাঘমতীর চেহারাটা দেখার পর সকলেই নিরুৎসাহ হয়ে পড়েছিল, একটা অজানা ভয়ও দেখা দিয়েছিল। মনে হয়েছিল, এ পথে আর কোন মতেই এগনো যাবে না। আল্লার প্রত্যক্ষ করুণা ছাড়া এ বাধা অতিক্রমের

সাধ্য কারও নেই।

সেই অসম্ভব সম্ভব হওয়াতেই এত আনন্দ, এত উৎসব মুখরতা।

এর জন্যে ইখ্‌তিয়ারউদ্দীন তো বটেই, দলের সকলেই আলি মেচের কাছে কৃতজ্ঞ বোধ করছে। তার চেষ্টাতে, তার পরামর্শেই এই দৈব অনুগ্রহ লাভ—হ্যাঁ, দৈব অনুগ্রহ ছাড়া কিছু বলা যায় না একে—সম্ভব হয়েছে। ঈশ্বরের দয়া নেমে এসেছে ওদের ওপর।

আসলে এ সেই সিদ্ধপীর বাবা শাহ গুরশাস্প ইরানীরই দয়া। আলি মেচের পরামর্শেই বখ্‌তিয়ার গিয়ে সটান ওঁর পায়ে পড়েছিলেন। ওঁকে গুরু বলে স্বীকার করেছিলেন। তারপর বলেছিলেন, 'বাবা, এ বিপদে আপনিই ভরসা, আপনি একটা উপায় করুন।'

শাহ তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ধৈর্যের সঙ্গেই সব শুনেছিলেন। তারপর বলেছিলেন, 'কিন্তু কী দরকার বেটা এই দুর্গম পথে এত বিপদের ঝুঁকি নিয়ে যাওয়ার! খোদা তোমাকে অনেক দিয়েছেন, তোমার যা প্রয়োজন তার ঢের বেশী। এইতেই খুশী থেকে দয়াময় খোদাকে ধন্যবাদ শুকরান্ জানানো উচিত। এ পথ অত্যন্ত বিপদসংকুল, দুর্গম—এতগুলি লোককে এই বিপদের মধ্যে টেনে নিয়ে যাওয়া কি উচিত!'

ইখ্‌তিয়ার জোড়হাতে বলেছিলেন, 'ইমান ইসলামের প্রচারের জন্যেই আমার এ অভিযান বাবা। সত্যধর্ম প্রচারের জন্যে প্রাণ গেলেই বা ক্ষতি কি?'

শাহ এতক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে ওঁর মুখের দিকে চেয়ে ছিলেন, এখন একটু মিষ্টি হাসি হাসলেন। বললেন, 'তা যদি যাও, যদি যথার্থ ধর্মপ্রচারের জন্যেই তোমাদের এ আয়োজন হয় তো আল্লার নাম ক'রে নির্ভয়ে চলে যাও। তাঁর কৃপায় তোমাদের মঙ্গলই হবে।

তারপর বললেন, 'কিন্তু এখানে নদী পেরোতে পারবে না, যত চেষ্টাই করো। তোমরা নদীতীর ধরে আরও উজিয়ে যাও, দশ-বারো ক্রোশ গেলে দেখবে এক জায়গায় নদী দুটো বড় পাহাড়ের খাঁজে খুব সঙ্কীর্ণ হয়ে গেছে। সেখানে একটা পুলও আছে। আমার এখানকার ক'জন অনুরাগী ভক্ত তৈরী করেছেন, আমার পরামর্শে হলেও আসলে আল্লার দোয়াতেই হয়েছে; নইলে সেও দুঃসাধ্য কাজ। তবে সে পুলে এত লোক পার হতে পারবে না, দশ মাস সময় লেগে যাবে। আমি এদেশী মজুর মিস্ত্রিদের বলে দিচ্ছি, এখন কাজটা অনেক সহজ হয়ে গেছে—অনায়াসে এপার ওপার করা যায় বলে—তাঁরা আরও খানিকটা চওড়া ক'রে দিতে পারবে পুলটা। তাদের মজুরী খোরাকি ঠিক মতো দিও, দুর্ব্যবহার করো না। তারা খুশী থাকলে অনেক দ্রুত অনেক সহজে তোমাদের কাজ উদ্ধার হবে।'

বলে দিয়েছেনও তিনি। এখানকার যেসব হিন্দু অধিবাসী বিদ্বিষ্ট ও সন্দিগ্ধভাবে সাবধানে নিজেদের দূরে রেখেছিল—তারাই 'বাবা'র হুকুমে এসে কাজে লেগেছে; কাজের ধরন দেখে মনে হচ্ছে পুল শেষ হতেও বেশী দেরি লাগবে না।

কিন্তু বাবার একটা হুঁশিয়ারি ইতিমধ্যেই ভুলে গেছেন বখ্‌তিয়ার। অবশ্য সে জন্যে দায়ী কতকটা আলি মেচই। তারা কেউ এদের বাবুচিখানায় খেতে রাজী হয় নি, পয়সা চেয়ে নিয়ে বাজার থেকে চাল সবজি কিনে পাকিয়ে খাচ্ছে।

সে খবর বখ্‌তিয়ারের পাবার কথা নয়। আলি মেচই এসে উদ্বিগ্ন গম্ভীর মুখে খবরটি পৌছে দিল, 'জনাবালি, এতেই তো দিনের অর্ধেক সময় চলে যাচ্ছে। এমন অকারণ দেরি করলে কদিনে কাজ শেষ হবে, আর কদিনই বা এমনভাবে বসে থাকব আমরা?'

শুনেই বখ্‌তিয়ার ক্ষেপে গেলেন। তখনই ছুটে গিয়ে হম্বিতম্বি শুরু করলেন। উনি ক্ষেপে গেলে অতি বড় সাহসীরও বুক কাঁপে, কিন্তু এই আপাত-নিরীহ মজুর কারিগরদের মুখের কোন ভাব পরিবর্তন হ'ল না। চুপ ক'রে শুনল তারা, তারপর বলল, 'বেশ, আপনাদের অসুবিধা হয় আমরা কাজ ছেড়ে দিচ্ছি। আপনারা অন্য লোক দিয়ে করান।'

'কী, এত বড় বেআদবি!' বখ্‌তিয়ার রাগে যেন তুড়িলাফ খেতে লাগলেন, 'জানো, মুণ্ডুগুলো এখনই নিজে হাতে ছিঁড়ে নিতে পারি!'

'তা পারবেন বৈকি।' নিরুদ্বিগ্ন মুখেই জবাব দিল, 'তার জন্যে নয়। আমরা তো মরবই একদিন। দু'দিন আগে-পিছেতে কী এসে যায়। তার জন্যে মিছিমিছি ধর্মটা আর কেন দিই। কিন্তু আমাদের মেরে ফেললে কাজটা শেষ করতে পারবেন কিনা, সেই তো চিন্তার কথা!'

তাদের অবিচল কণ্ঠস্বর থেকে বিদ্রূপের সুর খুঁজে পাওয়া গেল না।

কথাটা এত সত্য যে ঐ উন্মত্ত উষ্মার মধ্যেও বখ্‌তিয়ার তার যুক্তি মানতে বাধ্য হলেন। ক্রোধ দমন করা তাঁর অভ্যাস নেই, কেউ অপমান করছে মনে হ'লে তো কোন জ্ঞানই থাকে না—আর সেই জন্যেই তো এই অভিযান, কিন্তু এখানে নিরুপায় হয়েই মনের রাগ মনে চাপতে হ'ল। ফলে মৃগীরোগীর মতো তাঁর মুখ দিয়ে ফেনা কাটতে লাগল, অবিরাম দাঁতে ঠোঁট কামড়ে কামড়ে কুৎসিত মুখ লোহুতে বীভৎস হয়ে, উঠল, কিন্তু অপমান বা তাচ্ছিলের বদলা নিতে পারলেন না।

নিলেন বা নেবার চেষ্টা করলেন একেবারে শেষ দিন, পুল প্রশস্ততর করার কাজ শেষ হ'লে। মজুরী দেবার বদলে 'মৌত' দেবেন—ওদের খুনেই ওদের তৈরী পুলের

অভিষেক হবে—মনে মনে ঠিক ক'রে রেখেছিলেন কিন্তু আমি মেচের জন্যে বেঁচে গেল ওরা। সে এই ক'মাস বৃথা ঘোরে নি মানুষটার সঙ্গে, সে-ই এদের সাবধান ক'রে দিলে, বললে, 'ওকে চেন না, জ্যান্ত রাক্ষস। রাগ ভোলে না, পুষে রাখে। যদি বাঁচতে চাও তো সরে পড়ো।'

এরা বললে, 'কিন্তু এত দিন এত রাত খাটলুম আমরা—সব এমনি যাবে? খাব কি, খাওয়াবো কি ছেলেমেয়েদের!'

আলি মেচ বলল, 'তোমরা তো এসেছ পীরবাবার কথায়। তাঁকে বলো গে, তিনিই একটা ব্যবস্থা করবেন।'

ওরা এ পরামর্শের মূল্য বুঝল। আরও কারো কারো মুখে শুনেছে বৈকি এর মধ্যে—এই অভিযান-অধিনেতার পৈশাচিক মেজাজের ভয়াবহ সব কাহিনী। তারা রাতারাতি সরে পড়ল সেখান থেকে। প্রচলিত পথেও দশ-বারো ক্রোশ রাস্তা হাঁটা সহজ সেই পথেই : কিন্তু সে পথে হাঁটতে সাহস হ'ল না, পাহাড়ের উপর দিয়ে দিয়ে, ঘন জঙ্গল ভেদ ক'রে—কোথাও বা গাছ কেটে রাস্তা ক'রে নিতে হ'ল। অনাহারে অনিদ্রায় দুদিন ধরে অবিরাম হেঁটে এসে পীরবাবার কাছে পৌঁছল তারা।

'বাবা আমরা খাব কী? মজুরী তো সব মেরে দিল ঐ রাক্ষসটা!'

সাধুর প্রশান্ত উদাসীন চোখেও কি ক্ষণেকের জন্যে আগুন জ্বলে উঠল?

এরা মাথা হেঁট ক'রে ছিল, বুঝতে পারল না।

একটু পরে বাবা তাঁর চিরাভ্যস্ত ভাবে বললেন, 'নদী পার হয়ে যে রাস্তা শুরু হবে, সেখানে ঘোড়ায় চড়ে যেতে পারবে না। ঘোড়া রেখে যেতে হবে। হয়ত দু'চারজন লোক থাকবে পাহারা দেবার আর খাবার দেওয়ার জন্যে। তাদের তাড়িয়ে ঘোড়াগুলো দখল করা এক দণ্ডের ব্যাপার। তোমরা জান না—কামরূপের রাজা ওৎ পেতে আছেন, এরা চোখের আড়ালে গেলেই এদের ছাউনির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বেন। তাঁর হাতেই ওর জিন্দিগী নির্ভর করছে।...আমি তাঁকে বলে পাঠাচ্ছি, ঘোড়াগুলো বেচে যা টাকা পাবেন, তা থেকে তোমাদের মজুরী শোধ করবেন। বরং কিছু বেশীই যাতে পাও সে কথাও বলে দেব।...মনে হয় তিনি আমার কথা রাখবেন।'

আগে মনে হয়েছিল নদী পার হওয়াটাই বড় সমস্যা। যেমন রাস্তায় এসেছেন—ওপারে অন্ততঃ আর কিছুদূর—তেমনি রাস্তাই পাবেন। পথ দেখাবার একটা লোক থাকলে তো আর কোন ভাবনা নেই, না থাকলেও স্থানীয় লোক দু'চারটেকে ধরে পীড়ন নির্যাতন করলেই চলবে, পথ দেখাতে পথ পাবে না তারা।

কিন্তু নদী পার হয়ে কিছুদূর এগিয়েই থামতে হ'ল আবার। মুখ শুকিয়ে গেল সকলের।

এ কী রাস্তা!

রাস্তাই বা কোথায়? সরীসৃপ ছাড়া অন্য কোন জীবেরই তো যাবার কোন উপায় নেই। দুর্গম বললে কিছুই বলা হয় না, একেবারে অগম্য এ পথ।

অতি সরু পাকদণ্ডীর মতো পথ—অর্থাৎ একটা লোক আনাগোনা করলে যেটুকু পথের দাগ পড়ে সেইটুকুই প্রশস্ত—তার পরেই কোন-কোনখানে 'পাঁচশ' 'সাতশ' হাত খদ, মানে কষ্ট ক'রেও দুজন পাশাপাশি যাওয়া উচিত নয়, একচুল এদিক ওদিক হয়ে নিচে পড়লেই চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাবে। সবচেয়ে যেটা বড় কথা, ঘোড়ায় চড়ে যাওয়া সম্ভব হবে না এ পথে। কোথাও হয়ত সেটুকু চওড়া আছে, কোথাও কোথাও আবার একটা লোককেও কাত হয়ে যেতে হয় এমনই সরু।

তবু জোর করে কিছুদূর চালালেন—কিন্তু পর পর বেশ কয়েকটি অশ্ব এবং অশ্বারোহী খতম হতেই আবার থামতে হল। ওরই মধ্যে যে কজন সেনাপতি গোছের ছিলেন, সিপাহ্‌সালার, তাদের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে স্থির করলেন, বড় ঘোড়াগুলো এখানেই রেখে যাবেন, দু'চারটে ছোটখাটো বা টাট্টু গোছের যা আছে কর্তাব্যক্তিরা তাতেই চেপে যাবেন, আর যাবে কিছু খচ্চর—তাঁবু, খাদ্য ও দরকারী সরঞ্জাম, অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে যাওয়ার জন্যে যে কটা দরকার।

কেউ কেউ এরই মধ্যে চিন্তিত হয়ে পড়ছেন দেখে বখ্‌তিয়ার আশ্বাস দিলেন, 'খোদা তাঁর করুণা দেবার আগে পাত্রকে বা আধারকে পরীক্ষা ক'রে নেন। এইটুকু প্রতিকূল ঘটনাতেই যারা মুষড়ে পড়বে সুলতানতের পুরস্কার তাদের জন্যে নয়।'

সুতরাং শুরু হ'ল সেই কষ্টকর দীর্ঘ-বিলম্বিত যাত্রা। পিঁপড়ের মতো একজনের পিছনে একজন, কোথাও বড় জোর দুজন।

কতদিনে এই অভিযান শেষ হবে কে জানে! সকলের মনেই এই প্রশ্ন।

॥ ৭ ॥

বাঘমতী পেরিয়ে কিছুদূর পূর্বে গেলে কামরূপের উত্তর দিক। সেখান থেকে উত্তর মুখে তিব্বতের পথ। এটুকু সকলেই বলেছে। বলতে যেটা পারে নি—উত্তর দিকে কতটা যেতে হবে, তিব্বতের একজনই প্রধান না অনেক, হোসেনাকে যে নিয়ে গেছে সে আসলে রাজা না সর্দার, সেখানে সত্যিই বিপুল ঐশ্বর্য আছে না নেই,

এত কষ্ট ক'রে যাওয়ার দাম মিলবে কিনা।

বখ্‌তিয়ার শুনেছেন, তিব্বতের আসল রাজা বা সুলতান হলেন আবার এখানকার কাফেরদের ধর্মগুরু। হলদে কাপড় পরেন, বিয়ে করেন না, ন্যাড়া মাথা। এদের মতে তিনিই পয়গম্বর ; একই লোক—দেহ বদলে বদলে আসেন। তাঁর অধীনে অনেক সর্দার গোছের জায়গীরদার আছে, তাদের অনেক পয়সা, কিন্তু লড়াই করার শক্তি-সামর্থ্য কম। তারা কাঁচা চামড়ার জামা পরে, কী সব গাছের পাতা ফুটিয়ে খায়, পচা মাখন ব্যবহার করে। বুনো, জংলী। এদের সঙ্গে লড়াই করাটা আদৌ বখ্‌তিয়ারের কাছে কোন চিন্তার ব্যাপার নয়—সেখানে পৌঁছনোই আসল কথা। পথ অজানা, লক্ষ্য অনির্দেশ্য। বলতে গেলে জনশ্রুতির ওপর নির্ভর ক'রে তাঁর এই অভিযান।

কিছুকাল-ধরেই-স্বল্পচেষ্টায়-অভীষ্ট-সিদ্ধিতে-অভ্যস্ত বখ্‌তিয়ার ইতিমধ্যেই অসহিষ্ণু ও ঈষৎ অনুতপ্ত হয়ে উঠেছেন। শুধু হোসেনা ও আসন্ন প্রতিশোধ চরিতার্থ করার সম্ভাবনার কথা ভেবেই ইচ্ছাটাকে বজায় রেখেছেন এখনও।

আপসোসের আরও কারণ আছে বৈকি।

কামরূপের উত্তর প্রান্তে পৌঁছবার আগেই এক নিদারুণ দুঃসংবাদ পেয়েছেন। কামরূপের রাজা পিছন থেকে গিয়ে তাঁর সমস্ত ঘোড়া লুঠ করেছেন। প্রায় দু' হাজারের ওপর ঘোড়া। ভাল তেজী ঘোড়া, বিস্তর দাম দিয়ে অনেকদিন ধরে সংগ্রহ করা। এর সাজা দিতে পারতেন তিনি, এখনও পারেন—কিন্তু তাহলে আসল কাজটায় বাগড়া পড়ে। এখানের পথ-ঘাট দুর্গম। কামরূপের রাজার পাহাড়ী সেনারা এই পাহাড়ে-পথে অভ্যস্ত। এখানের প্রতিটি বিপজ্জনক স্থানের কথা তাদের জানা আছে—একটা দড়ির ভরসায় তারা খরস্রোতা নদী পার হয়ে যায় অনায়াসে, না খেয়েও তিন-চার দিন লড়াই দিতে পারে, এখানে যুদ্ধ করতে গিয়ে কী পরিমাণ ফ্যাসাদে পড়বেন তার ঠিক কি! শেষে কি একূল ওকূল দুকূল যাবে? কামরূপের রাজা লোকটি যে বড় সহজ নন, এই একটা ঘটনাতেই টের পাওয়া গেছে। এমন অতর্কিতে, এমন নিঃশব্দে এসে ওঁর প্রহরী ও সহিসদের ওপর পড়েছেনে যে, তারা ব্যাপারটা কি ঘটছে বোঝবারও সময় পায় নি। তাঁর নবদ্বীপ জয়ের মতোই চোখের পলকে তিনশো লোক নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। একটি লোক দূর গ্রামে খাদ্যের সন্ধানে গিছল, সে-ই কোনমতে ওদের চোখের আড়াল দিয়ে পালিয়ে এসে খবর দিয়েছে।

এ লোক, এই সব সেনাদের সঙ্গে যুদ্ধ, যদি হেরে নাও যান, হয়ত অনেকগুলি প্রাণের বিনিময়ে সে জয় কিনতে হবে তাঁকে। তখন, তার পর কি আর তিব্বত

অভিযান সম্ভব হবে ?

আবারও তাই মনের জ্বালা মনে চেপে রাখতে হ'ল। এক অপমানের শোধ নিতে এসে—তখন ওঁর কোন মর্যাদাই ছিল না তবু, বার বার এইভাবে অপমানিত হ'তে হবে- এমন জানলে এ পথে আসতেন না। সে অপমান পুরনো স্মৃতিতে পরিণত হয়েছে, মনের মধ্যে চিন্তার মধ্যে কোথায় যেন আটকে আছে বলেই এখনও খোঁজ করছেন, নইলে সে অস্থিরতা আর নেই। মাঝখান থেকে এই উপর্যুপরি বাধা আর অসুবিধায় রোগও শুরু হয়ে গেছে সেনা, সেনানায়ক সকলের মধ্যেই। ওঁর সহগামীদের মনোবল ভেঙ্গে আসছে। সেটা বেশ অনুভব করছেন উনি এবং সেজন্যে যথেষ্ট চিন্তিত হয়ে পড়েছেন।

এই দুশ্চিন্তা নিয়েই সেদিন তাঁবু থেকে বেরিয়ে পড়েছিলেন। ভয় তাঁর মানুষ-শত্রুকে কখনই নেই, ভূতপ্রেতও বিশ্বাস করেন না বিশেষ। কিন্তু এখানে অন্য অদৃশ্য শত্রু অনেক। বাঘ, বাঘের চেয়ে ভাল্লুকের উপদ্রব বেশী, তার সঙ্গে আছে পাহাড়সদৃশ এক জন্তু, হাতী—এদের পালের সামনে পড়ে ইতিমধ্যেই দুবার খুব ক্ষতি হয়েছে তাঁর। আর আছে সাপ। মোটা কাছির মতো, কাছির চেয়েও মোটা; সুপুরি গাছের মতো মোটা আর লম্বা এক রকমের সাপ। জঙ্গলে সোজা খাড়া দাঁড়িয়ে থাকে। শালের চারা বা সুপুরি গাছ মনে ক'রে মানুষ নিশ্চিন্তে এগিয়ে যায়। অকস্মাৎ ঝপাং ক'রে পড়ে চোখের নিমেষে জড়ায়। পিষে মেরে ফেলে, গোটা গিলে খায়। সে বন্ধন কোন মানুষের সাধ্য নেই খুলে বেরিয়ে আসে।

এদেরই ভয় বেশী, তাই দু'চারজন লোক সঙ্গে নিয়েছিলেন। বিশ্বস্ত দেহরক্ষী। তবে তাদের শাই আছে, তারা অস্ত্র বাগিয়ে ধরে আসবে ঠিকই কিন্তু বেশ খানিকটা পিছনে থাকবে। তাদের পায়ের শব্দ বা কথা বলার আওয়াজে তাঁর চিন্তা না বিঘ্নিত হয়।

এইভাবে যেতে যেতেই তাঁর নজরে পড়ল দৃশ্যটা।

অন্ধকারে বনের মধ্যে দপ ক'রে একটা আগুন জ্বলে উঠছে, তাতে দেখা যাচ্ছে এক রমণীমূর্তি—সে আগুন পলকের মধ্যেই আবার নিভে যাচ্ছে।

আলেয়া!

সঙ্গে সঙ্গে বখ্‌তিয়ারের মনে পড়ল কথাটা।

অশরীরী প্রেতযোনি-প্রাপ্ত নারী-আত্মা।

এদের কথাই ললিতা বলেছিল তাঁকে।

ওঁর সঙ্গের লোকরাও দেখেছে। তারা দাঁড়িয়ে গেছে সঙ্গে সঙ্গে---কাঠ হয়ে

গেছে ভয়ে। কারণ এ কাহিনী-কিস্‌সা তারাও শুনেছে এদেশে এসে, তাদের নিজেদের মতো একটা ধারণাও ক'রে নিয়েছে। মুসলমানদের আত্মা এভাবে আসবে না, কিন্তু বিধর্মী কাফেরদের আত্মার তো আর অধোগতি হতে বাধা নেই! তাদের বরং এই গতি হওয়াই তো স্বাভাবিক। আর ভূত কাফেরদের হলেও ভয় করার মতো বস্তু—যাদের দেহ নেই, অস্ত্রে জব্দ করা যায় না, তাদের ভয় না ক'রে উপায় কি?

থমকে দাঁড়িয়ে গিছলেন বখ্‌তিয়ারও। বুকের মধ্যে তাঁরও একটা গুরগুরুনি উঠেছিল—লল্‌তার মুখে শোনা গল্প, একাধিকবার শোনা—এখনও মনে আছে স্পষ্ট। ঐ আলোর মায়ায় ভুলিয়ে নিয়ে গিয়ে কীভাবে দঁকে ডুবিয়ে মারে তার বিবরণ দিয়েছিল মেয়েটা, তাঁর দিলের রৌশন, নূর ই-চশ্‌ম্ লল্‌তা।

কিন্তু সে ভয়, অজানা আতঙ্ক সামলে নিতেও দেরি হ'ল না বখ্‌তিয়ারের। এই কঠিন পার্বত্য দেশে আর যাই হোক দঁক বা হাবড় নেই, অন্ততঃ আজও দেখেন নি। নদীর ধারে চোরা বালি আছে শুনেছেন, কিন্তু নদী এখান থেকে বহু দূরে। এখানে যা আছে, যার তীর ধরে চলেছেন তাঁরা, সে একটা সরু ঝরণা মাত্র, তাও অনেক নীচে।

যুক্তি যখন বোঝে মানুষ, তখন বিহ্বলতা কেটে গেছে বুঝতে হবে। অথবা চিন্তার আচ্ছন্নতা বা বিহ্বলতা কেটে গেলেই যুক্তি জিনিসটা মাথায় ঢোকে। বখতিয়ারেরও প্রাথমিক ভয় কেটে গেছে, মস্তিষ্ক আবার তাঁর স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে গেছে। তিনি দৃঢ় মুষ্টিতে তলোয়ার বাগিয়ে ধরে এগিয়ে গেলেন।

ইতিমধ্যে আরও দুবার আগুন জ্বলেছে—তেমনিই দপ ক'রে নিভেছে। সে আলোর স্থায়িত্ব এতই স্বল্পক্ষণের যে ঐ একটা আবছা রমণীমূর্তি ছাড়া আর কিছুই লক্ষ্য হয় নি।

কাছে যেতে ভাল করে নজরে পড়ল।

সবটাই দেখতে পেলেন, বুঝতেও পারলেন।

সামনে দু'তিনটে বড় কাঠের গুঁড়িতে আগুন জ্বলছে। ধুঁইয়ে ধুঁইয়ে জ্বলছে বলে এ আগুন দূর থেকে দেখা যায় না—কাছে এলে তার আভায় কিছুটা বোঝা যায়।

একটি মেয়ে, যতদূর চোখ চলছে—সুন্দরী ও অল্পবয়সী—গেরুয়া রঙের কাপড় পরা, গলায় কি কাঁটাকাঁটা কঠের গুলির মালা—(পরে জেনেছিলেন ওকে এরা রুদ্রাক্ষ বলে) হাতেও বালার মতো ক'রে পরা ঐ জিনিসই—কপালে লাল মতো কি একটা

বস্ত, তাতে মানিয়েছে ভারি চমৎকার—একটা কী জানোয়ারের ছালের ওপর অদ্ভুত আসন ক'রে বসে বিড়বিড় ক'রে কী বকছে আর মধ্যে মধ্যে মুঠো মুঠো ধুনো সেই আগুনে ফেলে দিচ্ছে। তাতেই দপ ক'রে জ্বলে উঠছে একটু আগুনের শিখা, আবার সঙ্গে সঙ্গেই নিভে যাচ্ছে প্রায়। নিভছে যখন তখন কিছুক্ষণ আর কিছু দেখা যাচ্ছে না, সবটা অন্ধকার মনে হচ্ছে, আবার চোখ সয়ে গেলে দেখা যাচ্ছে মানুষটাকে, কাঠের গুঁড়ি, ছালের আসন—সব। পাশে একটা তে-মুখো বর্শা, সেটা খানিকটা বোধহয় মাটিতে পোঁতা আছে, অর্ধেকটা খাড়া দাঁড়িয়ে আছে।

মালিককে এগিয়ে যেতে দেখে এদেরও সাহস হয়েছে—অনুগামীদের। কাছে এসে ধুনির আলোতে তারাও দেখতে পেয়েছে সব ছবিটা—সুন্দরী তরুণী মেয়ে দেখে -কার জন্যে, কী জন্যে চায়, মালিকের সামনে এসব বেয়াদবি কিনা--কিছু না ভেবেই হৈ হৈ ক'রে এগিয়ে গেল। বহুকাল বাড়ি থেকে রওনা দিয়েছে তারা। এতগুলি লোকের দলে উপভোগ্য নারী আর কিশোর বালক সব মিলিয়ে একশোর বেশী হবে না—এদিক দিয়ে বহুদিন উপবাসী থাকতে হয়েছে—ফলে ওদের স্বভাব-বৃত্তিই কাজ করেছে, তলিয়ে কিছু ভাববার সময় পায় নি।

মেয়েটি এদের কাছে এগিয়ে আসাটা টের পেয়েছিল কি না কে জানে, সে চোখের নিমেষে ত্রিশূলটা টেনে বাগিয়ে ধরে উঠে দাঁড়াল। সেই সুন্দর মুখের উপযুক্ত মানানসই টানা দুটি চোখ যা এতক্ষণ মন্ত্রোচ্চারণের ভাবাবেশে ঢুলঢুল করছিল তা থেকে আগুন বেরোতে লাগল। সম্ভবতঃ উঠে দাঁড়াবার সময় কোন পাত্র থেকে ঘি বা তেল ঢেলে দিয়েছিল ধুনীতে—এবার বেশী স্থায়ী আগুন জ্বলতে লাগল। উভয় পক্ষকে দেখবার অসুবিধা নেই।

কিন্তু এদিকে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বিদ্যুৎবেগে—বখ্‌তিয়ারের তরবারি খাড়া হয়েছে, অনুগামীদের সামনে বাধা সৃষ্টি ক'রে তাদের আটকে দিয়ে বলে উঠেছেন, 'খবরদার।'

ওরা হকচকিয়ে গেলেও থামতে বাধ্য হ'ল।

বখ্‌তিয়ারের ঐ বাঁকা তলোয়ারের ধার ও গতি দুই-ই তাদের জানা আছে।

বখ্‌তিয়ার বাঁ হাতটা তুলে একটা অভয় বা শান্তির ভঙ্গী ক'রে আর একটু কাছে এগিয়ে গেলেন, তারপর তাঁর এই পাঁচ বছরের জ্ঞানমতো ভাঙা বাংলায় প্রশ্ন করলেন, 'তুমি কে? এখানে কি করিতেছ? তোমার বাড়ি কোথায়?'

মেয়েটি হাত ও ঘাড়ের ভঙ্গী ক'রে জানিয়ে দিল, ওঁর কথা সে বুঝতে পারছে না।

বখ্‌তিয়ার তখন আরো আস্তে আস্তে বলার চেষ্টা করলেন। মেয়েটি এবার যেন বুঝতে পারল, সেও অদ্ভুত এক ধরনের ভাষায় বাংলার মতোই কিন্তু বাঁকা বাঁকা উচ্চারণে বলল, 'আমি ভৈরবী, আমাদের বাড়ি নেই, আমাদের কোন পরিচয় নেই। আমরা বনেই থাকি, খাবারের কি অন্য জিনিসের দরকার হলে লোকালয়ে গিয়ে ভিক্ষে করি।'

বখ্‌তিয়ার বললেন, 'আমরা তিব্বতে যাবো। তুমি এর চেয়ে কোন ভাল রাস্তা জানো?'

ঘাড় নাড়লে ভৈরবী। বলল, 'এর চেয়ে ভাল রাস্তা নেই।'

তখন জায়গাটার নাম করলেন বখ্‌তিয়ার, 'তিব্বতের এই জায়গাটাতে যাব, কোন্ পথ বলতে পারো? জানো জায়গাটা?'

মেয়েটি বলল, 'সিধে উত্তর, প্রায় দেড়শো ক্রোশ গিয়ে আবার পুবে যেতে হবে খানিকটা। পথ আমি জানি না, তবে যে জানে এমন লোক দিতে পারি। এই কাছেই থাকে, সেও ভিক্ষা ক'রে খায়, তাকে ভাল কিছু পুরস্কার দিলে সে পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে পারবে।'

'কোথায় থাকে সে?'

'এই বনের মধ্যেই। তোমরা খুঁজে পাবে না—আমি ডেকে আনছি—'

ভৈরবী বাদিকে ফিরে পা বাড়াতেই বখ্‌তিয়ার চোখের নিমেষে সামনে এসে দাঁড়ালেন—পথ আড়াল ক'রে।

'উঁহু, তা হবে না। আমার দুজন লোক যাবে সঙ্গে, তোমাকে চোখের আড়াল করব না।'

'কেন, যদি পালাই!' হাসল ভৈরবী, 'আমি পালাতে চাইলে তুমি আটকাতে পারবে?—ভাল, কারা আসবে আসুক, আমি ডেকে আনছি সে লোকটাকে--'

ভৈরবী দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে চলল, বখ্‌তিয়ারের ইঙ্গিতে দুজন অনুচরও পিছু নিল তার।

অনুগামীদের দলে আলি মেচও ছিল, তাকে আজকাল সর্বদা সঙ্গে রাখেন বখ্‌তিয়ার, সে এবার এসে আস্তে আস্তে বলল 'এরা কামরূপের ভৈরবী জনাবালি, বড় সাংঘাতিক এরা। এদেশের সাধারণ মেয়েরাও ভোজবিদ্যা জানে, মানুষকে চোখের নিমেষে ভেড়া ক'রে দেয় নাকি। এদের অসাধ্য কিছু নেই।'

তাচ্ছিল্যের হাসি হাসলেন বখ্‌তিয়ার। 'হ্যাঁ, যেমন তোদের এই আলেয়া। এই তো আলেয়া ভেবে আঁতকে উঠেছিলি! দেখলি তো, কেমন পেতনী! এমন

পেত্নীতে পেতে আমি খুব রাজী।… তোরা ভয়ে ভয়েই গেলি।'

ভৈরবী যাকে ধরে আনল তার একেবারেই ভিখিরীর মতো বেশভূষা। রোগা চিমড়ে, যেন কতকাল খেতে পায় নি, ফরসা রঙ তাও ধুলোর মধ্যে থেকে চেনা কঠিন। কাপড় শতচ্ছিন্ন। আবার বোধ হয় একটু তোৎলাও।

বখ্‌তিয়ার প্রশ্ন করলেন, 'এ! এই লোক পথ দেখাবে?'

ভৈরবী বলল, 'এদিকের পথঘাট সব জানে ও। এখান থেকে চারিদিকে দেড়শো ক্রোশ দূর পর্যন্ত সব জায়গা ওর নখদপর্ণে। দলাইলামা যেখানে থাকেন সেখান পর্যন্ত গেছে।'

তবু সন্দিগ্ধকণ্ঠে বখ্‌তিয়ার বললেন, 'তুমি পারবে আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে?'

'খুব পারব। কিন্তু পাওনাটা কি মিলবে?'

'দেব। ভাল বকশিশ দেব। ঐখানে পৌঁছিয়ে দিতে পারলে একশো মোহর দেব, সোনার মোহর।'

'কখন দেবে?'

সেখানে পৌঁছলে।'

'হবে না। পারব না।'

'তার মানে? আরও কী চাও?'

'আরও চাই না, আগাম চাই। সেখানে পৌছলে কলা দেখাবে তা জানি।'

'কী এত বড় কথা বল! এত স্পর্ধা তোমার! এত বড় গোস্তাকি! আমি তোমাকে ঐ একশো মোহর ফাঁকি দেব? জানো শুধু এই কথাটা বলার জন্যই তোমার জিভ কেটে নিতে পারি?'

'তা পারো, কিন্তু তাতে কি আর সত্যিটা বদলাতে পারবে? তোমার খুব বদনাম, পুল তৈরী করিয়ে মজুরী দাও নি।'

'তারা মজুরীর জন্যে অপেক্ষা করে নি, চলে গিয়েছিল।'

'অপেক্ষা করলে কী মজুরী মিলবে তা তারা জানত, তাই চলে গিছল। আর সে তো তুমিও জানো।'

বখ্‌তিয়ারের রক্তাভ মুখ ক্রোধে বিবর্ণ হয়ে উঠল।

'এ সব কে বললে তোমাকে, তুমি কার মুখে শুনলে?'

'ঐ ছাখো, আমি দুটো ভাতের জন্যে কোথায় না কোথায় ঘুরি। নদী যেখানে

পেরিয়েছ সেখানে গিয়ে শুনে এলুম যে।'

'ঝুট। বিলকুল ঝুট বাত। তারা থাকলে মজুরী পেত।'

'অতশত জানি না বাপু, টাকা আগাম দাও, এখেনে আমি বিশ্বাসী লোকের জিম্মে ক'রে দিই—তারপর ধরো না কেন আমাকে বেঁধেই দিয়ে যেও। তাহলে তো আর ভাবনা নেই। পথ দেখাতে না পারি, যা মনে আসে তাই ক'রো। সে তো তোমাব হাতে রইলই। সেখানে নিজের কোটে পৌঁছে যদি আমাকে মেরেই ফ্যালো, মা বলতেও নেই, বাপ বলতেও নেই। তবু জানব—আমার ছেলেপুলেরা দুটো ভাত পাবে কিছুদিন।'

আর সহ্য করতে পারলেন না বখ্‌তিয়ার এই বেত্‌তমীজ বদবখ্‌তের বেযাদবি; তলোয়ারখানা খাপ থেকে বেরিয়ে এল চোখের পলক না পড়তেই—কিন্তু তার আগেই এক আশ্চর্য কাণ্ড ঘটে গেল। সেই এক নিমেষের মধ্যেই—ভিখিরী লোকটা, নাম বলেছে কালাচাঁদ—শূন্যেই ডান হাতটা চালিয়ে দিল, আর দেখা গেল যেন সেই শূন্য থেকেই একটা বিরাট শঙ্খচূড় সাপ তার হাতের মধ্যে এসে হাজির হয়েছে, আর সেটা বিপুল হিংস্র ফণা বিস্তার ক'রে দুলছে বখ্‌তিয়ারের চোখের সামনে!

চমকে পিছিয়ে এসেছিলেন বৈকি বখ্‌তিয়ার কয়েক পা—কিন্তু বেশী ভয় পাবার লোক তিনি নন, সঙ্গে সঙ্গে, যেন প্রস্তুতই হয়ে ছিলেন এই ভাবে, তাঁর তলোয়ারখানা ছুঁড়লেন। বখ্‌তিয়ারেব লক্ষ্য অব্যর্থ, সবাই জানে। সে তলোয়ারে—কী হচ্ছে তা বোঝার আগেই সাপটা কেটে দুখানা হয়ে যাবার কথা। কিন্তু তা হ'ল না, হওয়া সম্ভবও নয়, দেখা গেল সেটা আসলে সাপও না, কালাচাঁদের হাতের মুঠোয় একটা ছোট্ট সাদা পাখি, মুঠোটা আলগা করতেই ফুড়ুৎ ক'রে উড়ে চলে গেল আকাশে।

বার বার অধীনস্থ লোকেদের সামনে অপদস্থ হওয়া—বখ্‌তিয়ার আবারও ক্ষেপে গেলেন। সবাইকে ইঙ্গিত করলেন, চারিদিক থেকে ঘিরে ফ্যালো—পালাতে না পারে। ধরতে না পারো, মেরে ফ্যালো অন্ততঃ।

কালাচাঁদও যেন তৈরী ছিল এই নির্দেশের জন্যে। সে ট্যাঁক থেকে একটা সরু দড়ির মতো কী জিনিস মেঝেতে ফেলতেই সেটা আপনিই খাড়া হয়ে উঠল, একগাছা লাঠি সোজা হয়ে দাঁড়ালে যেমন হয়। সেইটে বেয়ে তরতর ক'রে উঠে গেল কালাচাঁদ, অনেক উঁচুতে—দেখতে দেখতে চোখের পলক ফেলার মধ্যেই চোখের বাইরে চলে গেল। দড়িটাও প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ওপরে উঠে গেল। না এই অদ্ভুত বাহন, না তার আরোহী—কাউকেই আর দেখা গেল না।

এরা হতভম্ব, একটু ভীতও।

বখ্‌তিয়ার হয়ত অত নয়। কিন্তু তাঁর সঙ্গের লোকেরা যে রীতিমতো ভয় পেয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। দু'একজনের পা কাঁপছে থরথর ক'রে। মুখ সাদা হয়ে গেছে। আলি মেচ মুসলমান হওয়ার আরে যে সব মন্ত্র পড়ত সেই সব মন্ত্র পড়তে শুরু করেছে।

ভৈরবী এতক্ষণ শান্ত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল, এবার একটু মুচকি হেসে বলল, 'পরীক্ষা করার সাধ মিটল সাহেবের? এটা কামরূপ, এখানে পাঁচ বছরের ছেলেও জাদু জানে, ভেলকি লাগাতে পারে।'

বখ্‌তিয়ার আর যাই হোন, নির্বোধ নন। হেরে গিয়ে না হারবার ভান করা বা শূন্যগর্ভ আস্ফালন করার অর্থ—বাকী সকলের কাছে হাস্যাস্পদ হওয়া। এমনিই যা তাঁর অনুচরদের মনোভাব, তাদের সামনে আরো বেশী অপদস্থ হলে তারা মানতে চাইবে না, সেটা বেশী ভয় আরও।

তিনি বললেন, 'বেশ, আমি আগাম বখশিশই দেব। ডাকো ওকে।'

ভৈরবীও বৃথা সময় নষ্ট করলেন না আর। ডাকলেন, 'কালাচাঁদ! কালাচাঁদ শুনছ!'

'আজ্ঞে।' বলে সকলের পিছন থেকে দু'একজনকে ঠেলেঠুলে সামনে এসে আবার হাতজোড় ক'রে দাঁড়াল।

সঙ্গের লোকেরা আরও কতটা বেশী ভয় পেল, কতটা অবাক্ হয়ে গেল—সে দিকে লক্ষ্যও করলেন না আর বখ্‌তিয়ার—শুধু আলি মেচকে হুকুম করলেন, 'ওকে একশো মোহর দিতে বল খাজাঞ্চীকে। আর তাঁবু গোটাতে বল। এখন থেকে কালাচাঁদই পথ দেখিয়ে যাবে তোমার সঙ্গে সঙ্গে।'

'আর—'

ভৈরবীকে দেখিয়ে বললেন, 'এ আওরৎ আমাদের সঙ্গে যাবে। একে নজর-বন্দী রাখতে বলে দাও। আমাদের খানা না খায়—নিজে যাতে পাকিয়ে খেতে পারে সেই রকম ব্যবস্থা ক'রে দিও।'

কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লে মানুষ থিতিয়ে ভাবার সময় পায় না। যেখানে বেশী ভাবতে দেওয়া বিপজ্জনক, সেখানে তেমন দরকার না থাকলেও কর্মব্যস্ততা সৃষ্টি করতে হয়, তা বখ্‌তিয়ার জানেন।

॥ ৮ ॥

আবারও সেই বাঘমতী! তেমনি খরস্রোতা, তেমনি ভীমদর্শনা, ভয়ঙ্করী।

এবার নদীর পারে এসে দাঁড়িয়েছেন ইখতিয়ারউদ্দীন মহম্মদ বখ্‌তিয়ার—যিনি একদা বিশাল তুরস্ক সাম্রাজ্যের একেশ্বর হওয়ার খোয়াব বা স্বপ্ন দেখেছিলেন এবারের এই যাত্রা করার আগে।

কিন্তু সে মানুষ আর এ মানুষে আকাশ-পাতাল তফাৎ।

বীর, দুঃসাহসী, উদ্ধত, অক্লান্তকর্মী, উচ্চাশী এক প্রায়-সুলতান লোক মাত্র মাস কয়েক আগে নদীর ওপারে এসে দাঁড়িয়েছিল—নূতন রাজ্য জয় করার জন্য অসহিষ্ণু, বিপদে ঝাঁপ দিতেই যার সাধ, পিছনে যার আজ্ঞা-অপেক্ষায় বারো হাজার লোক—সে আর নেই। আজ যে এপারে এসে অবসন্নভাবে বসে পড়েছে একটা পাথরের ওপর, ভগ্নোদ্যম, ভগ্নস্বাস্থ্য, ক্লান্ত : যার আজ্ঞা কেন—প্রয়োজন-মতো যাকে একটু তৃষ্ণার জল দেবারও লোক নেই, এই মুষ্টিমেয়—মাত্র দু'শোর মতো অবশিষ্ট অনুচরদের মধ্যে, সকলেই তার ওপর রুষ্ট বিরক্ত, নিজেদের প্রাণভয়ে ভাগ্যচিন্তায় ক্লিষ্ট—সে লোকটির মধ্যে সেই আগের দিনের মানুষটির চিহ্নমাত্রও খুঁজে পাওয়া কঠিন।

এত অল্প সময়ে এত পরিবর্তন অবিশ্বাস্য বৈকি।

কিন্তু এত অল্প দিনে এমন ভাগ্য-বিপর্যয়ই বা ক'জনের ঘটে, এত দ্রুত এমন সর্বনাশা ঘটনাপরম্পরাই বা ক'জনের ঘটেছে।

আজ এই ক'মাস পিছনে তাকিয়ে বখ্‌তিয়ারেরও তো বিশ্বাস হচ্ছে না কথাটা।

কালাচাঁদ পথ দেখিয়েছিল ঠিকই। সেখানে কোন তঞ্চকতা করে নি। হাতে সোনা গুনে নিয়ে যে কাজের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, সে-ই যে সংক্ষিপ্তম সহজতম পথ তা ফেরার পথে বখ্‌তিয়ার বহু প্রাণের মূল্যে ভাল ক'রেই বুঝেছেন।

কিন্তু যেখানে কোন প্রতিশ্রুতি ছিল না সেখানে সে আঘাত করেছে নির্মমভাবে।

বাহিনী সাজাবার পরিকল্পনা বখ্‌তিয়ারেরই। সামান্য যে ক'টি ছোট টাট্টু ঘোড়া আনা সম্ভব হয়েছিল, দু'একটি খচ্চর—তাতে আরোহী হয়েছিলেন অভিজ্ঞ সাহসী সেনানায়ক দু'চারজন। তাঁরা ছিলেন আগে আগে, পিছনে অর্ধেক সৈন্য সারিবদ্ধ অনেকটা পিঁপড়ের সারের মতো। তার পিছনে অর্থাৎ বাহিনীর ঠিক মাঝখানে ছিল রসদ ও অস্ত্রশস্ত্র, তার পিছনে নোকর-বাবুর্চির দল, তারও পিছনে বাকি অর্ধেক সৈন্য। একান্ত প্রয়োজনীয় বস্তুগুলি নিরাপদে রাখার জন্যই এই ব্যবস্থা।

এমনিতেই সংকীর্ণ পার্বত্যপথ—তারও একটা সংকীর্ণতর অংশ দিয়ে যখন যাচ্ছেন তাঁরা, বাঁয়ে একটা উত্তুঙ্গ পর্বতচূড়া, ডাইনে অতল গভীর খাদ—সহসাই, ঠিক যেমন সামনের সৈন্যদল পার হয়েছে, রসদবাহী গাধা ও খচ্চরের দল, কিছু কিছু

এদেশী পাহাড়ী য়াক্ বলদও আছে, এগোতে যাবে,— মাঝখানে বিরাট বিরাট দুটো তিনটে পাথর গড়িয়ে প'ড়ল এই দুই অংশের মধ্যে। এত বড় বড় পাথর যে, দু'চারজন লোকের সাধ্য নেই তাকে এক চুল নড়ায়। অথচ পথ এতই সরু যে পাশাপাশি দুজনের বেশি সেখানে দাঁড়ানোই অসম্ভব।

এত অল্প সময়ের মধ্যে ঘটনাটা ঘটল, বলতে গেলে এক লহমা সময়ও লাগল না, একবার বিদ্যুৎচমকে যতখানি সময় লাগে ততটুকু বোধহয়— যে, কী ঘটল তা ভাল ক'রে বুঝতে ওর দশগুণ সময় লাগল। লোক অবশ্য বিশেষ মরে নি, দু'চারজন মানুষ, একটা দুটো গাধা, আর্তনাদ করারও সময় পেল না তারা।

এখানে যে সময় এই ঘটনা ঘটল, ঠিক সেই সময় বাহিনীর মাঝখানের অংশের দক্ষিণ ভাগেও যেন নির্ভুল হিসাবে এমনি ভয়ঙ্কর কতকগুলো বড় পাথর পড়ল দুই ভাগের মধ্যে, উভয় ভাগের যোগসংযোগ ছিন্ন ক'রে। বখ্‌তিয়ার ছিলেন বাহিনীর একেবারে শেষে, এখান দিয়ে গিয়ে তাঁকে খবর দিতেই অনেক সময় লাগল। সরু পথ, দুজন ক'রে পাশাপাশি আসছে, বহুদূর পিছনে—বোধহয় এক ক্রোশ পিছনে—আছেন বখ্‌তিয়ার—তিনিও বুঝতে পারছেন না, কী হ'ল, গতি কেন বন্ধ হ'ল। তিনিও এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছেন কিন্তু সে সংকীর্ণ পথে দুজনই যথেষ্ট। তার পাশ কাটিয়ে কাউকে যেতে হলে আড়ভাবে যেতে হয়, তাতে আর যাই হোক, দ্রুত যাওয়া যায় না। বখ্‌তিয়ার ছিলেন একটা টাট্টু ঘোড়ায়, কিন্তু ঘোড়া যত ছোটই হোক, সেই স্বল্পতমপরিসর স্থান দিয়ে গলা অসম্ভব। অতএব হাঁটা—কিন্তু বহুদিন যার হাঁটা অভ্যাস নেই, বিশেষ পাহাড়ী পথে, সে একদণ্ড সময়ে মাত্র কয়েক হাত এগোতে পারে, তার বেশি নয়।

এদিকে, এই পাথর পড়াটা কিছু স্বাভাবিক বা অপ্রাকৃত ঘটনা নয়। রীতিমতো মনুষ্যকৃত, পূর্বপরিকল্পিত ; এবং যে বা যারা এই কাজ করেছে তারা বখ্‌তিয়ারের এ বাহিনীর মিত্র নয়, এটাও নিশ্চিত। অর্থাৎ তারা নিশ্চিন্ত হয়ে বসে নেই। এই সৈন্যদের দেহ অপেক্ষাকৃত ভারী ; গরম পোশাক, অস্ত্র এবং সামান্য যা জিনিস বইছে তারা—তার ওজনও কম নয়। দুশমন যারা দেখতে দেখতে চোখের নিমেষে এদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল—তাদের সকলেরই রোগা রোগা হালকা দেহ, পোশাকও নামমাত্র, তাদের অস্ত্র বলতে তীর ধনুক, বাঁশের তীরে ছোট ছোট লোহার মুখ আটকানো, তার ওজন এদের তলোয়ার বর্শা বল্লমের চেয়ে অনেক কম। ঢালু পাহাড়ের গায়ে ছোট ছোট গাছের ফেঁকড়িতে পা আটকে দাঁড়িয়ে ছিল, ঐ বড় পাথরগুলোও আগে থাকতে তৈরী সাজানো ছিল— সেগুলো গড়িয়ে দিতে আর কতটুকু

সময় লাগে।

পাথর পড়ার চমক এবং ভয় কাটার আগেই, স্বাভাবিক নিয়মে পড়েছে বা কেউ ফেলেছে—এমনি আরও মাথার ওপর গড়িয়ে পড়বে কিনা—সেটা অনুমান করারও সময় মিলল না, একযোগে পিলপিল ক'রে ঝাঁপিয়ে পড়ল তারা এদের ওপর এবং অনায়াসে খাদ্যখাবার অস্ত্রশস্ত্রের ভাণ্ডার নিয়ে আবার সেই খাড়া পাহাড়ের গা বেয়ে উঠে গেল—দেখতে দেখতে পাঁচ দণ্ড সময়ের মধ্যে যেন সেই কালাচাঁদের ভোজবাজির মতোই আকাশে মিলিয়ে গেল।

তারা কে, কোথা থেকে এসেছিল, কেমন ক'রে এ পথে নামল বা উঠে গেল—এরা কিছুই বুঝতে কি জানতে পারল না। সবটা যেন অবিশ্বাস্য দুঃস্বপ্নের মতো বোধ হতে লাগল। বাস্তব যেটা, সেটা হ'ল ওদের খাবার অস্ত্র-শস্ত্র বা তাঁবু একেবারেই অদৃশ্য হয়ে গেছে, তাদের আর কোন চিহ্ন পর্যন্ত নেই।

সর্বনাশের পরিমাণটা ঠিক কত— তা তারা অনুমান পর্যন্ত করতে সাহস করল না কেউ—মানে যে সব রক্ষী বা নোকরের দল ছিল। ভবিষ্যৎ তো গেলই, বর্তমানে—তাদের পিশাচ মনিব কী শাস্তি দেবেন তাই ভেবেই তারা পাগল হয়ে উঠল প্রায়। দু'একজন ঢালু পাহাড়ের পথে নেমে পালাবার চেষ্টা ক'রে গড়িয়ে অতল খাদে পড়ে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেল।

সত্যিই পাগল হয়ে উঠলেন বখ্‌তিয়ার। একটা জয় থেকে আর একটা জয়ই ক'রে গেছেন এতদিন, মেজাজটা সেই মাপেই উদ্ধত ও অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছে। এখন এই একটার পর একটা বাধা ও অপমান—এখন এই যাকে বলে খেয়া পেরোতে গিয়ে নৌকো ডুবে যাওয়া—তিনি আর জ্ঞান বা হুঁশ রাখতে পারলেন না। সত্যিই নির্মম শাস্তি দিলেন কয়েকজনকে। তারপর কতকটা ক্লান্ত হয়েই থামতে হ'ল যখন, সেনানায়করা বেশ একটু কঠিন কণ্ঠেই শুনিয়ে দিলে যে তিনি যদি ওঁর বিশ্বস্ত সেবকদের বিনাদোষে এইভাবেই পুরস্কৃত করেন তাহলে শীগগিরই হয়ত এমন একটা সময় আসবে, ওঁর অনুগামী হতে বা আদেশ পালন করতে একজনকেও খুঁজে পাবেন না।

তারাও মরীয়া হয়ে গেছে তখন। সামনে সমূহ বিপদ, হয়ত বা মৃত্যুই, এ সময় এমন পাগলামি তারা সহ্য করবে কেন? আর এ লোকটার জোর তো তাদের জোরেই? সামরিক বুদ্ধি যতই থাক, একা তো লড়াই জেতা যায় না?

তাদের এবং এখনও-নীরব বাকী সকলের মনোভাব বুঝে নিজেকে সামলে নিলেন

বখ‌্তিয়ার। বুঝলেন অবস্থাটাও। যারা কাছাকাছি ছিল, তাদের সকলের বক্তব্যই মিলে গেল। পায়ের দাগ, ছেঁড়া ভাঙা ডালপালা, লতাপাতাও দেখলেন। পাথরগুলো তো প্রত্যক্ষ, সেগুলো যে বেশ বুঝেসুঝে হিসেব ক'রেই ফেলেছে কেউ, সে সম্বন্ধেও সন্দেহ নেই।

কালাচাঁদ? কালাচাঁদ কে? সে এ বিষয়ে কী বলে? ডাকো তাকে।

শুধু বখ‌্তিয়ার নয়, আরও অনেকেই বলে উঠল।

কালাচাঁদ পথপ্রদর্শক, বাহিনীর পুরোভাগেই যাচ্ছিল। পিছনে পাথর পড়ার খবরটা যখন অনেক পরে সামনের দলে পৌছেছে— তখন কর্তাদের সঙ্গে কালাচাঁদও পিছিয়ে আসার চেষ্টা করেছে এই পর্যন্তই জানে সবাই। সেই গোলমালে অতঃপর সে কোথায় হারিয়ে মিশিয়ে গেছে তা কেউ বলতে পারল না।

খানিকটা—যতদূর সম্ভব খোঁজাখুজি হ'ল বৈকি। কিন্তু কোথাও তার কোন খবর মিলল না। তার মানে সেও অদৃশ্য হয়েছে এদের রসদ ও হাতিয়ারের সঙ্গে!

তখন আর বেশী খোঁজার সময়ও নেই। সূর্য পাটে বসে গেছে। এইসব বিস্নে কতক্ষণ কেটেছে কারও খেয়াল নেই। পাথরগুলো অতিকষ্টে গড়িয়ে নীচে ফেলে পথ সাফ করা হয়েছে বটে, কিন্তু তখন আর এগনো সম্ভব নয়। আর তাঁবুও তো নেই। যে যেখানে ছিল সে সেইখানেই বসে সম্ভাব্য মৃত্যুর প্রতীক্ষায় প্রহর গুনতে লাগল।

অবশ্য আর কিছু হ'ল না। রাত্রি প্রভাত হতে আবার চলতে শুরু ক'রে পরের দিন সন্ধ্যার আগে একটা অপেক্ষাকৃত সমতল জায়গায় পৌছল ওরা। তার ফলে আর কিছু না হোক, আবার দলবদ্ধ হতে পারল, এটাই কিছুটা ভরসা।

কিন্তু খাবার? ঝরনা একটা আছে, জলের অভাব নেই। খাদ্য?

আশেপাশে যে দু-একটা পাহাড়ী গ্রাম ছিল সেখান থেকে—কাউকে দাম দিয়ে কারুর কাছ থেকে বা ছিনিয়ে নিয়ে যেটুকু চাল পাওয়া গেল তা ফুটিয়ে সকলের এক এক মুঠোও হয় না। দুদিন অনাহারের পর খাবারের অবস্থা দেখে সাধারণ সিপাহীরা একেবারেই ভেঙ্গে পড়ল। একটা অস্ফুট গুঞ্জন উঠল, ক্রমশঃ তা বেশ সরবও হয়ে উঠল, 'এবার ফেরা উচিত'!

সে গুঞ্জন বখ‌্তিয়ারের কানেও পৌছেছিল, কিন্তু তিনি উত্তর দেবার আগে অন্য সিপাহ্‌সলাররাই জবাবটা দিয়ে দিলেন, ফেরার পথেও খেতে হবে, সেখানেও এই দুর্গম রাস্তা হাঁটবার প্রশ্ন আছে— তার চেয়ে, এতদূর যখন আসাই হয়েছে তখন এগিয়ে যেতেই বা দোষ কি, যদি নূতন দেশ জয় করতে পারি, সোজাসুজি আমাদের সঙ্গে

লড়াই ক'রে এই পাহাড়ীরা জিততে পারবে না এটা ঠিক, তাহলে আবার সবই হবে।

এইখানে এসে কাঠের আগুনের সামনে একটা গাছতলায় থিতিয়ে বসে বখ্‌-তিয়ারের মনে পড়ল ভৈরবীর কথা।

'সেটা আছে? সেই আওরৎটা? না, সেটাও ভেগেছে?'

শোনা গেল সে আছে। পিছনের দিকে যেদিকে বখ্‌তিয়ার ছিলেন, চারজন আগে-পিছে ক'রে নজর রেখে আন ছিল, সে পালায় নি। পালাবার কোশিসও করে নি।

'ডাক্ তাকে, এখানে নিয়ে আয়।'

নিয়ে আসা হ'ল ভৈরবীকে।

শান্ত নিস্পৃহ মুখে এসে দাঁড়াল সে।

ওর খবর যে বখ্‌তিয়ার একেবারে রাখেন নি তা নয়।

রসুই ক'রে খেতে রাজী হয় নি, এদের খাবারও খায় নি এদের সঙ্গে কিছু শুকনো ফল ছিল প্রধানদের ব্যবহারের জন্য, তাই দুটো চারটে মাত্র খেয়েছে,—কোথাও ঝরনা পেলে এক আঁজলা জল। নিজের পূজোপাঠ কিছুই করে নি এ কদিন, তবে মধ্যে মধ্যে নিঃশব্দে ঠোঁট নড়তে দেখেছে অনেকে, বোধহয় জপ করে ঐভাবে। পালায় নি, এদের কোন আচরণেও প্রতিবাদ করে নি। বোধহয় বেধে নিয়ে গেলেও আপত্তি করত না। মোটামুটি ওর সম্বন্ধে এ খবরটুকু রেখেছিলেন বখ্‌তিয়ার।

আজ এসে দাঁড়াতে ক'দিন পরে ভাল ক'রে চেয়ে দেখলেন বখ্‌তিয়ার।

রূপসী মেয়ে সন্দেহ নেই। গেরুয়া কাপড়, কপালে সিঁদুরের বড় ফোঁটা, রুদ্রাক্ষের মালা ও বালা— তবু কী অপরূপই না দেখাচ্ছে। মুহূর্তে যেন রক্তে আগুন ধরে গেল বখ্‌তিয়ারের। এতক্ষণ যে আগুন জ্বলছিল এ তা থেকে স্বতন্ত্র, ভিন্ন। তা থেকে অনেক বেশী প্রবলও। বোধ করি এই আগুন থেকে রেহাই পেতেই—জোর ক'রে ঐ আগুনটাকেই প্রজ্বলন্ত করে তুললেন। কঠিন কণ্ঠে বললেন, 'এই, তোর সে কালাচাঁদ কোথায়?'

'কালাচাঁদ!' ভ্রূ কুঁচকে বিস্ময় প্রকাশের ভঙ্গী ক'রে উত্তর দিল ভৈরবী, 'তার খবর আমি কি করে রাখব বলুন! আপনাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবার কথা—তার দেখানো পথেই চলেছি—এই তো জানি। সে কোথায় যাচ্ছে কাদের সঙ্গে, এত বড় দলের মধ্যে তার খবর কি আমার রাখার কথা? আমি তো আপনাদের নজরবন্দী হয়ে আছি, আপনার কাছে কাছে।'

যুক্তি অকাট্য। তাতেই যেন আরও খুন চেপে যায় মাথায়। কর্কশতর কণ্ঠে

বলে, 'চোপরাও হারামজাদী ! তোরা সব শয়তান, এসব যড় করা কাজ। বল্ সে বেইমান কোথায়, নইলে তার শোধ তোর ওপর দিয়ে তুলব !'

কাঁধ ও হাতের একটা বিচিত্র ভঙ্গী মাত্র ক'রে চুপ ক'রে থাকে ভৈরবী। বোধ করি এই ধরনের প্রশ্ন ও বক্তব্য উত্তর দেওয়ার অযোগ্য মনে করে সে।

তার এই তাচ্ছিল্যেই কি জ্ঞান হারান বখ্‌তিয়ার ? অথবা চারপাশে অনেকগুলা কাঠের আগুনের শিখা ঐ অপরূপ নারীদেহকে ঘিরে যে বিচিত্র আলো-আঁধারের মায়াজাল সৃষ্টি কবেছে তাতেই উন্মত্ত হয়ে ওঠেন ? ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে যায়, যুক্তি-বুদ্ধির পৃথিবী চোখের সামনে একাকার হয়ে যায়।

বখ্‌তিয়ার সহসা ঝুঁকে পড়ে ভৈরবীর একটা হাত ধরে সবলে আকর্ষণ করেন নিজের দিকে। প্রস্তুত ছিল না বলেই—আকাঙ্ক্ষা বা অনুমান একটা থাকলেও এত শীঘ্র, প্রথম চোটেই সেটা ফলে যাবে তা ভাবে নি। আকর্ষণটাও সম্পূর্ণ অতর্কিত ; নিজেকে সামলাতে পারল না ভৈরবী, একেবারে বখ্‌তিয়াবের বুকের ওপর এসে পড়ল।

কিন্তু সে ঐ একটি অসতর্ক মুহূর্তই। তারপরই একটা সভয় অস্ফুট শব্দ ক'রে বখ্‌তিয়ার ঠেলে সরিয়ে দিলেন ভৈরবীকে।

কারণটাও প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই চোখে পড়ল সকলের। ভৈরবীর গলায় একটি সরু লিকলিকে সাপ, মালার মতো গলায় বেষ্টন ক'রে ছোট একটি ফণা তুলে সামনে ঝুলছে—

ভৈরবীই ব্যাখ্যা করল।

বলল, 'ওটা আমার চুলের মধ্যেই থাকে , এমনি খুব শান্ত—কিন্তু কেউ জোর করে আমার গায়ে হাত দিতে গেলেই কী যে হয় ওর—! সাবধানে থাকি সেই জন্যেই, আরও বড্ড বিষ ওর। বেত-আছড়ার মতো দেখতে কিন্তু বেত-আছড়া ও নয়, কালনাগিনী। সাক্ষাৎ মৃত্যু !'

আরও বলল, একটু মুচকি হেসে, 'কালাচাঁদ বলে তোমরা যাকে জানতে—সে আসলে কিন্তু কামরূপের রাজা। বিস্তর ভেল্‌কি জানে, বুদ্ধিও খুব। অবিশ্যি বেইমানী সে করেনি পথ দেখাবার জন্যে টাকা নিয়েছে, পথ ঠিকই দেখিয়েছে—তখন তো আর এমন শর্ত করে নি যে লুটপাট করবে না কিছু বা কোনদিন।···সে-ই আমাকে এই সাপটা দিয়েছে, দরকার হতে পারে বলে। এ নাকি ওদের অহোম দেশের জঙ্গলে ছাড়া কোথাও হয় না—সাংঘাতিক বিষ এদের, ছুঁলেই মৃত্যু !'

দুই চোখ রক্তবর্ণ হয়ে উঠেছে তখন। সমস্ত দেহ আবেগে ও উত্তেজনায়,

কামনায়, আর অবাঞ্ছিত বাধার বিরক্তিতে কাঁপছে থরথর করে। বখ্‌তিয়ারের কদর্য মুখখানা বীভৎস হয়ে উঠেছে। তাঁর তলোয়ার ছোট, কিন্তু পাশে ছিল গিয়াসউদ্দীন, ওর বিশ্বস্ত দেহরক্ষী। সে লম্বা মানুষ, তলোয়ারও সেই পরিমাণে বড়—তার খাপ থেকে সবেগে সেখানা টেনে নিয়ে আবার সামনের দিকে এগিয়ে গেলেন। সাপের মতোই আক্রোশে ও উষ্মায় হিসহিস করে উঠলেন। বললেন, 'ছুঁলেই মৃত্যু। কিন্তু ছোঁয়ার দরকার হবে না। আমার সঙ্গে দিল্লাগির মজা কত তা বুঝিয়ে দেব আমি না ছুঁয়েই। আমিও সাপের চেয়ে কম নই!'

বকা এবং তলোয়ার টেনে নিয়ে এগিয়ে যাওয়া একসঙ্গেই চলছিল— কিন্তু ততক্ষণে ভৈরবীও স্থির হয়ে নেই। কী ক'রে কী করল—ঠিক তলোয়ার যেমন তুলেছেন বখ্‌তিয়ার—তাঁর সামনে বিরাট একটা আগুন জ্বলে উঠল অগ্নিশিখার এক প্রশস্ত ও সু-উচ্চ প্রাচীর রচনা করে—তার ঝাঁজ বা আঁচে সকলেই যেন ঝলসে গেল কিছুটা। যে যেমনভাবে পারল নিমেষের মধ্যে ঠেলাঠেলি ক'রে পিছিয়ে গেল খানিক—কিন্তু দেখা গেল অত ব্যস্ত হবার কোন দরকার ছিল না। আজকের এ আগুনও সে রাত্রের সেই ধুনোর আগুনের মতোই, যেমন দপ ক'রে জ্বলে উঠেছিল লেলিহান শিখা মেলে, তেমনিই দপ্‌ ক'রে নিভে গেল আবার।

কিন্তু তখনও, অগ্নির দীপ্তি ও তেজ সম্পূর্ণ মিলিয়ে গেলেও ভৈরবীকে আর দেখা গেল না। সারা রাত ধরে মশাল নিয়ে ছুটোছুটি ক'রে খুজেও না। যেন সে অশরীরী কেউ এসেছিল বাতাস থেকে দেহধারণ ক'রে, আবার বাতাসেই মিলিয়ে গেছে। কর্পূরের মতো উবে গেছে যেন।

দুর্ভাগ্যের সেই শুরু, শেষ নয়।

এখনও বোধহয় শেষ হয় নি।

সৌভাগ্য আর কোনদিন দেখতে পাবেন কিনা সন্দেহ।

আ-হা-হা শব্দ ক'রে এক দীর্ঘশ্বাস ফেলেন বখ্‌তিয়ার।

আজকাল এইটে হয়েছে তাঁর। দুঃখের কথা, বিরূপ ভাগ্যের কথা ভাবতে গেলে আর নীরব থাকতে পারেন না। নিঃশ্বাসটা একটা প্রবল শব্দ ক'রে সামলাতে হয়।

আগাগোড়াই ভুল খবর পেয়েছেন তিনি।

শুনেছিলেন, দুর্গম দুরারোহ হিমালয়ের পথঘাট বারোমাসই বরফে ঢাকা থাকে, সেখানে কোন ফসল হয় না, ফসল হয় না বলেই জনপদ নেই। নিরাপদে বিনা বাধায় চলে যেতে পারবে, বন্য গারু ছাগল হরিণ আছে, মেরে খেতে পারবে। খাবারের অভাব হবে না। সেখানে পৌঁছেও কোন ভাবনা নেই, তারা কখনও লড়াই করে না

নি, কিছুই জানে না, ফৌজ আর হাতিয়ার দেখলেই ভয়ে আত্মসমর্পণ করবে।

এগিয়ে গিয়ে দেখলেন সবটাই ভুল, আগাগোড়া মিথ্যা।

জনপদ যথেষ্ট, বরফ যেখানে বারোমাস জমে থাকে না, সেখানে বরফ গললে ফসল হয়! এই সব জায়গায় যারা থাকে তারা পরিশ্রমী এবং মুখে কোন ভাব পরিবর্তন না হ'লেও অত্যন্ত চতুর।

এই বিজাতীয় বিধর্মীর আগমন, তাও ভদ্রভাবে বন্ধুভাবে নয়—উদ্ধত বিদ্বিষ্ট শত্রু-রূপে—তারা কেউই প্রীতির চোখে দেখেনি। ভাষা না বুঝলেও আসন্ন সম্ভাব্য অনিষ্টের কথাটা তারা বেশ বুঝতে পেরেছিল—এদের ভাবে ভঙ্গীতে আচরণে।

তারা সেই ভাবেই প্রস্তুত হ'ল। যখন সেখানে পৌছল বখ্‌তিয়ারের বাহিনী, তখন সেখানেই শুধু যে বাধা পেল তা নয়—এদের অগ্রসর হওয়ার বার্তা বহুদূর আগে চলে যেতে লাগল, যাতে তারাও তৈরী থাকতে পারে।

ক্ষেতে মাঠের শস্য নষ্ট ক'রে দিল তারা। জন্তু জানোয়ার যা পারল এদের অগম্য পার্বত্য অঞ্চলে নিয়ে গেল, যা সরাতে পারল না, বিষ দিয়ে মেরে, মানুষের অখাদ্য ক'রে দিল। সঙ্গের রসদ আগেই লুঠ হয়ে গেছে। ভরসা ছিল পথে অন্ততঃ জীবন-ধারণের মতো কিছু পাওয়া যাবে, ধানচাল দুধ বা মাংস—দাম দিয়ে কিনতেও প্রস্তুত ছিলেন বখ্‌তিয়ার। কিন্তু যতদূর যান সে সব আহার্যের কোন চিহ্নমাত্র দেখতে পাওয়া যায় না। ধানের ক্ষেতে আগুন দেওয়া হয়েছে, মাটি পুড়ে কালো হয়ে গেছে, কোথাও বা তখনও ধোঁয়াচ্ছে কাঁচা খড—তাতেই বুঝতে অসুবিধা হ'ল না কিছু।

শুধু খাদ্য খাবার নষ্ট ক'রেই ক্ষান্ত হ'ল না।

দেখা গেল লড়াই করতেও জানে এই পাহাড়ী লোকগুলো।

পাহাড়ে জায়গায় সামনাসামনি লড়াই করা চলে না। সে চেষ্টাও তারা করল না। করলে হয়ত বখ্‌তিয়ারের বিপুল বাহিনীর সঙ্গে পেরে উঠত না। তারা ঐ কামরূপের রাজার মতোই আচম্বিতে এসে পড়ে কিছু লোককে ঘায়েল ক'রে দেখতে দেখতে সরে পড়ে। এঁরা কোন প্রতিকার করতে কি বাধা দিতে পারেন না। তারা যে বিপজ্জনক পথে যাওয়া আসা করে এঁদের পক্ষে সেখানে তাদের পিছু নেওয়ার সাধ্য নেই।

দেখা গেল অস্ত্রশস্ত্রও তাদের বিস্তর আছে। বর্শা, বল্লম, চামড়ার ঢাল, তলোয়ার—সবচেয়ে যেটা সাংঘাতিক, সে ওদের ছোট ছোট হালকা তীর, তীব্র বিষ মাখানো, গায়ে ভাল ক'রে বেঁধবারও দরকার হয় না—রক্তের সঙ্গে মেশা মাত্র মুহূর্তে মানুষ মরে যায়। বুদ্ধি-কৌশল যাকে বলে তাও কারও চেয়ে কম নয়। যেখানে বরফ কম

—গাছপালার শ্যামলিমা আছে—সেখানে সর্বাঙ্গে গাছের ডাল পাতা জড়িয়ে নেমে আসে, কাছে না আসা পর্যন্ত বোঝা যায় না ওরা মানুষ। যেখানে বরফ সেখানে বড় বড় রকমের গোলা করে আড়াল থেকে গড়িয়ে দেয়, অন্যত্র বড় বড় পাথর—তার চাপে কত লোক মরে তার ইয়ত্তা নেই।

লোক অনেকদিন ধরেই মরছিল। খাদ্যাভাবে যা তা খেয়ে মারা গেল কিছু, কিছু অনাহারে, কিছু শত্রুর হাতে; সবচেয়ে বেশী গেল রক্ত-আমাশয়ে আর ঠাণ্ডায়। প্রথমটা তুষারে অসাড় হয়ে যায়—হাত পা বা নাক—তারপর সেই সব জায়গায় পচ ধরে। এতদিন যে লড়াই ক'রে এসেছেন, যে লড়াই জানেন—সে লড়াইয়ের অভিজ্ঞতা কোন কাজেই এল না এখানে, আদৌ কোন লড়াই-ই হ'ল না। এখানে প্রধান বিরোধী পক্ষ হ'ল প্রকৃতি। যেটুকু লড়াই হ'ল সেও একতরফা। ওরা আসে, এ দলের লোক কিছু ঘায়েল ক'রে চলে যায়। কোথা দিয়ে কখন আসবে ওরা—এরা ঠিকই পায় না তার। অধিকাংশ সময়েই চোখে দেখতে পায় না তাদের। দেখলেও প্রত্যাঘাত করার সময় পায় না। বেছে বেছে অসতর্ক মুহূর্তগুলিতে অপ্রত্যাশিত দিক থেকে আক্রমণ করে ওরা। কখনও পর পর একই ভাবে আসে না, আক্রমণের ধারা-পদ্ধতি সেই সঙ্গে মারণাস্ত্রও অবিরাম পাল্টায়।

এবার বখ্‌তিয়ারও ভয় পেলেন।

সামনেই প্রত্যক্ষ সর্বনাশ, তার চেহারাটা কর্মজীবনে-বহু-পোড়খাওয়া বখ্‌তিয়ার স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছেন—তবু যতদিন পেরেছেন জোর ক'রেই চোখ বুজে থেকেছেন—কিন্তু আর সম্ভব নয়। অর্ধেক লোক গেছে, নিজের দলের লোকেরই গলিত শবদেহের পূতিগন্ধ অবশিষ্ট জীবিত সঙ্গীদের দিন-রাতের দুঃস্বপ্নে পরিণত—বাকী অর্ধেক স্পষ্টই বিদ্রোহী হয়ে উঠছে। উনি যদি এখনও ফিরতে রাজী না হন তাহলে ওঁকে বাদ দিয়েই তারা ফিরবে—অর্থাৎ ওঁকে হত্যা ক'রে রেখে। সে কঠিন সংকল্প ওদের দৃষ্টিতে স্পষ্টই পড়তে পারছেন উনি।

অতএব, ফেরার আদেশই দিলেন। এর পরিণাম কি তাও তাঁর অজানা নয়।

এই পথেই ফিরতে হবে, এই খাদ্যাভাব, এই অবিরাম শত্রুতা, সবই থাকবে। যে সময়ে অর্ধেক লোক মরেছে, তার চেয়ে অনেক কম সময়ে বাকী অর্ধেক মরবে, এ তিনি স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছেন। শুধু শুধু অগৌরব বরণ করা, ব্যর্থ বিফল হয়ে ফিরে যাওয়ার লজ্জা! কিন্তু উপায় কি?

মানুষ যখন সহ্যাতীত দৈহিক কষ্টে ও মৃত্যুভয়ে দিশাহারা হয়ে পড়ে তখন তাকে যুক্তিতর্ক দিয়ে কিছু বোঝাতে যাওয়া—মূর্খতা মাত্র। তার চেয়ে মরা-মানুষকে

বাঁচাবার চেষ্টা করা অনেক সোজা।

বখ্‌তিয়ার যা অনুমান করেছিলেন তা মর্মান্তিক ভাবেই অভ্রান্ত প্রমাণিত হ'ল। [illegible]ারের মৃত্যুর হার অনেক বেশী। মানে সময়ানুপাতে। যাবার সময় তবু সঙ্গের খচ্চর ও টাট্টু ঘোড়াগুলো মেরে খাওয়া চলছিল মধ্যে মধ্যে। পর পর মারতে দেন নি বখ্‌তিয়ার। কারণ সেও অগণিত কিছু নয়। দু'তিনদিন উপবাসের পর ক্ষুধার জ্বালা অসহ্য হয়ে উঠলে গোটা কতক ক'রে কেটেছেন, এক একটি ছোট মাংসখণ্ড --তাও কাঁচা খেতে হয়েছে শেষের দিকে, বরফে বা ঝরনায় ধুয়ে, কারণ জ্বালানি কাঠের অভাব—এক একজন করে পেয়েছে। তাতে ক্ষুধা নিবারিত হয় না, জীবনটা টিকে থাকে কোনমতে।

এখনও তাও আর নেই। জল বা বরফ ছাড়া কিছুই নেই কোথাও। মাঝে মাঝে, বিশেষ শেষের দিকে যখন গাছপালা পেয়েছে, তার পাতা খেয়ে বাঁচবার চেষ্টা করেছে কেউ কেউ, তাতে হিতে বিপরীতই হয়েছে। আমাশয় আরও উগ্র চেহারা নিয়েছে। এ ছাড়া জ্বর, বুকে সর্দি বসা—এ তো অসংখ্য। ফলে যে পথ দিয়ে এসেছেন মৃতদেহ ছড়িয়ে মাড়িয়ে—শবদেহের চিহ্ন রেখে। সে সব দেহ কেউ কোন দিন সমাধি দেবে না, কেউ ভগবানের নাম ক'রে প্রার্থনা জানাবে না তাদের জন্যে। আত্মীয়রা জানতেও পারবে না—কী পরিণাম হ'ল এদের, কে কোথায় মরে পড়ে রইল।

অবশেষে, সাড়ে বারো হাজার লোকের মধ্যে এই বোধহয় একশোটি মাত্র লোক বাঘমতীর তীরে পৌঁচেছেন তাঁরা।

॥ ৯ ॥

এত কটা দিন মন্ত্রের মতো ঐ একটা আশ্বাসই জপ করেছেন মনে মনে, বাঘমতীর তীরে পৌঁছতে পারলেই মুক্তি, জীবন।—সেই সঙ্গে ভবিষ্যৎ। এতদিন ভবিষ্যতের চিন্তা করেন নি অনর্থক জেনে, সেটা তুলে রেখেছিলেন। এই বাঘমতীর কাছাকাছি এসে ভাবতে আরম্ভ করেছেন। এখান থেকে যে সব জায়গা দিয়ে যেতে হবে, সে সব জায়গা তাঁর অধীন, পদানত। এখানের পর ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে বিশ্বস্ত সিপাহ্‌-শলার সুবেদার রেখে এসেছেন, তারা বিরূপ হবে না, তারা জানে তাঁর নেতৃত্বেই তাদের নিরাপত্তা। সাধারণ সৈনিকরা পর্যন্ত জানে—তাঁর অধীনে যুদ্ধ করা মানেই জয়লাভ। লুঠ, ঐশ্বর্যের সিংহদ্বার খুলে যাওয়া।

অর্থাৎ বাঘমতীর তীরের এই সর্বনাশের কথা তিনি কল্পনাও করেন নি।

এইটেই বোধ করি এতদিনের এত বিপর্যয়ের মধ্যে চরমতম আঘাত, তুরুক্-দিরের কাছে সবাপেক্ষা পরাভব!

অত দুঃখে তৈরী করা পুলের চিহ্ন মাত্রও নেই কোথাও। তাঁর অংগুলি ঘোড়া ও তার সেবকরাও উধাও।

খবর পেলেন বৈকি। আশপাশের লোকালয় থেকেই সংবাদ পাওয়া গেল।

কামরূপের রাজা পুল ভেঙে দিয়ে, রক্ষক ও সৈন্যদের মেরে ঘোড়া লুট ক'রে নিয়ে গেছেন।

কামরূপের রাজা, সেই শীর্ণ খবাকৃতি মানুষটি, যাঁকে ভীরু বলে ভেবেছিলেন আগে।

এতদিনের এত লোকের মৃত্যুর, এত অগ্নিদাহ এত লুণ্ঠনের শোধ কি তবে আল্লা এই লোকটিকে দিয়েই তুললেন?

হতাশ ক্লান্ত বখ্‌তিয়ার পাথরটার ওপর বসে পড়েছিলেন, সেই ভাবেই, আগাগোড়া এই ভাগ্যের হাতে মার খাওয়ার কথাটা ভেবে, আবারও তেমনি আ-হা-হা শব্দ ক'রে নিঃশ্বাস ফেললেন।

আর বোধ হয় পারলেন না। আর পারছেন না। বহুদিনের দুঃখকষ্ট উপবাসে অভ্যস্ত তাঁর দেহও এবার বিদ্রোহ করছে। বিশেষ এই শেষের দিকে আর একটি যে উৎপাত তাঁদের পিছনে লেগে ছিল—মানুষ ছাড়া আরও একটি জীব, সমান হিংস্র ভয়ঙ্কর—হয়ত আরও বেশী—ভালু—এরা বলে ভাল্লুক। নিঃশব্দে আসে, ধরে নখে ক'রে চিরে ফেলে। অকারণ হিংস্রতা এদের মাংস খায় না, কিন্তু মানুষ মারে। এদের হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়া- মানুষের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার চেয়েও কঠিন। ঘোড়া থাকলে পালানো যায়। মানুষ যত জোরেই ছুটুক, এরা ঐ ভারী দেহ নিয়ে ঠিক এসে ধরে ফেলে। এঁরা শেষের দিকে উপবাস-দুবল শীর্ণ দেহে বইতে না পেরে অস্ত্রশস্ত্র সব ফেলে দিয়েছিলেন, একটি ক'রে ছোট ছোট তলোয়ার ছাড়া। সে তলোয়ার দিয়ে ভালুর সঙ্গে লড়াই করা চলে না।

আসলে ভাগ্য। ভাগ্যের কাছেই মার খাওয়া এগুলো। এই একেবারে প্রত্যাবর্তনের শেষ পর্যায়ে যখন তিব্বতের লোক পিছু নেওয়া ছেড়েছে--নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচার কথা, তখনই ভালু আর ক্ষ্যাপা হাতির পাল্লায় পড়েই অন্ততঃ দুশো লোক মরেছে।

ভাবতে ভাবতে দু চোখ দিয়ে কখন যে জলের ধারা নেমেছে, পরাজয়ের,

হতাশার অশ্রু—তা বুঝতেও পারেন নি। পারলেও লজ্জিত হতেন না, লজ্জা অপমানের বোধ আর অবশিষ্ট নেই, সব যেন অসাড় অনড় হয়ে গেছে ভেতরটার —দেহ মন দুই-ই। একেই কি মৃত্যু বলে? এই যে হিম হতাশা দেহ বুদ্ধি চিন্তাশক্তি আচ্ছন্ন ক'রে বুকের দিকে এগিয়ে আসছে—এই কি মৃত্যু।

চমকে সোজা হয়ে উঠে বসলেন।

সঙ্গের লোক যারা—তারাও অবসন্ন ভাবে শুয়ে পড়ে চোখ বুজেছে। তাদেরও সমান অবস্থা, বরং আরও বেশী খারাপ—তারাও বর্তমান ভবিষ্যৎ কিছু ভাবতে পারছে না, ভাবতে পারবেও না আর, মরা বাঁচা এক হয়ে গেছে তাদের কাছে। এখন বিনা আয়াসে বাঁচতে পারে, অর্থাৎ এমনিই বেঁচে যায় তো ভাল আর কোন চেষ্টা করতে পারবে না তারা বাঁচবার জন্যে।

দেখে দেখলেন তাদের দিকে।

অবশিষ্ট বিশ্বস্ত অনুচর, দুর্দিনের বন্ধু। মরতে হয় এদের সঙ্গেই মরবেন। কিন্তু এইভাবে অনড় হয়ে পড়ে সর্বনাশ—সব সমাপ্তির প্রতীক্ষা করা? না না। ছিঃ। তা কেন করবেন তারা—এতকাল যুদ্ধ ক'রে এসে। তার চেয়ে এগিয়ে মৃত্যুকে বরণ করাই ভাল।

নদী তেমনি খরস্রোতা, ক্ষুরধারা। ঐ যে মধ্যে মধ্যে প্রবল ঘূর্ণাবর্ত দেখা যাচ্ছে, ওখানে নিশ্চয় বড় বড় পাথর আছে জলের ভিতরে, তাতেই ধাক্কা খেয়ে জল অমনি ভীমবেগে ঘুরপাক খাচ্ছে। ঐ ধরনের চোরা পাথর অজস্র। সাঁতার দিতে গেলে পাথরগুলোতে আছাড় খেয়েই মৃত্যু হবে, জলে ডুবে মরার জন্য অপেক্ষা করতে হবে না।

সেই তো ভাল। মনে মনে নিজেকে বোঝালেন বখতিয়ার। তারপর মন স্থির ক'রে উঠে দাঁড়ালেন। যে সঙ্গীরা অবসন্ন মূর্ছিতের মতো পড়ে ছিল, তাদের ডেকে বললেন উঠতে। এতদিন বীরের মতো এত কষ্ট সহ্য ক'রে তারা কি এইভাবে পড়ে পড়ে মরবে? এই হীন কাপুরুষ ভিখারীর মৃত্যু? তার চেয়ে ভাগ্যের সঙ্গে একবার শেষ লড়াই দিয়েই দেখুক না। আগু বেড়ে গিয়ে মৃত্যুকে বরণ করার মধ্যেও বীরত্ব আছে। সবাই মিলে নদীতে ঝাঁপ দিয়ে পড়া যাবে। সোজা সাঁতার দিয়ে না যেতে পারি, কোথাও না কোথাও হয়ত ওপারে গিয়ে পড়ব। নদীতে স্রোত যতটা—উঁচু থেকে নিচে যাচ্ছে বলেই এত স্রোত—জল তত নেই, চোবানি খেয়ে হয়ত নাও মরতে হতে পারে।

বুঝল তারা। এইগুলি বখতিয়ারের দলে বাছাই করা লোক। নইলে এই

দীর্ঘ দিনের অনাহার আর অবাঞ্ছনীয় পথকষ্ট সহ্য ক'রে এতদিন পথ চলতে পারত না। অপরিসীম মনের জোর না হ'লে এতটা পারে না কেউ। তা ছাড়া তারা বীর বলেই বীরের মর্যাদা বোঝে, বখ্‌তিযারের প্রতি অনুরক্ত।

তারা ক্লান্ত ক্ষতবিক্ষত (মশা, জোঁক ও কাঁটা গাছ, পাথরে আছাড় খাওয়ার চিহ্ন এগুলো) দেহ যেন কুড়িয়ে নিয়ে উঠে দাঁড়ায়। ম্লান জীবনজ্যোতিহীন মুখে এগিয়ে যায় নদীর দিকে। পুতুলের মতোই যায় তারা, ইচ্ছা বলতে কিছু নেই আর, বিচার-বিবেচনার সামর্থ্য নেই।

কিন্তু নদীর তীরে গিয়ে দাড়াতেই অতি নাটকীয়ভাবে পিছন থেকে নারীকণ্ঠ শোনা গেল, 'দাঁড়াও।'

পরিচিত কণ্ঠ। বিশেষ পরিচিত।

চমকে ফিরে চাইলেন বখ্‌তিযার।

ভৈরবী। আবার সেই ভৈরবী।

জ্বলে উঠলেন নিমেষে, অভ্যস্ত হাত কোমরবন্ধের দিকে এগিয়ে গেল। তারপরই সচেতন হয়ে উঠলেন। মনে পড়ল সে রাত্রের সেই ঘটনা। দশ হাজার লোক যাকে ধরতে বা আটকাতে পারে নি, এই কটা উপবাসী অসুস্থ লোক তাকে কী কায়দা করবে? তাছাড়া, এই একটু আগেই, ভার কমাবার জন্যে যে যার তলোয়ার ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে—কোমরবন্ধ, খাপসুদ্ধ।

হাসল ভৈরবী।

'এখনও দাপটটুকু আছে ষোল আনা! হায় হায়! আগের মেজাজ আর চাল! তা সত্যিই, আর কিছুই নেই যেকালে, ওটুকু না থাকলে বাঁচবে কি ক'রে!'

তারপর বলল, 'কিন্তু সে কথা বলতে আসি নি। মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা দেওয়া আমার স্বভাব নয়। · শোন, একবার আলেয়া মনে ক'রে ছুটে গিয়েছিলে, আমাকে ভেবেছিলে পেত্নী। জীবন্ত পেত্নীকে ধরবে।·· আরও একবার আলেয়ার দিকে ঠেলে দিচ্ছি। জীবনের আলেয়া। এখনই যদি মরো, নিয়তির কাছে চরম আঘাতটা খাওয়া হয় না যে, পাপের শাস্তি ভোগ হয় না। বাঁচো, বাঁচো, বাঁচার ব্যবস্থা করতেই এসেছি। বাঁচো—এ জন্মের পাওনাটা আদায় ক'রে নিয়ে যাও। এই নাও, এই নাও।'

ভৈরবী দাঁড়িয়েছিল—ঠিক পাহাড় নয়, একটা উঁচু পাথরের ওপর। সেইখানে কতকগুলো কি জড়ো করা ছিল, সেখানে থেকেই ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলতে লাগল।

মশক।

ছাগল বা ভেড়া কি বাছুরের চামড়া সেলাই করা। এতে ক'রে জল বয়ে নিয়ে যায় এরাই—বখ্‌তিয়াররা। এ যাত্রাতেও ওদের সঙ্গে ছিল, তারপর কোথায় কি হয়ে যায়, অত খেয়ালও ছিল না।

এ মেয়েছেলেটা পেল কী ক'রে? এখানেই বা আনল কে?

এর সম্বন্ধে বিস্ময়ের কি শেষ হবে না?

এর কি শক্তিরও সীমা নেই?

সত্যিই কি এরা মায়াবিনী? কুহক বা ইন্দ্রজাল জানে?

অনেক প্রশ্নই আজ সক্রিয় চৈতন্যে ওঠে, বিহ্বল চিন্তাশক্তি কোন উত্তর খুঁজে পায় না।

ভৈরবীও মিলিয়ে গেছে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই।

যাকগে। যেখানে খুশি যাক।

এই মশকগুলো সকলের মনে আবার আশার সঞ্চার করেছে, ভবিষ্যতের কল্পিত ছবি আঁকতে শুরু করেছে সেখানে।

এটাকে ওরা ভাগ্যের বিরূপতা কেটে যাবার লক্ষণ বলেই ধরে নেয়।

বোধহয় চরম কষ্ট দেখেই ভাগ্য সদয় হয়েছেন, ক্ষমা করেছেন তাদের।

খোদা হাফেজ! সবাই গেছে প্রায়, তা যাক। তবুও জীবনের মায়া প্রবল। আমি একা বেঁচে থাকব—মৃত্যুর চেয়ে সেও ভাল।

ওরা মশকগুলো জুড়ে ভেলা তৈরি করা যায় কিনা সেই তর্কে মেতে উঠল। না কি, এক একটা ভেলা আশ্রয় করে চার-পাঁচজন লোক জলে নামবে? কোনটা বেশী নিরাপদ?

॥ ১০ ॥

অনেক চিন্তা ক'রে অনেক বিবেচনার পর আলীমর্দান খলজির কাছেই এসে উঠলেন বখ্‌তিয়ার। যত প্রাদেশিক শাসনকর্তা রেখে গেছেন তিনি—তাদের মধ্যে আলীমর্দানই সত্যকার বিশ্বাসভাজন, এতটা মনে করার মতো নির্বোধ তিনি নন, তবু বাকী যারা আছে তাদের চেয়ে অনেক বেশী। এখানে কিছু দিন নিশ্চিন্ত হয়ে বিশ্রাম করতে পারবেন অন্ততঃ, তারপর—আলীমর্দানেরই লোকবল, বুদ্ধি ও অর্থবল সবচেয়ে বেশী—ওর সাহায্যে আবার পূর্বশক্তি ও শাসনক্ষমতা ফিরে পেতে পারবেন। তার জন্যে না হয় তাকে কিছু বেশীই সুবিধা দেবেন—না হয় আধাআধি

বখরা দেবেন।

আলিমর্দান যথোচিত বিনয় সহকারে, সসম্মানেই অভ্যর্থনা করলেন, সমস্ত কাহিনী শুনে যথেষ্ট আক্ষেপ করলেন, ওঁর স্বাস্থ্যের জন্য বিস্তর উদ্বেগ প্রকাশ করলেন। আদরযত্ন সেবারও ত্রুটি হ'ল না। [illegible] পাটনা [illegible] একজন হিন্দু হাকিমকেও আনালেন অতি দ্রুত ঘোড়ার ডাক বসিয়ে। কিন্তু এত সত্ত্বেও দু চার দিন বাদে বখতিয়ারের কেমন যেন মনে হ'ল—তিনি এখানে [illegible] বন্দী [illegible]ন।

অতি সূক্ষ্ম অনুভূতি [illegible], প্রশ্ন করলে উনি স্পষ্ট কোন কারণ দেখাতে পারবেন না। তবু আর কি দিন বাদে এই ধারণাটা তাঁর প্রবল হয়ে উঠল।

অস্বস্তি ও আশঙ্কার সীমা রইল না। এখানে তিনি একেবারেই একা। একা ও অসহায়। সম্পূর্ণ আলীমর্দানের বিশ্বস্ততা ও কৃতজ্ঞতার প্রত্যাপেক্ষী। যদি একশো জন দেহরক্ষী নিয়েও কোথাও রওনা হতে হয় তো আলীমর্দানের কাছে প্রার্থনা জানাতে হবে।

আরও কিছু দিন পরে—অস্বস্তিটা অসহ্য হওয়াতে সেই প্রার্থনাই জানালেন, 'এবার আমি বিহারে ফিরে যাই, তুমি কয়েকজন অশ্বারোহী দাও। আমি ওখানে গেলেই ফৌজ আর টাকা—দুই-ই [illegible]তে পারব।'

একেবারে হাঁ হাঁ ক'রে উঠলেন আলীমর্দান। –আপনার এই স্বাস্থ্যে? শরীরের এই অবস্থায়? পাগল নাকি? আপনার মাথা খারাপ হতে পারে, আমার তো হয় নি।···না না না, আরও অন্ততঃ মাস দুই আরাম করুন—তারপর ভাবা যাবে কথাটা।'

বখতিয়ার এবার একটু দৃঢ়কণ্ঠেই বললেন, 'না। আমার আত্মীয়স্বজন, বিশেষ বেগমদের জন্যে মন খুব উতলা হয়ে উঠেছে। মন এত খারাপ হয়ে থাকলে শরীর সারবে না। অত কষ্ট অত অনাহার সহ্য ক'রে হেঁটে এলুম দীর্ঘ পথ—এখন এই এত দাওয়াই, এত খাওয়া-দাওয়া বিশ্রামের পর এইটুকু পথ ঘোড়ায় চেপে যেতে পারব না? খুব পারব। তুমি একটা ব্যবস্থা ক'রে দাও। না দাও তো আমি একাই যাবো।'

'তা—তাহলে বরং লোক পাঠিয়ে বেগমদেরই এখানে আনিয়ে নিই না?'

'না, সে হবে না। বেগমদের পক্ষে সেটা অমর্যাদার কথা। আর ওখানটা খালি ক'রে চলে এলে সবাই ভাববে আমি মরেই গেছি। তা হলে আমার প্রধান ঘাঁটিই নষ্ট হয়ে যাবে। না, আমিই যাবো।'

কেমন যেন বিরূপ কণ্ঠে বললেন আলিমর্দান খাঁ, 'দেখি, একটু ভেবে।'

ভাগ্যের সঙ্গে নিজেকে অনেকটা মানিয়ে আনলেও এতটা সহ্য করা কঠিন।

অকস্মাৎ বখ্‌তিয়ার যেন এক বছর আগের মানুষ হয়ে উঠলেন, 'ভেবে দেখি! তার মানে? তোমার এত স্পর্ধা কবে থেকে হল আলিমর্দান! আমি তোমার মর্জি-মেজাজের ওপর নির্ভর করব! হুকুম দেবার মালিক আমি, তুমি নয়।'

মুখোশটা আলিমর্দানের মুখ থেকে খসে পড়ল এবার। কঠিন বিদ্রূপের স্বরে ব-লেন, 'আপাততঃ আমিই মালিক মনে হচ্ছে।...আপনার আর কিছুই নেই জনাবালি, ঐ মেজাজটা ছাড়া। ওটাও বোধহয় ত্যাগ করা ভাল। এতে কোন ফায়দা ওঠায় না, লোকসানের কারণ হয়। আমি যদি ভাল বুঝি আপনাকে ছাড়ব, নইলে নয়।...এত লোকের মৃত্যুর কারণ হয়েছেন আপনি এখন বাইরে আপনাকে দেখলে সবাই ক্ষেপে উঠবে, এটাও ভেবে দেখবেন। আপনার নিরাপত্তার জন্যেই আপনাকে আটকে রাখা দরকার। প্রবীন লোক অবুঝ হ'লে তার সঙ্গে শিশুর মতোই ব্যবহার করা দরকার।'

যেন মনে হ'ল কড়া কথাগুলো মুখ থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই অনুতপ্ত হয়ে উঠেছেন, আলিমর্দান, এখনই এতটা মুখোশ খোলা উচিত হয় নি মনে হয়েছে। সেই জন্যেই শেষের কথাগুলোয় একটু আপসের ভাব প্রকাশ পেল, বখ্‌তিয়ারের কল্যাণই যে ওঁর উদ্দেশ্য সেটা বুঝিয়ে ক্ষতে চন্দনপ্রলেপ দেবার চেষ্টা করলেন।

আর দাঁড়ালেনও না তিনি, দ্রুত সেখান থেকে চলে গেলেন। বখ্‌তিয়ার যদি আগের অবস্থায় থাকতেন, তাহলে অন্ততঃ তখনই কিছু করার চেষ্টা করতেন না। আগে ক্ষেপে উঠতেন অন্য কারণে, রাজকার্যে কি রাজনীতিতে বুদ্ধিভ্রষ্ট হ'ত কদাচিৎ। কিন্তু এখন এই সর্বনাশা ভাগ্যবিপর্যয়ে তাঁরও মাথার ঠিক নেই। তিনি গাল বাড়িয়ে চড় খেতে গেলেন, তখনই ছুটে বেরোতে চেষ্টা করলেন। হাতে যে একটা হাতিয়ার পর্যন্ত নেই, তাও মনে পড়ল না। যে দু'ঘরের 'মহল'টি তার জন্যে নির্দিষ্ট হয়েছিল, ঘর আর তার সামনে দালান—সেই মহল অর্থাৎ দালানের দরজায় আসতেই বর্শা উদ্যত ক'রে দুই প্রহরী পথ আটকাল, 'হুকুম নেই।'

জীবনে এ পরিস্থিতি যে কখনও আসতে পারে তা ভাবেন নি বখ্‌তিয়ার।

হুকুম দেবার মালিক তিনিই, মানুষকে বধ করার, রক্ষা করার, বন্দী করার বা মুক্তি দেওয়ার তিনিই ভাগ্যবিধাতা—দীর্ঘ দিনে এমনিই একটা ধারণা হয়ে গিয়েছিল। তাঁর পক্ষে এটা অবিশ্বাস্য। যে দীর্ঘদিন সৌভাগ্যের কনককরোজ্জ্বল দীপ্তিতে উত্তপ্ত, তার পক্ষে একান্ত দুর্ভাগ্যের অবস্থা—বাস্তব ও প্রত্যক্ষ হলেও তাকে স্বীকার ক'রে নেওয়া, মানিয়ে নেওয়া কঠিন। বখ্‌তিয়ারেরও সময় লাগল। তিনি গালাগালি

করলেন, অভিসম্পাত দিলেন। ভয় দেখালেন, শেষে কেঁদে ফেললেন—কিন্তু কোন ফল হ'ল না। বরং পাহারাদার সিপাহীরা তাকে বিদ্রূপ করতে লাগল—কটূক্তির জবাবে কটূক্তি করল। অবশেষে শ্রান্ত হয়েই একসময়ে চুপ করতে বাধ্য হলেন।

দুপুরে যথারীতি খানা এল, যেমন অন্য দিন আসে। উৎকৃষ্ট খাদ্য—তিনি কিছুই মুখে দিলেন না। শরবৎ, মদও এল। তাও পড়ে রইল। কিন্তু তার জন্যে কেউ উদ্বিগ্ন কি ব্যস্ত হ'ল না, প্রশ্নও করল না, অন্য দিন যেমন বাসনগুলো নিয়ে যায় খানসামান এসে—সেদিনও তেমনি নিয়ে গেল। আবার সন্ধ্যায় নতুন খাবার এল। তবে এতক্ষণে বোধ হয় মাথা ঠাণ্ডা হয়েছে এবার। খাবারের সঙ্গে যে গোটা ফল এসেছিল কিছু কিছু, তাই খেলেন দু-একটা। যাতে বিষ মেশাবার সুযোগ কম সেই ধরনের ফল।

সারাদিন ভেবেছেন, সারারাত ভাবলেন। উত্তেজিত হয়ে কোন লাভ নেই, বিলাপ ক'রে বা শত্রুর করুণা ভিক্ষা ক'রে। মাথা ঠাণ্ডা করাই শ্রেয়ঃ। লড়াই জেতে মগজ - গায়ের জোর তাকে সাহায্য করে মাত্র। এখানে গায়ের জোর আদৌ নেই—মগজকেই সব কাজটা করতে হবে। ধীরে সুস্থে মাথা ঠাণ্ডা ক'রে কাজ করা দরকার। কৌশল ছাড়া আর কোন পথ, কোন আশা কোথাও নেই মুক্তি পাবার।

ভাবতে ভাবতে ভোরের দিকে একটা পরিকল্পনাও ক'রে ফেললেন কাজের। টাকা মোহর সোনা কিছুই ফিরিয়ে আনতে পারেন নি, এনেছেন আঙরাখার সঙ্গে সেলাই করা ক'খানা পাথর—হীরে আর চুনি। এখানে এসে সেটা আর পরেন নি, কিন্তু সকলের অজ্ঞাতে যত্ন ক'রে তুলে রেখেছেন। ভোরবেলা উঠে সেই ক'খানাই বার ক'রে নিলেন জামা কেটে, এখন যে জামা পরেন তার ভেতরের জেবে রাখলেন ক'টা। শুধু দু'তিনখানা দামী পাথর বার ক'রে হাতে রাখলেন। পৃথিবীর সর্বোত্তম অস্ত্র হ'ল অর্থ, আর লড়াই হ'ল তার প্রয়োগ-পদ্ধতির বীজমন্ত্র—এটুকু দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতায় জেনে নিয়েছেন।

সকালবেলা নাস্তা নিয়ে এল বাবুর্চি আগা মহম্মদ। ক'দিনই আসছে সে, চেনাশোনা হয়ে গেছে।

এদিক ওদিক চেয়ে ইশারা ক'রে তাকে ভেতরের ঘরে ডাকলেন। প্রথমটা সে ভয় পেয়েছিল খুব। উনি নিঃশব্দে দু'হাত তুলে দেখালেন ওঁর হাতে কোন হাতিয়ারই নেই।

তখন অনেকটা আশ্বস্ত হয়ে ভেতরে এল আগা মহম্মদ।

'আগা, তুমি বড়লোক হ'তে চাও? বিনা কোশিসে, বিনা ঝুঁকিতে? অনেক

বড় লোক ?'

কথাটা ঠিক বুঝতে পারল না আগা, ফ্যালফ্যাল ক'রে চেয়ে রইল।

তখন জেবের মধ্যে হাত পুরে বখ্‌তিয়ার বার করলেন একখানা পাথর, বড় আকারের। হীরে অতি ক্ষীণ দিনের আলোতেও ঝকমক ক'রে উঠল।

সময় কম, বৃথা কথা বাড়ালেন না বখ্‌তিয়ার। বললেন, 'আর কিছুই নেই, শুধু এইটে আছে। কিন্তু এর দাম হাজার মোহরের কম নয়। তুমি কোনমতে আমাকে এই বাড়ির বাইরে বার ক'রে আমাকে একটা নৌকোতে তুলে দাও, তোমাকে আমি এই হীরেখানা দেব। আর যদি বেঁচে থাকি, আবার আমার আগের অবস্থা ফিরে পাই তোমার কথা ভুলব না, তোমাকে জায়গীরদার ক'রে দেব।'

আগার কণ্ঠতালু শুকিয়ে উঠল—একই সঙ্গে লোভে আর আশঙ্কায়। সে কিছুক্ষণ বিহ্বলভাবে চেয়ে থেকে কোনমতে শুধু বলল, 'আমি আসছি একটু পরে।'

এল সে প্রথম প্রহর পার ক'রে, আলীমর্দান খাঁ নাস্তা সেরে বেরিয়ে যাওয়ার পর। সামান্য একটা ছুতো ক'রেই এল।

ইশারা ক'রে এবারও ভেতরের ঘরে নিয়ে গিয়ে বলল, 'অন্য কোনও পথে হবে না, আলীমর্দান সবাইকে খুব শাসিয়ে রেখেছে। একটিই মাত্র পথ আছে, বেগম মহলের মধ্যে দিয়ে। ওদিকের গোসলখানায় মেথর খাটবার যে রাস্তা, সেইখানেই শুধু কোন পাহারা নেই। এক সেই পথে আপনাকে পার করে দিতে পারি। ফরিলাল নাওওয়ালা আমার জানাশুনো, তাকেও আমি এক মোহর কবুল ক'রে রেখেছি। কিন্তু গভীর রাত্রে হবে না, তখন ডালকুত্তা ছেড়ে দেয় আলীমর্দান, সন্ধ্যাবেলাও অনেক লোক। আলীমর্দান ফিরে যখন ভেতরের ঘরে আরাম ক'রে নাচগান শোনে, অনেকেই তখন সেখানে জড়ো হয়। এদিকটা ফাঁকা থাকে পয়লা প্রহরের মাঝামাঝি—আপনি তৈরী হয়ে থাকবেন, আপনাকে নিয়ে যাবো। খালি পায়ে যেতে হবে কিন্তু। সময়ও খুব কম। আপনাকে ঘাটে পৌঁছে দিয়ে ফিরে আসতে হবে খানা দেবার ঠিক আগে।। বুঝেছেন ? পারবেন ?'

'আমার পাবার আর কি আছে! এক পোশাকে যাবো, সঙ্গে নেবার মতো একটা হাতিয়ারও নেই। যখন বলবে তখনই যাবো।'

ভাগ্যের শেষ খেলাটা যে তখনও বাকী ছিল তা ভাবেন নি বখ্‌তিয়ার।

আগা মহম্মদ যথাসময়েই এসেছিল। উনিও তৈরী ছিলেন। খালি পায়ে পা টিপে

টিপেই বেরিয়ে এসেছিলেন অন্দরমহলের দিকের দরজা বন্ধই থাকে, বিকেলে এসে ওদিকের শেকল খুলে হাঁসকলে তেল দিয়ে রেখে গেছে আগা মহম্মদ—নিঃশব্দে খুলে বেগম মহলে পড়ল। বাইরে যে সান্ত্রীরা পাহারায় আছে তারা জানতেও পারল না। কারণ অন্য দিনও এই সময়টা চুপচাপ ঘরে শুয়ে থাকেন বখ্‌তিয়ার, কথা বলবার লোক নেই, বই পড়তেও জানেন না।

দ্রুত পা টিপে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ দরদালানটা পার হবার সময় ভেতরের ঘরে—যেখানে আলীমর্দান বসে বাইজীর নাচ দেখছেন সেইদিকে নজর পড়ল। এ কৌতূহল স্বাভাবিক। মানুষ মাত্রেই হ'ত। ভেতরের ঘরে দশ-বারোটা উজ্জ্বল আলো জ্বলছে।—বাইরের অন্ধকারে কে যাচ্ছে তা দেখা সম্ভব নয় ভেতর থেকে। সুতরাং উঁকি মেরে দেখতে কোন বিপদের সম্ভাবনাও নেই।

কিন্তু যা দেখলেন—তারপর আর তাঁর এক পাও নড়া সম্ভব হ'ল না। সম্ভব নয়।

বাইরে অন্ধকার, ওখানে আলো। দেখার কোন অসুবিধা নেই। তবুও বখ্‌তিয়ার চোখ মুছে আরও একবার ভাল ক'রে দেখলেন। আগা হাত ধরে টানছে—কিন্তু আগা বেওয়াকুফ, ও কী জানে?

বিশাল একটা দিওয়ান বা পালঙ্কে গোল তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে বসে আছেন আলীমর্দান—একটি মেয়েছেলেকে জড়িয়ে। সে মেয়েটাও একটু হেসে ওঁর বুকে মাথা রেখে বসে আছে।

সে হোসেনা!!

না বয়স হয়েছে ঠিকই, কিন্তু এখনও সে আশ্চর্য রূপের অনেকখানিই অবশিষ্ট আছে- ভুল হবার কোন কারণ নেই।

নিমেষে পাগল হয়ে গেলেন বখ্‌তিয়ার।

অগ্রপশ্চাৎ, ভবিষ্যৎ, নিজের জান-জিন্দিগা—আত্মীয়স্বজন, কোন কথাই মনে রইল না আর। বুকের রক্ত উত্তাল হয়ে উঠছে, মাথায় আগুন জ্বলছে, চোখের সামনে সব লাল হয়ে গেছে, শুধু লোহু দেখছেন চারিদিকে। ও যে তাঁর জীবনের আলেয়া—পেত্নীদহে ডুবিয়ে মারতেই সামনে রূপের আলো জ্বেলেছিল, সে কথা মনে রইল না। মনে পড়ল না সেই ভৈরবীর বিদ্রূপতিক্ত শেষ কথাগুলো। 'হোসেনা! শয়তানী!' বলে চিৎকার ক'রে উঠে ক্ষ্যাপা ষাঁড়ের মতো লাফিয়ে পড়লেন সেই নাচঘরের মধ্যে! ঐ শয়তানীর চোখ দুটো নিজের হাতে উপড়ে ফেলা চাই। ওকে দিয়ে তাঁর থুথু চাটানো চাই—তা ছাড়া জীবনে শান্তি নেই তাঁর। অনেক মেয়ের সর্বনাশের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে ওকে।

তারপর—হৈ চৈ, আর্তনাদ। পাহারাদাররাও ছুটে এসেছে, কিন্তু অত মেয়েছেলে ঠেলে তারা এগোতে পারছে না, বখ্‌তিয়ার তো ওদের মাড়িয়ে ডিঙিয়ে চলে গেছেন—তারা কেমন ক'রে যায়?··

প্রথমটা আলীমর্দান ঠিক খুন করতে চান নি, বন্দী করতেই চেয়েছিলেন। কিন্তু এ ভীষণ ভৈরব মূর্তি দেখে, রক্তপিপাসু দৃষ্টি তার পিশাচ রাক্ষসের মতো মুখভাব—তিনিও ভয় পেয়ে গেলেন। তলোযার ছিল না কাছে, কোমরবন্ধে বাঁকা ছোরা—কিরীচ ছিল একখানা ; বখ্‌তিয়ার তখন হোসেনাকে ধরে প্রাণপণে উন্মত্তের মতো টানাটানি করছেন, হোসেনাও ধরে আছে আলীকে—কোনদিকেই তাদের দৃষ্টি নেই। সেই সুযোগে আলীমর্দান ছুরিখানা খুলে বখ্‌তিয়ারের কাঁধের দিক থেকে বিঁধে চালিয়ে দিলেন বুক বরাবর। একটা বীভৎস শব্দ ক'রে বখতিয়ার হোসেনার বুকের ওপরই ঢলে পড়লেন, আর উঠলেন না।

আলীমর্দান নিরুপায়। ক্ষ্যাপা কুকুর কামড়াতে এলে তাকে মেরে ফেলা ছাড়া গতি কি?

একে ঠিক বিশ্বাসঘাতকতা বলা যায় না। এলেমদার কেউ বলবে না—অন্ততঃ উনি তাই আশা করেন।

আনারকলি

(নাটক)

পরিচয়

আনারকলি	...	...	ইরানী ক্রীতদাসী
রাবেয়া	...	...	মুরাদের স্ত্রী
যোধপুরী	...	...	আকবরের প্রধানা মহিষী

বেগমগণ, নর্তকীগণ, ক্রীতদাসীগণ

আকবর শাহ	...	...	দিল্লীর সম্রাট
সেলিম	...	...	ঐ জ্যেষ্ঠপুত্র
মুরাদ	...	...	আকবরের অন্যতম সেনানায়ক
নবী	...	...	খোজা সর্দার
রুকন্দীন	...	...	লাহোর দুর্গের অধ্যক্ষ

এনায়েৎ খাঁ, মানসিংহ, ব্রাহ্মণ, মীরহবিব, সৈন্যগণ, প্রহরীগণ, ইত্যাদি।*

*এই নাটকের রচনাকাল—১৯২৭-২৮

প্রথম অঙ্ক

[খুশ্‌রোজের সন্ধ্যা। নওরোজ বাজারে যাবার পথে প্রাসাদের একাংশ। দূরে আলোকমালা-শোভিত নওরোজ বাজার দেখা যাচ্ছে। নর্তকীগণ নাচবার প্রস্তুতি হিসেবে সাজগোজ করছিল। ভারতীয় নর্তকীর বেশে আনারকলি। প্রধানা নর্তকী একটি বড় গোলাপ হাতে এগিয়ে এলেন।]

প্রধানা নর্তকী। আজ খুশ্‌রোজের বাজারে আনারকলিকে ছেড়ে দিলে খুঁজে পাওয়া যাবে না—কি বলিস!

দ্বিতীয়া। আমাদের পসার একেবারে মাটি!

তৃতীয়া। আমাদের দিকে কেউ চাইবে না। সব চোখগুলো আনারকলির মুখে আটকে যাবে।

প্রধানা। আমার চাকরি এবার যাবে।

দ্বিতীয়া। বটে, কি ভাবিস্ লো? কারও চাকরি যাবে না। মনে করেছিস বড় নাচউলী হলেই ওর খুব উন্নতি হ'ল?…(চোখ টিপে) একবার নজরে পড়ে গেলে আর কি ও এখানে থাকবে? …ওর মহলে নাচবার জন্যে তখন আমাদের ডাক পড়বে।

প্রধানা। (আনারকলির বুকের কাপড়ে একটা গোলাপ আটকাবার চেষ্টা করতে করতে) কথা কইছিস না কেন ভাই?

দ্বিতীয়া। রূপের দেমাকে—

প্রধানা। না না, ও তো সেরকম মেয়ে নয়—ও ভাই ডালিমফুল, একটা কথা বল্ না ভাই!

দ্বিতীয়া। একটি উত্তর দাও গো রূপসী—

আনার। কী তোমরা বলছ, আমি তার আদ্ধেক কথাই বুঝতে পারছি না!

প্রাধানা। এই বয়সে বড় বড় কেতাব পড়ে বুঝতে পারিস আর এই সোজা কথাগুলো বুঝতে পারছিস না?

দ্বিতীয়া। ছিনালি লো—ছিনালি! কথা আর বুঝতে পারেন না—! মুখখানিকে অমন ফুলফুলে ক'রে রাখেন কিসের জন্যে শুনি!

প্রধানা। মর্! ছুঁড়ি হিংসের ফেটে মরছেন একেবারে।

তৃতীয়া। ওলো—ঐ—

[পরস্পর চকিতে গা-টেপাটেপি করে আনারকলিকে হাসতে হাসতে ঠেলে

দিয়ে অদৃশ্য হ'ল। আনারকলি ব্যাপার কি বোঝবার জন্যে এদিকে ওদিকে চাইতে চাইতে ফিরেই দেখল শাহ্‌জাদা সেলিম আসছেন। আনারকলি ওড়না টেনে দিল]

সেলিম। [মুগ্ধ দৃষ্টিকে যতদূর সম্ভব সংযত করে] তুমি কে গো? তোমায় তো এর আগে দেখি নি?

আনার। (নতমুখে) আমি জাঁহাপনারই একজন দাসী।

সেলিম। (রহস্যভরে) যে কথা এখন বললে সেকথা যেন মনে থাকে সুন্দরী!

[আনারকলি চমকে উঠল]

সেলিম। তোমার নাম?

আনার। আনারকলি।

সেলিম। সার্থক নাম। কোন্ কবি এমন নাম দিয়েছিল কে জানে!··· কিন্তু তোমায় তো এখানে দেখি নি আর কখনও? কোন্ মহলে থাক তুমি?

আনার। আমি মহামান্যা যোধপুরী বেগম সাহেবার মহলে থাকি।

সেলিম। তোমায় কি কেনা হয়েছিল?

আনার। হ্যাঁ।

সেলিম। তোমার দেশ কোথায়?

আনার। ইরানে।

সেলিম। (অসহিষ্ণুভাবে) আমি—আমি তোমার সমস্ত পরিচয় জানতে চাই!

আনার। আমিই যে আমার সম্পূর্ণ পরিচয় জানি না খোদাবন্দ। (মুখ তুলে) সুদূর ইরানে কার কুলে কোথায় জন্মেছি তার খবর খুব সম্ভব ঈশ্বর জানেন, আর বোধ হয় জানতেন আমার বাপ-মা। আমি জানি, আমি ক্রীতদাসী!·· কঠিন পর্বতের মধ্য দিয়ে, দুর্গম মরুর মধ্য দিয়ে ইরানী প্রভুর সঙ্গে সাত বছর বয়সে আমি যখন হিন্দুস্তানে আসি, তখন সেই প্রভু মোগল ফৌজদারের কাছে পরিচয় দিয়েছিলেন শুনেছি, আনারকলিকে তিনি দু বৎসর বয়সে এক ডালিমতলায় কুড়িয়ে পেয়েছিলেন। সেই থেকে তিনি মানুষ করেছিলেন বলে আমার ওপর তাঁর ক্রয়-বিক্রয়ের অধিকার। তারপর সেই ফৌজদারের সংসারেই তিন বৎসর কাটিয়ে তাঁর মৃত্যুর পর এসে ঢুকি শাহানশাহ্‌ দিল্লীশ্বরের অন্দরে। সেই থেকে এখানেই আছি।

সেলিম। আশ্চর্য! এই চার-পাঁচ বছর এখানে আছ অথচ আমি একদিনও দেখি নি?···আনার···তুমি বাঁদী!···কিন্তু তুমি তো বাঁদী নও!

আনার। হ্যাঁ জাহাপনা, আমি বাঁদী। এই আমার জন্মান্তরের অদৃষ্টলিপি।

সেলিম। তুমি আজ নাচবে?

আনার। জানি না। বেগম সাহেবার হুকুমের অপেক্ষায় বসে আছি।

সেলিম। বেগম সাহেবা, মানে মা? আচ্ছা, তাঁর হুকুম হলে নাচবে তো?

আনার। নাচতেই হবে।

সেলিম। তুমি লেখাপড়া জান?

আনার। জানি।

সেলিম। তোমার ললাটে বুদ্ধির আভা আছে—তোমায় ভোলা যায় না। আনারকলি, তুমি এখানেই থাকবে তো? আমি মায়ের মহল থেকে আসছি

আনার। আপনার আদেশ হলেই থাকব।

সেলিম। এখানেই একটু অপেক্ষা কর।

[সেলিমের প্রস্থান]

আনার। আমার বুক কেন আজ এমন ক'রে দুলে উঠল? আমি কেন আজ ওঁর সঙ্গে ভাল ক'রে কথা কইতে পারলুম না?…কি এ? বাদশাজাদাকে এর আগেও তো দেখেছি—বালিকার লুব্ধ কৌতুহলের মুগ্ধদৃষ্টি দিয়ে, চুরি ক'রে চাওয়া ক্ষণেক অবসরের চকিত দৃষ্টি দিয়ে, কই মন তো আমার এত অবসন্ন হয় নি?… ভয়? ঐ ভুবন-ভোলানো রূপ, ঐ সুধাভরা কণ্ঠস্বর, এতে তো ভয় নেই। তবে?… কে বলে দেবে কেন এ দোলা গো?…

[আকবরের প্রবেশ]

আকবর। খুশ্‌রোজের উৎসব বাতিকে উজ্জ্বল না ক'রে অর্ধ-অন্ধকার পথে কার পথ চেয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছ রূপসী?

[আনারকলি নিরুত্তর]

তোমার ও মুখ যেন চেনা-চেনা বলেই বোধ হচ্ছে! তুমি কে?

আনার। আমি জাঁহাপনার ইরানী বাঁদী—আনারকলি।

আকবর। আনারকলি! আনারকলি। তুমি যোধপুরীর মহলে থাক না?

আনার। বাঁদী সেইখানেই আশ্রয় পেয়েছে।

আকবর। তোমার আসন্ন যৌবনের আভাসে মনে হচ্ছে তোমার অদৃষ্ট ভাল। যাক্—এখন এস খুশ্‌রোজে যাই। তার বাজার তোমার অভাবে মলিন হয়ে আছে।

আনার। মার্জনা করবেন, কিন্তু আমি বেগম সাহেবার আদেশের অপেক্ষায় এখানে দাঁড়িয়ে আছি।

আকবর। আমার সঙ্গে গেলে তোমার বেগম সাহেবা অসন্তুষ্ট হবেন না, বিশেষতঃ আজ খুশ্‌রোজ—আজ সমস্ত স্ত্রীলোকের ওপর একমাত্র আমারই

অধিকার।

আনার। শুধু আজ কেন সম্রাট—সর্ব সময়ে সমস্ত স্ত্রী-পুরুষের উপরেই তো আপনার সমান অধিকার! তবে স্ত্রীলোক তো আমি নই পৃথ্বীশ্বর—সামান্য ক্রীতদাসী!

আকবর। ক্রীতদাসী কি নারী নয়?

আনার। না, অন্য একজন নারীর আদেশের দাসী মাত্র—তাই আমি এখন যেতে পারি না সম্রাট।

আকবর। বেশ তো, ইচ্ছে করলে অন্য নারীর দাসীত্ব থেকে মুক্তিও তো পেতে পার!

আনার। আপনার দয়া আপনার শক্তির মতোই অসীম—কিন্তু মাতৃতুল্যা বেগম সাহেবার কাছে আমি ভালই আছি—আমি মুক্তি চাই না।

আকবর। হুঁ, তোমার কথাগুলো খুব স্পষ্ট,—এবং আর যাই হোক, বিনত নয়। যাক, তোমার অপরাধ নিলুম না; তোমার বেগম সাহেবাকে ব'লো আমার হুকুম রইল—তোমায় খুশ্‌রোজে নাচতে হবে।

আনার। আপনার আদেশ তাঁকে অবশ্য জানাব।

আকবর। হ্যাঁ, জানিও—

[আকবরের প্রস্থান ও যোধপুরীর প্রবেশ]

যোধপুরী। আনারকলি, সেলিমের সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছিল?

আনার। হয়েছিল।

যোধ। কেন দেখা দিলে তুমি? কেন দিলে! আমি তোমায় বার বার নিষেধ করি নি?

আনার। নর্তকীরা আমাকে সাজাবার নাম ক'রে এইখানে টেনে এনে সহসা পরিত্যাগ ক'রে চলে গেল। ক্ষণেক অসতর্কতার অবসরে এ অপরাধ হয়েছে সম্রাজ্ঞী, মার্জনা করবেন।

যোধপুরী। দেখা না হ'লেই তোমার পক্ষে ভাল হ'ত আনার, এ অত্যন্ত মন্দ হ'ল, কে জানে এর ফল কি হবে!·· যাই হোক্, সেলিমের সনির্বন্ধ অনুরোধ আজ তোমায় নাচতে হবে। কিন্তু এখান থেকে শীঘ্রই তোমায় স্থানান্তরিত করা দরকার, নইলে তোমার মঙ্গল নেই।

আনার। (ঈষৎ জড়িত কণ্ঠে) আমি এখানে যখন শাহ্‌জাদার আদেশের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে ছিলুম, সহসা সম্রাট তখন এইখানে এসে পড়েন—

যোধপুরী। কে—কে এসে পড়েন?

আনার। শাহানশাহ্—

যোধপুরী। করেছিস কি হতভাগী, করেছিস কি!

আনার। শাহ্জাদা বলে গিয়েছিলেন যে মালেকা-এ-মহলের আদেশ না পাওয়া পর্যন্ত আমি যেন এইখানে অপেক্ষা করি। এ পথে সম্রাটকে তো প্রায়ই দেখি না, সহসা তিনি এসে পড়লেন, তাই—

যোধ। আজ যে খুশ্‌রোজ, আজ সম্রাটের সর্বত্র অবাধ গতি। তারপর, তিনি কি বললেন?

আনার। আমাকে তাঁর সঙ্গে যেতে বলছিলেন। আমি তাঁকে বললুম যে হজরত বড়-বেগম সাহেবার অনুমতি না পেলে আমি কোথাও যেতে পারব না। তাতে তিনি অসন্তুষ্ট হয়ে আপনাকে তাঁর আদেশ জানাতে বললেন।

যোধ। কি তাঁর আদেশ?

আনার। আজ খুশ্‌রোজের মেলায় আমায় নাচতে হবে।

যোধ। যা ভেবেছি তাই!…আমি সেলিমকে কথা দিয়েছি—তোমায় নাচতেই হবে, বাদশার আজ্ঞাও সেই সঙ্গে প্রতিপালিত হবে। কিন্তু নাচবার পরই তুমি আমার মহলে যাবে। বাদশা বা শাহ্জাদা যদি তোমায় কোথাও যেতে বলেন কিংবা সঙ্গে ক'রে নিয়ে যেতে চান তো স্পষ্টই তাঁদের জানিও যোধপুরী বেগমের নিষেধ আছে।…তুমি জান না আনারকলি কেন শাহানশাহ্ তোমার পক্ষে বিষধর সর্পের চেয়েও অনিষ্টকর।…আমি চললুম।

[প্রস্থান]

আনার। কেন এমন হ'ল, হে ভগবান, কেন এমন হ'ল!

[সেলিমের প্রবেশ]

সেলিম। মায়ের আদেশ পেয়েছ আনারকলি?

আনার। পেয়েছি।

সেলিম। নাচবে?

আনার। আমি তো প্রস্তুত হয়েই আছি।

সেলিম। তোমার ঐ কমনীয় দেহের যৌবন নৃত্য দেখবার জন্য আমার সমস্ত মন একাগ্র হয়ে রয়েছে।…তুমি কেন আমায় এমন করলে সুন্দরী, তোমায় দেখে অবধি আমার দেহের সমস্ত রক্তধারা উন্মত্ত তাণ্ডবে নাচছে—প্রতি শিরা-উপশিরা যেন প্রচণ্ড কামনায় অবশ হয়ে আসছে—এ আমার কী হ'ল?

আনার। (চেষ্টাকৃত নীরস কণ্ঠে) অনুমতি হলে আমি খুশ্‌রোজে যাই।

সেলিম। হাঁা হাঁা, চল, আমি ব্যাকুল হয়ে রয়েছি।

আনার। শাহ্‌জাদাকে হয় আগে যেতে হবে, নইলে একটু পরে আসতে হবে— যা আপনার অভিরুচি।

সেলিম। কেন আনার, আমার সঙ্গে গেলে কি—

আনার। না, বাদশাজাদার সঙ্গে বাঁদীর খুশ্‌রোজে যাওয়া শোভা পায় না।

[আনারের প্রস্থান। সেলিমের প্রস্থানের একটু পরে মেহ্‌বুব ও সিপার দুই খোজার প্রবেশ]

সিপার। আরে মেহবুব যে! তুই এখানে?

মেহবুব। আরে সিপার যে, তুই এখানে?

সিপার। খুশ্‌রোজের রাত, খাঁচার মধ্যে একটা পাখীও নেই, পাহারা দেব কাকে?

মেহবুব। তাই আমাদেরও আজ—

সিপার। খুশ্‌রোজ! যা খুশি তাই করার দিন! বোঝ তো ভায়া—

মেহবুব। এই—এই! ধরে ফেলেছ!

সিপার। মেহবুব!

মেহবুব। সিপার!

সিপার। বলি এবারের শিকারটা কে, কিছু ঠাওর পেলে?

মেহবুব। এবার রাজপুতানীদের ভেতর তো মজাদার কাউকে দেখছি না!

সিপার। হুঁ—

মেহবুব। হুঁ—!

সিপার। দেখেছ নাকি?

মেহবুব। ঐ থামটার আড়ালে ছিলুম।

সিপার। ঐ ওপরের জানলায় আমি—

মেহবুব। বাপে বেটায়—

সিপার। চুপ চুপ!

মেহবুব। মজা আছে!

সিপার। আল্‌বাৎ!

মেহবুব। চুলোয় যাক্!

সিপার। গোল্লায় যাক্!

মেহবুব। সিপার—ঐ—

সিপার। মেহবুব!

[প্রস্থান। আনারকলি ও পশ্চাতে সেলিমের প্রবেশ]

সেলিম। আনারকলি! তোমার নৃত্যের জন্যে অভিনন্দন জানাবার অবকাশ না দিয়েই চলে এলে?

আনার। অভিনন্দন যে জানাবেন, এ সংবাদ আগে পাই নি কিনা, নইলে অপেক্ষা করতুম।

সেলিম। আনারকলি! তোমার নৃত্য অপূর্ব!

আনার। শাহ্‌জাদার অসীম দয়া।

সেলিম। সে নৃত্যের ছন্দ যেন মর্তের সীমা ছাড়িয়ে মানুষের মনে এক অমর্ত্য-লোকের দ্বারে গিয়ে ঘা দেয়!

আনার। আমার শিক্ষা সামান্যই জনাব।

সেলিম। তোমার দেহের হিল্লোল যেন সদ্য-প্রস্ফুটিত কমলের রূপের দোলাকে স্মরণ করিয়ে দেয়!

আনার। দাসীর অযথা প্রশংসা করছেন জাঁহাপনা।

সেলিম। (স্বপ্নালসভাবে) কী তোমার নৃত্যভঙ্গীর কমনীয় লীলা, যার প্রত্যেকটি রেখা গভীর দুঃখের মধ্যে আনন্দের বিজলী রেখা টেনে দিয়ে যায়, যার দীপ্তি কিন্তু বিদ্যুতের মতো শীঘ্র মেলায় না, বহুক্ষণ ধরে স্নিগ্ধ সুন্দর আলোয় মনকে উজ্জ্বল করে রাখে!

আনার। অসংখ্য ধন্যবাদ জাঁহাপনা।...এখন অনুমতি করুন, দাসী মহলে ফিরে যাক্।

সেলিম। না না আনার, এখনি যেও না, আমায় একটু বুঝতে দাও, আর—আর বোঝাতে দাও, আমি কি দেখলুম—

আনার। কিন্তু জনাব, খুশ্‌রোজের রাতে পথের মধ্যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এমন বোঝাতে শুরু করলে আপনাকে এবং আমাকে দুজনকেই উপহাসাস্পদ হতে হবে।

সেলিম। হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা পথ বটে, তা—আনারকলি চল না আমরা একটু নির্জন স্থানে যাই—

আনার। মার্জনা করবেন শাহজাদা, আমার প্রতি অন্যরূপ আদেশ আছে।

সেলিম। (সহসা ক্রুদ্ধ হয়ে) আমাকে তোমার এত অবহেলা কেন? আমার অনুগ্রহ কি এতই তাচ্ছিল্যের বস্তু?

আনার। মহামান্য সম্রাট-পুত্রের অনুগ্রহ এত মহামূল্য সামগ্রী যে সামান্য ক্রীতদাসীর উপর তা বর্ষিত হবার উপযুক্ত নয়। আশীর্বাদ করুন, বামন হয়ে চাঁদে হাত দেবার লালসা যেন আমার কখনই না হয়।

সেলিম। তোমার ঐ ঘুরিয়ে কথা বলার ভঙ্গীটা অত্যন্ত অপমানসূচক। ধৃষ্টতারও একটা সীমা আছে।

আনার। মার্জনা করুন শাহ্‌জাদা—বাঁদীর অশিষ্টতা—(চক্ষু সজল হয়ে ওঠে)

সেলিম। আনার, তুমি কেঁদে ফেললে! না না, আমি তো তেমন কিছু বলি নি—ছিঃ ছিঃ—চোখের জল মোছ—(সহসা নিজের রুমাল দিয়ে তার চোখের জল মুছিয়ে দিলেন।)

আনার। (সে স্পর্শের মোহে ক্ষণকালের জন্য অভিভূত হবার পর) শাহ্‌জাদা —দাসীর প্রতি আপনার অসীম করুণা—কিন্তু মার্জনা করবেন, আমি সত্যই আপনার অনুগ্রহের যোগ্যা নই। আমার কথা ভুলে যান—

সেলিম। আমি ঠিক বুঝতে পারছি না আনারকলি। আমাকে এত ভয় করছ কেন? কিসের ভয় তোমার—

আনার। ভয—ভয় আপনার দয়াকে। অভাগিনীর এত দয়া সইবে না। আপনি যান শাহ্‌জাদা, অন্ততঃ আমায় অনুমতি করুন, আমার মহলে ফিরে যাই—সম্রাজ্ঞী ক্রুদ্ধ হবেন হয়ত—

সেলিম। আর একটু দাঁড়াও আনার, আমি তোমায় একটু ভাল ক'রে দেখে নিই—

[আকবরের প্রবেশ]

আকবর। দাসদাসীকে তাদের কর্তব্যে অবহেলা করতে প্রশ্রয় দেওয়া সম্রাটপুত্র এবং ভাবী সম্রাটের শোভা পায় না। সেলিম, ঐ বালিকার প্রতি তোমার ব্যবহারে আমি লজ্জিত।

সেলিম। আমায় মাপ করবেন সম্রাট—

[অভিবাদন ক'রে প্রস্থান করলেন]

আকবর। আনারকলি, তোমার নৃত্য আমাকে খুশী করেছে।

আনার। দাসীর অসীম সৌভাগ্য।

আকবর। তোমার নৃত্যের মোহনলীলা আমার দৃষ্টিকে এত আনন্দিত করেছে যে তোমার পূর্বেকার দুর্বিনীত ব্যবহার আমি ভুলে যাব স্থির করেছি।
(আনারকলি কথা কইল না, শুধু নীরবে অভিবাদন করল) তোমায় পুরস্কার দেব।

আনার। জাঁহাপনার তৃপ্তিই দাসীর যথেষ্টর বেশী পুরস্কার সম্রাট! তার অধিক আশা তার নেই

আকবর। সম্রাটরা কোন-কোনও লোককে আশার বেশিই দেন। আমিও তোমাকে তোমার আশার অতীত কিছু দেব।

আনার। সম্রাটের মহানুভবতার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাষা দাসীর কণ্ঠে নেই। অনুমতি করুন সম্রাট, আমি সম্রাজ্ঞীর মহলে ফিরে যাই।

আকবর। তার পূর্বে আমি তোমাকে পুরস্কৃত করব। তুমি আমার সঙ্গে এস—

আনার। দাসীর অপরাধ মার্জনা করুন সম্রাট—আমি যেতে পারব না।

আকবর। তোমার স্পর্ধার তো শেষ নেই দেখছি! কিন্তু কেন যেতে পারবে না শুনি?

আনার মহামান্যা সম্রাজ্ঞীর নিষেধ আছে। আমি তাঁরই দাসী।

আকবর। আমার অনুগ্রহ তোমার দাসীত্ব দূর করবে। তুমি নির্ভয়ে এস।

আনার। তাঁর নিষেধ অবহেলা করবার শক্তি আমার নেই।

আকবর। আমার নিষেধ অবহেলা করবার মতো কতটা শক্তি তোমার আছে, তা বুঝিয়ে দিতে বেশী বিলম্ব আমার হবে না। তোমার অশিষ্টতার কঠিন উত্তর আমি দিতে পারতুম।···কিন্তু তোমায় মাপ করলুম···তোমার রূপ আমায় মুগ্ধ করেছে।··আমি তোমার জন্য স্বতন্ত্র মহল নির্দিষ্ট ক'রে দেব। স্বতন্ত্র দাসদাসী দেব। আমার বেগমদের সমান ঐশ্বর্য ও ক্ষমতা তুমি পাবে।··· বুঝেছ?

আনার। এ সমস্ত সম্মানের যোগ্যা আমি নই সম্রাট, আমি দাসী মাত্র।

আকবর। (বিস্মিত ভাবে) তবে তুমি আরও কি চাও?

আনার। আমি কিছুই চাই না সম্রাট। আপাততঃ আমি প্রধানা সম্রাজ্ঞীর মহলে যাবার অনুমতি চাই।

আকবর। দেখ আমারও সহ্যের সীমা আছে···তুমি কি ভেবেছ সম্রাট সারারাত্রি পথের মাঝে দাঁড়িয়ে তোমার অনুগ্রহ ভিক্ষা করবে আর তুমি তাই প্রত্যাখ্যান ক'রে গৌরবলাভ করবে! আমার আদেশ, তুমি এখনই আমার সঙ্গে আসবে।

আনার। সে আদেশ যদি অবহেলা করি তো আমায় ক্ষমা করবেন,···ও আদেশ পালনের ক্ষমতা আমার নেই।

আকবর। তোমার এত স্পর্ধা!

[যোধপুরী বেগমের প্রবেশ]

যোধপুরী। সম্রাট!

আকবর। কে, সম্রাজ্ঞী ?

যোধপুরী। আপনার দাসী। কিন্তু সম্রাট, এভাবে এত রাত্রে—পথের মধ্যে দাঁড়িয়ে কেন ? বিশেষ খুশ্‌রোজের মেলা—

আকবর। আনারকলির নৃত্যে আমি সন্তুষ্ট হয়েছি, সেই কথা জানাচ্ছিলুম।

যোধপুরী। আনারকলি, সম্রাটের কাছে তোমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছ তো ? ··কিন্তু সম্রাট, ওকে আমার এখন একটু প্রয়োজন আছে। অনুমতি করেন তো—

আকবর। ও তোমারই দাসী, সম্রাজ্ঞী, তোমার প্রয়োজন হ'লেই যাবে। আমার অনুমতির আবশ্যক নেই।

[আনারকলি উভয়কে অভিবাদন ক'রে প্রস্থান করল]

যোধপুরী। সম্রাট।

আকবর। সম্রাজ্ঞী, তোমার দাসীদের শিষ্টাচার শিক্ষা দাও নি দেখে আমি ক্ষুব্ধ হলুম। সময়ে সময়ে তারা নিজেদের অবস্থার কথা বিস্মৃত হয়।

যোধপুরী। সম্রাট স্বয়ং যদি সময়বিশেষে নিজের পদমর্যাদার কথা বিস্মৃত হন—ওরা তো সামান্য দাসী মাত্র।

আকবর। আমার আদেশ অবহেলা করবার শাস্তি কঠিন, সে কথা তারা জানে না।

যোধপুরী। আপনার আদেশ অবহেলা করার মতো ধৃষ্টতা প্রকাশ আমার কোন্ দাসী করেছিল জানতে পারি কি ?

আকবর। আনারকলিকে কিছু পুরস্কার দেব বলে আমি ডাকছিলাম, কিন্তু সে গেল না।

যোধপুরী। আমার ঐ রকমই আদেশ ছিল সম্রাট। অপরাধ আমার। শাহান-শাহ আমায় মার্জনা করবেন।

আকবর। বেশ, এখনও তাকে পাঠিয়ে দিতে পার।

যোধপুরী। অনুমতি হয় তো আমি তাকে এখনই সঙ্গে ক'রে নিয়ে আসতে পারি।

আকবর। তাই নিয়ে এস।

[যোধপুরীর প্রস্থান]

যোধপুরী বেগম, তুমি সঙ্গে ক'রে নিয়ে এলেই কি সমস্ত সমস্যার মীমাংসা হবে মনে করো ? এমন পুরস্কার দেব যে তোমরা চমকে উঠবে। (পাদচারণ) আমি তাকে

শ্রেষ্ঠ পুরস্কারই দেব, যা সে কখনও আশা করে নি।

[যোধপুরী ও আনারকলির প্রবেশ]

যোধপুরী। আনারকলি এসেছে সম্রাট, আপনি ওকে পুরস্কার দেবে-বলেছিলেন—

আকবর। হ্যাঁ, ওকে আমি পুরস্কার দেব। সম্রাজ্ঞী, তুমি আনারকলিকে বল, আমি ওকে বিবাহ করব।

যোধপুরী। বিবাহ করবেন,—আনারকলিকে ?

আকবর। হ্যাঁ, বিবাহ করব।

যোধপুরী। আপনার মহানুভবতায় শুধু আনারকলি নয়, আমি সুদ্ধ আপনার কাছে কৃতজ্ঞ রইলুম সম্রাট। আনারকে আমি নিজের কন্যার মতো স্নেহ করি… এ অনুগ্রহ ওরই যোগ্য—এ অনাঘ্রাত কুসুম রাজোদ্যানেই শোভা পায়।

আকবর। তুমি খুশী হবে শুনে আমার খুব আনন্দ হ'ল সম্রাজ্ঞী। আমি এখনই মোল্লাকে ডেকে পাঠাচ্ছি, আজ রাত্রেই বিবাহ হবে।

যোধপুরী। এর চেয়ে আর আনন্দের কথা কি আছে জাঁহাপনা। আমি কন্যাকে বিবাহের পরিচ্ছদে সজ্জিতা করি—আপনি অন্যান্য আয়োজন করুন।

আনার। (সহসা যোধপুরীর পদতলে বসে পড়ে) আমায় মাপ করুন সম্রাজ্ঞী। আমি আপনার কন্যাস্থানীয়া—অন্য কোন সম্পর্কের উপর আমার লোভ নেই।

যোধপুরী। বলছিস কি হতভাগিনী। সম্রাট মহিষী হবার সৌভাগ্য, এ যে সমস্ত নারীর শ্রেষ্ঠতম কামনা !

আনার। সে মর্যাদার যোগ্য আমি নই, আমায় ক্ষমা করুন।

আকবর। কিন্তু তার কারণ কি ? সত্য কথা বলবে ?

আনার। আমার মন অন্যে আসক্ত, এ মন আপনাকে নিবেদন করবার যোগ্য নয়।

আকবর। আমি মনে করতাম আমিই রাজপুরীর মধ্যে সব চেয়ে সৌভাগ্যবান ব্যক্তি। কিন্তু এখন দেখছি আমার অপেক্ষাও সৌভাগ্যবান আছে।

যোধপুরী। শাহানশাহ্, এ অবোধ বালিকা আপনার ক্রোধের উপযুক্ত নয়।… সংসারের কোন অভিজ্ঞতাই এর নেই। অন্ততঃ একে একটু ভাববার অবসর দিন।

আকবর। বেশ, তোমার অনুরোধে আমি ওকে পনেরো দিন সময় দিলুম। এর মধ্যে ও যেন মন স্থির করে।…ওকে বুঝিয়ে দিও সম্রাজ্ঞী—সম্রাট আকবর আদেশ করতেই অভ্যস্ত—অনুরোধে নয়।

[প্রস্থান]

যোধপুরী। ওরে অভাগিনী, সম্রাটের কামনায় বাধা দিয়ে তুই জীবনে সুখের আশা করেছিস? ধ্রুব ছেড়ে অধ্রুবের পেছনে দৌড়তে নেই। সম্রাটের মহিষীত্ব উপেক্ষা করলে অন্যাকে নিয়েই কি তুই সুখী হতে পারবি? সম্রাটের ক্রোধ থেকে কে তোকে রক্ষা করবে?

আনার। (সজল নেত্রে—যোধপুরী বেগমের পায়ে হাত দিয়ে) আমি পারব না, পারব না সম্রাজ্ঞী, আমি যে তাকে আমার সব দিয়ে বসে আছি।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

যোধপুরী বেগমের মহলের একাংশ। আনারকলি দূর যমুনার দিকে তাকিয়ে আছে।

[সেলিমের প্রবেশ]

সেলিম। আনারকলি।

আনার। (চমকে উঠে—কম্পিত স্বরে) শাহ্‌জাদা!

[অভিবাদন]

সেলিম। আনারকলি, এই সাতদিন তোমার একটু দেখা পাবার জন্যে কত ঘুরে বেড়াচ্ছি, কত চেষ্টা করছি কিন্তু মায়ের অনুমতি পাই নি, আর তুমিও যেন কেবল আমার চোখের আড়ালে যেতে চাও! আজ অনেক সন্ধানের পর তোমায় নির্জনে পেয়েছি। আজ আর আমায় এড়িয়ে যেতে পারবে না।

আনার। দাসীকে শাহ্‌জাদার প্রয়োজন ছিল?

সেলিম। আঃ—আবার ঐ দাসী, শাহ্‌জাদা, আর প্রয়োজন! একটু পরেই হয়ত শুরু করবে মার্জনা করুন আর ক্ষমা করুন। তুমি কি কিছুতেই বুঝতে পার না আমাকে?

আনার। যদি কোনও আদেশ থাকে, বলুন। দাসীর সঙ্গে সম্রাট-পুত্রের ঘনিষ্ঠতা শোভা পায় না।

সেলিম। আমার আদেশ এখন এই যে, যেমন দাঁড়িয়ে আছ তেমনি থাক আর আমার সঙ্গে কথা কও। আনারকলি, একটা জনরব শুনলুম, সত্য কি?

আনার। বলুন কি জনরব?

সেলিম। সম্রাট তোমায় বিয়ে করতে চেয়েছিলেন?

আনার। সে সৌভাগ্য দাসীর হয়েছিল।

সেলিম। কিন্তু তুমি সম্মত হও নি?

আনার। না।

সেলিম। কেন সম্মত হও নি?

আনার। এত কথা যখন শুনেছেন জনাব, তখন ও-কথাও নিশ্চয় শুনেছেন। আমাকে আর নূতন ক'রে প্রশ্ন করছেন কেন?

সেলিম। মায়ের কাছে যখন তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার অনুমতি চাই—তখন তিনি যা উত্তর দিয়েছিলেন তার মধ্যে আমি যেন কিছু আভাস পেয়েছিলাম। কিন্তু আনারকলি, কে সে সৌভাগ্যবান—আমি তার নাম জানতে চাই।

আনার। কেন জনাব, তাকে শাস্তি দেবেন?

সেলিম। না, তার সঙ্গে তোমার মিলনের ব্যবস্থা করব। তোমাদের বিবাহের আয়োজন করব।

আনার। জাঁহাপনা, ক্ষুদ্রা দাসীর জীবনের খুঁটিনাটি নিয়ে ব্যস্ত হবেন না—তাদের ব্যবস্থা তারাই ক'রে নেবে।

সেলিম। না না, আমি তার নাম জানতে চাই। জানতে চাই সে কে, সম্রাট বা সম্রাট-পুত্র যাকে তুষ্ট করতে পারল না—তার কিশোর মন একটি একটি ক'রে পল্লব মেলল কার প্রেমের স্পর্শে—হে মোহিনী, কে সে শক্তিমান, আমি জানতে চাই—

আনার। কী হবে শাহ্‌জাদা?···সম্রাট চেয়েছিলেন আমার রূপ। মহিষীত্ব দিয়ে আমার যৌবন কিনতে চেয়েছিলেন; আর শাহ্‌জাদাও আমার রূপ দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন—আমায় উপপত্নীত্বের সম্মান দিয়ে কৃতার্থ করতে চেয়েছিলেন। আমার রূপের দাম হিসাবে ঐ সব সম্মান যদি মাথা পেতে না নিতে পেরে থাকি তো মার্জনা করবেন জনাব। সে সাধ্য আমার নেই।

সেলিম। আনারকলি, ভুল—ভুল করেছ তুমি। তোমার রূপ আমি চাই নি। চেয়েছি তোমায়; তোমায় চেয়েছি। প্রিয়াকে—প্রিয়তমাকে। প্রথম শুধু তোমার রূপই আমার নজরে পড়েছিল—তাই যদি সে রূপ আমায় মুগ্ধ ক'রে থাকে তো মাপ ক'রো কিন্তু রূপের আড়ালে তোমাকেও আমি দেখেছি প্রিয়ে, এবং ভুল দেখি নি।··· আর উপপত্নীত্বের সম্মান আমি দিতে চাই নি তোমায়—দিতে চেয়েছি আমার পত্নীত্বের মর্যাদা। তুমি আমার ধর্মপত্নী হবে আনার—প্রধানা মহিষী হয়ত মানসিংহের ভগিনী হতে পারেন কিন্তু তুমি হবে আমার প্রিয়তমা মহিষী।

আনার। (কেঁপে উঠে) কী বলছেন, কী বলছেন শাহ্‌জাদা! এসব কথা

কেন আমায় শোনাচ্ছেন!

সেলিম। সত্য কথা বলছি, ভীরু। (হাত দুটি ধরে) একথা কি তোমার বিশ্বাস হচ্ছে না আনার? আমি ঈশ্বর সাক্ষী ক'রে বলছি।

আনার। এ-সব কথা আমার বিশ্বাস করতে নেই যে! (কান্নার সুরে) এ হবে না, হবে না জনাব, একথা আপনি শোনাবেন না।

সেলিম। (দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে) জানি না কোন্ মায়াবী তোমায় মুগ্ধ করেছে, নইলে আমার মন তুমি দেখতে পেতে · এ হতভাগ্যের প্রতি একটুখানি করুণাও কি তোমার ঐ কিশোর মনে নেই? সামান্য একটুও?

আনার। এসব কথা বলে আমার অপরাধ বাড়াবেন না—

সেলিম। (সহসা আকুল আগ্রহে) কিন্তু তুমি আমাকে তার নাম বল। আমায় বিশ্বাস করো আনার, আমি তোমাকে সত্যই ভালবাসি। আমি তোমাব মঙ্গল করতে চাই। তুমি তোমার প্রণয়াস্পদের নাম নিঃসঙ্কোচে আমায় বল। তোমাদের মিলনের সব বাধা আমি দূর করব। আমার দুঃখই অদৃষ্টলিপি—কিন্তু তুমি সুখী হও।···বল বল আনারকলি—সে কে?

আনার। যেদিন প্রথম দিল্লীর রাজ-অন্তঃপুরে আসি সেইদিনই প্রভাতসূর্যের মতো অপরূপ দীপ্তি নিয়ে যে আমার চোখের সামনে দেখা দিয়েছিল সেই জাদুকরই নিমেষে আমার সর্বস্ব হরণ ক'বে নিয়ে গেছে জাঁহাপনা। সেইদিন থেকে আমার আর কিছুই নেই, অন্য কোন পুরুষকে কোনদিন মনে কামনা করি নি, আমার কিশোর মনের সবটুকু তার পায়ে ঢেলে দিয়েছি। কিন্তু সে আমার অবস্থা থেকে অনেক উর্ধ্বে থাকে—তাকে পাওয়া আমার পক্ষে একেবারে—একেবারেই অসম্ভব। তাই সে গোপন অর্ঘ্য আমার মনের মধ্যেই নিয়ত নিবেদন করি—বাইরে পূজার স্বপ্নও কখনও দেখি নি।

সেলিম। বল, বল, কে সে সখী। যত উর্ধ্বের মানুষই হোক তোমার কাছে সে কিছুই নয়—বল, আমার আদেশ।

আনার। সে দিল্লীর ভাবী সম্রাট!

সেলিম। (তার দু'হাতে ধরে) আনার, আনার, সে কি আমি?

আনার। তুমি, তুমি, সেলিম, প্রিয়তম, সে তুমি!!!

সেলিম। তবে ছলনাময়ী, কেন এ নির্মম খেলা আমার সঙ্গে খেলছিলে?

আনার। খেলা নয় প্রিয়তম, নিষ্ঠুর সত্য।

সেলিম। কেন সখী?

আনার। মহামান্যা সম্রাজ্ঞী আমায় কন্যাতুল্য স্নেহ করেন তিনি আমায় যেদিন বলেছেন তোর এ সর্বনাশা রূপ নিয়ে কখনও সম্রাট বা সম্রাট-পুত্রের সামনে যাস নি —তাতে তোর অত্যন্ত অকল্যাণ ঘটবে, সেদিন বুঝি নি কিন্তু আজ বুঝছি কতদূর সত্য সে কথা।

সেলিম। আমি যদি তোমায় বিবাহ করি তাতে কি অকল্যাণ তোমার ঘটতে পারে?

আনার। তুমি সম্রাটের পুত্র—সিংহাসনের ভাবী অধিকারী। তোমার সঙ্গে সামান্যা ক্রীতদাসীর বিবাহ শোভনও নয়, স্বাভাবিকও নয়। প্রথমতঃ এ মিলনের পথে অনেক বিঘ্ন ঘটতে পারে, দ্বিতীয়তঃ এ মিলন সুখের হবে না। মোহ যখন কাটবে—

সেলিম। সুখ ও মোহের কথা পরে হবে, কিন্তু বিঘ্ন ঘটবে কেন? কে বাধা দেবে এ বিবাহে?

আনার। সম্রাট!...এ অস্বাভাবিক বিবাহ সম্রাট কখনই অনুমোদন করবেন না।

সেলিম। সম্রাট কিন্তু নিজেই এ বিবাহ করবার প্রস্তাব করেছিলেন—

আনার। নিজের জন্য যা করা যায় পুত্রের জন্য তা করা যায় না, আর সে শুধু আমি তাঁর উপপত্নী হতে চাই নি —তারই শাস্তিস্বরূপ; আমি যে তাঁর প্রস্তাবে সম্মত হই নি সেটাই কি তিনি মার্জনা করতে পারবেন?

সেলিম। সেকথা সত্য—তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে উঠবেন। কিন্তু তার নিষেধে কোনও ক্ষতি হবে না। আমি তোমায় বিবাহ করবই।

আনার। সামান্যা আনারের জন্য পিতার মাথা পেতে নেওয়া কি তোমার উচিত? সে হয় না—আমায় ভুলে যাও প্রিয়তম। আমি তো কোন দিন এ চাই নি। আমি শুধু আড়াল থেকে তোমায় দেখতুম—নিভৃতে নীরবে তোমার পূজা করতুম। তুমি কোথায় আর আমি কোথায়—কী বিরাট ব্যবধান তোমার আমার মধ্যে, এ আমি বরাবরই জানতুম, তাই বৃথা স্বপ্ন কখনও দেখি নি! ভুল ক'রো না প্রিয়তম, ভুলে যাও ভুলে যাও অভাগিনীকে।...ভেবে দেখ দেখি, তোমার পিতামাতা আত্মীয়-স্বজনের কাছে, অগণিত প্রজা কর্মচারী সবার কাছে কত বিড়ম্বনা সহ্য করতে হবে—তা সহ্য ক'রেও কি আনারকে নিয়ে সুখী হতে পারবে?

সেলিম। সব সহ্য হবে আনার, যদি তোমায় পাই।...তোমার বিচ্ছেদ আমার সহ্য হবে না, ও অনুরোধ করো না। আমায় দয়া কর তুমি, আমার হও—

আনার। আমার জন্য নয় প্রিয়তম, ভাবি তোমারই জন্য। তোমার আদেশে এ দাসীর সব সহ্য হবে—কিন্তু তুমি যদি আনারের জন্য কষ্ট পাও—

সেলিম। তোমার প্রেমের কাছে পৃথিবীর সব সুখ তুচ্ছ। প্রিয়ে, তোমার পরিবর্তে অন্য কোনও সুখে আমার তৃপ্তি নেই।

আনার। (দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে) তবে তাই হোক - এইই হয়ত আমার নিয়তি। ...সম্রাজ্ঞী অসন্তুষ্ট হবেন, সম্রাট ক্রুদ্ধ হবেন, কিন্তু তবুও তোমার অদেশ অবহেলা করার শক্তি আমার নেই। নাও, নাও দেবতা—তোমার আনারকে তুমি নাও।

সেলিম। কিসের ভয় প্রিয়তমে,—(তার হাত দুটি ধরে) ঐ দেখ সুনীল যমুনা আর ঐ দেখ সুনীল আকাশ—না হয় এই সাম্রাজ্য ছেড়ে চলে যাব ঐ আকাশের নিচে আর যমুনার তীরে। আমাদের প্রেম সকল দুঃখকষ্টকে জয় ক'রে যে অসীম আনন্দ আমাদের দেবে তার কাছে এই প্রাসাদ, এই ঐশ্বর্য কত তুচ্ছ!

আনার। তোমার ভালবাসা আমাকে আজ যে সাম্রাজ্য দিয়েছে সে সাম্রাজ্য আনারেব কাছে সকল ঐশ্বর্যের চেয়ে বেশী মূল্যবান—কিন্তু তুমি—

সেলিম। থাক্ থাক্ আনার, আমার মন এখন কানায় কানায় ভরে উঠেছে, এখন কোনও কথা বলো না, শুধু অনুভব করতে দাও—

[যোধপুরীর প্রবেশ]

যোধপুরী। আনারকলি—

আনার। (উঠে দাঁড়িয়ে সসম্ভ্রমে অভিবাদনপূর্বক) সম্রাজ্ঞী?

যোধপুরী। সেলিম!... তুমি এখানে কেন? আনারকলি, এসব কি?

সেলিম। (অভিবাদন ক'রে) তোমার পুত্রের সব অপরাধই চিরদিন মার্জনা করেছ মা, এটাও করো। আনারকলিকে আমি বিবাহ করব বলেই স্থির করেছি। তোমার ভাবী পুত্রবধূকে আশীর্বাদ কর।

যোধপুরী। (ক্ষণকাল নীরব থেকে) এত ক'রে নিষেধ করলাম অভাগী, তবুও সর্বনাশ ডেকে আনলি?

সেলিম। দোষ ওর নয় মা, দোষ আমার! ও আমায় দূরে রাখবার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিল কিন্তু আমিই জোর করেছি...আমি পারব না ওকে ছেড়ে দিতে।... কিন্তু তুমি কেন এত ভয় পাচ্ছ মা?

যোধপুরী। সেলিম তুমি সম্রাটপুত্র, ভয় তোমার কিছু নেই...কিন্তু ঐ বালিকাকে তুমি রক্ষা করতে পারবে?...মরবে না ও?

সেলিম। আমার যথাশক্তি ওকে রক্ষা করব। তুমিও তোমাব কন্যাকে রক্ষা ক'রো। তুমি পারবে মা।

যোধপুরী। ভগবান তোমাদেই রক্ষা করুন।—কিন্তু কেমন যেন এক অজ্ঞাত

আশঙ্কায় আমার মন ভরে উঠছে। আনারকলি, এ বোধ হয় না হলেই ভাল হ'ত।

আনার। আমি যতদূর সম্ভব নিজেকে দূরে রেখেছিলাম সম্রাজ্ঞী, কিন্তু কি যেন এক অজ্ঞাত নিয়তি আমায় টেনে নিয়ে এল।

যোধপুরী। (শিউরে উঠে) অজ্ঞাত নিয়তি,...তাই হবে! হয়ত এইই বিধি-লিপি...। যাই হোক, যা হবার তাই হবে, ভেবে কি করব। সেলিম, আনার, তোমরা এখন যাও। আমি সম্রাটের অপেক্ষা করছি, তিনি হয়ত এখনই এসে পড়বেন।

[সেলিম ও আনার অভিবাদন ক'রে প্রস্থান করল। যোধপুরী কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে রইলেন। পরে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বাইরের দিকে চাইলেন। নিঃশব্দে সম্রাটের প্রবেশ।]

আকবর। সম্রাজ্ঞীর শারীরিক কুশল তো?

যোধপুরী। (চমকে উঠে অভিবাদন ক'রে) কে, সম্রাট? কি সৌভাগ্য, সহসা এতদিন পরে যোধপুরীর স্বাস্থ্যের কথা মনে পড়ল!

আকবর। তা এ অনুযোগ তুমি করতে পার বটে। কিন্তু ভেবে দেখ, এই বিরাট সাম্রাজ্যের পরিচালনভার একমাত্র তোমার এই অধম স্বামীটির উপর। তোমার সাম্রাজ্যের সংবাদ নিতে নিতে তোমার সংবাদ যদি না-ই নিতে পারি প্রিয়তমে, তবে আমায় মার্জনা করাই উচিত। সবই তো তোমার মহিষী!

যোধপুরী। সম্রাট, আজ আমার মনে বড় শান্তি এল।

আকবর। ঈশ্বর করুন অহরহ তোমার মনে শান্তি আসুক, কিন্তু বিশেষ ক'রে এখন আসবার কারণটা জানতে পারি কি?

যোধপুরী। যোধপুরীকে দেখে এখনও যে সম্রাটের পরিহাস করবার সাধ যায়—একথা মনে হলে মন নিশ্চিন্ত হয়, মনে হয় বুঝি এখনও বার্ধক্য আসে নি।

আকবর। তোমার বার্ধক্য প্রিয়ে! এক-একটি বসন্ত তোমার দেহে রূপের সম্ভার বাড়িয়ে দিয়েই যাচ্ছে, তোমাকে দেখলে তোমাদের মহাভারতের স্থিরযৌবনা কুন্তীকে মনে পড়ে।

যোধপুরী। চাটুবাদে সম্রাটের অসাধারণ নৈপুণ্য অধীনীর জানা আছে। তার বিস্তৃত পরিচয় অনাবশ্যক।

আকবর। চাটুবাদ নয় বেগম। ওটা আমার অন্তরের কথা। দেখ না তাই আজও আমি অন্য কোন বেগমের দিকে চাইতেই পারি না।

যোধপুরী। খালি সময়ে সময়ে ক্রীতদাসীদের বিয়ে করতে—(কথাটা বলেই বুঝলেন বলা উচিত হয় নি)। বাজে কথা থাক সম্রাট, আপনার কি প্রয়োজন আছে

দাসীর সঙ্গে জানিয়েছিলেন ?

আকবর। প্রয়োজন ?··· দেখ সম্রাজ্ঞী, প্রয়োজন হয়ত অনেক থাকে কিন্তু তোমার সামনে এলেই প্রয়োজনের কথা ভুলে যাই। ভাল কথা, তোমার দাসী আনারকলির খবর কি, তার মন স্থির হ'ল ?

যোধপুরী। হাঁা সম্রাট, সে মন স্থির করেছে। আপনার অনুমতি হলে সে আপনার কাছে গিয়ে মার্জনা ভিক্ষা ক'রে আসবে।

আকবর। না না, মার্জনার আবশ্যক কি ? বরং তাড়াতাড়ি একটা বিয়ের দিন দেখে সেই ব্যবস্থাই—

যোধপুরী। আপনার আদেশ হ'লেই সে আয়োজন করতে পারি। সম্রাট-পুত্রের বিবাহের পূর্বে যে সব প্রচলিত প্রথা আছে—

আকবর। কার, কার বিবাহের— ?

যোধপুরী। সম্রাট-পুত্রের—সেলিমের। সেলিম অবশ্য আপনার কাছে অনুমতি প্রার্থনা করতে যাবে।

আকবর। সেলিমের—?

যোধপুরী। হাঁা সম্রাট, আনারকলি চিরকালই মনে মনে সেলিমকে কামনা ক'রে এসেছে, আর সেলিমও আনারকলিকে মনে মনে ভালবাসে। আনারকলির আভিজাত্য-হীনতার জন্য এতদিন আমি সম্মতি দিই নি। কিন্তু সম্রাট স্বয়ং যখন তাকে বিয়ে করতে চাইলেন তখন আমার মনের সব দ্বিধা ঘুচে গেল। আপনিও প্রসন্নমনে সম্মতি দিন সম্রাট।

আকবর। নিশ্চয়। নিশ্চয় এ সংবাদে আমার মনে বড় আনন্দ হ'ল। আমার এ পরিণত বয়সে ওসব কি পোষায় ? শুধু ওকে পুরস্কৃত করতে চেয়েছিলাম বৈ তো নয় ! সম্রাট-মহিষী না হয়ে না হয় তাঁর পুত্রবধূ—ও একই কথা ! একই কথা ! আমার সম্মতি রইল। হ্যাঁ, আমার সম্মতি রইল !

[প্রস্থানোদ্যত]

যোধপুরী। সম্রাটের কি প্রয়োজন ছিল যে ?

আকবর। এখন থাক্।

[প্রস্থান। যোধপুরী তাঁর প্রস্থানের পর কিছুক্ষণ সেই নিষ্ক্রমণ পথের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন। তাঁর মুখে ভীতির চিহ্ন ফুটে উঠল।···তিনি একটি দড়ি ধরে টানলেন]

[প্রহরীর প্রবেশ]

যোধপুরী। শাহ্‌জাদা সেলিমকে এই মুহূর্তে যেখান থেকে হোক খুঁজে নিয়ে আয়—বলবি আমার হুকুম।

[প্রহরীর প্রস্থান। যোধপুরী অধীরভাবে প্রতীক্ষা করতে লাগলেন]

[সেলিমের প্রবেশ]

সেলিম, সম্রাট এসেছিলেন! তাঁকে আমি তোমাদের বিবাহের অনুমতি চাইতে তিনি তৎক্ষণাৎ সম্মতি দিয়ে গেলেন। বিনা আপত্তিতে, মনে রেখো!

সেলিম। একটি বাধাও তুললেন না?

যোধপুরী। না, একটিও না।...সেলিম, আমি ভয় পাচ্ছি।...তুমি এক কাজ করো, এখনই একবার সম্রাটের সঙ্গে দেখা করো, তাঁর মৌখিক অনুমতি নিয়ে এস। আমি এধারে আয়োজন করি, যেমন ক'রেই হোক আজ রাত্রেই বিবাহ সেরে ফেলতে হবে। বিবাহ হয়ে গেলে অনেকটা নিরাপদ—কিন্তু তার আগে কিছুই বিশ্বাস নেই।

[প্রস্থান]

দ্বিতীয় দৃশ্য

প্রাসাদের একটি কক্ষ। আকবর ও নবী।

আকবর। মৌলবী সাহেবকে বলে আয় যে প্রাসাদের মধ্যে বা দিল্লী শহরে যত মোল্লা আছেন তাঁদের কাছে আমার আদেশ জানাতে যে আজ থেকে আগামী তিন দিন কোনও বিবাহে তাঁরা যেন যোগদান না করেন। কোনও মোল্লা যদি কোন বিবাহে যোগ দেন তাহলে তাঁর প্রাণদণ্ড হবে। আমার এই লিখিত আদেশ তাঁকে দেখাবে।... বাইরে সৈন্যাধ্যক্ষ এনায়েৎ খাঁ অপেক্ষা করছেন, যাবার সময় পাঠিয়ে দিয়ে যা।

[অভিবাদন করে নবীর প্রস্থান। একটু পরে এনায়েৎ খাঁর প্রবেশ]

আকবর। এনায়েৎ খাঁ! বাংলাদেশ থেকে এইমাত্র পত্র পেলুম সেখানকার বিদ্রোহ নাকি প্রবল আকার ধারণ করেছে। মহারাজা মানসিংহ একা সে বিদ্রোহ দমনে সমর্থ হচ্ছেন না, সেখানে অবিলম্বে সাহায্য পাঠানো আবশ্যক।...আমি স্থির করেছি আজ রাত্রেই শাহ্‌জাদা সেলিমের অধিনায়কত্বে এক বাহিনী সৈন্য প্রেরণ করব।

এনায়েৎ। আজ রাত্রেই?

আকবর। (একটু কঠিন স্বরে) হ্যাঁ, আজ রাত্রেই। আপনি এখনই যান, এক প্রহরের মধ্যে সমস্ত সৈন্য অস্ত্রশস্ত্রাদি রসদসুদ্ধ যেন যাত্রার জন্য প্রস্তুত থাকে। আপনার

অধীনে যে পাঁচ হাজার সৈন্য আছে তার সঙ্গে আহ্‌মেদ আলীর পাঁচ হাজার সৈন্য একত্র ক'রে নেবেন আর শাহ্‌জাদা সেলিমের সহকারী সেনাপতিরূপে আপনি যাবেন।

এনায়েৎ। আপনার আজ্ঞা অবশ্যই প্রতিপালিত হবে। কিন্তু সম্রাট মানসিংহের যদি সাহায্যের আবশ্যক হয়ে থাকে তো মাত্র দশ হাজার সৈন্য পাঠানো কি উচিত হবে? বিশেষতঃ এক প্রহরের মধ্যে দশ হাজার সৈন্যের সজ্জা প্রায় অসম্ভব।

আকবর। আপনি কি আমার আদেশ শুনতে পান নি?

এনায়েৎ। মার্জনা করবেন সম্রাট, এখনই যাচ্ছি···

আকবর। মুরাদ খাঁকে একবার এইখানে পাঠিয়ে দেবেন·· হ্যাঁ·· শুনুন এনায়েৎ খাঁ, মহারাজ মানসিংহের নামে একখানা পত্র আছে · আপনি গিয়ে সর্বাগ্রে এখানা তাঁকে দেবেন। সেলিমের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হবার আগে—মনে থাকে যেন।

[এনায়েৎ খাঁর প্রস্থান। সেলিমের প্রবেশ]

সেলিম। সম্রাট্!

আকবর। কে, সেলিম! এস, এস, তোমাকে আমার বিশেষ প্রয়োজন ছিল। তোমাকে আজ রাত্রেই বাংলাদেশে যাত্রা করতে হবে। দশ সহস্র সৈন্যসহ এনায়েৎ খাঁ তোমার সঙ্গে যাবেন।

সেলিম। আজ রাত্রে? বাংলাদেশে? সম্রাট—

আকবর। হ্যাঁ, বৎস। তুমি বিস্মিত হচ্ছ যে! হিন্দুস্তানের ভাবী সম্রাট অন্ধকার রাতকে ভয় করে তা জানতুম না তো!

সেলিম। সম্রাট আকবরের পুত্র ঈশ্বর এবং তার পিতা ছাড়া আর কাউকে ভয় করে না—এমন কি মৃত্যুকেও না।

আকবর। এই তো তোমার উপযুক্ত কথা বৎস। বড় সন্তুষ্ট হলুম।·· হ্যাঁ, তাহলে যাও। আর দেরি করো না, এক প্রহরের মধ্যে যাত্রা করতে হবে, প্রস্তুত হও গে।

সেলিম। কিন্তু সম্রাট—

আকবর (ভ্রূকুটি ক'রে) কিন্তু কি? বল—

সেলিম। সম্রাট, আমার বিবাহের আয়োজন প্রস্তুত। আমি আপনার অনুমতি প্রার্থনা করতে এসেছি। শুধু আজ রাতটা আমায় মার্জনা করুন।

আকবর। তোমার বিবাহ!···ওঃ—হ্যাঁ। সেই বাঁদী আনারকলির সঙ্গে তোমার বিবাহের কথা মহিষী বলছিলেন বটে। আমিও অনুমতি দিয়ে এসেছি। (খুব মোলায়েম স্বরে) তা বিবাহের জন্য এত তাড়াতাড়ি কি বৎস! ভেবে দেখ, বাংলায় সাম্রাজ্য বিস্তারের কথা স্বপ্নে পরিণত হবে যদি এই যুদ্ধে আমরা হেরে

যাই। মানসিংহ যে অবস্থায় আছেন, খুব শীঘ্র সেখানে সাহায্য পাঠাতে না পারলে আমাকে হয়ত অমন বিচক্ষণ সেনাপতিও হারাতে হবে। ··দশদিনের মধ্যে তোমার বাংলায় পৌছনো আবশ্যক। যেমন করেই হোক। সুতরাং আজকের রাত্রি বৃথা নষ্ট হতে দিতে পারি না। আর এক প্রহরের মধ্যে তোমার যাত্রা করতে হবে।··· আশীর্বাদ করি সত্বর বিজয়ী হয়ে ফিরে এস, তখন তোমার বিবাহ-উৎসব হবে তোমার পুরস্কার।

সেলিম। আজকের রাত্রিটুকু আমায় সময় দিন সম্রাট, আমি প্রতিজ্ঞা করছি পথে এই ক্ষতি আমি যেমন ক'রে-হোক পূর্ণ ক'রে নেব।

আকবর। (সোজা হয়ে—উদ্ধত কঠিনস্বরে) আমার আদেশ সেলিম।

[উত্তরের অবকাশ না দিয়ে বের হয়ে গেলেন। সেলিমের প্রস্থান]

[মুরাদ খাঁর প্রবেশ]

মুরাদ। এ কি! সম্রাট কোথায়?

[আকবরের প্রবেশ]

আকবর। সম্রাট প্রয়োজনের সময় যথাস্থানেই থাকেন মুরাদ খাঁ!

মুরাদ। (চমকে উঠে—অভিবাদন) সম্রাট তাঁর দাসকে স্মরণ করেছিলেন—

আকবর। হাঁা, স্মরণ করেছিলুম। মুরাদ খাঁ, আপনার প্রভুভক্তিতে আমি সন্তুষ্ট।

মুরাদ। (আর একদফা অভিবাদন) আমার সৌভাগ্য!

আকবর। (খানিকটা নিঃশব্দে পদচারণ করে) আপনার উপর আমার পরিপূর্ণ আস্থা আছে।

মুরাদ। আমার জন্ম সার্থক সম্রাট।

আকবর। আপনার উপর তাই এক অতি গোপনীয় কার্যের ভার দিতে চাই—আশা করি আপনি আমার বিশ্বাসের মর্যাদা রাখবেন।

মুরাদ। আমার মাথা দিয়েও আপনার বিশ্বাস বজায় রাখব।

আকবর। শুনুন—মহামান্যা যোধপুরী মহিষীর মহলে আনারকলি বলে এক বাঁদী আছে জানেন?

মুরাদ। জানতুম না। আজ শুনলাম তার কথা।

আকবর। কি শুনলেন?

মুরাদ। শাহজাদার সঙ্গে নাকি তাঁর বিবাহ হবে।

আকবর। হুঁ। সেই আনারকলিকে আজই শেষ-রাত্রে সকলকার অজ্ঞাতসারে

লাহোর দুর্গে সরিয়ে ফেলতে হবে। কেউ যেন না জানতে পারে। মনে থাকে যেন। যদি একথা প্রচার হয় আপনার প্রাণদণ্ড হবে। আর কার্য যদি সফল হয়, পাঞ্জাবের সুবেদারী আপনার।

মুরাদ। কেউ জানবে না।

আকবর। (দৃষ্টি কঠিন হ'ল) সেইখানে তাকে আজীবন বন্দী ক'রে রাখা হবে। জীবিত অবস্থায় সে সেখান থেকে আর বেরোবে না।...কিন্তু মনে থাকে যেন—কেউ জানবে না।

মুরাদ। তাই হবে সম্রাট।

আকবর। লাহোর দুর্গাধ্যক্ষের নামে এই চিঠি নিয়ে যান। সেখানে পৌঁছে তার জিম্মা ক'রে দিলেই আপনার ছুটি। ফিরে এসে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন।

মুরাদ। আপনার আদেশ শিরোধার্য।

তৃতীয় দৃশ্য

যোধপুরীর মহল। আনারকলির কক্ষ। আনারকলি আসন্ন বিবাহের আয়োজনে ব্যস্ত। যোধপুরী প্রসন্ন দৃষ্টিতে চেয়ে আছেন।

[সেলিমের প্রবেশ]

সেলিম। মা, হ'ল না।

যোধপুরী। হ'ল না—সে কি ?

সেলিম। সম্রাটের আদেশ, আর এক প্রহরের মধ্যে আমায় বাংলাদেশের উদ্দেশে যাত্রা করতে হবে।

যোধপুরী। (পাংশুমুখে) আজ রাত্রে—এখনই।

সেলিম। হাঁ, আজ রাত্রে, এখনই।

যোধপুরী। তার আগে—

সেলিম। সবটা এখনও শোন নি মা। দিল্লী শহরের কোন মোল্লা আগামী তিন দিনের মধ্যে কোন বিবাহ দিতে পারবেন না। সম্রাটের এই রকম আদেশ আছে।

যোধপুরী। সেলিম—(ঠোঁট দুটি কাঁপতে লাগল। কথা বের হ'ল না)

সেলিম। মা—(হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে) মোল্লা বিবাহ না দিলেও ঈশ্বর সাক্ষী ক'রে আর তোমায় সাক্ষী রেখে বলছি যে ও আমার ধর্মপত্নী। মা, তোমার পুত্রবধূকে তুমি রক্ষা করো।

যোধপুরী। আমার সাধ্যের বাইরে সেলিম—ঈশ্বরকে ডাক—যদি তিনি রক্ষা করতে পারেন।

সেলিম। তুমি আমাদের আশীর্বাদ কর—

[সেলিম হাত বাড়িয়ে দিলেন—আনারকলি হাত ধরে হাঁটু গেড়ে বসল]

যোধপুরী। ঈশ্বর আমার পুত্র-কন্যাকে রক্ষা করুন। এর চেয়ে বেশী বলার নেই।

[প্রস্থান]

সেলিম। আনার—

আনার। আমার অদৃষ্ট প্রিয়তম। আমি এ জানতুম। আমার নিয়তি আমাকে টেনে নিয়ে এল এই পথে। আমার আর রক্ষা নেই—

সেলিম। ওসব কথা কেন বলছ আনার?

আনার। বুঝতে পারছ না প্রিয়তম···সম্রাট এ বিবাহে কেন এমন ক'রে বাধা দিলেন!·· কিছুতেই হ'ল না। এ দেখেও কি সত্যটা বুঝতে পারছ না?···বুঝতে পারছ না আমার অদৃষ্টে কি আছে—অনুভব করছ না যে এই আমাদের শেষ দেখা। ···ছিঃ ছিঃ সেলিম, তুমি বীর, তোমার চোখে জল কেন? (মুছিয়ে দিয়ে)··· চোখের জল ফেলে আমাদের মিলনের এই স্বল্প অবসরটুকুকে ম্লান ক'রে তুলো না। পরিপূর্ণ ক'রে তোল প্রিয়তম, মিলনের এই উৎসবকে বিদায়ের আগে! এই যে তোমার আনার—তার নৃত্য গীত হাসিতে তোমার বিদায়ের পাত্রকে ভরে নিয়ে যাও, নাও—নাও—তোমার দাসীকে—

সেলিম। এবার তো তুমিই কাঁদছ আনার!

আনার। আমি—না—গান শুনবে? এই দেখ হাসছি!

সেলিম। গাও, গাও, আনার। হয়ত এই আমাদের শেষ দেখা—আমার জন্য যে গান রচনা করেছ তাই গাও—শুধু আমার জন্য—

আনার। শুনবে? শোন—

[গান : তবু মনে রেখো, যদি দূরে যাই চলে।]

শুনলে, শুনলে বন্ধু গান?

সেলিম। এ গান কেন গাইলে আনার? অন্য গান—আরও ভাল, আরও মধুর, কিন্তু এত দুঃখময় না হয় আনার, আমার বুক ফেটে কান্না বেরুচ্ছে, ভুলিয়ে দাও একটু-খানি সে বেদনাকে!

আনার। সেলিম, একবার ভাল ক'রে দাঁড়াও তুমি আমার সামনে, হয়ত চির-কালের মতো দেখা, বুক ভরে নিই তোমার ঐ রূপে—

সেলিম। আনার, কিন্তু আর যে সময় নেই। বিদায় দাও সখী, যাবার সময় হ'ল—

আনার। যাবে প্রিয়তম, যাও · (ছুটে এসে হাত ধরে) বল বল একেবারে ভুলে যাবে না তোমার আনারকে !

সেলিম। তুমি নিশ্চিন্ত হও প্রিয়তমে, আমার বুকের ভিতর যদি নজর চলে দেখতে পাবে সেখানে আগুনের অক্ষরে আনারকলির নাম লেখা রইল। সম্রাট-পুত্রের, দিল্লীর ভাবী সম্রাটের শপথ রইল তোমার স্মৃতিকে আমার মন মৃত্যুর পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত পূজা করবে। আর—আর, যদি সত্যিই কোন অনিষ্ট তোমার হয়, তার প্রতি-শোধ তোমার সেলিম নেবে—তাকে কোনও দিন মার্জনা করবে না।

আনার। যাও তুমি, মৃত্যুতে আর আমার কোন ভয় নেই। তোমার ভালবাসা পরপারের সব অন্ধকারকে নিমেষে দূর করবে—

সেলিম। (হাঁটু গেড়ে সামনে বসে পড়ে) আমায় মার্জনা করতে পারবে আনার ! যদি তোমার কোন বিপদ ঘটে— আমিই তার কারণ।

আনার। (তার গলা জড়িয়ে) তুমি পাগল ! যেটুকু পেলুম, আনারের জীবনে তা সহস্র মৃত্যুর চেয়ে মূল্যবান নয় কি ?

সেলিম। তবে যাই…

[প্রস্থানোদ্যত]

আনার। (আর্তস্বরে) সেলিম, সেলিম, একটু—আর একটুখানি—

[সেলিম ছুটে এলেন। মুহূর্তে দুজনে আলিঙ্গনাবদ্ধ হলেন। অনেকক্ষণ পরে—]

সেলিম। (চুপি চুপি) তবে যাই প্রিয়ে—

[প্রস্থান]

[আনারকলি মেঝেতে পড়ে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল। কৃষ্ণবর্ণ পোশাক পরে মুরাদ খাঁর প্রবেশ। একটা কালো চাদর পিছন থেকে আনারের গায়ে ফেলে দিল। সব আলো নিমেষে নিভে গেল।]

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

বাংলার যুদ্ধশিবির। মানসিংহ ও এনায়েৎ খাঁ।

মানসিংহ। কি বলছ এনায়েৎ খাঁ ! আমি যে কিছুই বুঝতে পারছি না। দশ হাজার সৈন্যসুদ্ধ সেলিমকে সম্রাট পাঠিয়েছেন আমার সাহায্যার্থে ? আমি চেয়ে

পাঠিয়েছি? আমি বিপদগ্রস্ত? এখানে এখন যুদ্ধ কোথায় যে আমি বিপদগ্রস্ত হব! তুমি কি পরিহাস করছ?

এনায়েৎ। পরিহাস করছি কি না সম্রাটের চিঠি পড়ে দেখুন!

মানসিংহ। সেলিম কোথায়?

এনায়েৎ। পিছনে আসছেন। আমি প্রাণপণে ঘোড়া ছুটিয়ে একটু আগে এসেছি। সম্রাটের আদেশ ছিল শাহ্‌জাদার সঙ্গে মহারাজের সাক্ষাৎ হবার আগে এই পত্র মহারাজার হস্তগত হওয়া চাই।

মানসিংহ। কই, চিঠি দেখি? (এনায়েৎ খাঁ পত্র দিলেন। পড়ে) এনায়েৎ খাঁ! তোমায় আমি বিশ্বাস করি তাই তোমায় বলছি, শোন দেখি, এ চিঠির মর্ম কিছু বুঝতে পার কিনা:

'মহারাজা, আপনি ওখানে যুদ্ধের জন্য যে সৈন্য প্রার্থনা করিয়াছেন তদনুসারে দশ সহস্র সৈন্য পাঠাইতেছি। শাহ্‌জাদা সেলিমকে ঐ সৈন্যের অধিনায়কস্বরূপ পাঠাইলাম। শাহ্‌জাদা কিছুদিন আপনার অধীনে থাকিয়া যুদ্ধ শিখুন—আমার এই ইচ্ছা। উঁহাকে এখন তাড়াতাড়ি দিল্লীতে পাঠাইবার আবশ্যক নাই।'

বুঝলে কিছু?

এনায়েৎ। না, আমার বুদ্ধির অগোচর।

মান। হুঁ। আচ্ছা, দিল্লী প্রাসাদের সব চেয়ে আশ্চর্য খবর এর মধ্যে কি আছে বলতে পার? তুমি যাত্রা করার আগে কি শুনে এসেছ?

এনায়েৎ। আশ্চর্য খবর আর কি।...এর মধ্যে...আশ্চর্য খবর · এক খুশ্‌-রোজের মেলাতে একটা জনরব শুনেছিলাম বটে...তা সে...

মান। হ্যাঁ, হ্যাঁ সেই জনরব।.. আমার মনেই ছিল না যে এর মধ্যে নওরোজের...মেলা হয়ে গেছে.. কি জনরব বল দেখি?

এনায়েৎ। জনরব শুনেছিলাম, যে খুশ্‌রোজের মেলাতে নাকি সম্রাট যোধপুরী বেগমের এক ইরানী বাঁদীকে দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। এমন কি তিনি তাকে বিবাহ করতেও চেয়েছিলেন, কিন্তু সেই বাঁদী রাজী হয় নি—

মান। তারপর, তারপর—থেমো না বলে যাও—আমি ক্রমশঃ উত্তেজিত হয়ে উঠছি—। সম্রাট যথারীতি তাকে বিবাহ করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু সে রাজী হয় নি, তারপর—?

এনায়েৎ। শাহ্‌জাদা সেলিমও ঐদিন তাকে দেখতে পান এবং তিনিও—

মান। বুঝেছি তিনিও—। তারপর?

এনায়েৎ। বাঁদী সম্রাটকে প্রত্যাখ্যান করলেও সম্রাট-পুত্রকে করে নি। উভয়েই উভয়ের প্রতি আসক্ত হয়, ফলে উভয়ের বিবাহ স্থির হয়। যেদিন বিবাহ হবার কথা, সেইদিনই সহসা যাত্রা করতে হ'ল বলে—

মান। (যেন কথা কেড়ে নিয়ে) সেদিন বিবাহ হয় নি? সেলিম ফিরলে হবে, কেমন তো? বাস্, সমস্ত ব্যাপারটা জলের মতো সহজ হয়ে গেল! এনায়েৎ খাঁ, তুমি এত বৎসর বিশ্বস্ত ভাবে কাজ করলে—তবু কেন যে তোমার পদোন্নতি হ'ল না তা আজ বুঝলুম।

এনায়েৎ। কেন মহারাজ?

মান। তোমার নির্বুদ্ধিতা। নইলে দিনের আলোর মতো স্পষ্ট এই ব্যাপারটা বুঝতে তোমার এত বিলম্ব হয়। না, এমন গুরুতর ব্যাপারটা তোমার গোড়াতে বিস্ফরণ হয়!

এনায়েৎ। আমি যে এখনও ব্যাপারটা বুঝতে পারছি না।

মান। তুমি একেবারে নেহাৎ—কি বলব। থাক। এটা কিছুই না, শুধু সেলিমকে কিছুদিনের জন্য বাইরে সরিয়ে দেওয়ার ছল মাত্র। তাড়াতাড়ি ফিরে যেতে না পারে, তারই ভার আমার ওপর দেওয়া হয়েছে। "উহাকে এখন তাড়াতাড়ি দিল্লীতে পাঠাইবার আবশ্যক নেই"... হুঁ!

এনায়েৎ। তাতে সম্রাটের লাভ?

মান। সেলিমের অনুপস্থিতিতে তিনি বাঁদীকে লাভ করার সুযোগ পেতে পারেন—সেলিমও ততদিনে ভুলে যেতে পারে। মোটামুটি এই মনে হয়, তবে আরও কিছু উদ্দেশ্য থাকতে পারে অবশ্য, মেয়েটার যদি ভীষণ রকমের মন্দভাগ্য হয়—

এনায়েৎ। তার মানে? মৃত্যু?

মান। আরও ভীষণ রকমের কিছু! যাক্, ওসব কথাতে আমাদের আর দরকার নেই—।

এনায়েৎ। উঃ, কি ভীষণ চাল—।

মান। এটুকু শিখলে এই বিরাট সাম্রাজ্যের মালিক তুমিও হতে পারতে।

[দ্বারীর প্রবেশ]

দ্বারী। শাহ্‌জাদা সেলিম আসছেন—

[দ্বারীর প্রস্থান। সেলিমের প্রবেশ। উভয়ের অভিবাদন]

মান। আসুন শাহ্‌জাদা!

সেলিম। মহারাজ, আপনার কুশল তো?

মান। পরম করুণাময় জগদীশ্বর এবং স্নেহময় দিল্লীশ্বরের কৃপায় আপাততঃ কুশল বটে, কিন্তু সম্প্রতি এই বিদ্রোহ নিয়ে বড়ই কষ্ট পাচ্ছি।

এনায়েৎ। এই যে আপনি বলছেন মহারাজা, এখানে এখন যুদ্ধ—

মান। এনায়েৎ খাঁ। আপনি পথশ্রমে ক্লান্ত, আপনি বিশ্রাম করুন গে। শাহ্‌জাদা আপনিও এখন বিশ্রাম করুন···এই কদিনে আপনাকে এতখানি পথ অতিক্রম করতে হয়েছে, আপনি নিশ্চয়ই অত্যন্ত ক্লান্ত হয়েছেন—এখন আর যুদ্ধ-বিগ্রহের কথা নয়—

সেলিম। আমি এত ক্লান্ত—দেহে এবং মনে যে আমি সত্যিই বসে থাকতে পর্যন্ত পারছি না—

[দ্বারীর প্রবেশ]

দ্বারী। জাঁহাপনা, এক ব্রাহ্মণ দিল্লী থেকে এসে পৌঁচেছেন এইমাত্র। শাহ্‌জাদার সঙ্গে দেখা করতে চান। হজরৎ বাদশাবেগম নাকি শাহ্‌জাদার কল্যাণের জন্য কি আশীর্বাদী পাঠিয়েছেন···

মান। (ভীষণ ব্যস্ত হয়ে) এখন কিছুতেই দেখা হবে না, কোনও রকমে তার সঙ্গে দেখা হতে পারবে না। হয়ত শত্রুপক্ষের গুপ্তচর, কী মন্দ উদ্দেশ্য আছে··

দ্বারী। তার কাছে শাহ্‌বেগমের পাঞ্জা রয়েছে।

মান। চুরি ক'রেও তো আনতে পারে! তাছাড়া শাহ্‌জাদা এখন অত্যন্ত ক্লান্ত—এখন তাঁকে বিরক্ত করতে দিতে কিছুতেই পারি না। আগে আমি তাকে পরীক্ষা করে দেখি, তারপর শাহ্‌জাদার সঙ্গে দেখা হবে—যা, তাকে আমার মন্ত্রণা-ঘরে নজরবন্দী করে রাখ্‌—।

সেলিম। আস্তে মহারাজ।···দিল্লী থেকে এসেছে, মা পাঠিয়েছেন।·· দ্বারী, আমি এখনই তার সঙ্গে দেখা করব, এইখানেই। তাকে নিয়ে এস আর আমার শরীররক্ষীর সেনানায়ক মীরহবিব বাইরে অপেক্ষা করছেন, তাঁকে পাঠিয়ে দাও—

মান। শাহ্‌জাদা আপনি বুঝতে পারছেন না—

সেলিম। আমি বুঝতে পেরেছি মহারাজা।

মান। কতরকম বিপদ হতে পারে ঐ থেকে—

সেলিম। (কঠিন স্বরে) মহারাজা মানসিংহ। আমি তৈমুরের বংশধর—সম্রাট আকবরের পুত্র। বিপদ শব্দের অর্থ জানি না!···আমি বড় ক্লান্ত, আমি এইখানেই ওর সঙ্গে দেখা করব···যদি আপনারা দয়া ক'রে—

মান। আপনার যা অভিরুচি শাহ্‌জাদা, এস এনায়েৎ খাঁ।

[এনায়েৎ ও মানসিংহের প্রস্থান। দ্বারী, ব্রাহ্মণ ও মীরহবিবের প্রবেশ]

সেলিম। (দ্বারীকে) তুমি যেতে পার।

[দ্বারীর প্রস্থান]

মীরহবির, তুমি পাহারায় থাক, যেন কোনও লোক আমাদের কথাবার্তার সময় আড়াল থেকে না শোনে। যদি কেউ শোনবার চেষ্টা করে, তাকে তৎক্ষণাৎ বধ করবে—তা সে যত বড়ই পদস্থ হোক।

[মীরহবিবের প্রস্থান]

ব্রাহ্মণ, তুমি মায়ের কাছ থেকে আসছ? তোমায় যেন প্রাসাদে দেখেছি বলে মনে হচ্ছে!

ব্রাহ্মণ। হ্যাঁ, শাহ্‌জাদা। আমি আপনার মায়ের পূজারী।

সেলিম। মায়ের চিঠি এনেছ?

ব্রাহ্মণ। না। যে গুরুতর সংবাদ আমি বহন ক'রে এনেছি তা চিঠিতে পাঠানো অত্যন্ত বিপজ্জনক। যা বক্তব্য তিনি মুখে বলে দিয়েছেন।...নিদর্শন-স্বরূপ পাঞ্জা আর এই আংটি পাঠিয়েছেন।

[সেলিম নিদর্শন পরীক্ষা করে সসম্ভ্রমে মাথায় ঠেকালেন]

সেলিম। এ আংটি আমি চিনি, এ মায়েরই বটে। বল, কি বলবে!

ব্রাহ্মণ। শাহ্‌জাদা অত্যন্ত মর্মান্তিক কথা আমায় বলতে হবে। আপনি মন প্রস্তুত করুন।

সেলিম। ব্রাহ্মণ, সারা পথ আমি সংশয়ে দগ্ধ হতে এসেছি—এখনও তোমার কথার সারাংশ অনুমান করতে পারছি। তুমি শীঘ্র বল—।

ব্রাহ্মণ। শাহ্‌জাদা, সেদিন আপনি সসৈন্যে প্রাসাদ ত্যাগ করবার পরই সম্রাজ্ঞী আনারকলির ঘরে গিয়েছিলেন কিন্তু তাকে দেখতে পান নি। তারপর সমস্ত রাত্রি ধরে তন্নতন্ন ক'রে খুঁজেও আনারকলিকে কোথাও পান নি। কেউ সংবাদ দিতে পারে নি সে কোথায়। সারা রাত্র বৃথা চেষ্টার পর সম্রাজ্ঞী প্রত্যূষে পাঠিয়েছেন আপনাকে সংবাদ দেবার জন্য। তাঁর আদেশ ছিল আপনি এখানে পৌঁছবার আগে আপনার কাছে যেন সংবাদ পৌঁছয়, কিন্তু বহু চেষ্টা ক'রেও তা পারি নি, আমায় মার্জনা করবেন।

সেলিম। (কিছুক্ষণ বিমূঢ় স্তব্ধভাবে বসে থেকে) আনার নেই! তাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না!...মীরহবিব?

[মীরহবিবের প্রবেশ]

মীর। শাহজাদা ডাকছিলেন ?

সেলিম। মীরহবিব, তুমি শুধু আমার কর্মচারী নও, আমার বন্ধু। আমি ভীষণ বিপদগ্রস্ত, আমায় সাহায্য করতে পারবে ?

মীর। মানুষের শক্তিতে যতদূর সম্ভব তা আমি করব, তার বেশী অসম্ভব।

সেলিম। তোমার দেহরক্ষী সৈন্যরা এখনই দিল্লীর পথে যাত্রা করতে পারবে ?

মীর। যাত্রা তারা জাঁহাপনার আদেশ পেলেই করবে, কিন্তু কজন শেষ পর্যন্ত দিল্লী পৌছবে সেই বিষয়ে একটু সন্দেহ আছে। তারা অত্যন্ত ক্লান্ত শাহজাদা।

সেলিম। তাদের মধ্যে এমন বলিষ্ঠ কজন আছে তুমি মনে কর, যারা শেষ পর্যন্ত পৌছবে ?

মীর। একশো জন হতে পারে।

সেলিম। বেশ, ঐ একশো হলেই চলবে। তুমি সেই একশো জন লোককে এখনই প্রস্তুত কর গে। বাকি সব সৈন্য যেন কাল যাত্রা করে। আর এই ব্রাহ্মণকে তুমি নিজে সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাও—ইনিও ওদের সঙ্গে কাল যাবেন। এঁর নিরাপদে পৌছনোর জন্য তারা দায়ী, মনে থাকে যেন। ব্রাহ্মণ, এই মুক্তার মালা নিন আপনার সম্মান।

[মানসিংহের প্রবেশ]

মান। শাহজাদা, এইবার আসুন বিশ্রাম করবেন।

সেলিম। আমার আর বিশ্রাম অদৃষ্টে নেই মহারাজা, আমি এই মুহূর্তে দিল্লী যাত্রা করব।

মান। সে কি শাহজাদা ?

সেলিম। দিল্লীতে আমার বিশেষ কাজ আছে—

মান। কিন্তু তার থেকেও জরুরী কাজের জন্য সম্রাট আপনাকে এখানে পাঠিয়েছেন যে।

সেলিম। সৈন্যরা রইল, এনায়েৎ খাঁ রইল, আর বিশেষতঃ আপনি রইলেন।

মান। কিন্তু আপনারও তো প্রয়োজন আছে বলেই সম্রাট পাঠিয়েছেন—

সেলিম। মহারাজা ! বৃথা বাক্যব্যয় ক'রে কোন লাভ নেই—যে কুৎসিত ষড়যন্ত্র ক'রে আপনারা আমায় টেনে এনেছেন তা আমি জানতে পেরেছি। আমি আপনাদের ও প্রয়োজন জানি।

মান। তাহলে এটাও জানেন নিশ্চয় যে আপনাকে এখন দিল্লীতে যেতে দিতে

সম্রাটের নিষেধ আছে!

সেলিম। একজন সম্রাটের আদেশ কেন, সহস্র সম্রাটের আদেশও আজ আমায় ধরে রাখতে পারবে না—

মান। শাহ্‌জাদা, সম্রাটের আদেশ খুব স্পষ্ট। আপনি বিশ্রাম করবেন চলুন—

সেলিম। মহারাজা, আমার ইচ্ছা আরও স্পষ্ট।

মান। আমি হয়ত বলপ্রয়োগ করতে বাধ্য হব।

সেলিম। সাধ্য থাকে করুন। · মহারাজা, আপনি বাতুল, নইলে এমন কথা মুখে আনতে পারতেন না। আপনি কি মনে করেন যে কোনও সৈন্য আপনার আদেশে তার শাহ্‌জাদার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করবে?…আর যদিও করে, তবুও আমি যাব—সহস্র শৃগালের ভয়ে সিংহ কখনও নিজের কাজ ভুলে যায় না। মীরহবিব, আমার শরীর-রক্ষীদের যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করো গে!

[মীরহবিব ও ব্রাহ্মণের প্রস্থান]

আমাকে ভয় দেখাবার চেষ্টা আপনি আগেও বারকয়েক করেছিলেন…। আপনি আমার বংশমর্যাদা ভুলে যাচ্ছেন বোধ হয়।…

মান। সামান্য কারণে রাজরোষ ডেকে আনছেন শাহ্‌জাদা!

সেলিম। শুধু রাজরোষ নয়, ঈশ্বরের রোষকেও আমি তুচ্ছ মনে করি যদি সে রোষ অন্যায় হয়। আর তুচ্ছ কারণ বলছেন! আমার স্ত্রী, আমার কিশোরী বধূ, যার একমাত্র অপরাধ সে আমায় ভালবেসেছে, তার ওপর এই নৃশংস অত্যাচার হচ্ছে আর আমি এখানে সেই অন্যায়কারীর ক্রোধের ভয়ে চুপ ক'রে বসে থাকব? সে আমায় বারণ করেছিল, মা আমায় নিষেধ করেছিলেন কিন্তু আমি শুনি নি—সে জানত তাকে রাজরোষ থেকে রক্ষা করবার শক্তি আমার নেই, তবুও সে আমারই ইচ্ছায় আত্মসমর্পণ করেছিল। কী বলছেন মহারাজ, আমি এইখানে, আমার প্রাণের ভয়ে, চুপ ক'রে বসে শুধু মনে মনে তার অসহায় মুখ কল্পনা করে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলব! সেই বালিকা, সে হয়ত এখনও একান্ত বিশ্বাসে ভাবছে তার স্বামী তাকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার করবেই, আর আমি প্রাণের ভয়ে এইখানে চুপ ক'রে বসে থাকব? মহারাজা মানসিংহ, সম্রাট আকবর যদি আজ এই মুহূর্তে তাঁর সমস্ত বাহিনী নিয়ে আমার পথ রোধ ক'রে দাঁড়ান, তবুও আমি যাব—পৃথিবীর শেষ প্রান্ত থেকেও আমার প্রিয়তমাকে খুঁজে আনব—আমার আনার—আমার স্ত্রী—

[প্রস্থান]

এনায়েৎ। মহারাজা, এখন কি করবেন?

মান। কিছুই না। সম্রাট বরং এ অপরাধ মার্জনা করবেন কিন্তু সেলিমের গায়ে অস্ত্রাঘাত করলে তিনি কিছুতেই মাপ করবেন না।···আর ও যেরকম ক্ষেপেছে, ওকে শুধু ভয় দেখিয়ে বাগানো যাবে না—। আমি খালি ভাবছি সম্রাটের কথা, তিনি বড় ভুল করলেন।

[প্রস্থান]

দ্বিতীয় দৃশ্য

লাহোর দুর্গ। দুর্গের পিছনের উদ্যান। আনারকলি পশ্চিমের আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে।

আনার। দিনের পর দিন কেটে যায়—রাত্রির পর রাত্রি কাটে—তোমার আনার যে বড় একা প্রিয়তম। শুনতে পাচ্ছ না প্রভু তার এই আবেদন, অনুভব করছ না তার নিঃসঙ্গতা, তার ব্যথা? এস সখা, এস গো!···আমার সব দুঃখ আনন্দ হয়ে উঠত যদি নিমেষের জন্য আর একবার তোমার দেখা পেতাম! কে জানে তুমি কোথায় আছ? তুমিও নিশ্চয়ই সুখে নেই, তাই আমার দুঃখ—আমার জন্য তুমি কষ্ট পাবে—সে যে আমি ভাবতেও পারি না।

[মুকুন্দীনের প্রবেশ]

মুকু। কন্যা, আজও তুমি কিছু খাও নি শুনে বড় ক্ষুব্ধ হলুম।

আনার। পিতা, আমার কিছুমাত্র ক্ষুধা নেই। আমায় মাপ করবেন।

মুকু। বৎসে, তোমা এরই মধ্যে এত হতাশ্বাসের কোনও কারণ নেই, তোমার স্বামী শাহ্‌জাদা সেলিম তোমার সংবাদ পাবেনই। প্রেমিকের কাছ থেকে তার প্রিয়তমাকে বিচ্ছিন্ন ক'রে রাখতে পারে—দুনিয়ায় এমন কোন শক্তি নেই মা।

আনার। আমার জন্য শাহ্‌জাদকে সম্রাটের সঙ্গে বিবাদ করতে হয়—এ আমি কোনও দিনই চাই নি। আমার আর বাঁচতে সাধ নেই—আমি বেঁচে থাকলে এ বিবাদ অবশ্যম্ভাবী।···ছি পিতা, সে বড় চিন্তা করবে। যদি শুধু এইটুকু সংবাদ তাকে পাঠাতে পারতুম আমার জন্য চিন্তা যেন সে না করে, তাহলে সুখে মরতে পারতুম।···আপনাকে পিতৃ-সম্বোধন করেছি, আপনার কাছে সত্য ক'রে বলছি অন্য কোনও কথা লিখব না শুধু এইটুকু সংবাদ তার কাছে পাঠাতে পারেন না? এ স্থানের আভাস পর্যন্ত দেব না—

মুকু। যদি এ কাজে শুধু আমারই জীবন বিপন্ন হ'ত, তাহলে আমি হাসি মুখে

করতুম মা—কিন্তু সম্রাটের আদেশ আছে, যদি কোনও রকমে তোমার সংবাদ বাইরের কোনও লোক পায় বা তোমার কাছ থেকে কোনও রকম চিঠি বাইরে পৌঁছয় তাহলে শুধু আমি নয়, আমার স্ত্রী পুত্র পরিবার—এমন কি আমার আত্মীয় ও বন্ধুরা পর্যন্ত সপরিবারে নিহত হবেন।

আনার। (শিউরে) তবে থাক্‌, আমার প্রয়োজন নেই। ইহজীবনে অনেক লোকের দুঃখের কারণ হয়েছি আর হ'তে চাই না।...আমার মায়ের মতো বেগম-সাহেবা, তিনি হয়ত কেঁদে আকুল হচ্ছেন—তিনিও যদি একটা সংবাদ পেতেন।

মুরু। কিন্তু মা, সংবাদ তাঁরা পাবেনই—তুমি আর কিছুদিন ধৈর্য ধর মা। এতটা অনাচার ভগবান সইবেন না কখনও। কিন্তু তুমি এ-রকম অনাহারে কতদিন থাকবে!

আনার। আমাকে মরতেই হবে। আমায় বাঁচতে অনুরোধ করবেন না।

মুরু। (কিছুক্ষণ ইতস্ততঃ ক'রে) একটা কথা তোমাকে জানাবার আদেশ ছিল। আমি দাস মাত্র, সম্রাটের আদেশ প্রতিপালন করতে আমি বাধ্য—

আনার। বলুন না, আপনি অত কুণ্ঠিত হচ্ছেন
কারাবাসকে স্বচ্ছন্দ ক'রে তুলেছে, আপনি ত
আমার কাছে আপনার কোন সঙ্কোচের কারণ নে

মুরু। সম্রাট আকবর তোমায় জানাতে বলে
ভুলে যাও, সম্রাটকে বিবাহ করতে সম্মত হও, তাহ
বিশেষ প্রাসাদ তৈরি ক'রে দেবেন। তোমাকে
তোমার গর্ভে যদি কোনও সন্তান হয়, তাহলে সে পা
সেলিমের সাম্রাজ্য থেকে ঐ দুটি প্রদেশ পৃথক ক'রে
জীবদ্দশায় পাঞ্জাব প্রদেশ তোমারই কর্তৃত্বাধীনে থাক
সঙ্গেই এই প্রদেশ পাবে যৌতুক। তা ছাড়া একশত
ভাণ্ডারের সমস্ত মণিমাণিক্যের মধ্যে থেকে তুমি তো
নেবে—

আনার। পিতা থাক্ থাক্, মানুষের কুৎসিত লো
হয়ে আসছে—

মুরু। সম্রাটকে তাহলে আমি কি উত্তর দেব মা?

আনার। সম্রাটকে আপনি বলবেন পিতা, আনারসী হলেও এ ঐশ্বর্য ও সম্মানে পদাঘাত করার মতো মনোবল তার আছে।...র আনার ধর্মতঃ তাঁর

পুত্রবধূ—এরকম কুৎসিত প্রস্তাব শুনলে তাঁর প্রজারা ভাবতেও পারবে না যে এই লোক তাদের সম্রাট!

কুক। তোমার যা ইচ্ছা মা—

[প্রস্থান]

আনার। তবে তাই হোক প্রিয়তম। আর তোমার দর্শন আমি চাই না—তাতে তোমার বিপদ ঘটবে। তুমি আমার অন্তর ভরে আছ, তাই থাকো, চিরদিন ধরে—যুগযুগান্ত ধরে—অন্তরের মধ্যে চলুক আমাদের নিত্য মিলনোৎসব স্বামী।

তৃতীয় দৃশ্য

দিল্লী প্রাসাদ। আকবর ও নবী।

আকবর। তোমায় যে ঘর ঠিক করতে বলেছিলাম করেছ?

নবী। হ্যাঁ, শাহ্‌নশাহ। ঐ পাশের বন্ধ ঘরখানাতে তিনটে তীব্র বিষধর সাপ রেখে দিয়েছি। কাল থেকে তারা উপবাসী আছে। প্রথম যে লোক তাতে প্রবেশ করবে তার মৃত্যু অনিবার্য্য।

আকবর। তুমি বাইরে অপেক্ষা করো। মুরাদ খাঁ খুব সম্ভব এখনই উপস্থিত হবেন। সোজা তাঁকে এইখানে পাঠিয়ে দেবে।

[নবী অভিবাদন ক'রে প্রস্থান করল]

মুরাদ খাঁর অভ্যর্থনার আয়োজন খুবই পরিপাটী হয়েছে—। আনারকলিকে কোথায় সরানো হ'ল, এক আমি ছাড়া অন্য কোনও জীবিত ব্যক্তি জানে—এ আমার ইচ্ছা নয়। মুরাদ খাঁ, পাঞ্জাবের সুবেদারীর লোভ আপাততঃ ত্যাগ করতেই হবে বোধ হয় তোমাকে।

[মুরাদ খাঁর প্রবেশ]

মুরাদ খাঁ, আপনি কার্য উদ্ধার ক'রে ফিরেছেন?

মুরাদ। হ্যাঁ, সম্রাট।

আকবর। আপনার কার্যের কথা কোনও দ্বিতীয় ব্যক্তি জানে?

মুরাদ। লাহোর দুর্গাধ্যক্ষ ছাড়া আর কেউ জানে না সম্রাট। এই নিন তাঁর চিঠি—

[পত্র দান

আক। আমি সব খবর বিস্তৃতভাবে জানতে চাই—কিন্তু এ স্থান নিরাপদ নয়। আপনি ঐ দক্ষিণদিকের গুপ্ত ঘরটায় অপেক্ষা করুন, আমি যাচ্ছি। নবী—

[নবীর প্রবেশ]

এঁকে ঐ ঘরে নিয়ে গিয়ে বসাও।

[উভয়ের প্রস্থান]

(পত্র পড়তে পড়তে) মুরুদ্দীনের হাতের লেখা আমি জানি। এ তারই লেখা বটে—

[নেপথ্যে একটা চাপা আর্তনাদ শোনা গেল]

যাক। বাকী রইল মুরুদ্দীন, সে সাহস করবে না আনারকলির সংবাদ আর কাউকে জানাতে। মুরাদ খাঁ, তোমার প্রভুভক্তির পুরস্কার এইভাবে দিতে হ'ল, সেজন্য আমি দুঃখিত। কিন্তু কি করব! আমার সুনাম তোমার প্রাণের চেয়েও অনেক বড়। আমার ইচ্ছা—আনারকলির নাম পর্যন্ত বিলুপ্ত হয়ে যাক।

[নবীর প্রবেশ]

মুরাদ খাঁ!

নবী। হ্যাঁ, সম্রাট। সে সরল বিশ্বাসে ঘরে ঢুকেছিল। কিন্তু পা দেওয়ামাত্র একসঙ্গে দুটি সর্প তাকে দংশন করে—

আকবর। আচ্ছা তুমি যাও। ঐ ঘরের দুয়ারসুদ্ধ গেঁথে দেবে। সর্প আর তাদের আহার্য দুয়েরই সমাধি হয়ে যাক—

[নবীর প্রস্থান]

আনারকলি আকবরের কামনায় যদি এমনভাবে বাধা না দিতে, তাহলে হয়ত এতগুলো লোকের জীবন বিপন্ন হ'ত না—

[প্রস্থান]

[অপর দিক দিয়ে যোধপুরী ও একজন বাঁদীর প্রবেশ]

যোধ। আমি সংবাদ পেলাম সেলিম এইমাত্র প্রাসাদে এসে পৌচেছে। সে নাকি সোজাসুজি সম্রাটের সঙ্গে দেখা করবার চেষ্টা করছে। কিন্তু তার আগে আমার সঙ্গে তার দেখা হওয়া চাই যে। তুই খুঁজে দেখ্—এইখানেই নিশ্চয় কাছাকাছি কোথাও থাকবে—

[বাঁদীর প্রস্থান]

হে ভগবান, পিতা-পুত্রে বিবাদ না বাধে!

[সেলিমের প্রবেশ]

সেলিম!

সেলিম। মা। আমার আনারকলি কৈ ?

যোধ। সে উত্তর কিছুদিন আগে আমার দেওয়া সম্ভব ছিল বৎস। কিন্তু তুমি তাকে জোর ক'রে আমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছ। তাকে রক্ষা করার দায়িত্ব এখন তোমায়। ও প্রশ্ন এখন আমি করব।

[সেলিম নতমুখে দাঁড়িয়ে রইলেন]

সেলিম। আমি তোমায় তিরস্কার করতে চাই না। শুধু সাবধান ক'রে দিতে চাই। যৌবনের এ স্বপ্ন ক্ষণিকের—এ নেশা একদিন ছুটে যাবেই—তখন মনে হবে সাম্রাজ্য আনারকলির চেয়ে অনেক—অনেক বড়। আমি মা, তোমায় পশ্চাত্তাপ না করতে হয় এ বিষয়ে সতর্ক করা আমার কর্তব্য।

সেলিম। মা, সব মুঘল বংশধর হয়ত সাম্রাজ্যকে তার স্ত্রীর চেয়ে বড় দেখে না। তোমার সেলিম অন্ততঃ মনের উপর সাম্রাজ্যকে কখনও ঠাঁই দেবে না, এ বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থাক।

যোধ। তুমি সাম্রাজ্য পাও বা না পাও তাতে তোমার জননীর কোনই ক্ষতিবৃদ্ধি নেই বৎস। হিন্দুর মেয়ে হয়ে যেদিন মুঘলের অন্তঃপুরে ঢুকেছি, সেইদিনই ইহলোকের সমস্ত আশা ভরসা নিঃশেষে ত্যাগ করেছি। ভাবি শুধু তোমার জন্য। তাছাড়া শুধু সাম্রাজ্যই বড় কথা নয়, তোমার জীবনও বিপন্ন হতে পারে। পিতা-পুত্রে বিবাদ না বাধে জননীর এই আশঙ্কা।

[সম্রাটের প্রবেশ]

আকবর। সম্রাজ্ঞী এখানে ? তুমি তোমার পদমর্যাদা বিস্মৃত হয়েছ দেখে আমি ক্ষুব্ধ হচ্ছি। এ স্থান তোমার অন্তঃপুরের সীমানাব বাইরে তা জান বোধ হয় ?

সেলিম। পুরুষ যদি নিজের পদমর্যাদা বিস্মৃত হয়ে ঢের—ঢের বেশী কুৎসিত কর্ম করতে পারে—তাহলে সামান্যা রমণীর পক্ষে অন্তঃপুরের অবগুণ্ঠন মোচন ক'রে বাহরে আসা কি এতই বেশী অস্বাভাবিক সম্রাট !

আকবর। এ কি সেলিম ?···বাংলাদেশের যুদ্ধ কি জয় ক'রে ফিরে এলে ?

সেলিম। বাংলাদেশে যুদ্ধ থাকলে অবশ্যই জয় ক'রে ফিরে আসতুম, কিন্তু বাংলাদেশে কোন যুদ্ধ জয় করবার জন্য যে আমায় পাঠান নি একথা আর সবাই যেমন জানে আপনিও তো তেমনই জানেন সম্রাট। সুতরাং ও প্রশ্ন নিরর্থক।

আকবর। তোমার এসব কথার অর্থ কি ? তুমি কি আমায় অপমান করতে চাও ?

সেলিম। আপনি আপনাকে যেমন অপমান করেছেন, তার চেয়ে বেশী অপমান

আর কেউ আপনাকে করতে পারবে না।

আকবর। তার মানে ?

সেলিম। তার মানে আপনি মিথ্যা কথা বলে আমায় বাংলাদেশে পাঠিয়েছিলেন। সেখানে আমার যাবার প্রয়োজন ছিল না। সেখানে এখন বস্তুতঃ কোনও যুদ্ধই নেই।

আকবর। সেলিম, তুমি পুত্র হতে পারো কিন্তু মনে রেখো—আমার সহেরও সীমা আছে।

সেলিম। শুধু আমার ধৈর্যেরই সীমা নেই আপনি মনে করেন ?

আকবর। তোমার এত স্পর্ধা!…জান তোমার ঐ স্পর্ধিত রসনা আমি চিরকালের মতো চুপ করিয়ে দিতে পারি ?

যোধ। সেলিম! সেলিম!

সেলিম। সম্রাট! রসনা স্তব্ধ হবার আগে আমি যে প্রশ্ন করব তার জবাব আপনাকে আজ দিয়ে যেতে হবে— আনারকলি কোথায় সম্রাট ?

আকবর। একটা বাঁদীর সংবাদ নেওয়া ছাড়া সম্রাটের আরও ঢের বেশী কাজ থাকে।

সেলিম। আমিও তাই মনে করতুম সম্রা ট। কিন্তু সে ভুল আজ ভেঙেছে। আজ জানলুম সম্রাটের কর্তব্যের চেয়ে কামনা বড়।

আক। সম্রাজ্ঞী, তোমার মুখ চেয়ে তোমার পুত্রের স্পর্ধা বার বার আমি মার্জনা করব না, একথা তোমার ঐ উন্মাদ পুত্রকে বুঝিয়ে দাও। এর পরেও যদি সহ্য করি তাহলে আমার বিচারশক্তিতে কলঙ্ক স্পর্শ করবে। আমি রাজা, আমার বিচার পুত্র-আত্মীয়-নির্বিশেষে নিরপেক্ষ হওয়া দরকার।

সেলিম। সম্রাট, আপনি সুবিচারের অহঙ্কার করছেন·· ভাল, আপনার কাছেই আমি সুবিচারের প্রার্থনা জানাচ্ছি। আমার অভিযোগ সম্রাট আকবরের বিরুদ্ধে—তিনি মিথ্যা কথা বলে আমায় স্থানান্তরিত ক'রে আমার পত্নীকে হরণ করেছেন। করুন—বিচার করুন!

আকবর। সম্রাজ্ঞী তোমার পুত্র পীড়িত—আমি চিকিৎসক প্রেরণ করি—

[প্রস্থানোদ্যত]

সেলিম। আপনি আমার প্রশ্নের উত্তর দিয়ে তবে এ কক্ষ ত্যাগ করবেন!

আকবর। আমায় নিতান্ত বাধ্য হয়েই হয়ত রক্ষী ডাকতে হবে।

সেলিম। (অকস্মাৎ তরবারি বার ক'রে) তার আগে আপনার বিচার আমিই

ক'রে দেব—

যোধ। (আর্তস্বরে) সেলিম ··বাইরে যাও, আমার অনুরোধ, আদেশ!

সেলিম। (তরবারি কোষবদ্ধ ক'রে) তাই হোক মা, আমি যাচ্ছি। কিন্তু আপনি জানবেন সম্রাট, যদি পৃথিবীর সীমার মধ্যে সে থাকে, আমি তাকে খুঁজে বার করবই। আপনার সমস্ত রাজশক্তি তাকে আমার কাছ থেকে আড়াল করতে পারবে না

[প্রস্থান]

আকবর। (কিছুক্ষণ স্তব্ধ থেকে—যেন রোষ দমন ক'রে নিয়ে) সম্রাজ্ঞী, এর পরেও তুমি ঐ উন্মাদকে মার্জনা করতে বল ?

যোধ। আপনিই ভেবে দেখুন সম্রাট, আপনার বিবেক কি বলে—

[প্রস্থান]

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

আগ্রা প্রাসাদ। অন্তঃপুর। সেলিমের মহল।

[রাবেয়ার প্রবেশ]

রাবেয়া। এসেছি। পালিয়ে এসেছি।·· আজ চারদিন ধরে অনাহারে অনিদ্রায় ঘুরে বেড়াচ্ছি সেলিমের সঙ্গে দেখা করার জন্য—কিন্তু সুযোগ পাই নি। আজ এতক্ষণে সুযোগ মিলেছে···হে ভগবান, আর একটু বল দাও দেহে, আর একটু···একবার সেলিমের সঙ্গে দেখা হলে আমি আর কিছু চাই না।

[সেলিমের প্রবেশ]

সেলিম। এ কি: কে এখানে ? তুমি কে বাছা ?

রাবেয়া। তুমি কি শাহজাদা সেলিম ? সত্য বল, প্রতারণা করো না।

সেলিম। আমিই সেলিম। কিন্তু তুমি কে উন্মাদিনী, তোমায় এখানে প্রবেশ করতে দিলে কে ?

রাবেয়া। কেউ দেয় নি প্রবেশ করতে। আজ চারদিন ধরে প্রবেশ করবার চেষ্টা করোছ—ঐ প্রহরীগুলো তাড়িয়েছে। দেখ কত মেরেছে···পায়ে ধরে কেঁদেছি, তবুও ঢুকতে দেয় নি—আজ অনেক কষ্টে এসেছি, তোমার সঙ্গে আমার বড় দরকার, কিন্তু তুমি প্রতারক নও তো ? তুমিই সেলিম, বল বল, ঈশ্বরের নামে শপথ করে বল, তুমি সেলিম কিনা ?

সেলিম। উন্মাদিনী, আমার সঙ্গে তোমার কিসের প্রয়োজন? যদি ভিক্ষার প্রয়োজনে এসে থাক, আমি তোমায় এখনই ভিক্ষা দিচ্ছি।

রাবেয়া। না না, ভিক্ষা নয়। দেখছ আমার গায়ে রত্নালঙ্কারের চিহ্ন? একখানি একখানি ক'রে খুলে দিয়েছি প্রহরীদের হাতে···শুধু এখানে আসবার জন্য। চারিদিকে সম্রাটের লোক, চারিদিকে সতর্ক কান। যদি সেলিম না হয়ে অন্য কোন লোক আমার কথা শোনে, তাহলে আমার আর রক্ষা নেই—আমি যাই তাতে দুঃখ নেই কিন্তু উদ্দেশ্যসিদ্ধির আগে মরতে চাই না—

সেলিম। নারী, আমি ঈশ্বরের নামে শপথ ক'রে বলছি, আমিই সেলিম,··—কিন্তু তোমার এমন কি প্রয়োজন থাকতে পারে আমার সঙ্গে?

রাবেয়া। আছে, আছে, প্রযোজন আছে, শাহ্জাদা, তুমি দেখতে পাচ্ছ না, কিন্তু আমার সারা অঙ্গ ধু-ধু ক'রে জ্বলছে, দেহের অঙ্গে অঙ্গে জ্বালা! শিরায়-উপশিরায় অস্থিতে-মজ্জাতে জ্বালা, প্রতি রক্তবিন্দুতে যেন বিষের আগুন জ্বলছে—এ জ্বালা শেষ হবে যখন আমার প্রিয়তমের পাশে মাটিতে শোব—তার আগে নয়—

সেলিম। রমণী, তোমার কি অভিযোগ বল আমার কাছে—

রাবেয়া। অভিযোগ নয় শাহ্জাদা, বিচার। আমিই বিচার ক'রে শাস্তি দিতে এসেছি ··শাহ্জাদা, আনারকলি কোথায় আছে জান?

সেলিম। (সাগ্রহে) না, জানি না। কিন্তু তুমি জান? রমণী, বল বল, তোমায় প্রচুর পুরস্কার দেব, আমার গলার এই রত্নহার, কোটি মুদ্রা মূল্যের—

রাবেয়া। আবার তুমি আমায় রত্নহারের প্রলোভন দেখাচ্ছ! তোমায় বলি নি আমার গায়ের রত্নালঙ্কার একখানি একখানি ক'রে খুলে দিয়েছি তোমার আনারকলির সংবাদ শোনাবার জন্য—

সেলিম। কিন্তু সে কোথায় আছে বল তাড়াতাড়ি, আমি হতাশ হয়ে পড়েছি। কত দিকে লোক পাঠিয়েছি, রাজসভার প্রত্যেক কর্মচারীকে প্রশ্ন করেছি—কেউ বলতে পারে নি। বল, বল!

রাবেয়া। কে বলবে তোমায়, যে বলতে পারত সে মাটির নীচে অসাড় হয়ে পড়ে রয়েছে!···আনারকলিকে লাহোর দুর্গে বন্দী ক'রে রাখা হয়েছে; দুর্গের শেষ প্রান্তে উদ্যানের এক কোণে তার কুটির, দুর্গাধ্যক্ষ নুরুদ্দীন নিজে তাকে পাহারা দেয়। সেখানে তাকে জীবন্ত সমাধি দিয়ে রেখেছে—

সেলিম। কিন্তু তুমি কি ক'রে জানলে নারী? যে সংবাদ কেউ জানে না—

রাবেয়া। আমি, আমি···আমি মুরাদ খাঁর স্ত্রী। মুরাদ খাঁকে চিনতে?·· আমি

তাঁর স্ত্রী। বহু স্ত্রীর মধ্যে একজন নয়, আমিই তাঁর একমাত্র—প্রিয়তমা স্ত্রী।

সেলিম। মুরাদ খাঁকে দিন-চারেক পূর্বে সর্পাঘাতে প্রাণদণ্ড দেওয়া হয়েছিল না? কী এক রাজনৈতিক কারণে?

রাবেয়া। কিন্তু কি রাজনৈতিক কারণ জান? আনারকলিকে হরণ ক'রে লাহোর দুর্গে পৌঁছে দেবার ভার ছিল তার ওপর। সম্রাট বলেছিলেন যে, এই কাজ যদি ঠিকমত করতে পারে তাহলে পাঞ্জাবের সুবেদারী তার। কিন্তু কেউ যদি জানতে পাবে তাহলে তার কঠিনতম শাস্তি হবে।···সম্রাট জানতেন সে পুরস্কারের লোভে আর প্রাণের ভয়ে একথা কাউকে বলবে না—তাই সে যখন কাজ শেষ ক'রে ফিরে এল, সম্রাট তাকে পুরস্কার দিলেন এই শোচনীয় মৃত্যু! জান, তোমার বাবা তারপর আমার কাছে পাঠিয়েছিলেন সহস্র স্বর্ণমুদ্রা, মুরাদ খাঁর প্রভুভক্তি আর প্রাণের মূল্য। সে স্বর্ণমুদ্রা আমি দু'হাতে মুঠো মুঠো করে সেই বাহকদের ছুঁড়ে মেরেছি···রাস্তা তাদের রক্তে রাঙা হয়ে উঠেছে···। সম্রাট আকবর স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধ জানতেন না তাই অমন ভুল করলেন। স্বামী সকলের কাছে গোপন করতে পারে, কিন্তু স্ত্রীর কাছে পারে না—সে আমায় বলেগিয়েছিল যাবার আগে, আবার লাহোর থেকে ফিরে আমার সঙ্গে দেখা করেছিল। ভগবান আছেন মাথার উপর, তিনিই ঐ কথা বলিয়েছেন তাকে দিয়ে·· সম্রাট সাপকে দিয়ে খাইয়েছেন মুরাদ খাঁকে···কিন্তু সাপিনীর কামড় কেমন জানেন না, তাতে বড় জ্বালা · হাঃ হাঃ ·

সেলিম। রমণী, তুমি যে পৈশাচিক ইতিহাস বিবৃত করলে তা এতই ভয়ঙ্কর যে আমার বিশ্বাস হচ্ছে না : কিন্তু সত্যই যদি আনারকলি লাহোর দুর্গে থাকে, তাহলে তুমি প্রচুর পুরস্কার পাবে। আমি তোমার সমস্ত ক্ষতি পূরণ ক'রে দেব—

রাবেয়া। তুমি আমায় পুরস্কার দেবে! তুমি? ··তোমার পিতা আমার স্বামীকে বিশ্বাসঘাতকতা ক'রে হত্যা করেছে, তার পুত্রের কাছ থেকে নেব আমি পুরস্কার? শাহজাদা সেলিম, তোমায় আমি ঘৃণা করি—তোমায় ঘৃণা করি, তোমার পিতাকে ঘৃণা করি, সমস্ত রাজপরিবারকে ঘৃণা করি। কী ক্ষতিপূরণ তুমি করতে পার শাহজাদা, তোমার ক্ষমতা কতটুকু? · পার আমার স্বামীকে ফিরিয়ে দিতে? না আমাকেই তুমি রাজরোষ থেকে রক্ষা করতে পারবে? তুমি কি মনে করো তুমি লাহোর থেকে ফিরে আসা পর্যন্ত আমি জীবিত থাকব? সম্রাট আকবর যখন জানবেন তাঁর সমস্ত পৈশাচিক আয়োজন আমি ব্যর্থ ক'রে দি.. . তখন তিনি তার শোধ নেবেন না? বাঁচবার সাধও আমার নেই, আমি স্বামীর কাছেই যেতে চাই কিন্তু তার আগে আমি প্রতিশোধ নেবার জন্য এসেছিলুম শাহজাদা, হত্যাকারীর পুত্রের কাছ

পুরস্কার নেবার জন্য নয়—সম্রাট যে কথা তোমার কাছ থেকে গোপন করবার জন্য আমার স্বামীকে হত্যা করলেন সেই কথা তোমায় জানিয়ে দিলুম, এই তো চমৎকার প্রতিশোধ! বাকী কাজ করবে তার বিবেক তুমি—তুমিও একদিন সম্রাট হবে! করবে না হত্যা অকারণে? ঐ তো তোমাদের রাজনীতি! না, না,·· আমার কাজ হয়ে গেছে, আমি যাই, এখানকার বাতাসে আমার স্বামীর অন্তিম আর্তনাদ মিশিয়ে আছে···এ যেন বিষ···

[প্রস্থান। অপর দিক দিয়ে যোধপুরীর প্রবেশ]

যোধ। সেলিম!

সেলিম। মা, আনারকলির সংবাদ পেয়েছি। কিন্তু যদি জানতে, মানুষ কী নৃশংস হতে পারে মানুষের উপর!

যোধ। জানি বৎস, শুনেছি। আমি ঐখানে ছিলুম।...কিন্তু উপায় নেই, তিনি সম্রাট, তোমার পিতা···একথা নিয়ে এখন আলোচনা ক'রো না, একথা সম্রাটের কানে পৌছবেই, তিনি তখন আরও ভয়ঙ্কর কিছু ক'রে না বসেন। আর সময় নষ্ট ক'রো না বৎস, দেখ যদি এখনও বাঁচাতে পার অভাগিনীকে!

সেলিম। আমি এখনই যাচ্ছি মা। মাত্র একশো জন শরীররক্ষী নিয়ে আমি যাত্রা করব। আর এক প্রহরের মধ্যেই আগ্রা ত্যাগ করব।

[উভয়ের প্রস্থান। একটু পরে আকবর ও এনায়েৎ খাঁর প্রবেশ]

আকবর। সেলিম চলে গেছে?···যা ভেবেছি তাই—এনায়েৎ খাঁ, আপনি কদিনে লাহোর পৌছতে পারেন?

এনায়েৎ। যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি গেলে—যদি ডাক ঠিক পাই, দুদিন সময় লাগবে।

আকবর। আর এখনও এক প্রহর বেলা আছে।· কাল রাত্রি এক প্রহরের মধ্যে আপনাকে লাহোরে পৌছতে হবে।·· সেখানকার দুর্গে আনারকলি বন্দিনী আছে। তার বিষপানে প্রাণদণ্ড হবে। এই আমার লিখিত আদেশ, দুর্গাধ্যক্ষ খাঁ নুরুদ্দীনকে দেবেন। বেচারী বালিকা! সাম্রাজ্যের কল্যাণের জন্য মরতেই হবে তাকে।·· কিন্তু মনে রাখবেন এনায়েৎ খাঁ, সেলিম হয়ত এতক্ষণে যাত্রা করেছে, সেও লাহোর যাবে। যেমন ক'রেই হোক তার পৌছবার আগে আপনাকে লাহোর পৌছতে হবে।·· প্রচুর পুরস্কার পাবেন। কিন্তু মনে রাখবেন, যদি ব্যর্থ হন—তাহলে আমার রাজসভায় আপনার আর স্থান নেই।

এনায়েৎ। আপনার আদেশ প্রতিপালিত হবে সম্রাট।

[প্রস্থান]

আকবর। এইবার রাবেয়া! তোমারও কথাও ভুলি নি, ভুলব না। আর সেলিম! তোমাকে কঠিন শাস্তি দিতে পারতুম। কিন্তু একথা প্রচার হওয়া আমি পছন্দ করছি না তাই। যাহ হোক, আনারকলির মৃত্যুই তোমার ধৃষ্টতার উত্তর। ·· এতেই তোমার শিক্ষা হওয়া উচিত যে সম্রাটের ইচ্ছার বিরুদ্ধতা করা তোমার শক্তির অতীত। আনারকলি·· আনারকলি···কী করব, উপায় কি·· তাই বলে আমি পুত্রের কাছে পরাজয় মেনে নিতে পারি না!

[প্রস্থান]

দ্বিতীয় দৃশ্য

লাহোর দুর্গ। আনারকলির কক্ষ। আনারকলি একাকী।

আনারকলি। প্রিয়তম, সমস্ত আলো-আঁধারের পারে তুমি দাঁড়িয়ে রয়েছ, সমস্ত অন্তর-আকাশ জুড়ে·· আমার আর দুঃখ নেই, মনে মনে পেয়েছি তোমায়, বাইরে না-ই বা পেলুম।·· ভিতরে-বাইবে, জীবনে-মরণে, লোকলোকান্তর, যুগযুগান্তর ধরে সমস্ত সময়ে সকলের মাঝে তুমি। তোমার এই বিশ্বরূপ আমায় কি সকরুণ আলিঙ্গনে ঘিরে রযেছে—দিনরাত যেন কী সুগভীর সঙ্গীত তোমার মুখের প্রেম-বাণী বহন ক'রে আনছে···। বাইরে থেকে তোমায় হরণ করেছে, তাই কি তুমি এমন ক'রে আমার ভেতরে সব কিছু জুড়ে এসেছ? আমার সকলের মধ্যে তুমি!

[নুরুদ্দীনের প্রবেশ]

নুরু। মা!

আনার। পিতা!· এ সময়ে সহসা আপান কেন? কোন বিশেষ প্রয়োজন আছে কি?·· এ তো আপনার বিশ্রামের সময়।·· চুপ ক'রে নতশিরে দাঁড়িয়ে আছেন কেন?·· আপনার হাতে ও কি?

নুরু। সম্রাটের আদেশপত্র মা।

আনার। সম্রাটের আদেশ! কি আদেশ পিতা? আরও কিছু দুঃসংবাদ আছে কি? বলুন না, আমার মুখের দিকে চেয়ে দেখুন, আমি কেমন স্থির রয়েছি। আর কোন দুঃখই আমাকে পীড়া দিতে পারবে না। আপনি বলুন সম্রাটের কি আদেশ!

নুরু। আমি পারব না মা। আমি পারব না তোমায় সে আদেশ শোনাতে।

আনার। আমি আপনার কন্যা। পরের কাছ থেকে শোনবার আগে আপনার কাছ থেকে শোনা আমার ঢের বেশী শান্তির হবে।…ও কি আমার প্রাণদণ্ড ?

মুরু। আদেশ পওয়ামাত্র বিষপ্রয়োগে তোমায় হত্যা করতে হবে—এই আদেশ ! ওঃ…

আনার। পিতা, ছিঃ ! আপনি অধীর হবেন না। এ তো সুসংবাদ। আমার এ জীবন কি এত সুখের যে তার সমাপ্তির চিন্তায় আপনি অধীর হচ্ছেন ?…সম্রাট তো এ অভাগিনীর প্রতি অনুগ্রহ করেছেন।…আমার অদৃষ্টলিপি কী তা কি আপনি আজও বোঝেন নি ? ‥বিষ আনুন পিতা, আপনার কন্যা সম্রাটকে আশীর্বাদ করতে করতে মরবে। ভেবে দেখুন—কী আশায় আমি আর বাঁচব।…এ জীবন্ত সমাধির চেয়ে মৃত্যু কি ঢের—ঢের বেশী সুখের হবে না ?

মুরু। তাই হোক মা। কেন আমায় পিতৃসম্বোধন করেছিলি অভাগিনী ? …ওঃ…

[প্রস্থান]

আনার। প্রিয়তম ! এতদিন আত্ম-প্রবঞ্চনাই করেছি। হয়ত আর একবার তোমায় বাইরেও দেখবার সাধ ছিল।

[মুরুদ্দীনের প্রবেশ]

মুরু। মা ! .

আনার। পিতা, এনেছেন বিষ ?…(তাঁর হাত ধরে) তার সঙ্গে দেখা হ'ল না…কিন্তু যদি দেখা হয় আপনি বলবেন, বলবেন তাকে যে তার আনারকলি তার যথাসর্বস্ব সমস্ত সত্তা দিয়ে তাকে ভালবেসেছিল। পিতা, তাকে বলবেন যে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তার আনারকলি তার কথা চিন্তা করেছে। আনারের দেহের প্রতি রক্তবিন্দু স্থির হবার পূর্ব পর্যন্ত সেলিমের নাম করতে থাকবে, বলবেন—বলবেন তাকে ?

মুরু। মা মাগো, আমি পারব না। এ দাসের জীবনের চেয়ে মৃত্যুই ভাল। আমি পা"ন করব না এ আদেশ।

আমার। তাহলেই কি আমায় রক্ষা করতে পারবেন পিতা ? · আমারই বা এই বন্ধ জীবনে প্রয়োজন কি ?…না না…আমি মরছি, কিন্তু আপনি বলবেন তাকে। বলবেন যে সন্ধ্যার মৃদু হাওয়া যখন আনারকলিকে স্পর্শ করত তখন তার মনে হ'ত যেন সেলিম তাকে চুম্বন করছে।‥ তাকে বলবেন আনারের জন্য সে যেন শোক না করে। আনার মরে তার সমস্ত অস্তিত্বে জড়িয়ে থাকবে। সে ঘুমুলে

মৃদু হাওয়ার সঙ্গে গিয়ে তার কপালের ঘাম মুছিয়ে দেবে—নিদ্রার মধ্যে স্বপ্ন হয়ে তার আনার তাকে আলিঙ্গন করবে।…পিতা, তাকে বলবেন…

শুরু। মা…

আনার। হ্যাঁ পিতা, বিষ দিন…আর দেরি করবেন না (বিষগ্রহণ)। · যদি তার সঙ্গে একবার দেখা হ'ত পিতা…কোনরকমে যদি সম্ভব হ'ত—কাছে থেকে নয়, দূর থেকে একবার দেখে চলে আসতুম—

গুরু। মা, আমি বাইরে যাই, আমার চোখের সামনে নয়—

আনার। পিতা, মৃত্যুর সময় কন্যার কাছে থাকবেন না ? মরণের সময় নিঃসঙ্গ থাকতে যে বড় কষ্ট হবে।…আমি আর দেরি করব না পিতা। একটু দাঁড়ান—

[বিষপান]

জানেন পিতা, আজ সকালের দিকে একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলুম, স্বপ্নে দেখলুম যেন আমি মরে গিয়েছি, আমার শবদেহ পড়ে রয়েছে এই ঘরে, এইখানে, আর তার ওপর ··সে …সে পড়ে কাঁদছে। (আগ্রহভরে) যদি—যদি সে আসে, তাকে আপনি সান্ত্বনা দেবেন পিতা। তাকে বলবেন আনারের কোন দুঃখ ছিল না, সে মরবার আগে তোমাকে তার অন্তরের মধ্যে পেয়েছিল। আর সে মরেও তো তোমায় ছেড়ে বেশীদূরে যেতে পারবে না, সে সর্বদা তোমার কাছে থাকবে—তোমার ছায়ার সঙ্গে মিশে, তোমার দেহের সুগন্ধের সঙ্গে মিশে, তোমার অণুতে পরমাণুতে মিশে…। (আপন মনে) না না, তার এসে কাজ নেই, বড় কষ্ট পাবে সে·· কিন্তু যদি আসে পিতা, তাকে আমার কথা বলবেন।…আর কিছু বলে দরকার নেই, শুধু বলবেন তাকে—তার আনারকলি তাকে ভালবাসত। আর ভালবাসবেও যুগযুগান্তর ধরে জন্মজন্মান্তর ধরে,—(ঢলে পড়ে) দেহে যেন কী গভীর ক্লান্তি আসছে·· চোখে যেন আর তোমায় দেখতে পাচ্ছি না, প্রিয়তম ! দাঁড়াও, দাঁড়াও আমার সামনে…(ক্লান্ত সুরে কী যেন গান গাইবার চেষ্টা করল)

[কণ্ঠস্বর ক্রমে ক্ষীণতর হয়ে এল

এসেছ প্রিয়তম ? কিন্তু আমার যাবার সময় হ'ল যে ! এস, তোমার আলিঙ্গনে ধরে রাখ আমায়…এস প্রিয় !

[মৃত্যু

[সেলিমের প্রবেশ]

সেলিম। আনার—আনার—আনারকলি !

গুরু। (স্বপ্নাবিষ্টের মতো) চুপ, চুপ শাহ্‌জাদা, বেচারী বড় কষ্টের পর একটু শান্তি পেয়েছে। ডাকবেন না, তাহলে হয়ত আত্মা তার আর থাকতে পারবে না, ফিরে আসবে।

সলিম। তবে তুমি নেই আনার! পারলুম না তোমায় বাঁচাতে! আ- .. র!

[মৃতদেহের উপর আছাড় খেয়ে পড়ল]

[যেন মনে হতে লাগল বাতাসে একটি করুণ সুর ভেসে বেড়াচ্ছে]

'যাহা কিছু আছে সকলি ঝাঁপিয়া,
ভুবন ছাপিয়া জীবন ব্যাপিয়া,
দাঁড়াও যেখানে বিরহী এ হিয়া
তোমার লাগিয়া একেলা জাগে!
...দাঁড়াও আমার আঁখির আগে।"

যবনিকা